

অ.আ.

Pollyunnyane Rabindranath (collection
of writings on Rabindranath Tagore)
by Dr. Anwarul Karim
Price : BDT 150.00 only
US $ 4.00
Au. Aa > dhaka>Bangladesh

ISBN 984814052-2

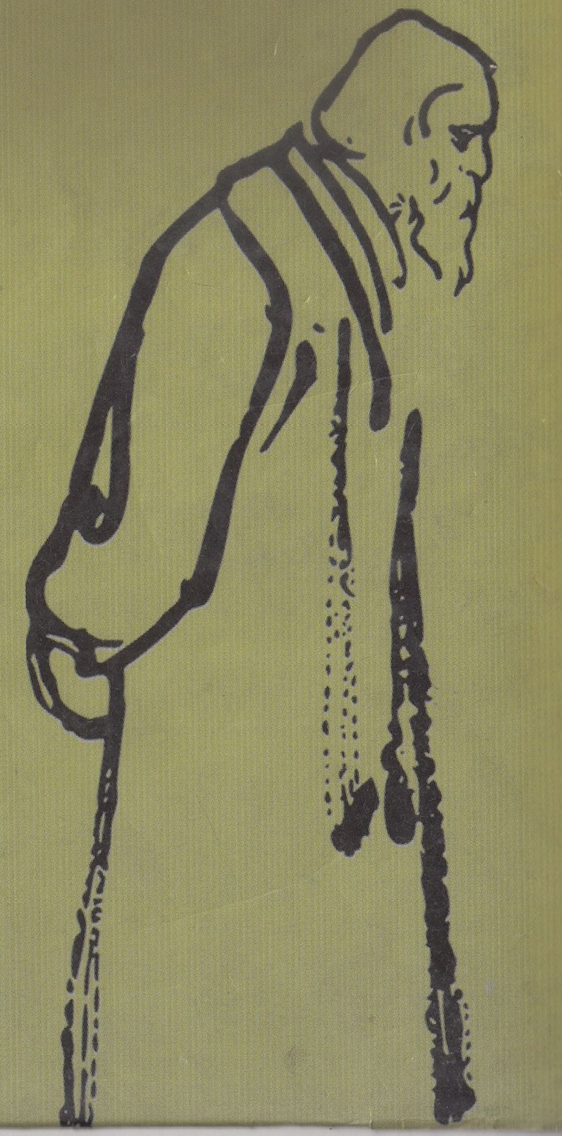
পল্লী উন্নয়নে রবীন্দ্রনাথ

ড. আনোয়ারুল করীম

অ.আ.

পল্লী উন্নয়নে রবীন্দ্রনাথ

ড. আনোয়ারুল করীম



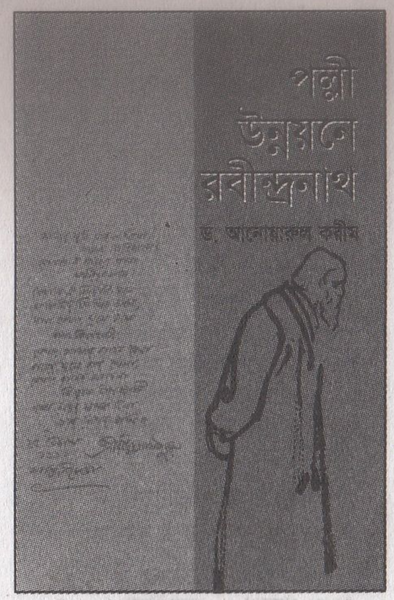
পল্লী উন্নয়নে রবীন্দ্রনাথ

ড. আনোয়ারুল করীম



পল্লীউন্নয়নে রবীন্দ্রনাথ

ড. আনোয়ারুল করীম



অ.আ.
অ. আ. প্রকাশন

উৎসর্গ

আমার মা
বেগম রহিমা খাতুন-কে
যিনি আমার সব গবেষণা ও
সাহিত্যচিন্তায় প্রেরণার উৎস।

অ.আ.

প্রকাশক ▸▸ অ. আ. প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
পরিবেশক ▸▸ সূচীপত্র
৩৮/২ক বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
ফোন ৭১১৩৮৭১

পল্লীউন্নয়নে রবীন্দ্রনাথ
ড. আনোয়ারুল করীম

স্বত্ব ▸▸ লেখক

প্রথম প্রকাশ ▸▸ সেপ্টেম্বর ২০০৪
প্রচ্ছদ ▸▸ মাসুদ কবির
মুদ্রণ ▸▸ সালমানী প্রিন্টিং প্রেস নয়াবাজার ঢাকা
কম্পোজ ▸▸ কম্পিউটার গ্যালাক্সী ৩৩ নর্থব্রুক হল রোড ঢাকা

Pallyunnayane Rabindranath by Dr. Anwarul Karim
Published by AU. AA. PROKASHION
Tel : 7113871. E-Mail : saeedbari@dhaka.net
Price : Tk 150.00 only. US $ 6.00

মূল্য ▸▸ ৳ ১৫০.০০ মাত্র

ISBN 984-8140-52-2

সূ | চী

প্রাক-কথন # ৯
পটভূমি এবং প্রস্তাবনা # ১৯

প্রথম অধ্যায়

রবীন্দ্র-সাহিত্যে পল্লীউন্নয়ন ভাবনার চালচিত্র # ২৪
রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন বিষয়ক গ্রন্থাদির পর্যালোচনা # ৭০
গ্রামবাংলার ঐতিহাসিক পটভূমি # ৭৮
পূর্ববাংলায় ঠাকুর এস্টেটের জমিদারি ও রবীন্দ্রনাথ # ৯৬
জমিদার রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পল্লীউন্নয়ন ভাবনার সূচনা # ১০০
রবীন্দ্রনাথ ও লোকসংস্কৃতি # ১১০
রবীন্দ্রনাথ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি # ১১৪
গ্রাম সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা # ১২১

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিলাইদহ পর্ব # ১২৯
শিলাইদহের কুঠিবাড়ি # ১৩৭
রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচি : শিলাইদহ # ১৪৬

তৃতীয় অধ্যায়

সাজাদপুর পর্ব # ২০৯

চতুর্থ অধ্যায়

পতিসর পর্ব # ২২৩

পঞ্চম অধ্যায়

শ্রীনিকেতন পর্ব # ২৪৪
শ্রীনিকেতনের আদর্শ ও কর্মনীতি # ২৫৫

ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রীনিকেতনের ইতিহাস ও আদর্শ : রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়া # ২৭৪

এক॥

রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা শুরু হয়েছিল তৎকালীন পূর্ববঙ্গে–শিলাইদহ এবং পতিসরে। সাজাদপুরে রবীন্দ্রনাথের অবস্থান খুব বেশি দিনের ছিল না। এখানে পল্লীউন্নয়নের তেমন কোনও পরিকল্পনা তাঁর ছিল না। অনেকটাই তদারকিতে সীমাবদ্ধ ছিল সাজাদপুরের জমিদারি— এখানে সৃজনশীল সাহিত্যে মেতেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

শিলাইদহ এবং পতিসরের শেষে শান্তিনিকেতন এবং শ্রীনিকেতন। শিলাইদহে পল্লীউন্নয়ন কালেই তিনি শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনেও কাজ শুরু করেছিলেন এবং এখানেই তাঁর কর্মকাণ্ডের পরিসমাপ্তিও ঘটেছিল। এখনও শ্রীনিকেতন রবীন্দ্রনাথের আদর্শ নিয়েই টিকে রয়েছে।

আজকে যাঁরা এনজিও কর্মকাণ্ড নিয়ে ব্যস্ত, রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে তাঁদের পথিকৃৎ হবেন। রবীন্দ্রনাথ দেশ ও মানুষকে ভালবাসতে গিয়েই তাদের কল্যাণে পল্লীউন্নয়ন কর্মকাণ্ড গড়ে তুলেছিলেন। এই গ্রন্থে সে সব কথাই লিখেছি।

রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বারবার তাঁর কবিতা, ছোটগল্প এবং চিঠিপত্রের সাহায্য নিতে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ পল্লীর যে জীবনকে দেখেছিলেন তাকে তিনি একদিকে তাঁর সাহিত্যে রূপায়িত করেছেন, অতঃপর সে জীবনের দুঃখদুর্দশাকে সরিয়ে তিনি একটি আলোকোজ্জ্বল প্রভাতের প্রত্যাশা করেছেন তাঁর পল্লীউন্নয়ন কর্মকাণ্ডে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা দেখেছি এক প্রজাদরদী জমিদার যিনি পল্লীউন্নয়নের মাধ্যমে মানুষকে রূপান্তরিত করতে চেয়েছেন মানবসম্পদে। তিনি গ্রামীণ অর্থনীতির পুনরুদ্ধার ঘটিয়ে গ্রামকে স্বনির্ভর করে তুলতে চেয়েছেন সমবায়ের ভিত্তিতে। বস্তুত, সমবায় ছিল তাঁর সকল কাজের ভিত্তি। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন গ্রামের উন্নতির মধ্যেই নিহিত রয়েছে সমগ্র বাংলাদেশের মুক্তি। তিনি লক্ষ করেছিলেন গ্রামের মানুষের অধিকাংশই কৃষিজীবী। সুতরাং কৃষির উন্নতি ঘটাতে পারলেই দেশের উন্নতি হবে। তবে কৃষির উন্নতি বলতে তিনি শুধু কৃষির ফলন বৃদ্ধি বোঝেন নি, তিনি চেয়েছিলেন এই উন্নতির মাধ্যমে কৃষকের হাতে অর্থ আসুক এবং যার মাধ্যমে সে সমৃদ্ধির পথে এগুতে পারে। তিনি মধ্যস্বত্বভোগীদের বিলোপ ঘটাতে চেয়েছিলেন এবং এ কারণেই তিনি কৃষিসংশ্লিষ্ট শিল্প প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন ছিল এদেশের অর্থনৈতিক মুক্তির অন্যতম সোপান। তিনি পল্লীসংগঠন এবং সমবায়ের মাধ্যমে যথার্থভাবে অর্থনৈতিক মুক্তির একটি বিপ্লব ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছিলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ভূমির উপর সর্বাধিক চাপ পড়েছে এবং এই ব্যবস্থার মাধ্যমে যে জমিদার ও জমিদখলকারী নামে একটি মধ্যস্বত্বভোগী সৃষ্টি হয় তারা গ্রামের সম্পদকে লুণ্ঠন করতে শুরু করে এবং শহরে ও নগরে বসবাস করে বিলাসিতায় নিমগ্ন হয়ে পড়ে। এর ফলে গ্রাম শ্রীহীন হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ জমিদারি দায়িত্ব নেবার পর গ্রামের এই অসহায় অবস্থা প্রত্যক্ষ করেন।

এখানে বলা প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথের পল্লী-চিন্তা খুব অল্পবয়সে হয়েছিল। খুব

ছেলেবেলায় তিনি পশ্চিমবঙ্গের দু-একটা গ্রাম দেখেছিলেন। এরপর ১৫ বৎসর বয়সে শিলাইদহে প্রথম গ্রামবাংলার সঙ্গে তাঁর পরিচয়। তিনি তাঁর 'ছবি ও গান' কাব্যে সর্বপ্রথম পল্লী প্রসঙ্গ নিয়ে এসেছেন। 'অভিলাস' কবিতা তাঁর ১২ বৎসর বয়সের লেখা। এখানে তিনি কৃষকদের কষ্ট করে ফসল ফলাবার কথা বলেছেন। এই কবিতায় তিনি যে শব্দ বা বাক্য রচনা করেছেন যেমন, 'রৌদ্রের প্রখর তাপে দরিদ্র কৃষক' অথবা 'ঘর্মসিক্ত কলেবরে করিছে কর্ষণ' 'সমস্ত বর্ষের তার শ্রমের যে ফল'—এ সব থেকে পল্লী এবং তার মানুষের প্রতি তাঁর এক দরদি মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

শিলাইদহে থাকতে রবীন্দ্রনাথ যে কৃষককে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তা ফুটে উঠেছে 'সোনার তরী' কাব্যে:

সোনার ক্ষেত্রে কৃষাণ বসিয়া
কাটিতেছে পাকা ধান,
ছোট ছোট তরী পাল তুলে যায়
মাঝি বসে গায় গান।
দূরে মন্দিরে বাজিছে কাঁসর
বধূরা চলেছে ঘাটে,
মেঠো পথ দিয়ে গৃহস্থজন
আসিছে গ্রামের হাটে।

অথবা, গীতবিতানের এই গান:

আমরা চাষ করি আনন্দে
মাঠে মাঠে বেলা কাটে সকাল হতে সন্ধে।।
রৌদ্র ওঠে, বৃষ্টি পড়ে, বাঁশের বনে পাতা নড়ে,
বাতাস ওঠে ভরে ভরা চষা মাটির গন্ধে।।

রবীন্দ্রনাথ কৃষকদের দুঃখকষ্ট এবং দারিদ্র্যের মধ্যেও তাদের আনন্দপ্রিয়তাকে অবলোকন করেছিলেন। কৃষকেরা ফসল বুনতে এবং ধান কাটতে গিয়ে তারা বারমাসী, ধুয়ো, প্রভৃতি গান গেয়ে থাকে। নদীতে নৌকার মাঝি নৌকা বাইতে বাইতে গান গেয়ে থাকে—এই গানের মাধ্যমে তার শ্রমের ক্লান্তি দূর হয়ে যায়—তার মন এক অনির্বচনীয় সৌন্দর্য ভাবনার সঙ্গে মিশে যায়। এ কারণেই রবীন্দ্রনাথ সকল কাজের শুরুতে 'সংগীত' এর ব্যবহার ঘটাতে চেয়েছিলেন। এর মধ্যেই জাগে আনন্দ—যা কাজকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর পল্লীউন্নয়নে কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশা প্রত্যক্ষ করে তাদের সামগ্রিক উন্নয়ন ঘটাতে চেয়েছিলেন। এ প্রসংগে তিনি তাদের আয়-ব্যয় সংবলিত বাজেট, তাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

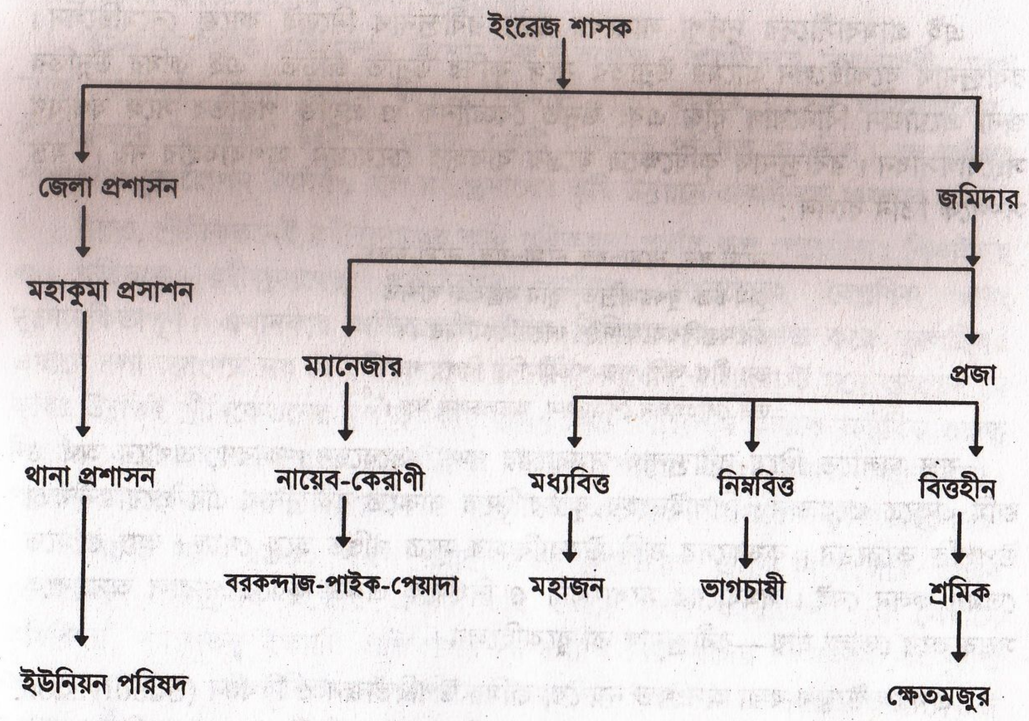
এ সম্বন্ধে করুণাময় মুখার্জী তাঁর 'Tagore's thoughts and work on Agrarian Reforms' গ্রন্থে উল্লেখ করেন:

> "No single life of the peasant`s life the poet would ignore: his income, his budget, his happiness, health, education, culture, mode of living, his attitude, even his sense of beauty and joy,—'the joy of creation' as the poet would call it."[১]

রবীন্দ্রনাথ বিরচিত নানা ছোটগল্প, কবিতা এবং উপন্যাসে পল্লীগ্রামের সমস্যা

নানাভাবে এসেছে। অনেক গল্পে রবীন্দ্রনাথ জমিদারদের মন-মানসিকতাকেও টেনে এনেছেন। এখানে কোথাও সহমর্মিতা লক্ষ করা গেছে আবার কোথাও প্রজা-পীড়নও ঘটে গেছে সকলের অলক্ষ্যে। এমনি একটি গল্পের নাম 'হালদার গোষ্ঠী'। 'গোরা' উপন্যাসে গোরা গ্রামাঞ্চলে ভ্রমণ করে গ্রাম-সমস্যাকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। অপরদিকে 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে নিখিলেশকে স্বদেশী আন্দোলনের সাথে যুক্ত করেছেন। কিন্তু উভয়ের মানসিকতা ভিন্নখাতে প্রবাহিত হয়েছিল। মানুষের চরিত্রের এই বিভিন্নতাও রবীন্দ্রনাথ যে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তার বিবরণ ও পাওয়া যায় এসব গল্প-উপন্যাসে।

শিলাইদহে জমিদারি দায়িত্ব নিয়েই রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন চাষিদের করুণ অবস্থা। তাই গ্রামীণ অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন তাঁর একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। রবীন্দ্রনাথ তখনকার সমাজচিত্র এঁকেছিলেন নিম্নোক্তভাবে।



রবীন্দ্রনাথ গ্রামের মহাজনী কারবার প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এ কারণে জমি হস্তান্তরের বিষয়টি নিয়ে তিনি ভেবেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন চাষির হাতে জমি তুলে দিলেই চাষির সমস্যার সমাধান হবে না কারণ দারিদ্র্যের কারণে তার স্বত্ব সেই মুহূর্তে মহাজনের হাতে গিয়ে পড়বে। সে শোষিত হবে। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন:

> "মূল কথাটা এই— রায়তের বুদ্ধি নেই, বিদ্যে নেই, শক্তি নেই, আর ধনস্থানে শনি। তারা কোনমতে নিজেকে রক্ষা করতে জানে না। তাদের মধ্যে যারা জানে তাদের মতো ভয়ঙ্কর জীব আর কেউ নেই। রায়ত-খাতক রায়তের ক্ষুধা যে কত সর্বনেশে তার পরিচয় আমার জানা আছে। তারা যে প্রণালীর ভিতর দিয়ে স্ফীত হতে হতে জমিদার হয়ে ওঠে, তার মধ্যে শয়তানের সকল শ্রেণীর অনুচরেরই জটলা দেখতে

পারে।... অতএব রায়ত যতদিন বুদ্ধি ও অর্থের তহবিলে সম্পন্ন হয়ে না ওঠে ততদিন 'উচল' আইনও তার পক্ষে 'অগাধ জলে' পড়বার উপায় হবে।... আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা তাতে বলতে পারি, আমাদের দেশের মূঢ় রায়তদের জমি অবাধে হস্তান্তর করবার অধিকার দেওয়া আত্মহত্যার অধিকার দেওয়া। একসময় সেই অধিকার তাদের দিতেই হবে, কিন্তু এখন দিলে কি সেই অধিকারের কিছু বাকি থাকবে?"[২]

এ বিষয়ে যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। রবীন্দ্রনাথ বেশ বুঝতে পেরেছিলেন সাধারণ মানুষ নিজেদের সম্বন্ধে কিছুই জানে না। তিনি বলেন :

"আমাদের দেশে লোকসাধারণ এখনও নিজেকে লোক বলিয়া জানে না, সেই জন্য জানান দিতেও পারে না।... আমাদের ভদ্রসমাজ আরামে আছে, কেন না আমাদের লোক সাধারণ নিজেকে বুঝে নাই। এইজন্য জমিদার তাহাদিগকে মারিতেছে, মহাজন তাহাদিগকে ধরিতেছে... আমাদের দেশে জনসাধারণ আজ জমিদারের, মহাজনের, রাজপুরুষের— মোটের উপর সমস্ত ভদ্র-সাধারণের দয়ার উপর অপেক্ষা রাখিতেছে।"[৩]

এই গ্রামবাসীদের দুর্দশা লাঘবের জন্য রবীন্দ্রনাথ নিজেই কাজে নেমেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন গ্রামের উন্নতির সঙ্গে কৃষির উন্নতি জড়িত। এই কৃষির উন্নতির জন্য প্রয়োজন বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং উন্নত বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি পদ্ধতির সঙ্গে যথাযথ সংযোগসাধন। রবীন্দ্রনাথ কৃষিক্ষেত্রে যন্ত্রের ব্যবহার চেয়েছেন, অপব্যবহার নয়।[৪] যন্ত্র সম্পর্কে তিনি বলেন :

'নমো যন্ত্র, নমো–যন্ত্র নমো–যন্ত্র, নমো-যন্ত্র!
তুমি চক্র মুখরমন্দ্রিত, তুমি বজ্রবহ্নি বন্দিত
তব বস্ত্রবিশ্ববক্ষোদংশ ধ্বংসবিকট দন্ত।।
তব দীপ্ত-অগ্নি-শত-শতঘ্নী-বিঘ্ন বিজয় পন্থ।
তব লৌহগলন শৈলদলন, অচলচলন মন্ত্র।"[৫]

যন্ত্র চালাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ সমবায়ের কথা ভেবেছেন। কারণ, এখানে অর্থ ও জমি একত্রে প্রয়োজন। শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে থাকতে রবীন্দ্রনাথ এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন। কৃষকদের জমি উত্তরাধিকার সূত্রে খণ্ডিত হয়ে গেছে। অল্প জমিতে তেমন ফলন নেই। সমবায়ের মধ্যে ধনী ও নির্ধনকে একত্র করতে পারলে অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলা যায়—রবীন্দ্রনাথ তা বুঝেছিলেন।

এখানে উল্লেখ করা অসংগত নয় যে, জমির উপবিভাজন ও বিখণ্ডন (Subdivision and fragmentation) বাংলাদেশের (তৎকালীন পূর্ব ও পশ্চিমবাংলা) কৃষি-ব্যবস্থার একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন :

"ঢের লোকে এসব জমি চাষ করে। কারো বা দুই বিঘা জমি, কারো বা চার, কারো বা দশ। জমির ভাগগুলি সমান নয়, সীমানা আঁকা বাঁকা। এই জমিতে যখন চাষ চলিতে থাকে তখন প্রথমেই এই কথা মনে হয় হালের গরু কোথাও বা জমির পক্ষে যথেষ্ট, কোথাও বা যথেষ্টের চেয়ে বেশি, কোথাও বা তার চেয়ে কম।... আঁকা বাঁকা সীমানায় হাল বারবার ঘুরাইয়া লইতে গোরুর অনেক পরিশ্রম মিছা নষ্ট হয়।[৬]

বর্তমানে এই অবস্তা আরও সংগীন। গ্রামে জমির বিঘা ভেঙে কাঠায় পৌঁছেছে। রবীন্দ্রনাথ সমবায়ের মধ্যে জমি একত্রিত করতে সক্ষম হলে পুত্র রথীন্দ্রনাথ সেখানে

ট্র্যাক্টরের সাহায্যে জমি চাষ করেন এবং লোকেরাও উৎসাহিত হয়ে ওঠে।[৭]

রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে এবং পতিসরে কৃষির উন্নতির যে প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন তা তেমন সফল না হওয়ার পেছনে যে কারণগুলো ছিল তার মধ্যে শিলাইদহ হাতছাড়া হয়ে যাওয়া, পারিবারিক সমস্যা-অন্যতম ছিল। শেষ পর্যন্ত তাঁকে শান্তিনিকেতনে ফিরে যেতে হয়েছিল। এখানে তিনি যে কর্মপদ্ধতি নিয়েছিলেন এ গ্রন্থে যথাস্থানে তার বর্ণনা রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ কৃষিবিদ না হয়েও তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও দেশকে গড়ে তোলার আগ্রহের কারণে তিনি কৃষির বিশেষ উন্নয়ন সাধন করেছিলেন। শ্রীনিকেতনের কৃষিকেন্দ্রের মূল কাজ ছিল প্রশিক্ষণ, কৃষি সম্প্রসারণ এবং কৃষি বিষয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা। ১৯২৬ সালে শ্রীনিকেতন খামারে প্রথম রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হয়েছিল। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতনে গ্রামোন্নয়ন চিন্তার সম্পূর্ণ এক নূতন ধারা সংযোজন করেছিলেন। এই ধারার মূলে ছিল কৃষি সম্প্রসারণ এবং সমবায়। কৃষি উন্নয়নে রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ অবদান কৃষিমেলা।

কৃষির উন্নতিতে কৃষিমেলার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। শিলাইদহে 'কাত্যায়ণী মেলা' 'রাজ-রাজ্যেশ্বরী' মেলা প্রবর্তন করে রবীন্দ্রনাথ কৃষির ব্যাপক উন্নয়ন ঘটিয়েছিলেন। শ্রীনিকেতনে 'হলকর্ষণ' উৎসবও এমনি একটি মেলাতে পরিণত হয়েছিল। হলকর্ষণের পাশাপাশি বৃক্ষরোপন উৎসবও ছিল রবীন্দ্রনাথের কৃষি উন্নয়নে একটি বড় অবদান।

বস্তুত, শ্রীনিকতনেই রবীন্দ্রনাথের কৃষি পরিকল্পনা পূর্ণাঙ্গ রূপ পেয়েছিল। শিলাইদহ ও পতিসরে রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন কর্মকাণ্ড নিঃসন্দেহে বৈপ্লবিক এবং দুঃসাহকিতাপূর্ণ। এখানকার অভিজ্ঞতাই তাঁকে শ্রীনিকেতনে পরিণত করে তুলেছিল। এখানে বলা অসংগত নয় যে রবীন্দ্রনাথের বিদেশী সহযোগী এল্‌মহার্স্ট মনে করতেন যে কৃষির উন্নতিই শ্রীনিকেতনের মূল কর্মকাণ্ড হবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কৃষিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েও এর সাথে সম্পৃক্ত করেছিলেন শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সমাজ সচেতনতা। পল্লীউন্নয়নকে তিনি একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন হিসেবে গণ্য করেছিলেন।

এসবের মূলে ১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথের সোভিয়েত ভ্রমণ নিঃসন্দেহে প্রভাব ফেলেছিল। রবীন্দ্রনাথ মস্কোর একটি কৃষি ভবনে লক্ষ্য করেছিলেন যে সেখানে কৃষিবিদ্যা, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি প্রশিক্ষণের পাশাপাশি নিরক্ষরদের শিক্ষাদান কর্মসূচীও অর্ন্তভুক্ত রয়েছে। এই কৃষিভবনেই চাষিদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ শিক্ষা দেওয়া হতো। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছিলেন রাশিয়ার প্রায় শহরেই এরকম কৃষিভবন রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের শ্রীনিকেতন অনেকটা রাশিয়ার কৃষিভবনের আদলে গড়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ যে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে চেয়েছিলেন তা ছিল একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনভিত্তিক শিক্ষা—যার ভিতরে অর্থশাস্ত্র, কৃষিতত্ত্ব, স্বাস্থ্যবিদ্যা এবং ব্যবহারিক বিজ্ঞান স্থান পেয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ কৃষির পাশাপাশি শিল্পকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এজন্যে তিনি শ্রীনিকেতনে 'শিল্পভবন' গড়ে তুলেছিলেন। ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত কৃষির পাশাপাশি থাকলেও পরবর্তীতে 'শিল্পভবন' স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ জেনেছিলেন শুধুমাত্র কৃষির উপর নির্ভর করে একটি জাতি বাঁচতে পারে না, এই বিপুল জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের জন্য শিল্পোন্নয়ন একান্ত প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথ গান্ধী প্রবর্তিত চরকার মাধ্যমে বস্ত্রশিল্প তৈরি স্বয়ং-সম্পূর্ণতার ক্ষেত্রে অনেকটা অবাস্তব বলে মনে করতেন। 'চরকা' শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন :

> "চরকা চালনায় উৎসাহ প্রকাশ করিনি অপবাদ দিয়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র আমাকে ছাপার কালিতে লাঞ্ছিত করেছেন। ... কবুল করতে লজ্জা হচ্ছে না (যদিও যথেষ্ট লোকভয় আছে) যে, এ পর্যন্ত চরকার আন্দোলনে আমার মন ভিতর থেকে দোল খায় নি। অনেকে সেটাকে আমার স্পর্ধা বলে মনে করবেন, বিশেষ রাগ করবেন; কেন না বেড়াজালে যখন অনেক মাছ পড়ে, তখন যে মাছটা ফসকে যায় তাকে গাল না পাড়লে মন খোলসা হয় না। তথাপি আশাকরি, আমার সঙ্গে প্রকৃতিতে মেলে এমন লোকও অনেক আছেন। তাদের সকলকে বাছাই করে নেওয়া শক্ত; কেন না চরকা সম্বন্ধে তাদের সকলের হাত চলে না, অথচ মুখ খুব মুখর বেগেই চলে।"[৮]

রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বলেন :

> "চাষীকে চাষের পথে উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে চরিতার্থ করবার চেষ্টা অন্যান্য কোনো কোনো কৃষিবহুল দেশে চলছে, সে সব জায়গায় বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি খাটিয়ে মানুষ চাষের বিস্তর উন্নতি করেছে। আমাদের দেশের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, তারা তাদের জমি থেকে আমাদের চেয়ে দ্বিগুণ চারগুণ বেশি ফসল আদায় করছে।... চাষের উৎকর্ষ-উদ্ভাবনের দ্বারা চাষির উদ্যমকে ষোলোআনা খাটাবার চেষ্টা না করে তাকে চরকা ঘোরাতে বলা শক্তিহীনতার পরিচয়।"[৯]

এখানে বলা অসংগত নয় যে, রবীন্দ্রনাথ 'চরকা'-বিরোধী হলেও কুটিরশিল্প ও ক্ষুদ্রশিল্পের প্রসার চেয়েছিলেন এবং শ্রীনিকেতনে তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থাও নিয়েছিলেন। এ বিষয়ে যথাস্থানে আলোচনা করা হয়েছে।

শ্রীনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ যে কর্মযজ্ঞ শুরু করেছিলেন, তা গোটা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি নূতন পথের সন্ধান দিয়েছিল। আজ সমাজ উন্নয়নে 'গ্রাম-সেবক' এর কথা বলা হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ আগেই সে ব্যবস্থা বাস্তবায়িত করেন গ্রামীণকর্মী হিসেবে।

প্রকৃতঅর্থে, রবীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতনের মাধ্যমে শিক্ষার একটি নূতন অবকাঠামো তৈরি করেছিলেন যা ছিল একান্ত করেই Production oriented বা উন্নয়ন ধর্মী।

রবীন্দ্রনাথ ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়েছিলেন বিধায় তিনি শিল্পভবনের মাধ্যমে গ্রামীণ কারিগরদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছিলেন। শ্রীনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ এ সব কারিগরদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। অতঃপর সমবায় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে তাদের মূলধন সরবরাহ করে তাদের স্বনির্ভর করে তোলেন।

শ্রীনিকেতনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল সমবায় প্রথা। রবীন্দ্রনাথ সর্বক্ষেত্রে সমবায়কে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ১৯০৪ সালে 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে সমবায়ের মাধ্যমে দেশের মানুষের উন্নয়নের কথা বলেন। এই বৎসরে ব্রিটিশ সরকার এদেশে Cooperative Credit Societies Act প্রবর্তন করে। রবীন্দ্রনাথ ১৯০৫ সালে তাঁর জমিদারি কালীগ্রাম পরগনার পতিসরে প্রতিষ্ঠা করেন 'পতিসর কৃষিব্যাংক'। এখানেই তিনি ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কারের সকল অর্থ বিনিয়োগ করেন। ১৯২৮সালে রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় সাঁওতালদের গ্রামে সমবায় ঋণদান সমিতি গঠিত হয়।

এমনিভাবে অনত্রেও সমবায় ঋণদান সমিতি গঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন যে একমাত্র সমবায় প্রণালির দ্বারাই দেশ অগ্রসারমান হবে–অন্যকিছুতেই নয়। আজও রবীন্দ্রনাথের এই কথাটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দুই॥

'পল্লীউন্নয়নে রবীন্দ্রনাথ' এই বিষয়ে গবেষণা করার একটি ব্যাকুল বাসনা পোষণ করে আসছিলাম দীর্ঘ বছর ধরে। ইতোমধ্যে, ১৯৮০ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত সাহিত্য, প্রকাশনা ও ঐতিহ্য বিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির সদস্য মনোনীত হই। এরপর বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের উদ্যোগে ১৯৮৩ সালে ভারতের দশটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশের সংস্কৃতি বিষয়ে বক্তৃতা করবার সুযোগ আসে। এই দশটি বিশ্ববিদ্যালয় হল :

০১. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা,
০২. রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা,
০৩. যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা,
০৪. বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন,
০৫. ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, হায়দ্রাবাদ,
০৬. ব্যাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যাঙ্গালোর,
০৭. মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাজ,
০৮. মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়, মহীশূর,
০৯. বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়, বোম্বাই,
১০. দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লী।

এই সময় ভারত সরকার আমার পরিবারের সকলকে কাশ্মীর ভ্রমণের ব্যবস্থা করেছিলেন। বক্তৃতা দেওয়ার সুবাদে শান্তিনিকেতন এবং শ্রীনিকেতনে অবস্থানকালে রবীন্দ্রনাথের অবিস্মরণীয় কর্মকাণ্ড দেখেছিলাম। তখনই মনের ভিতর রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন বিষয়ে গবেষণা করার একটি দারুণ ইচ্ছে জন্ম নেয়। শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে থাকার সময় Folklore and Rural Development নামে শ্রীনিকেতনে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলাম। ওখানকার অধ্যাপকবৃন্দ আমাকে সাধুবাদ জানিয়েছিলেন। তাঁরা শ্রীনিকেতনের পার্শ্ববর্তী দুএকটি গ্রামও দেখিয়েছিলেন। অতঃপর দেশে ফিরে আখতার হামিদ খান প্রতিষ্ঠিত কুমিল্লা পল্লীউন্নয়ন প্রকল্প যা পরবর্তীতে Bangladesh Academy For Rural Development (BARD) হিসেবে খ্যাতি লাভ করে— তা দেখতে যাই। এমনিভাবে বগুড়ার Rural Development Academy (RDA) তে তাদের কর্মকাণ্ড দেখারও সুযোগ আসে। আখতার হামিদ খান পাকিস্তান আমলে কুমিল্লার প্রশাসক থাকাকালীন সময়ে সমবায় প্রথায় পল্লীউন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। পল্লীউন্নয়নের ক্ষেত্রে তিনি আজ এক কিংবদন্তী এবং মহান পুরুষ। স্বাধীনতা-পূর্ব যুগে তিনি যে কাজ শুরু করেছিলেন তা কুমিল্লার সাধারণ মানুষের জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিল। স্বাধীনতার পরে তাঁর সেই কর্মকাণ্ড বিস্তার লাভ করলেও

যথার্থ পরিচালনার অভাবে তা পরিপূর্ণ সুফল বয়ে আনতে পারে নি।

আখতার হামিদ খানের কর্মপদ্ধতি দেখতে গিয়ে লক্ষ্য করলাম রবীন্দ্রনাথও এমনতর পরিকল্পনাই গ্রহণ করেছিলেন তাঁর জমিদারিতে-পূর্ববঙ্গে। অবশ্য দুজনার প্রেক্ষিত ছিল ভিন্ন। রবীন্দ্রনাথ কবি-জমিদার হয়ে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে নিয়েছিলেন। তখনই পল্লীউন্নয়নে সমবায়ের চিন্তাটি তাঁর মাথায় এসেছিল। তিনি লক্ষ করেছিলেন এদেশে সমাবয়ের ঐতিহ্য হাজার বছরেরও আগের। রাজতন্ত্রের অনেক কর্মকাণ্ডও ছিল সমবায়ভিত্তিক। আমি লক্ষ করেছিলাম আখতার হামিদ খানের অনেক পরিকল্পনার অনুল্লেখিত উৎস ছিলেন রবীন্দ্রনাথ অথবা এ দেশের ইতিহাস এবং ঐতিহ্য।

১৯৮৯ সালে মেহেরপুর সরকারি কলেজে অধ্যক্ষ থাকাকালীন সময়ে শিলাইদহে রবীন্দ্র জন্মোৎসব উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে 'পল্লীউন্নয়নে রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ আমি পাঠ করেছিলাম। এই অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমার এ প্রবন্ধ শুনে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, 'আমরা রবীন্দ্রনাথের কবিতা গান গল্প এবং সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছি। আপনি একটি অনালোচিত এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে তুলে ধরেছেন— এ বিষয়ে আমরা অতি সামান্যই জানি।' অতঃপর তিনি আমাকে এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ গবেষণার জন্য অনুরোধ জানান। আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় লোকবিজ্ঞানী কবি ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকীও এ বিষয়ে আমাকে অনুপ্রাণিত করেন।

কিন্তু পরপর তিনটি বড় সরকারি কলেজে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তা আর সম্ভব হয় না। অতঃপর ১৯৯৬ সালে কুষ্টিয়া সরকারি কলেজে অধ্যক্ষ পদ থেকে অবসর নেবার পর আমার বন্ধু ও সহপাঠী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ইনামুল হক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে সুপার নিউমারারী প্রফেসর হিসেবে আমাকে যোগদানের আমন্ত্রণ জানালে আবার আমি উজ্জীবিত হয়ে উঠি। অতঃপর বাংলা বিভাগের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন ভাবনা বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের অর্থানুকূল্যে একটি গবেষণা প্রকল্প সম্পন্ন করি।

এ সময়ে পুনরায় আমি কয়েক বার শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে যাবার সুযোগ পাই। শ্রীনিকেতনের তৎকালীন পরিচালক ডক্টর গোরাচাঁদ খাঁ আমাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেন। এ সময়ে পল্লীউন্নয়ন বিভাগের প্রধান ও বিশিষ্ট উচ্চাঙ্গ সংগীত বিশেষজ্ঞ এবং আন্তর্জাতিক লোক সংগীত সংস্থার সদস্য প্রফেসর ওম প্রকাশও আমাকে নানাভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করেন। এ সময়ে আমি শ্রীনিকেতনের পার্শ্ববর্তী গ্রাম পরিদর্শন করি এবং গ্রামবাসীদের কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করি। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে একটি গ্রামে কাজ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তবে তিনি অনেক গ্রামকে জড়িয়েই শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দীর্ঘদিন শ্রীনিকেতনে থেকে আমি রবীন্দ্রনাথের উন্নয়নকর্ম সম্পর্কে একটি বাস্তব ধারণা নিতে সক্ষম হই।

এরপর শুরু হয় রবীন্দ্রনাথকে নূতনভাবে দেখবার একটি প্রচেষ্টা। দীর্ঘ বছর যাবৎ তাঁর লেখা পড়ে এবং পূর্ববঙ্গ অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশে তাঁর কর্মকাণ্ডের পরিচয় নিতে গিয়ে তাঁকে নূতনভাবেই জানবার সৌভাগ্য হ'ল আমার। রবীন্দ্রনাথকে কবি সাহিত্যিক

এবং সংগীতজ্ঞ, বিজ্ঞানী নানা মাত্রা ও অভিধায় চিহ্নিত করা হয়েছে। কেউ তাঁকে অত্যাচারী জমিদার এবং সাম্প্রদায়িক বলেও চিহ্নিত করতে চেয়েছে। অথচ এ সবেরই তিনি অনেক উর্ধ্বে ছিলেন। এ কথা সত্য, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে হিন্দু-প্রীতিময়তা ছিল। কিন্তু তাঁর জমিদারিতে হিন্দু প্রজা, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা নানাভাবে তাঁর বিরোধিতা করেছে। অপরপক্ষে মুসলমানেরাই তাঁকে সর্বতোভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছে। শিলাইদহ ও পতিসরে এর প্রমাণ রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ পল্লীউন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে ধর্মীয় কর্ম বলে বিশ্বাস করতেন। এজন্যে তিনি কোন প্রচার বা প্রশংসা চান নি। তিনি বলতেন, তাঁর এই কাজ যিনি দেখবার, তিনি দেখে সন্তুষ্ট হলেই তাঁর সুখ।

রবীন্দ্রনাথ যে কত বড় এবং মহৎ মানুষ ছিলেন তাঁর পল্লীউন্নয়ন কর্মকাণ্ডে তার পরিচয় রয়েছে। পতিসরের মানুষ যখন ওলাওঠাতে ভুগছে, রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ্য হয়েও তাদের পাশে ছুটে গেছেন। তিনি কখনও তাদের দুরাবস্থায় ফেলে চলে আসেন নি। জমিদারি চলে যাবার পরও তাঁর প্রজারা তাঁকে ভোলে নি। শেষবারে শিলাইদহ এবং পতিসরে তাঁর আগমন এবং বিদায় সংবর্ধনা কবি ও প্রজাদের চোখকে অশ্রুসিক্ত করেছে এবং এই প্রজাদের একটি বড় অংশ ছিল মুসলমান।

বস্তুত, 'পল্লীউন্নয়নে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে আমি এক অন্য রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্কার করেছি—যিনি মানব প্রেমিক শুধু নন, যথার্থ মানব হিতৈষী। সাধারণের সঙ্গে ছিল তাঁর অংশীদারের সম্পর্ক—এ সম্পর্ক শুধু জমিদার ও প্রজার মধ্যেকার ছিল না, এ সম্পর্ক ছিল মানুষের সঙ্গে মানুষের। রবীন্দ্রনাথ জাতিভেদকে ঘৃণা করেছেন। বুঝেছিলেন, এই জাতিভেদ প্রথাই সকল উন্নয়নের অন্তরায়। তিনি বিশ্বাস করতেন, হিন্দু-মুসলমান, বিত্তবান ও বিত্তহীন উভয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টা সমাজকে সুসংগঠিত করে তোলে। এ কারণেই তিনি বাউল দর্শনকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। বলেছেন, এখানে হিন্দু-মুসলমান সবাই এসে মিলেছে, কেউ কাউকে আঘাত করে নি। এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে রবীন্দ্রনাথ পল্লী পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করেছিলেন।

আমার এ গবেষণার কাজে অনেকেই সহযোগিতা করেছেন। বাংলাদেশ মঞ্জুরী কমিশনের তৎকালীন চেয়ারম্যান প্রফেসর জহুরুল হক, বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক প্রফেসর মনসুর মুসা, বিশিষ্ট রবীন্দ্র গবেষক আহমদ রফিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আমাকে উৎসাহিত ও প্রাণীত করেছেন। পশ্চিমবাংলার (ভারত) কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগের প্রধান প্রফেসর ড. বরুণ কুমার চক্রবর্তী, ভারতীয় ফোকলোর কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ড. দুলাল চৌধুরী, শান্তিনিকতন ও শ্রীনিকেতনের অধ্যাপকমণ্ডলী, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ফোকলোর বিভাগের প্রধান প্রফেসর তুষার বন্দোপাধ্যায়, একই বিশ্ববিদ্যালয়ের খণ্ডকালীন অধ্যাপক ড. শীলা বসাক প্রমুখ আমাকে উৎসাহ প্রদান করেছেন। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রফেসর নজরুল ইসলাম, ড. আবুল কালাম আজাদ, বাংলা বিভাগের প্রফেসর ড. আবুল আহসান চৌধুরী, বিভাগীয় প্রধান ড. শহীদুর রহমান, ড. সরোয়ার মুর্শেদ রতন, জনাব গাজী মাহবুব মুর্শিদ, জনাব ইয়াসিন আলী, জনাব রেজাউল করিম ও জনাব রহমান হাবিব,

কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের ইতিহাস বিভাগের প্রধান ও বিশিষ্ট ছোটগল্প লেখক হাবিব আনিসুর রহমান, বিশিষ্ট গবেষক এবং বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর কুষ্টিয়া জেলা শাখার প্রধান জনাব ম, মনিরুজ্জামান রবীন্দ্র বিষয়ে আলাপ-আলোচনায় আমার গবেষণাকে সমৃদ্ধ করেছেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রী ও এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাংকের সমাজবিজ্ঞানী ও কনসালট্যান্ট আমার কন্যা সুলতানা আফরোজ, বিসিএস সিনিয়র কর্মকর্তা আমার জামাতা সামস আল মুজাদ্দীদ এবং আমার সহধর্মিণী কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান ও বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ, কুষ্টিয়া জেলা শাখার সভাপতি অধ্যাপিকা সৈয়দা আমেনা করীম ও আমার মা বেগম রহিমা খাতুন আমার প্রয়াত পিতা কৃষিবিদ মৌ. করীম বখ্স আমার গবেষণার কাজে নানাভাবে প্রেরণা দিয়েছেন। আমার লেখা কমপিউটার কম্পোজ করেছেন বিশিষ্ট কবি সৈয়দা হাবিবা ও তদীয় ভগ্নী রুমা এবং আমজাদ হোসেন। প্রুফরিডিং করেছিলেন তারিফ হোসেন, আনোয়ারুল কাদের, শ্যামা, সুলতানা করীম ও সৈয়দা তাসনিয়া জেরীন করীম। তাদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। গ্রন্থটি রবীন্দ্রপ্রতিভার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা—পাঠক সাধারণ ও গবেষকদের প্রয়োজন মেটালে আমার পরিশ্রম সার্থক হবে।

আনোয়ারুল করীম
বাংলা বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

তথ্যসূত্র

১. Karunamay Mukherji - Tagore's Thoughts and Work on Agrarian Reforms, Rabindranath Tagore: Homage from Visva-Bharati, Santosh Chandra Singnpta (ed), Visva Bharati, Santiniketan, 1962, p.222
২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রায়তের কথা, কালান্তর, রবীন্দ্ররচনাবলী (১৩), পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলিকাতা ১৯৬৯, পৃ.৩৮৪-৪৯
৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লোকহিত, রবীন্দ্ররচনাবলী (১৩), পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৬১, পৃ. ২২২-২২৯।
৪. দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়— রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানচেতনা, রবীন্দ্রনাথ, দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য (সং) ইস্ট লাইট বুক হাউস, কলকাতা ১৯৬১, পৃ, ১২৭।
৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতবিতান (অখণ্ড) বিশ্বভারতী, কলকাতা ১৯৬৭, পৃ. ৫৭৮।
৬. চিত্রা দেব— অনালোচিত রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ, মডার্ণ কলাম, কলকাতা, পৃ. ৪৪-৪৫।
৭. পরিমল চক্রবর্তী—গ্রামোন্নয়নে মনীষীরা, রত্নাবুক এজেন্সি, কলকাতা ১৯৮৬, পৃ. ২২-২৩।
৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর— 'চরকা' কালান্তর, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৯৬১, পৃ. ৩২৭-৩৩৬।
৯. প্রাগুক্ত।

পটভূমি এবং প্রস্তাবনা

রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন ভাবনার উন্মেষ ঘটেছিল বাংলাদেশে। জমিদারি দায়িত্ব নেবার পর তিনি গ্রামে বসবাসকারী সাধারণ মানুষের অসহায় অবস্থার সাথে পরিচিত হন। তিনি সাহিত্য-প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে তাঁর অনুভূতি ছিল অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র। বলা যেতে পারে, তাঁর সাহিত্য-প্রতিভার কারণে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি তাঁকে বাংলাদেশের গ্রাম এবং তাঁর বাসিন্দাদের দুর্বিষহ জীবনের পরিচয় জানতে সাহায্য করেছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন কবিতা, ছোটগল্প এবং উপন্যাসে পল্লীগ্রামের সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের নানা চালচিত্রের ছবি এঁকেছেন গভীর মমতায়। এসব সাহিত্যকর্মে গ্রাম-বাংলার দুঃখ-দারিদ্র্যের কথা প্রকাশ করে রবীন্দ্রনাথ তাদের জীবনে পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন। তিনি একজন মহৎকবি এবং লেখক ছিলেন বলে তাঁর জমিদারিতেই তিনি পল্লীউন্নয়নের পরিকল্পনা করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জমিদারি থেকেই পল্লীউন্নয়নের সকল তথ্য যেমন সংগ্রহ করেছেন আবার এই জমিদারির বিভিন্ন অঞ্চলে যেমন শিলাইদহ, শাহজাদপুর এবং পতিসরে তিনি তাঁর এসব ভাবনা বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছিলেন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শোষণের ফলে বাংলাদেশের সকল গ্রাম শ্রীহীন ও সম্পদহীন হয়ে পড়েছে এবং গ্রামের বিত্তবান এবং শিক্ষিত মানুষদের একটি বড় অংশ তাদের স্বার্থসিদ্ধির আশায় গ্রাম ছেড়ে নগরে বা শহরের অধিবাসী হয়ে পড়েছে। গ্রামের অসহায় এবং ধ্বংসোন্মুখ চেহারা দেখে রবীন্দ্রনাথের অন্তরে দেশপ্রেম গভীরভাবে জেগে উঠেছিল। তিনি গ্রামোন্নয়নে নিজেকে নিবিষ্ট করেছিলেন।

পল্লীউন্নয়নে রবীন্দ্রনাথের এই যে গভীর অনুভূতি তা তাঁর ক্ষণিক চেতনার বহিঃপ্রকাশ নয়—এ তাঁর সমগ্র জীবনের একদিন প্রতিদিন রূঢ় বাস্তবের অভিজ্ঞতার অবশ্যম্ভাবী ফল।

বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনা এবং সাহিত্য-সৃষ্টির মর্মমূলে ছিল বাংলাদেশের গ্রাম এবং তার বাসিন্দা—নিয়ত খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষ। রবীন্দ্রনাথ তাদের উন্নতির জন্য সারাজীবন প্রাণপাত করেছেন। এ যেন এক অন্য রবীন্দ্রনাথ। তাঁর সকল কবিতা-সংগীত ছাপিয়ে তিনি একজন হৃদয়বান কর্মযোগী মহাপুরুষরূপে প্রতিভাত হয়েছেন। এ কর্মযোগীকে পৃথিবী দেখে নি।

রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন বিষয়ে তেমন কোন আলোচনা এদেশে হয় নি। যা হয়েছে তা খণ্ডিত। বর্তমান গবেষণায় রবীন্দ্রনাথকে পল্লীউন্নয়নের এক অনলস কর্মযোগী হিসেবে আবিষ্কারের প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ পল্লীউন্নয়নের জন্য কেবল চিন্তাই করেন নি, তিনি এ বিষয়ে পরিকল্পনা করেছিলেন এবং বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

তিনি বলেন :

> 'গ্রামের কাজের দুটি দিক আছে। কাজ এখান থেকে করতে হবে। এদের সেবা করতে হলে শিক্ষা চাই।... আমি যদি কেবল দুটি তিনটি গ্রামকেও মুক্তি দিতে পারি অজ্ঞতা অক্ষমতার বন্ধন থেকে, তবে সেখানেই সমগ্র ভারতবর্ষের একটি ছোট আদর্শ তৈরি হবে- এই কথা তখন মনে জেগেছিল, এখনও সেই কথা মনে হচ্ছে। এই ক'খানা গ্রামকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করতে হবে- সকলে শিক্ষা পাবে, গ্রামজুড়ে আনন্দের হাওয়া বইবে, গান, 'বাজনা, কীর্তন-পাঠ চলবে, আগের দিনে যেমন ছিল। তোমরা কেবল ক'খানা গ্রামকে এইভাবে তৈরি করে দাও। আমি বলব, এই ক'খানা গ্রামই আমার ভারতবর্ষ। তাহলেই প্রকৃতভাবে ভারতকে পাওয়া যাবে।'

গ্রামবাংলার প্রতি রবীন্দ্রনাথের অনুরাগের সীমা ছিল না। গ্রামকে তিনি নারীর সাথে তুলনা করে বলেন : "Villages are like women, in their keeping is the cradle of the race".

১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে চৈতন্য লাইব্রেরিতে বিশেষ অধিবেশনে 'স্বদেশী সমাজ' শীর্ষক অভিভাষণে গ্রামীণ সমাজ পুনর্গঠনে ও স্বাবলম্বী গ্রামীণ অর্থনীতি পরিকল্পনার কথা ব্যক্ত করেন। আমরা জানি তিনি শিলাইদহে এবং পতিসরে কৃষি ও সমবায় ব্যাংক স্থাপন করে গ্রামের শিক্ষা, কৃষি, শিল্প ইত্যাদির সামগ্রিক উন্নয়ন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরপর দুটো মহাযুদ্ধ এবং দুর্ভিক্ষ-মহামারী গ্রামকে ধ্বংস করেছিল। গ্রামের সম্পদ শহরের প্রয়োজনের জন্য ব্যবহৃত হল। রবীন্দ্রনাথ তা উপলব্ধি করেছিলেন। তাই সকল গ্রামের সকল অধিবাসীকে তিনি একত্রিত হবার উপদেশ দিলেন।

> "জোতদার ও চাষারা যতদিন প্রত্যেকে স্বতন্ত্র থাকিয়া চাষাবাদ করিবে ততদিন তাহাদের অসচ্ছল অবস্থা কিছুতেই ঘুচিবে না। পৃথিবীতে চারদিকে সকলে জোট বাঁধিয়া প্রবল হইয়া উঠিতেছে, এমন অবস্থায় যাহারাই বিচ্ছিন্ন এককভাবে থাকিবে তাহাদিগকে চিরদিনই অন্যের গোলামি ও মজুরি করিয়া মরিতে হইবে"।

রবীন্দ্রনাথ অনুধাবন করেছিলেন পল্লীর উন্নয়ন কৃষির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। উন্নত প্রথায় কৃষির ব্যবস্থা না হলে পল্লীঅঞ্চলে প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়। এইজন্যে তিনি তাঁর কনিষ্ঠ জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে কৃষি শিক্ষার জন্য ইলিয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান। শিক্ষা শেষে জামাতা নগেন্দ্রনাথ এবং পুত্র রথীন্দ্রনাথ দেশে ফিরলে রবীন্দ্রনাথ তাদেরকে শিলাইদহে কৃষি উন্নয়নের কাজে

নিয়োজিত করেন। এর জন্য শিলাইদহের খাসজমিতে একটি বড় খামার স্থাপিত হয়, কিন্তু নানা কারণে রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনা বাংলাদেশে তাঁর জমিদারিতে ব্যর্থ হয় তবে পরবর্তীতে তিনি শ্রীনিকেতনে পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়িত করেন। শ্রীনিকেতনে পল্লীউন্নয়নের সহযোগিতার জন্য একজন বিদেশী এসেছিলেন। তার নাম লর্ড এলমহার্স্ট। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সহযোগিতায় পল্লীউন্নয়নে সফল হয়েছিলেন। এসব কাজের মধ্যে দু-একটি এমন ছিল যেমন, গ্রামবাসীকে বাইরে থেকে সাহায্য করা হবে না, তার শক্তির উৎস সে নিজের মধ্যেই আবিষ্কার করে নেবে এবং আপন শক্তির উপর তাকে নির্ভর করতে হবে ইত্যাদি।

সমবায়ের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ দীর্ঘকালের। তিনি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন গ্রামের দরিদ্র কৃষক এবং অন্যান্য পেশাজীবী মানুষকে বাঁচাতে হলে সমবায় নীতি ছাড়া উপায় নেই। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আমাদের দেশে আমাদের পল্লীতে ধান উৎপাদনে ও পরিচালনার কাজে সমবায় নীতি অপরিহার্য।" শিলাইদহে তিনি তাঁর এই ইচ্ছাকে কাজে লাগিয়েছিলেন। এখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিকে একত্রিত করে সমবায়ের মাধ্যমে ফসল উৎপাদনের কাজে হাত দিয়েছিলেন, কৃষিব্যাংক বসিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ পল্লীউন্নয়নের ক্ষেত্রে যে কয়টি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করেছিলেন তার মধ্যে শিক্ষা এবং সমবায় প্রাধান্য পেয়েছিল। এর সাথে তিনি যুক্ত করেছিলেন জোতদারের সঙ্গে রায়তকে। তিনি বুঝেছিলেন, উন্নয়নের ক্ষেত্রে উভয়ের সঙ্গে সংযোগ হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। তিনি অস্পৃশ্যতা ও বর্ণবাদকে সরিয়ে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপন করেছিলেন। তিনি সমগ্র গ্রামকে কয়েকটি মণ্ডলীতে বিভক্ত করে উন্নয়ন সুশাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই প্রথা অনেকটাই বলা চলে, অতীতের পঞ্চায়েতী প্রথার অনুরূপ ছিল। গ্রামের মানুষ নিজেদের সমস্যাকে চিহ্নিত করে নিজেরাই সমাধানের পথ বের করে নিত।

রবীন্দ্রনাথ কৃষি উন্নয়নকে গ্রামের অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাবিকাঠি বলে জেনেছিলেন এবং সেজন্যে নানা প্রকল্প গ্রহণ করেন। তাঁর জমিদারিতে তিনি কৃষি এবং কৃষি সম্পর্কিত নানা কর্মকাণ্ডের উন্নয়নের জন্য তাঁর নোবেল পুরস্কারের সকল অর্থ দিয়ে কৃষি ব্যাংক গড়ে তোলেন।

তিনি রাশিয়ার অনুরূপ কৃষিক্ষেত্র একত্রীকরণের পরিকল্পনা করেন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি কৃষির পাশাপাশি কৃষিভিত্তিক শিল্পকর্মের উন্নয়ন সাধন করতে চেয়েছিলেন। তিনি তাঁতশিল্প, রেশমশিল্প এবং চিনিশিল্প উন্নয়নের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ খাদ্যাভাসেও পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন এবং তাঁর কর্মক্ষেত্রে আলু চাষেরও ব্যবস্থা নিয়েছিলেন।

তবে এসব কর্মকাণ্ডকে সফল করে তুলবার জন্য তিনি গ্রামে গ্রামে মেলা ও উৎসবের প্রয়োজনিয়তাও উপলব্ধি করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি লোকসাহিত্য ও

লোকসংগীত সংগ্রহ ও সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। জাতিসত্তা নির্মাণে এসবের গুরুত্ব যে অপরিসীম রবীন্দ্রনাথ তা জানতেন বিধায় তিনি শিলাইদহে এই কার্যক্রম শুরু করেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করেন :

> "আমার প্রস্তাব এই যে বাংলাদেশের যেখানে হোক একটি গ্রাম আমার হাতে নিয়ে তাকে আত্মশাসনের শক্তিতে সম্পূর্ণ উদদ্বুধিত করে তুলি। সে গ্রামের রাস্তা-ঘাট, তার ঘরবাড়ির পরিপাট্য, তার পাঠশালা, তার সাহিত্যচর্চা ও আমোদপ্রমোদ, তার রোগী পরিচর্যা ও চিকিৎসা, তার বিবাদ নিষ্পত্তি প্রভৃতি সমস্ত কার্যভার সুবিহিত নিয়মে গ্রামবাসীদের দ্বারা সাধন করার উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করি।"

তৎকালীন পূর্ববঙ্গে (বর্তমান বাংলাদেশ) তাঁর জমিদারিতে এ উদ্যোগ তিনি নিয়েছিলেন। কিন্তু জমিদারি চলে যাওয়ায় এখানে পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন পরিপূর্ণভাবে সম্ভব হয় নি। পরবর্তীতে শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী স্থাপন করে শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি পল্লীউন্নয়নের মত দুঃসাধ্য কাজকে সফল করে তুলেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন সম্পর্কে পরিকল্পনা নিঃসন্দেহে অভিনব এবং বৈপ্লবিক। তিনি তাঁর এই পরিকল্পনা গড়ে তুলেছিলেন গ্রামবাংলার ঐতিহ্য এবং আদর্শকে সামনে রেখেই। বাংলাদেশ (পূর্ব ও পশ্চিমবাংলা) একদা যে সোনার বাংলার গৌরব অর্জন করেছিল তা কেবল অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নয়, এই উন্নয়ন ছিল সার্বিক। তখন অবশ্য জনসংখ্যার তুলনায় সম্পদেরও এমন অপ্রতুলতা ছিল না। ধনী-দারিদ্র্যের মধ্যে গ্রাম সুবাদে সৌহার্দের ভাব ছিল। রবীন্দ্রনাথের সময় ব্রিটিশ শাসনামলে গ্রামের ধনী এবং শিক্ষিত সমাজ গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসে। ফলে, গ্রামের সমস্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। জমিদার হিসেবে পূর্ববাংলায় সাধারণ দরিদ্র মানুষের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেই রবীন্দ্রনাথ এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। কবির দৃষ্টির কারণে তিনি সাধারণ মানুষের অন্তরের বেদনাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। মানুষের প্রতি তাঁর এই মমত্ববোধ তাঁকে এই কাজে প্রলুব্ধ করেছিল। তাঁর এই কর্মকাণ্ডকে নিয়েই আমার এই গবেষণা। মোট চারটি পর্যায়ে আমি আমার এই গবেষণা কর্মকে সীমায়িত করেছি। প্রথম পর্যায় সাধারণ আলোচনা। এই আলোচনায় পল্লীউন্নয়নে রবীন্দ্রনাথের মূল উদ্দেশ্যকে চিহ্নিত করতে চেষ্টা করেছি। অতঃপর তার বিশ্লেষণ। এখানে সাহিত্যই হয়েছে তার মানদণ্ড।

দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়েছে, তাঁর জমিদারি অঞ্চলে—পূর্ববাংলার শিলাইদহ, সাজাদপুর এবং পতিসরে। এখানে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জমিদারিতে থেকে প্রত্যক্ষভাবে সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দেখে যেসব বাস্তবমুখী পরিকল্পনা করেছিলেন তার বিবরণ রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এই কাজকে তাঁর 'ধর্ম' বলে গ্রহণ করাতে তিনি তাঁর জীবনকেই পরিপূর্ণভাবে উৎসর্গিত করেছিলেন। এ কাজে তিনি

প্রচার-বিমুখ ছিলেন। কেউ এ কাজকে সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রচার করতে চাইলে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বারণ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, তাঁর এ কাজ যিনি অলক্ষে থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন তিনি সন্তুষ্ট হলেই, তাঁর বড় প্রাপ্তি ঘটবে। রবীন্দ্রনাথ শারীরিক দিক থেকে অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও যখন পতিসরে 'ওলা-ওঠা'র প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল তিনি গরিব প্রজাদের অসহায় অবস্থা চিন্তা করে তখুনি তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। এ এক অসাধারণ কর্তব্যবোধ। এই মানসিকতা এবং অনুভূতি নিয়েই তাঁর পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচি গড়ে উঠেছিল। পূর্ববাংলায় তাঁর এই উন্নয়ন কর্মকাণ্ড তেমন সফল হয় নি, কিন্তু তাঁর এই উদ্যোগ শেষ পর্যন্ত সুফল বয়ে নিয়ে এসেছিল যখন তিনি পূর্ববাংলার অভিজ্ঞতা নিয়ে শ্রীনিকেতন গড়ে তুলেছিলেন। তৃতীয় পর্যায় তাই শ্রীনিকেতনকে নিয়েই আমাদের আলোচনা। এখানে কবি জমিদার রুক্ষ মাটির বুকে তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করেছিলেন।

চতুর্থ পর্যায়ে শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের যে কর্মকাণ্ড, সাধারণ মানুষের জীবনে তার প্রভাব এবং এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়া, ভবিষ্যতে তাঁর এই কর্মকাণ্ডকে পরিপূর্ণ রূপ দেওয়ার পরিকল্পনা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন কর্মকাণ্ড স্বতন্ত্রভাবে শিলাইদহ পর্ব, সাজাদপুর পর্ব, পতিসর পর্ব এবং শ্রীনিকেতন পর্বে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার চেষ্টা নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি পর্বে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বিশেষ করে কবিতা, গল্প এবং চিঠিপত্রে গ্রামবাংলার যে ছবি অঙ্কিত হয়েছে তাকে ধারণ করেই রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন এই গবেষণাকে দাঁড় করাতে চেষ্টা নিয়েছি। রবীন্দ্রনাথের জীবন ও জগৎ কোন কিছুই তাঁর সাহিত্য থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। বস্তুত, সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ স্বপ্ন দেখেছেন এবং তাকে নিয়েই তিনি নির্মাণ করেছেন তাঁর পল্লীউন্নয়ন প্রকল্প—যা আজ অবধি পল্লীউন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে সর্বকালের আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের এই উন্নয়নকর্ম মধ্যবঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গ নিয়ে হলেও এর মধ্য দিয়েই আমরা সমগ্র পূর্ববাংলা (বর্তমান বাংলাদেশ) এবং পশ্চিমবাংলার (ভারত) সাধারণ গ্রামবাসীর জীবনের দুঃখ-শোকের কথাকেই বিবেচনায় এনেছি। রবীন্দ্রনাথ এই কাজের মধ্য দিয়েই অবিভক্ত বাংলাদেশকে দেখেছিলেন। স্বদেশের প্রতি তাঁর এই অকৃত্রিম ভালবাসা যা তাঁর নিজস্ব সুখ- স্বাচ্ছন্দ্যকে সরিয়ে দিয়েছে, তা মানুষের কল্যাণে উৎসর্গিত হয়েছে। অতঃপর এই পল্লীউন্নয়ন পরিকল্পনা রবীন্দ্রনাথকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি সন্তান হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

প্রথম অধ্যায়

রবীন্দ্র-সাহিত্যে পল্লীউন্নয়ন ভাবনার চালচিত্র

রবীন্দ্রনাথের কবিখ্যাতি বিশ্বব্যাপী। ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার লাভের পর তিনি বিশ্বকবি হিসেবে স্বীকৃত। তাঁর কবিতা ও গানে যে জীবনদর্শন ফুটে উঠেছে তা গোটা বিশ্বকে যে চমকিত করেছে তা শুধু নয়, বলা চলে, এসবের মধ্যে মানুষ তার আসল পরিচয় লাভ করেছে। পৃথিবীর তাবৎ কর্মযজ্ঞে তার ভূমিকা সম্বন্ধেও সে সচেতন হয়েছে। এজন্যে নোবেল পুরস্কার লাভের পূর্বে লন্ডনে রোটেনস্টাইনের বাড়িতে গীতাঞ্জলি পাঠের যে আসর বসেছিল তার শ্রোতারা সব হতবাক হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন। সেদিন একটি কথাও তাঁরা বলেন নি। রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল পাশ্চাত্য বুঝি তাঁর কবিতা ও গান গ্রহণ করল না। তিনি ভয়ানক লজ্জিত হলেন। কিন্তু পরের দিনই রবীন্দ্রনাথের এই সন্দেহ ভুল প্রমাণিত হল। চতুর্দিক থেকে অসংখ্য প্রশংসাবাক্য রবীন্দ্রনাথকে অভিভূত করে ফেলেছিল। এসব কবিতা ও গানে রবীন্দ্রনাথ 'নতুন কথা' বলেছেন। যা ইতোপূর্বে কেউ বলে নি। 'গীতাঞ্জলি'র ভাববাদের আড়ালে রবীন্দ্রনাথ এক সুখী-সমৃদ্ধ পৃথিবীর কথা ভেবেছেন যা তাঁকে মানুষের কবি বলেই পরিচিত করে নি; বরং তাঁর দায়িত্ব আরও বাড়িয়ে দিয়ে মানুষের কর্মযজ্ঞে তাঁর অবস্থানকে সুদৃঢ় করেছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানের মূল বিষয় ছিল মানুষ এবং প্রকৃতি। বাংলদেশের গ্রাম তাঁকে এ দুটোই দিতে সক্ষম হয়েছিল। বাল্য ও কৈশোরে রবীন্দ্রনাথ গ্রামের কথা শুনেছেন, কিন্তু তা দেখবার সৌভাগ্য তখনও তাঁর হয় নি। রবীন্দ্রনাথ কলকাতার আশেপাশের দুএকটা গ্রাম দেখে থাকলেও পুরো গ্রামের পরিচয় তিনি পেয়েছিলেন বাংলাদেশে দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে কুষ্টিয়া অঞ্চলে শিলাদহে তাঁর জমিদারিতে এসে। একদিকে 'নতুন'কে দেখবার একটি উন্মাদনা, অশান্ত আবেগ, অপরদিকে গ্রামের শ্রীহীন চেহারা দেখে মন পীড়িত এবং ভারাক্রান্ত। রবীন্দ্রনাথ ব্যতিক্রমী হয়ে জন্মেছিলেন। খুব ছেলেবেলা থেকেই তাঁর চেতনার জগৎ ছিল অন্যদের থেকে ভিন্ন। তাঁর দেখবার ইচ্ছাটি ছিল অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং গভীর। একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ গ্রামের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন এমনিভাবে,

"মাঠের শেষে গ্রাম
সাতপুরিয়া নাম।

চাষের তেমন সুবিধে নেই কৃপণ মাটির গুণে
পঁয়ত্রিশ ঘর তাঁতির বসত, ব্যবসা জাজিম বুনে।
নদীর ধারে খুঁড়ে খুঁড়ে পলির মাটি খুঁজে
গৃহস্থরা ফসল করে কাঁকুড়ে তরমুজে
ওই খানেতে বালির ডাঙা মাঠ করেছে ধু-ধু
ঢিবির পরে বসে আছে গাঁয়ের মোড়ল বধূ
সামনে মাঠে ছাগল চরছে কটা -
শুকনো জমি নেইকো ঘাসের ঘটা।"

গ্রামের আর একটি ছবি :

"বেলা দ্বিপ্রহর।
ক্ষুদ্র শীর্ণ নদীখানি শৈবালে জর্জর
স্থির অর্থহীন। অর্ধমগ্ন নদী পরে
মাছরাঙ্গা বসি, তীরে দুটি গোরু চরে
শস্যহীন মাঠে। শান্ত নেত্রে মুখ তুলে
মহিষ রয়েছে জলে ডুবি। নদী কূলে
জনহীন নৌকা বাঁধা। শূন্য ঘাট তলে
রৌদ্রতপ্ত দাঁড়কাক স্নান করে জলে
পাখা ঝটপটি। শ্যাম শষ্পতটে তীরে
খঞ্জন দুলায়ে পুচ্ছ নৃত্য করি ফিরে।"

রবীন্দ্রনাথ এখানে মানুষ এবং প্রকৃতিকে দেখেছেন গ্রামীণ জীবনের পটভূমিতে। নদীমাতৃক গ্রাম বাংলা একদিকে বন্যায় প্লাবিত, অপরদিকে শুষ্ক মৌসুমে অনাবৃষ্টির শস্যহীন মাঠ। নদীর চরে কাঁকুড় আর তরমুজ ছাড়া অন্য কোন শস্য নেই এবং তা ফলাতেও হিমশিম খেতে হয় চাষিকে। নদীর পাশে গ্রামে তাঁতিদের বাস। তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা তাই ভাল নয়। এরই মধ্যে গাঁয়ের মোড়ল এসে বসে আছে তার ঋণের টাকা সুদসমেত ফেরৎ নিতে। দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য যে সুদ সে নিয়েছিল মোড়লের কাছ থেকে তা চক্রবৃদ্ধিহারে বেড়ে চাষিকে করেছে সর্বস্বান্ত। রবীন্দ্রনাথ এসবই উপলব্ধি করেছেন। তাঁর অসংখ্য কবিতায়, চিঠিপত্রে, ছোটগল্পে, প্রবন্ধে তিনি গ্রামের দুরবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ অভিজাত ঘরের সন্তান ছিলেন এবং পরবর্তীতে জমিদার; এ কারণে পল্লীজীবনের মধ্যে প্রবেশ করা তাঁর পক্ষে অনেকটা দুঃসাধ্য ছিল; কিন্তু কবি-সাহিত্যিকের চোখ ও মন থাকার ফলে তিনি অতি সহজেই গ্রামের সাধারণ মানুষ এবং প্রকৃতির অন্তরঙ্গ জীবনের কাছে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। এবং তার ফলেই জমিদারি দায়িত্বভার নেবার পরপরই পল্লীর সাধারণ মানুষের দুরবস্থা নিরসনে ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কবি ছিলেন বলেই জমিদার হিসেবেও তাই তিনি ব্যতিক্রমী ছিলেন। তাঁর অনুভূতিপ্রবণ ও সংবেদনশীল অন্তর তাঁকে সাধারণ মানুষের দুঃখ-শোকের অংশীদার করে নিয়েছিল। কবিতা ও সাহিত্য তাঁকে স্বদেশপ্রেমী করে তুলেছিল এবং সে কারণেই পল্লীউন্নয়নের চেতনা তাঁকে অভীষ্ট লক্ষে পৌঁছুবার জন্যে নিরন্তর ধাবিত

করেছে। রবীন্দ্রনাথ 'ছিন্নপত্রাবলী' তে মানুষ প্রকৃতির এক অসামান্য চিত্রময়তা এঁকেছেন। অসাধারণ দক্ষতায় তিনি গ্রাম বাংলার এই ছবি এঁকেছেন একের পর এক। 'ছিন্নপত্রাবলী' তে এমনই একটি অসামান্য চিত্রময়তা :

> "বোট খুলে দিয়েছে, আস্তে-আস্তে কাছারির দিকে চলেছে। বেশ একটু বাতাস দিচ্ছে। তেমন ঠাণ্ডা নয় দুপুরবেলার তাতে অল্প গরম হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে ঘন শৈবালের মধ্যে দিয়ে যেতে খস খস শব্দ হচ্ছে। সেই শৈবালের ওপর অনেকগুলো ছোটো ছোটো কচ্ছপ আকাশের দিকে সমস্ত গলা বাড়িয়ে দিয়ে রোদ পোহাচ্ছে। অনেক দূরে দূরে একটা একটা ছোটো ছোটো গ্রাম আসছে। গুটি কতক খড়ো ঘর, কতকগুলি চালশূন্য মাটির দেয়াল দুটো একটা খড়ের স্তূপ, কুলগাছ, আমগাছ, বটগাছ এবং বাঁশের ঝাড়, গোটা তিনেক ছাগল চরছে, গোটাকতক উলঙ্গ ছেলেমেয়ে— নদী পর্যন্ত একটি গড়ানে কাঁচা ঘাট, সেখানে কেউ কাপড় কাচছে, কেউ নাইছে, কেউ বাসন মাজছে, কোনো কোনো লজ্জাশীলা বধূ দুই আঙ্গুলে ঘোমটা ঈষৎ ফাঁক করে ধরে কলসি কাঁখে জমিদার বাবুকে সকৌতুক নিরীক্ষণ করছে ... তীরে কতকগুলো নৌকা বাঁধা এবং একটা পরিত্যক্ত প্রাচীন জেলে ডিঙি অর্ধনিমগ্ন অবস্থায় পুনরুদ্ধারের প্রতীক্ষা করছে।"[১]

এই চিত্রময়তা ছিল পল্লীয় একটি বহিরঙ্গরূপ। রবীন্দ্রনাথ এমন অনেক ছবিই এঁকেছেন তাঁর 'ছিন্নপত্রাবলী'তে। কিন্তু এরই পাশাপাশি গ্রামের দারিদ্র্যেরও ছবিও এঁকেছেন তিনি। গ্রামের এই দারিদ্র্য তাঁকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। তিনি লিখেছিলেন :

> "যখন গ্রামের চারদিকের জঙ্গলগুলো জলে ডুবে পাতা-লতা গুলো পচতে থাকে, গোয়ালঘর ও লোকালয়ের বিবিধ আবর্জনা চারদিকে ভেসে বেড়ায়, পাট-পচানির গন্ধে বাতাস ভারাক্রান্ত, উলঙ্গ পেট মোটা পা সরু রুগ্ন ছেলে মেয়েরা যেখানে সেখানে জল কাদায় মাখামাখি ঝাঁপাঝাঁপি করতে থাকে, মশার ঝাঁক স্থির জলের উপরে একটি বক্ষস্তরের মতো ঝাঁক বেঁধে ভেসে বেড়ায়, গৃহস্থের মেয়েরা ভিজে শাড়ি গায়ে জড়িয়ে বাদলার ঠাণ্ডা হাওয়া বৃষ্টির জলে ভিজতে ভিজতে হাঁটুর উপর কাপড় তুলে জল ঠেলে ঠেলে সহিষ্ণু জন্তুর মতো ঘরকন্যার নিত্যকর্ম করে যায়, তখন সে দৃশ্য কোনোমতেই ভালো লাগে না। ঘরে-ঘরে বাত ধরেছে, পা ফুলেছে, সর্দি হচ্ছে, জ্বর ধরেছে, পিলেওয়ালা ছেলেরা অবিশ্রাম কাঁদছে, কিছুতেই কেউ তাঁদের বাঁচাতে পারছে না। এত অবহেলা অস্বাস্থ্য অসৌন্দর্য, দরিদ্র মানুষের বাসস্থানে কি এক মুহূর্ত সহ্য হয়!"[২]

এখানে রবীন্দ্রনাথ অন্তরঙ্গ দৃষ্টিতে গ্রামের যথার্থ রূপটিকে দেখতে পেয়েছেন। বাংলাদেশের প্রায় গ্রামে রবীন্দ্রনাথ এমনই অসহনীয় দারিদ্র্যের এবং রোগ-শোকের ছবি দেখতে পেয়েছিলেন। কবিতাতে শুধু নয় রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য ছোটগল্প ও উপন্যাসে গ্রামীণ জীবনের এই অন্তরঙ্গ রূপ, দুঃখ-সুখের

ইতিহাস বিধৃত হয়েছে। শিলাইদহ. সাজাদপুর এবং পতিসরে জমিদারিতে অবস্থান কালে গ্রামীণ জীবনের যে পরিচয় রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন এবং তাকে ভিত্তি করেই রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্প ও উপন্যাস রচনা করেছিলেন। এসবের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের আন্তরিকতা ও সহমর্মিতার পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছোটগল্প সম্বন্ধে বলেন :

> "অসংখ্য ছোট ছোট লিরিক লিখেছি। বোধহয় পৃথিবীর অন্য কোন কবি এত লেখেন নি। কিন্তু আমার অবাক লাগে তোমরা যখন বল যে আমার গল্পগুচ্ছ গীতধর্মী। একসময়ে ঘুরে বেড়িয়েছি বাংলার নদীতে নদীতে, দেখেছি বাংলার পল্লীর জীবনযাত্রা। একটি মেয়ে নৌকা করে শ্বশুর বাড়ি চলে গেল, তার বঁধূরা ঘাটে নাইতে নাইতে বলাবলি করতে লাগল, আহা যে পাগলাটে মেয়ে শ্বশুর বাড়ি গিয়ে ওর কিনা জানি দশা হবে। কিংবা ধর, একটা ক্ষ্যাপাটে ছেলে সারা গ্রাম দুষ্টুমির চোটে মাতিয়ে বেড়ায়, তাকে হঠাৎ একদিন চলে যেতে হল শহরে, তার মামার কাছে। এইটুকু চোখে দেখেছি, বাকিটা নিয়েছি কল্পনা করে। একে কি তোমরা গান জাতীয় পদার্থ বলবে? আমি বলব, - আমার গল্পে বাস্তবের অভাব কখনও ঘটেনি। যা কিছু লিখেছি, নিজে দেখেছি, মর্মে অনুভব করেছি, সে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।— ভেবে দেখলে বুঝতে পারবে আমি যে ছোট ছোট গল্পগুলো লিখেছি, বাঙালি সমাজের বাস্তব জীবনের ছবি তাতেই প্রথম ধরা পড়ে।"[৩]

অপর একস্থানে তিনি বলেন :

> "আমি একদা যখন বাঙলাদেশের নদী বেয়ে তার প্রাণের লীলা অনুভব করেছিলুম তখন আমার অন্তরাত্মা আপন আনন্দে সেই সকল সুখ-দুঃখের বিচিত্র আভাস অন্তঃকরণের মধ্যে সংগ্রহ করে মাসের পর মাস বাঙলার যে পল্লীচিত্র রচনা করেছিল, তার পূর্বে আর কেউ করে নি। কারণ, সৃষ্টিকর্তা তাঁর রচনাশালায় একলা কাজ করেন। সে বিশ্বকর্মারই মতন আপনাকে দিয়ে রচনা করেন। সেদিন কবি যে পল্লীচিত্র দেখেছিলেন নিঃসন্দেহে তার মধ্যে রাষ্ট্রিক ইতিহাসের আঘাত- প্রতিঘাত ছিল। কিন্তু তার সৃষ্টিতে মানবজীবনের সেই সুখ-দুঃখের ইতিহাস, যা সকল ইতিহাসকে অতিক্রম করে বারবার চলে এসেছে কৃষি ক্ষেত্রে, পল্লী পাঠনে, আপন প্রাত্যহিক সুখ-দুঃখ নিয়ে। কখনও বা মোঘল রাজত্বে কখনো বা ইংরেজ রাজত্বে তার অতি সরল মানবত্ব প্রকাশ নিত্য চলেছে, সেইটিই প্রতিবিম্বিত হয়েছিল গল্পগুচ্ছে, কোনো সামন্ততন্ত্র নয়, কোনো রাষ্ট্রতন্ত্র নয়।"[৪]

জমিদারি দায়িত্ব নেবার পর থেকে রবীন্দ্রনাথ গ্রামগুলোকে বারবার পর্যবেক্ষণ করেছেন। গ্রামের মানুষের সমস্যার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন এবং সেসব কথা তাঁর সাহিত্যকর্মে প্রতিফলিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছোটগল্পে এবং উপন্যাসে পল্লীজীবনের যে চিত্র এঁকেছেন তাতে পল্লীর মানুষের দুরবস্থার কথা যেমন প্রকাশ পেয়েছে তেমনি তাদের প্রেম-

ভালবাসা, আনন্দ-বেদনার বেশ কিছু চিত্র যে ধরা পড়ে নি—এমন নয়।

'পোস্টমাস্টার' গল্পের নায়িকা রতন এমন এক অসাধারণ চরিত্র। পোস্টমাস্টার শহর কলকাতার মানুষ। রতন গ্রামের অশিক্ষিত মেয়ে। তার মনের মধ্যে কখন অজান্তে প্রেম এসেছে রতন তা জানতে পারে নি। ভালো করে বুঝে উঠবার মুহূর্তে প্রেমের মৃত্যু হ'ল জীবনের দুঃসহ কঠিন আঘাতে।

> "পোস্টমাস্টার বলিলেন রতন কালই আমি যাচ্ছি।
> রতন। কোথায় যাচ্ছ দাদাবাবু?
> পোস্টমাস্টার। বাড়ি যাচ্ছি।
> রতন। আবার কবে আসবে?
> পোস্টমাস্টার। আর আসব না।
> অনেকক্ষণ আর কেহ কোনো কথা কহিল না। মিটমিট করিয়া প্রদীপ জ্বলিতে লাগিল এবং একস্থানে ঘরের জীর্ণচাল ভেদ করিয়া একটি মাটির সরার ওপর টপটপ করিয়া বৃষ্টির জল পড়িতে লাগিল।"

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন দক্ষ শিল্পী। তাঁর অনুভূতিও ছিল অসাধারণ। পল্লীর একটি সাধারণ মেয়ে রক্তে মাংসে এবং মননে ভাবনায় একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষ। তার জীবনেও প্রেম আসে। রবীন্দ্রনাথ বাস্তবতাকে অস্বীকার করেন নি। পোস্টমাস্টার শিক্ষিত যুবক। তার মধ্যেও যে প্রেম আসে নি এমন নয়, কিন্তু রতনকে নিয়ে পল্লীতে কিংবা শহরে ঘর বাঁধা তার জন্যে সহজ ছিল না। তাই তাকে নীরবে সরে আসতে হয়েছে। সৃষ্টি হয়েছে এক সকরুণ বিয়োগান্তক পরিণতি। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে পল্লীজীবনের পাশাপাশি অখণ্ড মানুষের ছবি আছে যারা শহর নগরে বসবাসকারী অন্যান্য মানুষের মতোই। 'সুভা' গল্পের বোবা মেয়ে সুভাষিণী, 'শাস্তি' গল্পের দুখিরাম, ছিদাম. বড়বৌ রাধা এবং ছোটবৌ চন্দরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চরিত্রেরই এক একজন। 'শাস্তি' গল্পে রবীন্দ্রনাথ বলেন :

> "জেলখানায় ফাঁসির পূর্বে দয়ালু সিভিলসার্জন চন্দরাকে জিজ্ঞাসা করিল—কাহাকেও দেখিতে ইচ্ছা করে? চন্দরা কহিল 'একবার আমার মাকে দেখিতে চাই।' ডাক্তার কহিল—'তোমার স্বামী তোমাকে দেখিতে চায়, তাহাকে কি ডাকিয়া আনিব।'
> চন্দরা কহিল—'মরণ!'"

'সমাপ্তি' গল্পে রবীন্দ্রনাথ প্রেমের অন্য এক ছবি এঁকেছেন। এখানে প্রেমের পরিণাম বিয়োগান্তে শেষ হয়নি। 'পোস্টমাস্টার' গল্পে যা সম্ভব হয় নি—সমাপ্তি গল্পে তা সম্ভব হয়েছে। এখানে নায়ক কলেজে পড়া যুবক। মৃণ্ময়ী অশান্ত প্রকৃতিকন্যা। 'রতন' ছিল প্রকৃতির শান্ত সমাহিত পরিবেশে লালিত কন্যা 'যার বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না'। দুটি গল্পেই জীবন আছে। রবীন্দ্রনাথ পল্লীজীবনের এই সমস্ত মানুষের যে ছবি এঁকেছেন তা তাঁকে প্রাণিত করেছে পল্লীউন্নয়নের কর্মকাণ্ড হাতে নিতে। এরাও মানুষ। এরা মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না বলে তাদের প্রতি করুণা করা চলে না। এদেরকে মানুষের পদমর্যাদায়

ভূষিত করতে চেয়েছিলেন তিনি। একদিকে তাদের জীবনকে দেখেছেন আর সে সাথে তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাতে চেয়েছেন তাদের আত্মশক্তিকে উসকিয়ে দিয়ে।

'মেঘ ও বৃষ্টি' গল্পে শশিভূষণও একটি অসাধারণ চরিত্র। 'শুভদৃষ্টি'ও 'দৃষ্টিদান' 'পণরক্ষা' গল্পে গ্রামের ছবি ছাপিয়ে মানুষের ছবি বড় হয়ে উঠেছে। এই গোটা মানুষকে রবীন্দ্রনাথ তিলে তিলে দুঃখ-শোকের পরিমণ্ডলে নিঃশেষিত হতে দিতে চান নি। এখানে স্বদেশপ্রেম এবং মানবতা এক হয়ে গেছে। উপন্যাসেও রবীন্দ্রনাথ এই মানুষের কথা বলেছেন। এখানেও গ্রামের ছবি একেবারে অনুপস্থিত নয়। তবে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে গ্রাম্যজীবনের বৈচিত্র্য, তার ভালমন্দ, চাঞ্চল্য-স্থবিরতার পাশাপাশি কৃষক-শ্রমিক-জেলে-মুচী-মাঝির জীবন্ত প্রাণস্পদন যে লক্ষ করা যায় তাঁর উপন্যাসে হয়তো তেমন করে তা দেখা যায় না। 'গোরা' 'নৌকাডুবি' 'যোগাযোগ' প্রভৃতি উপন্যাসে গ্রাম এসেছে কিন্তু এখানেও রবীন্দ্রনাথ মানুষের কথা বলতে চেয়েছেন। তার দুর্বলতার কথা, তার প্রেম- ভালবাসা, আনন্দ-বেদনার কথা। তবে একথা বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ এ সবকিছুকে গ্রামের পটভূমিকায় দেখতে চেয়েছেন মানুষকে তার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে। তাঁর বিশ্বাস ছিল, 'একটি গ্রাম জাগলে একটি দেশ জাগবে।' এই জীবনদর্শন রবীন্দ্রনাথকে তাঁর পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে উদ্বুদ্ধ করেছিল। পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচি তাঁর হঠাৎ কোন খেয়াল বা বিলাসিতা ছিল না। এর মাধ্যমে তিনি কোন দেশনায়কের ভূমিকাও দাবি করেন নি। যথার্থ প্রাণের তাগিদ, মানুষের কল্যাণে তিনি নিজেকে উৎসর্গিত করেছিলেন। কবিতা, গান, ছোটগল্প, উপন্যাস তাঁর এই কর্মকাণ্ডে প্রেরণার উৎস হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এখানে হৃদয়ের সাথে বৃদ্ধিবৃত্তি এবং মেধাকে মেলাতে চেয়েছেন।

বলা যেতে পারে, দীর্ঘদিন ধরে ঠাকুরদা দ্বারকানাথ ঠাকুরের জমিদারিতে যে শোষণ-ত্রাসন চলে আসছিল, রবীন্দ্রনাথ সেই অপরাধবোধকে মাথায় নিয়ে গ্রামের অসহায় মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটিয়ে সে অপরাধকে দূরীভূত করতে চেয়েছিলেন। এ কথা সত্য যে, অত্যাচারের কোন খড়্গ-কৃপাণ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জমিদারিতে আসেন নি - কিন্তু জমিদারি পরিচালনায় বাবা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যবসায়িক প্রত্যাশাকেও তিনি ব্যর্থ করেন নি। সবকিছুকেই তিনি মেলাতে পেরেছিলেন। অত্যাচার পর্যবসিত হয়েছিল ভালবাসায় এবং এই ভালবাসা দিয়েই রবীন্দ্রনাথ তাঁর জমিদারিতে সাধারণের অবস্থানকে উন্নয়নমুখী করে গড়ে তুলেছিলেন। জমিদারি বণ্টন বা বিক্রি না হলে হয়তো বাংলাদেশেই রবীন্দ্রনাথের গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে পারত — যা অবশেষে পশ্চিমবাংলার (ভারত) শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ তা সফল করে তুলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ জমিদারির দায়িত্বভার গ্রহণের পর গ্রাম্যজীবন এবং প্রজাদের দুরবস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হন। একাধারে স্বশিক্ষিত এবং কবি মনের অধিকারী হওয়ায় দেশের বৃহদাংশ গ্রামীণ মানুষের দারিদ্র্য এবং তৎকালীন ইংরেজ শাসকদের অবহেলা তাঁকে ব্যথিত করেছিল।

রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন বাংলাদেশের কৃষকদের অবস্থা সরেজমিনে দেখেছিলেন বিধায় সাধারণ কৃষক ও অন্যান্যের সমস্যা সম্বন্ধে তিনি ছিলেন পূর্ণমাত্রায় ওয়াকিবহাল। বাংলাদেশে জমিদারির দায়িত্ব নেবার পর তিনি পল্লীউন্নয়নে নিবিষ্ট হন। তাঁর এই প্রচেষ্টা তাঁকে তাঁর সমকালীন অন্যান্য জমিদার থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল। এসব জমিদারদের অনেকেই তাঁর শত্রুও হয়ে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছিলেন তৎকালীন জমিদারেরা মুখ্য সামন্তশ্রেণীভুক্ত হওয়ায় তারা শোষণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিকে বজায় রেখেছিল। কৃষকের মৃত্যুতে তাই জমিদারের কিছু এসে যেত না। জমির মালিক জমিদার হওয়ায় তারা অন্যত্র জমির বিলি-বণ্টন যেমন করতে পারতো, তেমনি ইজারদার, পাওনাদার, তালুকদার নামে ছোট সামন্তশ্রেণী তৈরি করে নিজেদের অবস্থানকে দৃঢ় করে রাখত। এ সবকিছু রবীন্দ্রনাথের অজানা ছিল না। রবীন্দ্রনাথ বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন কৃষককে মেরে জমিদার চিরকাল বেঁচে থাকতে পারে না। কারণ, কৃষকের হাতেই তার আর্থিক প্রবৃদ্ধির চাবিকাঠি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সে কারণে যে কৃষকের উন্নতি কামনা করেছিলেন তা নয়। তিনি ছিলেন মূলত একজন রোমান্টিক কবি। ফলে মানবতা ছিল তাঁর সমগ্র জীবন ও সাহিত্যকর্মের মূল উপজীব্য বিষয়।

কবি হিসেবে অনুভূতিপ্রবণ ও সংবেদনশীল হওয়ায় একদিকে যেমন সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা তাঁকে তীব্রভাবে নাড়া দিত, তেমনি এর সুখ-দুঃখ নিরসনের জন্য তিনি উপায় খুঁজে ফিরতেন। এ কারণেই পল্লীউন্নয়ন ভাবনা তাঁর অন্তর জুড়ে ছিল। রবীন্দ্রনাথ পল্লীউন্নয়ন বলতে পল্লীর সামগ্রিক অবস্থার উন্নয়নকেই বুঝেছিলেন। এ উন্নয়ন শুধু যে উৎপাদনের তা নয়, রবীন্দ্রনাথ পল্লীউন্নয়নকে পল্লীর মানুষের আহার, বাসস্থান, শিক্ষা এবং চিকিৎসার নিশ্চয়তা বিধানস্বরূপ যেমন বুঝেছিলেন তেমনি তাকে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শ্রীবৃদ্ধিকেও অনুধাবন করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ বর্ণ এবং শ্রেণী বৈষম্যকে পল্লীউন্নয়নের প্রধান অন্তরায় বলে বুঝেছিলেন। অতীতে বর্ণবিভাজন হয়েছিল কর্মের ভিত্তিতে। পরবর্তীতে তা স্থায়ী রূপ নিয়ে বর্ণবৈষম্যে পরিণত হল। কালে সমাজ বিভক্ত হয়ে উন্নয়নকে ক্ষতিগ্রস্ত করলো।[৪]

পল্লীউন্নয়নের চালিকাশক্তি হিসেবে রবীন্দ্রনাথ তাই সমবায়কে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেন। সমবায়ের মাধ্যমে তিনি জোতদার, বিভিন্ন পেশাজীবী এবং রায়তদের জোট বাঁধতে প্রাণিত করেছিলেন। কারণ, তিনি বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন যে জোট বাঁধার মাধ্যমেই উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন ইংরেজ শাসিত ভারত উপমহাদেশের অন্তর্ভুক্ত বাংলাদেশ অন্যান্য প্রান্তের মতো ইংরেজ শোষণে ধ্বংসের সম্মুখীন। বলা যেতে পারে, ইংরেজ শাসনামলে এখানে শোষণের মাত্রা ছিল খুব বেশি। ইংরেজ শাসন

এবং শোষণ করেছে, কিন্তু তার বিনিময়ে তারা এদেশের কোন উন্নয়ন করে নি। দেশের প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর অনুরাগ ও ভালবাসা তাঁকে পল্লীর মূঢ় ম্লান মুখে ভাষা ধ্বনিতে প্রাণিত করেছিল। তিনি পল্লীর মানুষের দুর্দশা দেখে পীড়িত হয়ে লেখেন : "এদের অকৃত্রিম ভালবাসা এবং এদের অসহ্য কষ্ট দেখলে আমার চোখে জল আসে।"

রবীন্দ্রনাথ এই পল্লীর সাধারণ মানুষের কাছাকাছি আসাতেই তিনি মানুষের কবি, মানবতার কবি হতে পেরেছিলেন। তাঁর কাব্য বিশ্ব সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে তাঁকে বিশ্বকবির মর্যাদা এনে দিয়েছিল। জমিদারির দায়িত্ব নেবার অনেক আগেই তিনি পল্লীবাংলার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁর কবিপ্রতিভা তাঁকে জমিদারি দায়িত্ব পালনে শিথিলতা প্রদর্শনে উদ্বুদ্ধ করে নি; বরং এখানে তিনি জমিদারির হিসেব-নিকেশ ভালোভাবে বুঝে নেবার পাশাপাশি প্রজাদের প্রতি জমিদারের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধেও সচেতন হয়েছিলেন। এই দায়িত্ববোধ থেকেই তাঁর পল্লীউন্নয়ন ভাবনার সৃষ্টি হয়েছিল। শিলাদহ (কুষ্টিয়া), পতিসর (রাজশাহী) এবং শাহজাদপুর (পাবনা) এলাকায় তাঁর উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড জমিদার হিসেবেই শুধু নয়, এক অসাধারণ মানবতাবাদী, স্বদেশপ্রেমী কর্মযোগী পুরুষ হিসেবে পরিচিত করে। তাঁর অসংখ্য লেখায়, চিঠিপত্র ও প্রবন্ধে তাঁর এই দৃপ্ত মনোভঙ্গির পরিচয় রয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ব্রিটিশ আমলেও সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে পল্লীউন্নয়নের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। সরকার পল্লী পুনর্গঠন দপ্তর গঠন করেছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ আমলে সরকার আন্তরিক না থাকায় এ প্রচেষ্টা সফল হয় নি। চিরস্থায়ী ব্যবস্থার ফলে কৃষকদের অবস্থা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। জমিদার এবং সামন্ত শ্রেণীর মাধ্যমে ইংরেজ কর্তৃক পল্লীবাংলার বুর্জোয়া শোষণের চালচিত্রও বিভিন্ন সাহিত্যকর্মে প্রকাশিত হয়। শরৎচন্দ্র, রাজা রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, মীর মশাররফ হোসেন, দীনবন্ধু মিত্র, নজরুল প্রমুখদের রচনায় এই শোষণের চিত্র দেখতে পাওয়া যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙালি চিন্তাবিদদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায় অগ্রণী ছিলেন। রামমোহন অবশ্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উচ্ছেদ চান নি। কিন্তু তিনি কৃষকদের অবস্থা বিশেষ করে তাদের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি সম্বন্ধে বলিষ্ঠ মতামত ব্যক্ত করেন। ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনে যে কৃষকেরা শোষিত হয়েছে এ কথা তাঁর বিভিন্ন রচনায় দেখতে পাওয়া যায়। তিনি জমিদারি প্রথার সমর্থক হলেও কৃষকেরা যে তাদের উৎপন্ন আয়ের পর্যাপ্ত অংশ পাবার দাবিদার এমন কথাও তিনি উল্লেখ করেছিলেন। রামমোহন বলেছিলেন,

> "আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না, যে অধিকার জমিদারকে দেওয়া হয়েছিল সে রকম অধিকার প্রজারা কেন পাবে না; তাদের দেয় খাজনা স্থায়িভাবে স্থিরীকৃত হবে না কেন, কেনই বা সহৃদয় সরকার এখন রায়তের খাজনা বর্তমানে প্রদত্ত পরিমাণ অনুসারে স্থির করে দেবেন না, কেন ভবিষ্যতে খাজনা বৃদ্ধি শক্ত হাতে নিষিদ্ধ করা হবে না।"[৫]

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বঙ্গদেশের কৃষক শীর্ষক' আলোচনায় কৃষকদের অর্থনৈতিক দুরবস্থার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। 'দেশের শ্রীবৃদ্ধি' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র উল্লেখ করেছেন যে, কৃষিজাত আয়ের বৃদ্ধিজনিত অর্থ কৃষকের ঘরে আসে না। তা হলে "এই বেশি টাকাটা কার ঘরে যায়? কে লইতেছে?" বঙ্কিমচন্দ্র লক্ষ করেছিলেন যে, উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে যে বর্ধিত আয় লাভ হয় তা কৃষকের প্রাপ্য, কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। তিনি বলেন : "এ ধন কৃষিজাত—কৃষকের প্রাপ্য—বাস্তবিক তাহারা পায় না"। বঙ্কিমচন্দ্র আরও লিখেছেন,

> "দেশের অত্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। ... অতএব সেই শ্রীবৃদ্ধিতে রাজা, ভূস্বামী, বণিক, মহাজন সকলেরই শ্রীবৃদ্ধি। কেবল কৃষকের শ্রীবৃদ্ধি নাই। সহস্র লোকের মধ্যে কেবল নয়শত নিরানব্বই জনের তাহাতে শ্রীবৃদ্ধি নাই। এমত শ্রীবৃদ্ধির জন্য যে জয়ধ্বনি তুলিতে চাহে তুলুক; আমি তুলিব না। এই নয়শত নিরানব্বই জনের শ্রীবৃদ্ধি না দেখিলে আমি কাহারও জয়গান করিব না।"[৬]

সাধারণ মানুষের প্রতি, বিশেষ করে, পল্লীর কৃষকের প্রতি এই গভীর মমত্ববোধ বঙ্কিমচন্দ্রকে একজন দেশপ্রেমী মহৎপ্রাণ জাতীয়তাবাদী সাহিত্যিক হিসেবে পরিগণিত করেছে। পরবর্তীতে রামমোহন রায় ও বঙ্কিমচন্দ্র উভয়েই রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেন।

ব্রিটিশ আমলে ইংরেজ শাসনের কুফলে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ক্ষতি সাধিত হয়েছিল এবং পল্লী অঞ্চলও ধ্বংসের সম্মুখীন হয়ে পড়েছিল, এ বিষয়টি সে সময়ে ভারতীয় বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাবিদদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

দাদা ভাই নওরোজীর Drain Theory এবং অর্থনীতিসংক্রান্ত গবেষণা গ্রন্থ Poverty and un British Rule in India স্পষ্টভাবে এ দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থাকে তুলে ধরেছে। নওরোজী তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, এদেশের মানুষের দারিদ্র্য এবং তা মোচনের ক্ষেত্রে সরকারি প্রয়াসের অভাব ছিল। এ ছাড়া ইংরেজ সরকার ভারতবর্ষ থেকে বৃটেনে সকল সম্পদ নানাভাবে প্রেরণ ও রপ্তানি করেছে যা Drain Theory নামে পরিচিত।

রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর Economic History of India এর দুটি খণ্ডে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার পর্যালোচনা করেছেন। তাঁর মতে :

> চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে দেশের কৃষিক্ষেত্রে উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য সহায়ক ছিল। কিন্তু তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং ইংরেজ শাসনকে অভিযুক্ত করে বলেন যে, ইংরেজ শাসকেরা এদেশের সম্পদ ব্যবসার নামে তাদের দেশে পাচার করছিল এবং এদেশের কোন উন্নয়নে তারা আন্তরিক না হওয়ায় দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভেঙে পড়েছিল।[৭]

শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে পল্লীবাসীর দুরবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি 'পল্লীসমাজ' 'বামুনের মেয়ে' প্রভৃতি উপন্যাসে কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশার বর্ণনা দিয়েছেন। জমিদারদের অত্যাচারের নানা কাহিনীর চিত্র রয়েছে মীর মশাররফের

'জমিদার দর্পণে'। এখানে জমিদারদের অত্যাচারের পাশাপাশি কোম্পানির কর্মচারীদের যথেচ্ছ লুঠতরাজ ও নিপীড়নের বিবরণ রয়েছে। এই প্রসঙ্গে মধ্যযুগের সাধক কবি রামদাসের একটি গানে সে সময়ের ধনী নির্ধনের বৈষম্য সম্বন্ধে একটি চিত্র পাওয়া যায়। তিনি বলেন :

> "কে বলে তোমাকে তারা দীন দয়াময়ী।
> কারে দিলে ধনজন মা, ছয় হস্তী রথী জয়ী,
> আর কারো ভাগ্যে মজুর খাটা শাকে অন্ন মেলে কই।
> কেহ থাকে অট্টালিকায়, আমার ইচ্ছা তেমনি রই ॥

অপর গানে—

> "কেহ সারা দিন পায় না খেতে, কেহ সুখে খায় সাদা চিনি।
> কেহ শুয়ে তেতলাতে, পালঙ্কে মশারি টানি ॥
> আমরা মরি শুড়শুড়িয়ে, ভাঙাঘরে নাইকো ছানি।
> অনুভবে বুঝি তারা তেল মাথায় তেল ঢালানি।

রামমোহনের সমসাময়িক বাউল সাধক লালন ফকির ও পাঞ্জু শাহের গানেও মহাদুর্ভিক্ষের চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। লালন ফকির এক গানে বলেন :

> বাঁকির কাগজ গেল হুজুরে
> সুখের অন্তঃপুরে
> যখন ভিটেয় হও বসতি
> দিয়েছিলে খোশ কবলিতি
> ...

পাঞ্জু শাহের গানে দুর্ভিক্ষের চিত্র ঃ

> কি রূপে ছেলে পুলে মানুষ করি
> তেরোশো সাল চারি, ধান চাল আককারা ভারি
> ...
> মহাজনের হলোরে ত্যাল
> দেখিয়ে ভারি আকাল
> সোনা রূপা পোছেনা আর
> এক টাকায় লয় দশ ভরি ॥

নজরুল তাঁর 'বিষের বাঁশি' এবং প্রায় সকল কাব্যগ্রন্থেই ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন এবং কৃষক, শ্রমিক, মজুরের অসহনীয় দুঃখের চিত্র এঁকেছেন।

এমনিভাবে কোম্পানি আমলে দরিদ্র কৃষকেরা মহাদুর্ভিক্ষের কবলে পড়েছিল। সময় ছিল ১১৭৬ বঙ্গাব্দ, ইংরেজি ১৭৬৯ সাল। এই দুর্ভিক্ষ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে ইতিহাসে চিহ্নিত। এই মহাদুর্ভিক্ষের ৩ বছর পর ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস ইংল্যান্ডে কোম্পানির পরিচালকদের কাছে এই চিঠিতে জানান যে, বাংলা প্রদেশের সমগ্র লোকসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের মৃত্যু ঘটেছে এবং চাষের চরম অবনতি সত্ত্বেও ১৭৭১ খ্রিস্টাব্দে নীট রাজস্ব আদায় এমন হয়েছিল যে তা ১৭৬৮ খ্রিস্টাব্দের রাজস্ব আদায় থেকে

অধিক হয়েছে। ওয়ারেন হেস্টিংস আরও লেখেন যে, অনেকের এমন ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে, এমন ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের মধ্যে রাজস্ব আদায় অপেক্ষাকৃত অল্প হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা না হওয়ার কারণ এই যে, সকল শক্তি দিয়ে রাজস্ব আদায় করা হয়েছে। দুর্ভিক্ষের আগে বাংলাদেশের রাজস্ব ছিল ১৭৬৮ খ্রিস্টাব্দে ১, ৫২, ০৪, ৮৫৬ টাকা। ১৭৭১ সালের দুর্ভিক্ষের কারণে এক-তৃতীয়াংশ মানুষের মৃত্যু সত্ত্বেও মোট রাজস্ব বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১, ৫৭, ২৬, ৫৭৬ টাকায়।[৮]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল জমিদারদের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। মোঘল আমলে জমিদারি প্রথা থাকলেও জমির মালিক ছিল কৃষক। ভূমি রাজস্বনির্ভর মোঘল শাসনে জমিদারশ্রেণী শাসককুলের অনুদান ও অনুকম্পার উপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু কোম্পানি আমলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমির মালিক কৃষকের পরিবর্তে জমিদারেরা হয়ে পড়ে। এই মালিকানার ফলে জমিদারেরা ইচ্ছেমতো জমি ক্রয়-বিক্রয়, বিলি ব্যবস্থা সবকিছু করার অধিকার লাভ করেছিল। এই সাথে জমিদারেরা শুধু যে খাজনা নেয়ার অধিকার পেয়েছিল তা নয়, তারা প্রজাপত্তনেরও অধিকার লাভ করেছিল। জমিদারেরা রাতারাতি বড়লোক হওয়ার জন্য প্রজাদের উপর অত্যাচার করে রাজস্ব আদায় করতে শুরু করেছিল। এই জমিদারেরা তাদের জমিদারি সংরক্ষণের জন্য তাদের নিচে তালুকদার, ইজারাদার নামে নানা মধ্যস্বত্বভোগী সৃষ্টি করেছিল। এই মধ্যস্বত্বভোগীরা নির্দিষ্ট খাজনা দেবার অঙ্গীকারে জমিদারদের নামে জমি ভোগ দখল করতো। ফলে এরাও লাভের জন্য কৃষকদের নিকট থেকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাজনার জন্য নানা অত্যাচার করতো। এদের কারণেই দেশে দুর্ভিক্ষ যেমন সৃষ্টি হয়েছিল, তেমনি জমি থেকে কৃষক উচ্ছেদও হয়েছিল। ফলে তারা পরিণত হয়েছিল ভূমিহীন কৃষক ও গ্রাম্য দিন মজুর শ্রেণীতে।[৯]

প্রকৃত অর্থে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত শুধু যে, জমিদারদের সরকারিভাবে জমির মালিক করে তুলেছিল তা নয়, এই প্রথা একাধিক সামন্তশ্রেণীও গড়ে তুলেছিল। এ সম্পর্কে বিনয় ঘোষ বলেন :

> "জমিদারদের পরবর্তী স্তরে পত্তনিদার, দর-পত্তনিদার, গাঁতিদার ইত্যাদি মধ্যস্বত্বভোগীর ক্ষুদে জমিদার শ্রেণী সৃষ্টি হয়েছিল। হেস্টিংসের আমলে ১৭৭২ সালে বড় বড় জমিদার ও জমিদারির সংখ্যা একশ'র খুব বেশি ছিল না। কিন্তু তারপর চিরস্থায়িত্ব ও মধ্যস্বত্বের ফলে ১৮৭২ সালের মধ্যে জমিদারির সংখ্যা বেড়ে দেড় লক্ষের বেশি হল। এর মধ্যে ৫৩৩ টি বড় জমিদারি ২০০০ একরের উপরে, ১৫, ৭৪৭ টি জমিদারি হল ৫০০-২০০০ একরের মধ্যে এবং ৫০০ একর ও তার কম জমিদারির সংখ্যা হল ১৩৭৯২০টি।"[১০]

জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষক শোষণের মাত্রাও বেড়ে যায়। এসব অত্যাচারের ইতিহাস সমকালীন সাহিত্যিকদের রচনায় উল্লিখিত হয়েছে। অক্ষয় কুমার দত্ত, লাল বিহারী দে, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ

কৃষকদের দুর্দশার নানা বিবরণ দিয়েছেন তাঁদের গ্রন্থে। ব্রিটিশ শাসনামলে এদেশের কুটিরশিল্প প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শিল্পবিপ্লবের ফলে কলকারখানায় উৎপাদিত দ্রব্যসমূহ এদেশের বাজারগুলো দখল করে নেয়। ফলে এ দেশের কুটিরশিল্প ধ্বংস হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে প্রেমচাঁদ লাল বলেন :

> The village industries, so necessary for the prosperity of the vast population of rural India, and which for centuries have been the main stay of the prosperity of the country have all been distroyed by foreign industries.[১১]

ঠিক এমন সময়ে রবীন্দ্রনাথ জমিদারির দায়িত্ব লাভ করেন। তাঁকে আসতে হল বাংলাদেশে। কুষ্টিয়ার শিলাইদহে তখন ছিল ঠাকুর এস্টেটের সদর কাছারি। এ সময় তাঁর বয়স ছিল ঊনত্রিশ বছর। এর আগে ১৮৭৫ সালে চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি এখানে এসেছেন দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাথে। সেটিই ছিল বাংলাদেশের একটি পল্লীতে তাঁর প্রথম আগমন। এরপর তিনি নানাভাবে বাংলাদেশে এসেছেন। সেসব বিবরণ তাঁর কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস এবং প্রবন্ধে পাওয়া যায়।

শৈশব থেকে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবণ রোমান্টিক কবি। তিনি ছিলেন মানবতাবাদী এবং দেশপ্রেমী। বাংলাদেশে পরিভ্রমণকালে তিনি সাধারণ মানুষের দুঃখ-সুখের সঙ্গে পরিচিত হন। অনুভূতিসম্পন্ন হওয়ায় এসব মানুষের আনন্দ বেদনা তাই তাঁকে নাড়া দিত। রবীন্দ্রনাথ জমিদার হিসেবে দায়িত্বভার নেবার পর তিনি গভীরভাবে অনুধাবন করলেন কত অসহায় তাঁর প্রজাবৃন্দ। তাঁর কবি-মন তাঁকে অন্য জমিদারে রূপান্তরিত করলো। তিনি অস্পৃশ্যতা এবং ধনী-নির্ধনের বৈষম্য মর্মে মর্মে বুঝে বললেন :

> হে মোর দুর্ভাগা দেশ। যাদের করেছ অপমান
> অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।
> মানুষের অধিকারে
> বঞ্চিত করেছ যারে।
> সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান,
> অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।
> মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
> ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।
> বিধাতার রুদ্ররোষে
> দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে
> ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান
> অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।" (সঞ্চয়িতা)

প্রসংগত উল্লেখ্য যে, রবীন্দ্রনাথ প্রথমেই জমিদারির পূর্ণ দায়িত্ব এবং কর্তৃত্ব লাভ করেন নি। প্রথমে তাঁকে দেওয়া হয় জমিদারি পর্যবেক্ষণের ভার। এই সময়

এক চিঠিতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে লেখেন :

> "এইক্ষণে তুমি জমিদারির কার্য পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য প্রস্তুত হও; প্রথমে সদর কাছারিতে নিয়মিত বসিয়া সদর আমিনের নিকট হইতে জমা তফশিল বাকি ও জমা খরচ দেখিতে থাক এবং প্রতিদিনের আমদানি রপ্তানি পত্র সকল দেখিয়া তার সারমর্ম নোট করিয়া রাখ। প্রতি সপ্তাহে আমাকে তাহার রিপোর্ট দিলে উপযুক্ত মতে তোমাকে আমি উপদেশ দিব এবং তোমার কার্য্যে তৎপরতা ও বিচক্ষণতা আমার প্রতীতি হইলে আমি তোমাকে মফস্বলে থাকিয়া কার্য করিবার ভার অর্পণ করিব।"[১২]

পিতার পরীক্ষায় রবীন্দ্রনাথ কৃতকার্য হওয়ায় ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের ৮ আগস্ট 'পাওয়ার অব অ্যাটর্নি'র মাধ্যমে তিনি সমগ্র জমিদারির সর্বময় কর্তৃত্ব লাভ করেন। এর আগে রবীন্দ্রনাথের দাদা এবং ভাইপো, ভাগনে, ভগ্নিপতির উপর জমিদারি দেখাশুনার ভার দেওয়া হয়। কিন্তু কেও তেমন সফল হতে পারেন নি। এ থেকে বোঝা যায় রবীন্দ্রপ্রতিভা শুধু কবিত্ব শক্তিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং বাস্তবতার নিরিখে জীবনকে দেখবার যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের ছিল তা তাঁকে কবিতায় এবং জীবনে মহিমাময় করে তুললো।

রবীন্দ্রনাথের আগে তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন যেভাবে জমিদারি দেখেছিলেন তাতে জমিদারির চিরাচরিত প্রথা কাজ করেছিল। আদায়ই ছিল প্রধান কাজ। এবং এই কাজে ঠাকুর এস্টেটের যেসব আমলারা জড়িত ছিলেন তাদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ এবং অসন্তোষ কুষ্টিয়ার কুমারখালি থানার 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'র' বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশ পায়। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন কবি কাঙাল হরিনাথ মজুমদার। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন। তিনি এসবের কারণে রবীন্দ্রনাথকেই এ কাজে মনোনীত করেন।

রবীন্দ্রনাথ জমিদারি হাতে পেয়ে চিরাচরিত প্রথা সব ভেঙে দিয়েছিলেন। কবিতায় যে মানুষের অবস্থানকে তিনি উন্নত করতে চেয়েছিলেন, বাস্তবে তাকেই তিনি প্রতিষ্ঠাদানের জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। এক স্থানে রবীন্দ্রনাথ বলেন :

> "আমার জন্মগত পেশা জমিদারি, কিন্তু আমার স্বভাবগত পেশা আসমানদারি। এই কারণেই জমিদারির জমি আঁকড়ে থাকতে আমার অন্তরের প্রবৃত্তি নেই। এই জিনিসটার পরে আমার শ্রদ্ধার একান্ত অভাব। আমি জানি জমিদার জমির জোঁক- সে প্যারাসাইট, পরাশ্রিত জীব। আমরা পরিশ্রম না করে উপার্জন না করে কোনো যথার্থ দায়িত্ব গ্রহণ না করে ঐশ্বর্যভোগের দ্বারা দেহকে অপটু ও চিত্তকে অলস করে তুলি। যারা বীর্যের দ্বারা বিলাসের অধিকার লাভ করে, আমরা সে জাতের মানুষ নই। প্রজারা আমাদের অন্ন জোগায়, আর আমলারা আমাদের মুখে অন্ন তুলে দেয়— এর মধ্যে পৌরুষও নেই, গৌরবও নেই।"[১৩]

রবীন্দ্রনাথ জমিদারি দেখতে এসেই এ সত্য মর্মে উপলব্ধি করেন। এই

মনোভাবের পেছনে রামমোহন রায়ের গভীর প্রভাব ছিল। এ ছাড়াও তিনি বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃকও প্রভাবিত হন। কিন্তু জমিদারি সম্পর্কে তাঁর যত বিতৃষ্ণা বা ক্ষোভ থাকুক, রবীন্দ্রনাথ জমিদারি পরিচালনা করতে এসেই দেশকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন ভাবনা তাঁকে অন্য জমিদারে পরিণত করেছিল। তিনি মানুষের কবি হওয়ায় তিনি মানুষের দুঃখ-কষ্টের দিকটি গভীরভাবে উপলব্ধি করে তা অপসারণের ব্যবস্থাও নিয়েছিলেন। কিন্তু একা যে এই কাজটি করা সম্ভব নয়, সে কারণে তিনি অন্য জমিদারদের প্রতি তাঁর পথ অনুসরণের জন্য অনুরোধ করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, একবার এই ঘুমন্ত জাতিকে সচেতন করে তুলতে পারলে সব অন্যায়ের অবসান হবে, দেশ আপন মহিমায় জেগে উঠবে। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেন :

> "এই উপলক্ষে দেশের জমিদারের প্রতি আমার নিবেদন এই যে, বাংলার পল্লীর মধ্যে প্রাণ সঞ্চারের জন্য তাহারা উদ্যোগী না হইলে এ কাজ কখনোই সুসম্পন্ন হইবে না। পল্লী সচেতন হইয়া নিজের শক্তি নিজে অনুভব করিতে থাকিলে জমিদারের কর্তৃত্ব ও স্বার্থ খর্ব হইবে বলিয়া আপাতত আশঙ্কা হইতে পারে, কিন্তু একপক্ষকে দুর্বল করিয়া নিজের স্বেচ্ছাচারের শক্তিকে কেবলই বাধাহীন করিতে থাকা আর ডাইনামাইট বুকের পকেটে লইয়া বেড়ানো একই কথা— একদিন প্রলয়ের অস্ত্র বিমুখ হইয়া অসিকেই বধ করে। রায়তদিগকে এমনভাবে সবল ও শিক্ষিত করিয়া রাখা উচিত যে, ইচ্ছা করিলেও তাহাদের প্রতি অন্যায় করিবার প্রলোভন মাত্র জমিদারের মনে না উঠিতে পারে। জমিদার কি বণিকের মতো কেবল দীনভাবে আদায় করিবার পথগুলিই সর্বপ্রকারে মুক্ত রাখিবেন? কিন্তু সেইসঙ্গে মহৎভাবে স্বার্থত্যাগ করিবার সম্বন্ধ যদি একান্ত যত্নে না রক্ষা করেন, উচিত ক্ষতি ও দায়ভার স্বীকার করিবার শক্তি যদি তাঁহার না থাকে, তবে তাঁহার আত্মসম্মান কি করিয়া থাকিবে? রাজহাটে উপাধি কিনিবার বেলায় তিনি তো লোকসানকে লোকসান জ্ঞান করেন না। কিন্তু যথার্থ রাজা হইবার একমাত্র স্বাভাবিক অধিকার আছে তাঁহার রায়তদের কাছে।"[১৪]

রবীন্দ্রনাথ সামন্তশ্রেণীর মানুষ বলে তাঁর নিন্দুকেরা তাঁর উন্নয়নমুলক চিন্তা-ভাবনাকে 'স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন' বলে ভেবেছে। তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে তিনি নাকি জমিদার হিসেবে প্রজাপীড়ক এবং অত্যাচারী ছিলেন। এই অপবাদ যারা দিয়েছে তাদের অধিকাংশই হিন্দু এবং মধ্যবিত্ত। এঁরা অনেকাংশই সাম্প্রদায়িক ভাবনাপুষ্ট ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ গরিব হিন্দু এবং মুসলমান প্রজাদের প্রতি সদয় ছিলেন। এই প্রসঙ্গে ১৮৯১ সালে জমিদারি কাজে শিলাইদহে এসে তিনি হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বর্ণবাদজনিত একটি বিরোধ লক্ষ করেন। এ সময় ছিল শিলাইদহের জমিদারিতে 'পুণ্যাহ' উৎসব। হিন্দু মুসলমান সব শ্রেণীর মানুষ এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছে। রবীন্দ্রনাথ দেখলেন, মুসলমানেরা চাদরে ঢাকা

সতরঞ্চিতে বসতে পারে নি, অথচ সব হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য সেখানে বসবার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এই ব্যবস্থা রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ পীড়া দেয় এবং তিনি তার প্রতিবাদ করেন। কিন্তু তাতে হিন্দু নায়েব এবং আমলারা রুষ্ট হয়ে পদত্যাগ করেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে তাঁরা পরে তা প্রত্যাহার করে নেন।[১৫]

এমনিভাবে রবীন্দ্রনাথ তার জমিদারিতে প্রথমে এসেই শ্রেণীভেদের দূরত্ব নিরসনের প্রচেষ্টা নেন। রবীন্দ্রনাথ অস্পৃশ্যতাকে ঘৃণা করেছেন এবং এ কারণেই তিনি বাউলদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন।

বস্তুত, রবীন্দ্রনাথ জমিদারি দায়িত্ব লাভ করে তাকে 'শোষণের যন্ত্র' হিসেবে ব্যবহার করতে চান নি; একে তিনি দেশের কল্যাণে নিয়োজিত করতে চেয়েছিলেন। গরিব প্রজাদের অসহায় অবস্থা দেখে রবীন্দ্রনাথ যে কত দুঃখ পেয়েছিলেন তার একটি বিবরণ রয়েছে ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে লেখা একটা চিঠিতে।

> "আমার এই দরিদ্র চাষি প্রজাগুলোকে দেখলে আমার ভারী মায়া করে। এরা যেন বিধাতার শিশু সন্তানের মতো নিরুপায়। তিনি এদের মুখে নিজের হাতে কিছু তুলে না দিলে এদের আর গতি নেই। পৃথিবীর স্তন যখন শুকিয়ে যায় তখন এরা কেবল কাঁদতে জানে, কোনমতে একটুখানি খিদে ভাঙলেই আবার তখন সমস্ত ভুলে যায়।"[১৬]

রবীন্দ্রনাথ জমিদার হিসাবে প্রজাদের যে কত কাছের মানুষ হয়ে উঠেছিলেন তাঁর নিজের বক্তব্যেই সে পরিচয় রয়েছে।

> "বহুকাল থেকেই আশা করেছিলুম, আমাদের জমিদারি যেন আমাদের প্রজাদেরই জমিদারি হয়, আমরা যেন ট্রাস্টির মতো থাকি। অল্প কিছু খোরাক-পোশাক দাবি করতে পারবো, কিন্তু সে ওদেরই অংশীদারের মতো"।[১৭]

রবীন্দ্রনাথ প্রকৃত অর্থে দেশকে চিনতে পেরেছিলেন জমিদারি পরিচালনা করতে এসে। ১৮৯১ সালের ফেব্রুয়ারিতে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেন :

> "বেলা দশটার সময় হঠাৎ রাজকার্য উপস্থিত হল—প্রধানমন্ত্রী এসে মৃদুস্বরে বললেন একবার রাজসভায় আসতে হচ্ছে। কি করা যায়, লক্ষ্মীর তলব শুনে সরস্বতীকে ছেড়ে তাড়াতাড়ি উঠতে হল। সেখানে ঘণ্টাখানেক দুরূহ রাজকার্য সম্পন্ন করে এইমাত্র আসছি। আমার মনে মনে হাসি পায় আমার নিজের অপার গাম্ভীর্য এবং অতলস্পর্শ বুদ্ধিমানের চেহারা কল্পনা করে সমস্তটা একটা প্রহসন বলে মনে হয়। প্রজারা যখন সসম্ভ্রমে কাতরভাবে দরবার করে এবং আমলারা বিনীত করজোড়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন আমার মনে হয় এদের চেয়ে এমনি আমি কি মস্তলোক যে, আমি একটু ইঙ্গিত করলেই এদের জীবন রক্ষা এবং আমি একটু বিমুখ হলেই এদের সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে।

> আমি যে এই চৌকিটার ওপর বসে বসে ভান করছি যেন এই সমস্ত মানুষের থেকে আমি একটি স্বতন্ত্র সৃষ্টি, আমি এদের হর্তাকর্তা বিধাতা, এর চেয়ে অদ্ভুত আর কি হতে পারে! অন্তরের মধ্যে আমিও যে এদেরই মতো দরিদ্র সুখ-দুঃখ কাতর মানুষ, পৃথিবীতে আমারও কত ছোটো ছোটো বিষয় দরবার, কত সামান্য কারণে মর্মান্তিক কান্না, কত লোকের প্রসন্নতার উপরে জীবনের নির্ভর! এই সমস্ত ছেলে-পিলে গোরু লাঙল-ঘরকন্যাওয়ালা সরল হৃদয় চাষাভুষোরা আমাকে কি ভুলই জানে! আমাকে এদের সমজাতীয় মানুষ বলেই জানে না। সেই ভুলটি রক্ষে করবার জন্য কত সরঞ্জাম রাখতে এবং কত আড়ম্বর করতে হয়। বোট থেকে কাছারি পর্যন্ত আমি হেঁটে আসবার প্রস্তাব করেছিলুম, নায়েব বিজ্ঞভাবে বললেন, কাজ নেই। কি জানি যদি ওই ভুলে আঘাত লাগে! Prestige মানে হচ্ছে মানুষ সম্বন্ধে মানুষের ভুল বিশ্বাস! আমাকে এখানকার প্রজারা যদি ঠিক জানত, তাহলে আপনাদের একজন বলে চিনতে পারত, সেই ভয়ে সর্বদা মুখোশ পরে থাকতে হয়।"[১৮]

এর পরে রবীন্দ্রনাথকে অত্যাচারী জমিদার হিসেবে যারা চিহ্নিত করতে চান, তাঁরা রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যে কতদূর ঈর্ষাপরায়ণ, তা সহজেই অনুমেয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অজস্র চিঠিতে তাঁর মনের দুঃখ-সুখের কথা অকপটে ব্যক্ত করছেন যা তার ভিতরের মানুষটাকে নিঃসঙ্কোচে উন্মোচিত করছে।

ছেলেবেলায় দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে শিলাইদহ এবং অন্যান্য জমিদারি অঞ্চলে বেড়াতে আসা যাওয়া বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জমিদারিতে যাতায়াত করেছেন মোট ৫০ বছর। এর মধ্যে ১৮৯১ থেকে ১৮৯৮ এই আট বছর একাই থেকেছেন তাঁর জমিদারিতে। এসময় তিনি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছেন সাধারণ মানুষের সঙ্গে। তখন ছিল তাঁর পুরো যৌবন। প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে পারতেন। একদিকে জমিদারির দায়িত্ব, অন্যদ্বারে তাঁর হৃদয়ের দাবি সাহিত্যচর্চা, যা তাঁর পথ চলায়ও প্রাণিত করেছে। কবির অন্তর নিয়েই তিনি মানুষকে জানতে চেয়েছেন। এই কবিতার মাধ্যমেই তাঁর জীবনদেবতা তাঁকে সঠিক পথ নির্দেশনা দিয়েছিলেন বলেই রবীন্দ্রনাথ অন্য জমিদারে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁর সান্নিধ্যে প্রজাদের ভয়-ভীতি দূর হয়ে যাবার ফলে তিনি তাদেরই 'লোক' হয়ে পড়েছিলেন। একটি চিঠিতে তাঁর প্রজাদের সম্বন্ধে তিনি বলেন :

> "...এরা যেন আমার একটি দেশজোড়া বৃহৎ পরিবারের লোক। এইসমস্ত নিঃসহায় নিরুপায় নিতান্ত নির্ভরপর সরল চাষাভুষোদের আপনার লোক মনে করতে বড় একটা সুখ আছে। এদের ভাষা শুনতে আমার এমন মিষ্টি লাগে- তার ভিতর এমন স্নেহমিশ্রিত করুণা আছে ! এরা যখন কোনো একটা অবিচারের কথা বলে আমার চোখ ঝাপসা হয়ে আসে—অন্য নানা ছলে আমাকে সামলে নিতে হয়। এঁরা অনেক দুঃখ অনেক ধৈর্য সহকারে সহ্য করেছে, তবুও এদের ভালবাসা কিছুতেই ম্লান হয় না।"[১৯]

পতিসর থেকে লেখা অপর একটি চিঠি :

"এখানকার প্রজাদের উপর বাস্তবিক মনের স্নেহ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। এদের কোনরকম কষ্ট দিতে আদবে ইচ্ছে করে না। এদের সরল ছেলেমানুষের মতো অকৃত্রিম স্নেহের আবদার শুনলে বাস্তবিক মনটা আর্দ্র হয়ে ওঠে। যখন তুমি বলতে বলতে তুই বলে ওঠে, যখন আমাকে ধমকায়, তখন ভারী মিষ্টি লাগে। এক-একসময় আমি ওদের কথা শুনে হাসি, তাই দেখে ওরাও হাসে। ...আমার এখানকার প্রজারা সেই পরিপূর্ণ ভক্তির সরলতায় সুন্দর। তাদের রেখাঙ্কিত বৃদ্ধমুখের মধ্যেও একটি শৈশবের সৌকুমার্য আছে।"[২০]

ওপরের দুটি চিঠিতেই প্রজাদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর ভালবাসা ও সহমর্মিতার পরিচয় পাওয়া যায়। মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরী বলেন :

"রবীন্দ্রনাথ জমিদার হিসেবে মহাজনের কবল থেকে প্রজাকে রক্ষা করবার জন্য আজীবন কি করে এসেছেন তা আমি সম্পূর্ণ জানি—কেননা তাঁর জমিদারি সেরেস্তায় আমিও কিছুদিন আমলাগিরি করেছি। ... কিন্তু সেইসঙ্গে এও আমি বেশ জানি যে, বাংলার জমিদার মাত্রেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নন। রবীন্দ্রনাথ কবি হিসেবেও যেমন জমিদার হিসেবেও তেমনি Unique।[২১]

বস্তুত, রবীন্দ্রনাথ পল্লী অঞ্চলে জমিদারির দায়িত্ব নিয়েছিলেন এমন একটি সময়ে যখন ব্রিটিশ শাসকদেরকে তিনি জমিদারদের মাধ্যমে এ দেশকে শোষণ করতে দেখেছেন। সাধারণ মানুষের এই শোষিত চিত্র তাঁকে গভীরভাবে পীড়িত করে তুলেছিল। তিনি তাই জমিদারি দায়িত্ব নিয়েছিলেন স্বদেশের কল্যাণ সাধনের জন্য। এ প্রসঙ্গে অমিতাভ চৌধুরী রবীন্দ্রনাথের এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেন :

"রবীন্দ্রনাথ পল্লী অঞ্চলে জমিদারির ভার নিয়েও জমিদার হিসাবে যান নি, গিয়েছিলেন স্বদেশ-হিতৈষী কর্মী রূপে। সাধারণ মানুষের ধারণা, জমিদার বাবুমশাই দুহাতে দান খয়রাত করবেন, জোর করে খাজনা আদায় করবেন, আমলাদের হাতে তামাক খাবেন, দুচার দিন কাছারিতে আনন্দোৎসব করে স্বস্থানে ফিরে যাবেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে দেখে ওরা হতবাক। ইনি অন্যরকম, দান খয়রাতের বালাই নেই, খাজনা নিয়ে চাপ দেন না এবং আমলারা তাঁর ভয়ে কম্পমান।"[২২]

প্রকৃত অর্থে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রজাদের অভিভাবক। তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রজাদের আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করে তাদেরকে স্বাবলম্বী রূপে গড়ে তোলা। ব্রিটিশ শাসনে জমিদারেরা ছিলেন রাজস্ব আদায়কারী। এই কাজে জমিদারদের সহায় ছিল আমলারা। এরা জোতদার মহাজনদের মাধ্যমে এই কাজ করতেন চাষিদের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ না করেই। ফলে তাদের অত্যাচার জমিদারের অত্যাচার

হিসেবেই গণ্য হতো। জমিদারির বছর দুই এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তা বুঝে নিলেন। অতঃপর আমলাদের বিরুদ্ধে প্রজারা নালিশ করলে রবীন্দ্রনাথ প্রজাদের কথাই বিশ্বাস করেছেন। শিলাইদহের ঠাকুর এস্টেটে এমন অনেক আমলার চাকরি তিনি বিচ্যুত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জমিদারিতে পল্লীর অসহায় মানুষদের জন্য কি করতে চেয়েছিলেন, তাঁর লেখা 'ঐকতান' কবিতায় তাঁর মনের কথা প্রকাশ পেয়েছে এমনিভাবে !

চাষী খেতে চালাইতেছে হাল
তাঁতি বসে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল-
বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার,
তারি পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।
অতিক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চিরনির্বাসনে
সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে
মাঝে মাঝে গেছি আমি ও পাড়ায় প্রাঙ্গণের ধারে;
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।
জীবনে জীবন যোগ করা
না হলে, কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পশরা
তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা ...
...
কৃষাণের জীবনের শরিক সে জন
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।
এসো কবি, অখ্যাতজনের
নির্বাক মনের।
মর্মের বেদনা যত করিয়ো উদ্ধার।
প্রাণহীন এ দেশেতে গানহীন যেথা চারিধার,
অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ সেই মরুভূমি
রসে পূর্ণ করি দাও তুমি।
অন্তরে যে উৎস তাঁর আছে আপনারি
তাই তুমি দাও তো উদবারি।
সাহিত্যের ঐকতান— সংগীত সভায়
একতারা যাহাদের তারাও সম্মান যেন পায়-
মূক যারা দুঃখ সুখে
নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে।
ওগো গুণী,
কাছে থেকে দূরে যারা, তাহাদের বাণী যেন শুনি।
তুমি থাকো তাহাদের জ্ঞাতি,
তোমার খ্যাতিতে তারা পায় যেন আপনারি খ্যাতি—

আমি বারংবার
তোমারে করিব নমস্কার"[২৩] (সঞ্চয়িতা)

এর পরেও কি শুনতে হবে রবীন্দ্রনাথ অত্যাচারী ছিলেন এবং যা করেছেন তা নিজের স্বার্থের জন্য? অতঃপর রবীন্দ্রনাথ তাদের হয়ে বলেন :

"ওরা চিরকাল
টানে দাঁড় ধরে থাকে হাল;
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে।
ওরা কাজ কারে
নগরে প্রান্তরে ॥"[২৪] (সঞ্চয়িতা)

১৮৮০ থেকে ১৯২২সাল পর্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে রবীন্দ্রনাথ জমিদারি পরিচালনায় তাঁর প্রজাদের জীবন ও কর্মের যে দুঃখ-ভরা বৃত্তান্ত জেনেছিলেন, তা থেকেই তাদের প্রতি তাঁর মমত্ব সৃষ্টি হয়েছিল।

জমিদারির উপর রবীন্দ্রনাথের বিতৃষ্ণা বরাবরই ছিল। কিন্তু চট করে তিনি তা ছেড়ে দেবারও পক্ষপাতী ছিলেন না। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

"আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা তাতে বলতে পারি, আমাদের দেশের মূঢ় রায়তদের জমি অবাধে হস্তান্তর করবার অধিকার দেওয়া আত্মহত্যার অধিকার দেওয়া। একসময়ে সেই অধিকার তাদের দিতেই হবে, কিন্তু এখন দিলে কি সেই অধিকারের কিছু বাকি থাকবে?"[২৫]

রবীন্দ্রনাথ জানতেন,

"চাষীকে জমির স্বত্ব দিলেই সে স্বত্ব পরমুহূর্তেই মহাজনের হাতে গিয়ে পড়বে, তার দুঃখভার বাড়বে বই কমবে না।"[২৬]

রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে যা দেখেছিলেন তা হলো ঃ

"জমি যদি খোলাবাজারে বিক্রী হয়ই তা হলে যে স্বয়ং চাষ করে, তার কেনবার সম্ভাবনা অল্পই; যে-লোক চাষ করে না কিন্তু যার আছে টাকা, অধিকাংশ বিক্রয়যোগ্য জমি তার হাতে পড়বেই। জমি বিক্রয়ের সংখ্যা কালে কালে ক্রমে যে বেড়ে যাবে, এ কথাও সত্য। কারণ, উত্তরাধিকার সূত্রে জমি যতই খণ্ডখণ্ড হতে থাকবে, চাষির সাংসারিক অভাবের পক্ষে সে জমি ততই অল্পস্বত্ব হবেই, কাজেই অভাবের তায় খরিদ-বিক্রী বেড়ে চলবে। এমনি করে ছোট ছোট জমিগুলি স্থানীয় মহাজনের বড়ো বড়ো বেড়াজালের মধ্যে ঝাঁকে ঝাঁকে ধরা পড়ে।"[২৭]

রবীন্দ্রনাথ নিজেকে প্রশ্ন করেছেন ঃ

"এমন জমিদারি ছেড়ে দিলেইতো হয় ? কিন্তু কাকে ছেড়ে দেব? অন্য এক জমিদারকে? গোলাম-চোর খেলার গোলাম যাকেই গতিয়ে দিই, তার দ্বারা গোলাম চোরকে ঠেকানো হয় না। প্রজাকে ছেড়ে দেব ? তখন দেখতে-দেখতে এক বড় জমিদারের জায়গায়

দশ ছোটো জমিদার গজিয়ে উঠবে। রক্ত পিপাসায় বড় জোঁকের চেয়ে ছিনে জোঁকের প্রবৃত্তির কোনো পার্থক্য আছে তা বলতে পারিনে।"[২৮]

এসব বক্তব্য থেকে একটি সত্য বেরিয়ে আসে তা হলো, রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রজাদেরসহ সকল সাধারণ মানুষের উন্নয়ন ঘটাতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথকে অনেক সময় তাঁর নিন্দুকেরা ধনীর সন্তান বলে কটাক্ষ করেছে। তাদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন :

"লোকে অনেক সময়ই আমার সম্বন্ধে সমালোচনা করে ঘরগড়া মত নিয়ে। বলে, উনি তো ধনী-ঘরের ছেলে। ইংরেজিতে যাকে বলে রূপোর চাম্‌চে মুখ নিয়ে জন্মেছেন। পল্লীগ্রামের কথা উনি কি জানেন।' আমি বলতে পারি, আমার থেকে কম জানেন তাঁরা যাঁরা এমন কথা বলেন। কী দিয়ে জানেন তাঁরা। অভ্যাসের জড়তার ভিতর দিয়ে জানা কি যায় ?"[২৯]

রবীন্দ্রনাথ প্রজাদের সমস্যা সম্পর্কে একজন পরিপূর্ণ অভিভাবকের মতো সবকিছুই, বলতে কি, অবগত ছিলেন। এই চেতনার জন্ম হয়েছিল তাঁর মানবতাবোধ থেকে। তিনি ধর্মীয়ভাবে পরিপূর্ণ হিন্দু ছিলেন না। তাই হিন্দুর বর্ণাশ্রম পদ্ধতিকে তাঁর অস্বীকার করতে বাঁধেনি। পাশ্চাত্যের প্রগতিবাদ তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। বাবা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্মধর্মে বিশ্বাসী হওয়ায় নানা দেব-দেবীর পূজায় তাঁর তেমন আস্থা ছিল না। বাবার মাধ্যমে ফার্সি ও সুফীদর্শন জানার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। সুফীদর্শন ছিল সমন্বয়ের ধর্ম। সব ধর্মকে একীভূত করে একটি সমন্বিত ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছিল সুফীদর্শনে। পরবর্তীতে বাউলদের মধ্যে ও উপনিষদে এই সমন্বয়ের প্রকাশ লক্ষ করে তিনি 'মানবধর্ম' নামে একটি সমন্বিত ধর্মীয়বোধকে গুরুত্ব দেন। সম্রাট আকবরের দীন-ইলাহী এবং দারা শিকোহ প্রবর্তিত 'মাজমাউল বাহরাইন' তাঁর চেতনাকে আরো শাণিত করেছে। মানুষকে তিনি তখন আর হিন্দু-মুসলমান হিসেবে না দেখে কেবল মানুষ হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। তাঁর জমিদারিতে হিন্দুদের দ্বারা মুসলমানদেরকেই অধিক মাত্রায় শোষিত হতে দেখেছেন। ফলে তাঁর সহানুভূতি হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানদের প্রতি বেশি ছিল তা বেশ লক্ষ করা যায়। শিলাইদহে 'পুণ্যাহ' উৎসবে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বসবার বৈষম্যকে তিনি হিন্দুদের প্রবল প্রতিরোধের মুখেও তা অপসারিত করেছিলেন। তাঁর পল্লীউন্নয়নের ক্ষেত্রে এটা ছিল একটি বড় পদক্ষেপ।

রবীন্দ্রনাথ আরও লক্ষ করেছিলেন যে, হিন্দু সাহা সম্প্রদায় ছিল সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে প্রতিপত্তিশালী। মুসলমান শেখ সম্প্রদায় তাদের পদানত গরিব রায়ত হিসেবে বিবেচিত হতো। রবীন্দ্রনাথ এই সাহাদের হাত থেকে শেখদের বাঁচাতে চেয়েছিলেন। এটাকে তিনি তাঁর অন্যতম কাজ বলে মনে করেছিলেন। অবশ্য এখানে 'সাহা' বলতে তিনি হিন্দু মহাজনদেরকেই বুঝেছিলেন যারা 'সাহা' পদবিধারী ছিল এবং সুদের ব্যবসা করতো। শিলাইদহে

এবং তাঁর অন্য জমিদারি অঞ্চলে মুসলমান প্রজারাই রবীন্দ্রনাথকে আন্তরিক সমর্থন দিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ এমন একটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যেখানে অর্থকষ্ট ছিল না। তাই বাংলাদেশের পল্লীতে এসে তিনি যখন কৃষক ও সাধারণ মানুষের দুর্দশা দেখলেন তখন তিনি হতবিহ্বল হয়ে পড়েন। এমন অভিজ্ঞতা আগে তাঁর কখনও হয় নি। তাঁর এই অনুভূতি সৃষ্টির মূলে ছিল তাঁর কবি-মন—যা তাকে মানুষের কবি হতে সাহায্য করেছিল।

'দুই বিঘা জমি' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ সাধারণ একজন রায়তের মনের দুঃখকে প্রকাশ করেন এমনিভাবে :

শুধু বিঘে দুই ছিল মোর ভুঁই আর সবি গেছে ঋণে
বাবু কহিলেন "বুঝেছ উপেন এ জমি লইব কিনে।
কহিলাম আমি তুমি ভূস্বামী ভূমির অন্ত নাই
চেয়ে দেখ মোর আছে বড় জোর মরিবার মতো ঠাঁই।
শুনে রাজা কহে, বাপু জান তো হে করেছি বাগানখানা,
পেলে দুই বিঘে প্রস্তে ও দিঘে সমান হইবে টানা
ওটা দিতে হবে।" কহিলাম তবে বক্ষে জুড়িয়া পানি
সজল চক্ষে করুন রক্ষে গরিবের ভিটেখানি।

উপেন তার দুই বিঘে জমি শেষ পর্যন্ত রক্ষা করতে পারে নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কি অসাধারণ মমতায় সাধারণ একজন গরিব রায়তের মনোবেদনার কথা উচ্চারণ করলেন এমনভাবে যেন সেই গরিব রায়ত তিনি নিজে। উপেনকে তিনি কবিতার মাধ্যমে সকলের নিকটেই শুধু পরিচয় করে দেন নি, বরং ধনী-দরিদ্রের মধ্যে এই যে, শোষণের চিত্র তাকেই তিনি অঙ্গুলি সংকেত করেছেন এ উদ্দেশ্যে যে এই বৈষম্যকে তিনি দূরীভূত করার প্রচেষ্টা নেবেন পল্লীউন্নয়নের মাধ্যমে। 'অপমানিত' কবিতায় তিনি ধনীকে নির্ধনের পাশে নেমে আসতে বলেছেন:

'তোমার আসন হতে যেথায় তাদের দিলে ঠেলে
যেথায় শক্তিরে তব নির্বাসন দিলে সবহেলে।
চরণে দলিত হয়ে ধুলায় সে যায় বয়ে,
সেই নিম্নে নেমে এস নহিলে নাহিরে পরিত্রাণ।
অপমানে হতে হবে আজ তোরে সবার সমান ॥'
(অপমানিত : সঞ্চয়িতা)

মানুষে মানুষে এই বিভেদের প্রকাশ থেকে সৃষ্টি হয়েছিল তাঁর 'প্রশ্ন' নামক কবিতা।

"আমি যে দেখেছি, গোপন হিংসা কপট রাত্রিছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে,
আমি যে দেখেছি, প্রতিকারহীন শক্তির অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।"
(প্রশ্ন : সঞ্চয়িতা)

কৃষক ও সাধারণ মানুষের এই দুরবস্থার জন্য যারা দায়ী ছিল তাদের বিরুদ্ধে কিছু করার ক্ষমতা রবীন্দ্রনাথের একার ছিল না। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, "আমি যদি আমার প্রজাদের একমাত্র জমিদার হতুম তাহলে আমি এদের বড় সুখে রাখতুম এবং এদের ভালবাসায় আমিও সুখে থাকতুম।"[৩০] নিজের অসহায়ত্ব উল্লেখ করে তাই তিনি বলেন :

"কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে, বাঁশি সংগীতহারা
অমাবস্যার কারা
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে;
তাইতো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে—
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো?"
(প্রশ্ন : সঞ্চয়িতা)

অতঃপর তাঁর হৃদয়ের জ্বালা থেকে বেরিয়ে এল কিছু অবিস্মরণীয় কবিতা, যেখানে তাঁর দেশপ্রেম অকুণ্ঠভাবে প্রকাশিত হলো। এখানে রবীন্দ্রনাথ নিজেদের তথা সামন্তবাদী, উচ্চবিত্ত সমাজকে তীব্রভাবে আক্রমণ করতে দ্বিধা করেন নি। তিনি জেনেছিলেন সাধারণ মানুষের এই অবস্থার জন্য দায়ী এই পরজীবী সমাজ যার লজ্জা তিনি কখনও মন থেকে মুছে ফেলতে পারেন নি। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলেন :

"... ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির
মূক সবে, ম্লান মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী; স্কন্ধে যত চাপে ভার
বহি চলে মন্দগতি যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার-
তারপরে সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি,
নাহি ভর্ৎসে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি,
মানুষেরে নাহি দেয় দোষ, নাহিজানে অভিমান
শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনোমতে কষ্ট ক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া। সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে,
সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে,
নাহিজানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে,
দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে
মরে সে নীরবে।"
(এবার ফিরাও মোরে : সঞ্চয়িতা)

এমন করে বাংলাদেশের দরিদ্র এবং অসহায় মানুষের জীবনচিত্র রবীন্দ্রনাথের পূর্বে কেউ আঁকতে পেরেছেন বলে আমার জানা নেই। জমিদারের দায়ভার নিয়েই রবীন্দ্রনাথ এ ছবি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁর অন্তরের কবিসত্তা যা ছিল বিধাতার দান তাঁকে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত হবার প্রেরণা জুগিয়েছে। কবি তাঁর কর্তব্য স্থির করে ফেলেছেন। অতঃপর তিনি বলেন :

এইসব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই-সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা; ডাকিয়া বলিতে হবে
"মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে;
যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনই সে পলাইবে ধেয়ে।"
(এবার ফিরাও মোরে)

এমন মহৎ উচ্চারণ যিনি করতে পারেন তাঁর স্বদেশপ্রেম নিয়ে কি কোন সংশয় থাকে? অথচ এমনটি হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের জীবনে।

রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন নি ঠিকই এবং এ উপমহাদেশের স্বাধীনতাও তিনি চোখে দেখে যেতে পারেন নি। কিন্তু তিনি স্বাধীনতার যথার্থ ভিত নির্মাণ করে গেছেন। তিনি পল্লীউন্নয়নকে স্বাধীনতার প্রধান পদক্ষেপ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

বস্তুত, রবীন্দ্রনাথ যখন জমিদার হিসেবে বাংলাদেশে এলেন তখন তাঁর কাছে সাধারণ মানুষের অবস্থা আর অজানা রইল না। তিনি নিজেই তাদের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব নিলেন। এখানে এসেই তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে গভীরভাবে মিশেছেন। অতঃপর 'রাশিয়া ভ্রমণ' তাঁকে এক সংগ্রামী সমাজসেবীতে পরিণত করে অবশেষে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, গণমানুষের অভ্যুত্থান শুরু হয়েছে। ক্রমে ক্রমে তা সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন যারা কখনও বলতে শেখেনি তারা নিজেরাই কথা বলুক।

> "চাষীকে আত্মশক্তিতে দৃঢ় করে তুলতে হবে, এই ছিল আমার অভিপ্রায়। এ সম্বন্ধে দুটো কথা সর্বদাই আমার মনে আন্দোলিত হয়েছে—জমির স্বত্ব ন্যায়ত জমিদারের নয়- সে চাষির। দ্বিতীয়ত, সমবায় নীতি অনুসারে চাষের ক্ষেত্রে একত্র করে চাষ না করতে পারলে কৃষির উন্নতি হতেই পারে না। মান্ধাতার আমলের হাল লাঙল নিয়ে আল বাঁধা টুকরো জমিতে ফসল ফলানো আর ফুটো কলসিতে জল আনা একই কথা।"[৩১]

রবীন্দ্রনাথ জমিদারি দায়িত্ব নেবার পরপরই মনস্থির করেছেন, তাঁর জমিদারি যেন অন্য জমিদারদের মতো না হয়। গল্প, কবিতায় যেমন তিনি সাধারণের দুঃখ-কষ্টের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন বাস্তবে তেমনি তিনি সেসব সমাধানের উপায়ও উদ্ভাবন করতে চেয়েছেন। পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচি ছিল তাঁর এই চেতনার সফল প্রয়াস।

১৮৯১-১৮৯৮ সাল পর্যন্ত আট বৎসর শিলাইদহে একা থাকবার পর রবীন্দ্রনাথ ১৮৯৯ সাল থেকে স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে অনেকটাই স্থায়িভাবে থেকেছেন। এ সময় থেকে গভীরভাবে দেশকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর। সাহিত্যের আকাশচারিতার সঙ্গে জীবনের কর্মযোগের অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু এরপর ১৯০১ থেকে ১৯০৭ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের

দুঃসময় কেটেছে পারিবারিক কারণে। ১৯০২ সালে স্ত্রীর, ১৯০৩ সালে কন্যা রেনুকার, ১৯০৫ সালে পিতার এবং ১৯০৭ সালে কনিষ্ঠ সন্তান শমীন্দ্রনাথের মৃত্যু কবিকে দারুণভাবে শোকাভিভূত করে তুলেছিল। কিন্তু এর মধ্যেও দেশের কল্যাণচিন্তা থেমে থাকে নি। বারবার তিনি ফিরে এসেছেন বাংলাদেশে তাঁর জমিদারিতে। ভালো করে জেনে নিয়েছেন সাধারণ মানুষকে যাদের জন্য তাঁর কল্যাণকামিতা। রবীন্দ্রনাথ সমাজবিজ্ঞানী কিংবা নৃবিজ্ঞানী কোনটিই ছিলেন না, কিন্তু তাঁর কর্মকাণ্ড ছিল একজন অভিজ্ঞ নৃবিজ্ঞানী কিংবা সমাজবিজ্ঞানীর। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন :

> "বাংলাদেশের নদীতে নদীতে গ্রামে গ্রামে তখন ঘুরে বেড়াচ্ছি, এর নূতনত্ব, চলন্ত বৈচিত্র্যের নূতনত্ব।
>
> শুধু তাই নয়, পরিচয়ে-অপরিচয়ে মেলামেশা করেছিল মনের মধ্যে। বাংলাদেশকে তো বলতে পারি সে বেগানা দেশ, তার ভাষা চিনি, তার সুর চিনি। ক্ষণে-ক্ষণে যতটুকু গোচরে এসেছিল তার চেয়ে অনেকখানি প্রবেশ করেছিল মনের অন্দর মহলে আপন বিচিত্ররূপে নিয়ে।...
>
> আমি শীত গ্রীষ্ম বর্ষা মানি নি, কতবার সমস্ত বৎসর ধরে পদ্মার আতিথ্য নিয়েছি, বৈশাখের খররৌদ্রতাপে, শ্রাবণের মুষল ধারা বর্ষণে। পরপারে ছিল ছায়াঘন পল্লীর শ্যামশ্রী, এপারে ছিল বালুচরের পাণ্ডুবর্ণ জনহীনতা, মাঝখানে পদ্মার চলমান স্রোতের পটে বুলিয়ে চলেছে দ্যুলোকের শিল্পী প্রহরে প্রহরে নানাবর্ণের আলোছায়ার তুলি। এইখানে নির্জন-সজনের নিত্য সঙ্গম চলেছিল আমার জীবনে। অহরহ সুখদুঃখের বাণী নিয়ে মানুষের জীবনধারার বিচিত্র কলরব এসে পৌঁছাচ্ছিল আমার হৃদয়ে। মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে আমার মনকে জাগিয়ে রেখেছিল। তাদের জন্য চিন্তা করেছি, কাজ করেছি, কর্তব্যের নানা সংকল্প বেঁধে তুলেছি, সেই সংকল্পের সূত্র আজও বিচ্ছিন্ন হয় নি আমার চিন্তায়। সেই মানুষের সংস্পর্শই সাহিত্যের পথ এবং কর্মের পথ পাশাপাশি প্রসারিত হল আমার জীবনে। আমার বুদ্ধি এবং কল্পনা এবং ইচ্ছাকে উন্মুক্ত করে তুলেছিল এই সময়কার প্রবর্তনা, বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবলোকের মধ্যে নিত্য সচল অভিজ্ঞতার প্রবর্তনা।"[৩২]

রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশকে ভালবেসেছিলেন। ভালবেসেছিলেন এর প্রকৃতি আর মানুষকে। উভয়েই অনুপম। কিন্তু আত্মরক্ষায় আত্মশক্তিহীন। বাংলাদেশের এই দুরবস্থা দেখে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত শঙ্কিত হয়েছিলেন। বোধকরি কবি হওয়ার ফলেই তাঁর দেশপ্রেম তাঁকে অন্য রবীন্দ্রনাথে পরিণত করেছিল। রবীন্দ্রনাথ বলেন :

> "প্রজারা আমার কাছে তাদের সুখ-দুঃখ নালিশ আব্দার নিয়ে আসত। তার ভিতর থেকে পল্লীর ছবি আমি দেখেছি। একদিকে বাইরের ছবি—নদী, প্রান্তর, ধানখেত, ছায়াতরুতলে তাদের কুটির, আর

একদিকে তাদের অন্তরের কথা। তাদের বোঝাও আমার কাজের সঙ্গে জড়িত হয়ে পৌঁছত।"[৩৩]

বাংলাদেশের পল্লী এবং পল্লীর মানুষের এমন নানা বর্ণনা রয়েছে রবীন্দ্রনাথের নানা চিঠিপত্রে। এসব বিবরণ থেকে জানা যায় যে কত গভীরভাবে তিনি বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবন সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। এসবের পিছনে তাঁর যে উদ্দেশ্য ছিল তা হলো, এই মানুষদের জীবনে এমন একটি পরিবর্তন আনতে হবে যা একদিকে এসব মানুষদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাবে অপরদিকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দেশ স্বাবলম্বী হবে এবং তখন সমাজ প্রতিষ্ঠায় আর দেরি হবে না। একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বলেন :

"যতদিন পল্লীগ্রামে ছিলেম, ততদিন তাকে তন্নতন্ন করে জানবার চেষ্টা আমার মনে ছিল। কাজের উপলক্ষে এক গ্রাম থেকে আর এক দূর গ্রামে যেতে হয়েছে, শিলাইদা থেকে পতিসর, নদী-নালা বিলের মধ্য দিয়ে- তখন গ্রামের বিচিত্র দৃশ্য দেখেছি। পল্লীবাসীদের কৃত্য; প্রতিদিন তাদের জীবনযাত্রার বিচিত্র চিত্র দেখে প্রাণ ঔৎসুক্যে ভরে উঠত।

আমি নগরে পালিত, এসে পড়লুম পল্লীশ্রীর কোলে—মনের আনন্দে কৌতূহল মিটিয়ে দেখতে লাগলুম। ক্রমে এই পল্লীর দুঃখ-দৈন্য আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল, তার জন্যে কিছু করব এই আকাঙ্ক্ষায় আমার মন ছটফট করে উঠেছিল। তখন আমি যে জমিদারি-ব্যবসায় করি, নিজের আয়-ব্যয় নিয়ে ব্যস্ত, কেবল বণিকবৃত্তি করে দিন কাটাই। এটা নিতান্তই লজ্জার বিষয় মনে হয়েছিল। তারপর থেকে চেষ্টা করতুম—কী করলে এদের মনের উদবোধন হয়, আপনাদের দায়িত্ব এরা আপনি নিতে পারে। আমরা যদি বাইরে থেকে সাহায্য করি তাতে এদের অনিষ্টই হবে। কী করলে এদের মধ্যে জীবন সঞ্চার হবে, এই প্রশ্নই তখন আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল।"[৩৪]

রবীন্দ্রনাথকে কবি হিসেবেই পৃথিবীর মানুষ জানে। তিনি নোবেল পুরস্কারের মাধ্যমে বিশ্বকবির মর্যাদাও পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কবির থেকেও কর্মযোগী হিসেবে যে বড় এ কথা পৃথিবী তেমন করে জানে না। আজকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য যে পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হচ্ছে, বিশেষ করে পল্লীউন্নয়নের ক্ষেত্রে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর তরুণ বয়সে তাঁর অসাধারণ ধী-শক্তির মাধ্যমে বর্তমানের থেকেও উন্নত পদ্ধতি উদ্ভাবন করে তার প্রসার ঘটিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের জীবন দর্শন এবং পল্লীউন্নয়ন সম্পর্কে তাঁর ধ্যানধারণা ইত্যাদি লক্ষ করলেই তা স্পষ্ট বুঝা যায়। সমাজবিজ্ঞান বা নৃবিজ্ঞানে Participatory Observation বা অংশগ্রহণের মাধ্যমে কোন অবস্থার সম্যক পর্যবেক্ষণ এবং পর্যালোচনা যাকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাপ্রসূত বলা হয়ে থাকে, ইংরেজিতে যা empirical method নামে পরিচিত, রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনে পল্লীগ্রামের উন্নয়নের ক্ষেত্রে তা সম্ভব করে তুলেছিলেন।

আজকের উন্নয়ন দর্শনে যাকে Rural Apprisal বলা হয় রবীন্দ্রনাথ তা আগেই সম্ভব করে তুলেছিলেন। তাঁর দেখা বাংলাদেশের চিত্র ছিল নিখুঁত এবং জীবন্ত। অতঃপর সমস্যার সমাধানের পথও তিনি বের করে নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ একজন দক্ষ নৃবিজ্ঞানী বা সমাজবিজ্ঞানীর মতো বুঝেছিলেন, যাদের কাজ তাদেরকেই করতে হবে, তারাই সমস্যার কথা বলবে এবং তাদেরকেই সমাধানের পথও বের করে নিতে হবে। বাইরে থেকে সাহায্য করলে তাদের ক্ষতি হবে। বাংলাদেশে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দাতা সংস্থাদের মাধ্যমে এই ক্ষতিটিই করে চলেছে। রবীন্দ্রনাথ এও বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, এসব গ্রামবাসী অশিক্ষিত এবং নিজেদের প্রতি আস্থাহীন। ফলে এদের মধ্যে কোন উন্নয়নের কাজ করতে যাওয়া অনেক সময় বাধাগ্রস্ত হয়। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন :

'এদের উপকার করা শক্ত, কারণ এরা নিজেকে বড় অশ্রদ্ধা করে। তারা বলত, 'আমরা কুকুর, কষে চাবুক মারলে তবে আমরা ঠিক থাকি।'... আমি ভাবলুম এদের গ্রামের মাঝখানে ঘর বানিয়ে দেব; এখানে দিনের কাজের পর তারা মিলবে, খবরের কাগজ, রামায়ণ মহাভারত পড়া হবে; তাদের একটা ক্লাবের মতো হবে। সন্ধ্যাবেলায় তাদের নিরানন্দ জীবনের কথা ভাবতে আমার মন ব্যথিত হত; সেই একঘেয়ে কীর্তনের একটি পদের পুনরাবৃত্তি করছে, এইমাত্র। ঘর বাঁধা হল, কিন্তু সেই ঘর ব্যবহার হল না। মাস্টার নিযুক্ত করলুম, কিন্তু নানা অজুহাতে ছাত্র জুটল না।'[৩৫]

রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন, উপকার করতে চাইলেই উপকার করা যায় না। বাংলাদেশে পল্লীউন্নয়ন কর্মকাণ্ডে উদ্যোগী হলে তাই এমন অনেক বাধা পেয়েছেন তিনি। এমনি আর একটি ঘটনা :

"আমার জমিদারিতে নদী বহুদূরে ছিল, জলকষ্টের অন্ত ছিল না। আমি প্রজাদের বললুম, 'তোরা কুয়ো খুঁড়ে দে, আমি বাঁধিয়ে দেব।' তারা বললে, এ যে মাছের তেলে মাছ ভাজবার ব্যবস্থা হচ্ছে। আমরা কুয়ো খুঁড়ে দিলে আপনি স্বর্গে গিয়ে জলদানের পুণ্যফল আদায় করবেন আমাদের পরিশ্রমে।' আমি বললুম, 'তবে আমি কিছুই দেব না।' এদের মনোভাব এই যে, স্বর্গে এর জমা খরচের হিসাব রাখা হচ্ছে। ইনি পাবেন অনন্ত পুণ্য, ব্রহ্মলোক বা বিষ্ণুভুলোকে চলে যাবেন, আর আমরা সামান্য জলমাত্র পাব।

আর একটি দৃষ্টান্ত দিই। আমাদের কাছারি থেকে কুষ্টিয়া পর্যন্ত উঁচু করে রাস্তা বানিয়ে দিয়েছিলুম।

রাস্তার পাশে যেসব গ্রাম তার লোকদের বললুম, 'রাস্তা রক্ষার দায়িত্ব তোমাদের'। তারা যেখানে রাস্তা পার হয় সেখানে গরুর গাড়ির চাকায় রাস্তা ভেঙে যায়, বর্ষাকালে দুর্গম হয়। আমি বললুম, 'রাস্তায় যে খাদ হয় তার জন্যে তোমরাই দায়ী, তোমরা সকলে মিলে সহজেই ওখানটা ঠিক করে দিতে পারো।' তারা জবাব দিলে 'বাঃ আমরা

রাস্তা করে দেব আর কুষ্টিয়া থেকে বাবুদের যাতায়াত সুবিধে হবে।'

অপরের কিছু সুবিধা হয় এ তাদের সহ্য হয় না। তার চেয়ে তারা নিজেরা কষ্টভোগ করে সেও ভালো। এদের ভালো করা বড়ো কঠিন। তবুও আরম্ভ করেছিলুম কাজ।"[৩৬]

অপর একস্থানে রবীন্দ্রনাথ বলেন :

"... আমি একদিন একটি গ্রামের উন্নতি করতে গিয়েছিলুম। গ্রামের লোকদের জিজ্ঞাসা করলুম, সেদিন তোদের পাড়ায় আগুন লাগল, একখানা চালাও বাঁচাতে পারলিনে কেন? তারা বললে, 'কপাল!' আমি বললেম, কপাল নয় রে, কুয়োর অভাব। পাড়ায় একখানা কুয়ো দিসনে কেন?' তারা তখনই বললে, "আজ্ঞে কর্তার ইচ্ছে হলেই হয়।' যাদের ঘরে আগুন লাগবার বেলায় থাকে দৈব, তাদের জলদান করবার ভার কোন একটি কর্তার। সুতরাং যে করে হোক এরা একটা কর্তা পেলে বেঁচে যায়। তাই এদের কপালে আর সকল অভাবই থাকে, কিন্তু কোন কালেই কর্তার অভাব হয় না।"[৩৭]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জমিদারিতে এইসব দরিদ্র চাষিদের জীবনে হতাশা এবং পরনির্ভরতা লক্ষ করেছিলেন, তাই তিনি নিজেই এসব সাধারণ মানুষের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করেছিলেন এর একমাত্র কারণ তাঁর মানবতাবোধ এবং দেশপ্রেম। বাংলাদেশে তাঁর জমিদারিতেই তিনি পল্লীউন্নয়নের কাজে হাত দিয়েছিলেন। কুষ্টিয়ার শিলাইদহ অঞ্চলে প্রথমে এ কাজ তিনি শুরু করেন। এ সম্পর্কে একটি বিবরণে তিনি বলেন :

"একদা আমি পদ্মার চরে বোট বেঁধে সাহিত্যচর্চা করেছিলুম। মনে ধারণা ছিল, লেখনী দিয়ে ভাবের খনি খনন করব এই আমার একমাত্র কাজ, আর কোনো কাজের আমি যোগ্যই নই। কিন্তু যখন এ কথা কাউকে বলে কয়ে বোঝাতে পারলুম না যে, আমাদের স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্র হচ্ছে কৃষিপল্লীতে, তার চর্চা আজ থেকে শুরু করা চাই, এখন কিছুক্ষণের জন্য কলম কানে গুঁজে এ কথা আমাকে বলতে হল আচ্ছা আমিই এ কাজে লাগব।"[৩৮]

সমবায়, সুশীল সমাজ, সুশাসন

রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচি মূলত, একজন কবির কর্মযজ্ঞের অনেক না বলা কাহিনী। কবির অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে তিনি যা দেখেছিলেন, তিনি সেসব কথা কবিতায়, প্রবন্ধে এবং ছোটগল্পে উল্লেখ করেছিলেন। এসব সাহিত্যে তাঁর ইচ্ছার প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু বাস্তবে তিনি তাঁর ইচ্ছার বিকাশ ঘটিয়েছেন তাঁর জমিদারিতে। রবীন্দ্রনাথ পল্লীউন্নয়নকে একটি জাতির উন্নতির একমাত্র উপায় বলে জেনেছিলেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, সাধারণ মানুষকে বাদ দিয়ে দেশের সার্বিক উন্নয়ন কখনই সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের এই উন্নয়ন ভাবনায় মানুষ

প্রাধান্য পেয়েছে। সে কোন ধর্মের বা বর্ণের, তিনি তা ভাবেন নি। তবে যারা নিচের তলার সাধারণ মানুষ তাদের প্রতিই তাঁর মমত্ব ছিল বেশি। তাঁকে সমাজতন্ত্রী বলা যাবে না। কারণ, তিনি পুঁজি এবং ধনার্জনের বিরুদ্ধে ছিলেন না। কিন্তু তাঁর মতে এই ধনার্জন স্বেচ্ছাচার হবে না এবং তার উপর সমাজের নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, ধনীকে মেরে এই নিয়ন্ত্রণ আসবে না; বরং সে তার অংশীদার হওয়ায় তা আপনা থেকে আসবে। এজন্যেই তিনি সমবায়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন সমবায়ের মাধ্যমে অতিকায় ধনের শক্তি বারবার বিভক্ত হয়ে ক্রমে অন্তর্ধান করবে। তখন দুর্বলই হবে জয়ী, তবে 'প্রবলকে মেরে নয়। নিজের শক্তিকে ঐক্য দ্বারা প্রবলরূপে সত্য করে।'

পল্লীউন্নয়নের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ সমবায়কে চালিকাশক্তি মনে করলেও একে সংহতরূপ দেবার জন্য তিনি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর মতে জোট বাঁধা, ব্যূহবদ্ধতা এবং অর্গানিজেশন' এই তিনটি পল্লীউন্নয়নের সার কথা। তিনি বলেন :

"সমস্ত মহৎগুণ থাকিলেও ব্যূহের নিকট কেবলমাত্র 'সমূহ' আজ কিছুতেই টিকিতে পারিবে না। অতএব, গ্রামে গ্রামে আমাদের যে বিশ্লিষ্টতা, যে মৃত্যুলক্ষণ দেখা দিয়াছে, গ্রামগুলিকে সত্বর ব্যবস্থাবদ্ধ করিয়া তাহা ঠেকাইতে হইবে।"[৩৯]

রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন। একদিকে পল্লীর উন্নয়ন ক্ষেত্রে তিনি যেমন সকলের অংশগ্রহণকে অত্যন্ত গুরুত্বসহ বিবেচনা করেছিলেন, তেমনি এই গোষ্ঠীভূত দলের চালিকাশক্তি হিসেবে নেতা সৃষ্টির কাজটিকেই বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন। তিনি লক্ষ করেছিলেন গ্রামের মানুষ ঐক্যবদ্ধ নয়, ফলে বাইরে থেকে বিরুদ্ধশক্তি তাকে প্রতিনিয়ত আত্মসাৎ করে ফেলছে। রবীন্দ্রনাথ এ অবস্থা থেকে বাঁচবার জন্য বলেন :

"এখন সমাজকে ইহার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে হইলে অত্যন্ত নিশ্চিতরূপে তাঁহার আপনাকে দাঁড় করাইতে হইবে। তাহা করাইবার একমাত্র উপায়— একজন ব্যক্তিকে অধিপতিত্বে বরণ করা, সমাজের প্রত্যেককে সেই একের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করা, তাঁহার সম্পূর্ণ শাসন বহন করাকে অপমান জ্ঞান না করিয়া আমাদের স্বাধীনতারই অঙ্গ বলিয়া অনুভব করা।

এই সমাজপতি কখনো ভালো কখনো মন্দ হইতে পারেন, কিন্তু সমাজ যদি জাগ্রত থাকে তবে মোটের উপর কোনো ব্যক্তি সমাজের স্থায়ী অনিষ্ট করিতে পারে না।

আবার, এইরূপ অধিপতির অভিষেকই সমাজকে জাগ্রত রাখিবার একটি প্রকৃত উপায়। সমাজ একটি বিশেষ স্থলে আপনার ঐক্যটি প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিলে তাহার শক্তি অজেয় হইয়া উঠিবে।

ইহার অধীনে দেশের ভিন্ন ভিন্ন নির্দিষ্ট অংশে ভিন্ন ভিন্ন নায়ক নিযুক্ত

> হইবে। সমাজের সমস্ত অভাবমোচন মঙ্গল কর্মচালনা ও ব্যবস্থা রক্ষা ইহারা করিবেন এবং সমাজপতির নিকট দায়ী থাকিবেন।"[৪০]

আমরা ভেবে অবাক হই যে, আজকের পৃথিবীতে যে সুশীল সমাজ গঠনের প্রয়োজনীয়তা আমরা উপলব্ধি করছি, রবীন্দ্রনাথ শতবর্ষ পূর্বে তা বাস্তবে প্রয়োগের পথটিও নির্দেশ করে দিয়েছিলেন। তিনি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সমাজপতি নির্ধারণের কথা যেমন বলেছিলেন, তেমনি সুষ্ঠু প্রশাসন বা সুশাসনের জন্য সমাজপতির প্রতি আস্থা রাখার জন্যও সকলকে আহ্বান করেছিলেন। এই সুশীল সমাজ ও সুশাসনের প্রক্রিয়া পল্লীর উন্নয়নকেই যে ত্বরান্বিত করতে পারে তা নয়, গোটা জাতিই তাতে লাভবান হয়।

রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন ভাবনার মর্মমূলে ছিল তাঁর স্বাদেশিকতা। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন লর্ড কর্ণওয়ালিসের জমিদারি প্রথা বাংলাদেশকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। জমিদারদের শোষণের মাধ্যমে এ দেশের সম্পদ বিদেশীরা লুণ্ঠন করে চলেছে। ফলে সাধারণ মানুষ ও গ্রামপতি বা জমিদারদের সঙ্গে আর পূর্বের সম্পর্ক থাকে নি। ইতোমধ্যে গ্রামের উদ্বৃত্ত সম্পদও আর গ্রামে না থেকে তা জমা হ'ল শহরে। বাণিজ্য বৃদ্ধির কারণে শহর পরিণত হল নগরে। গ্রামের বিত্তশালী ব্যক্তিরা আর গ্রামে থাকতে চাইলো না। তারা শহর এবং নগরের বাসিন্দা হয়ে পড়লো সম্পদের বাণিজ্যকরণ ও বিনিয়োগের স্বার্থে। সমাজের নেতৃত্বও এসে পড়লো নগরবাসী ধনিক শ্রেণীদের হাতে। এর ফলে গ্রাম দুর্দশার সম্মুখীন হয়ে পড়লো। রবীন্দ্রনাথ গ্রামের এই অবস্থা বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন। এবং সে কারণে তিনি তাঁর জমিদারিতে ঐতিহ্যভিত্তিক পল্লীউন্নয়নের কর্মসূচি গ্রহণ করেন। কিন্তু ইতোমধ্যেই গ্রামের মানুষের মানসিকতারও পরিবর্তন ঘটেছে। জনসংখ্যার বৃদ্ধির কারণে চাষযোগ্য ভূমি নানাংশে খণ্ডিত হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রবীন্দ্রনাথের মতো এমন মানসিকতা অন্য জমিদার বা ধনিক শ্রেণীদের মধ্যে ছিল না। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছিলেন, অভাবের কারণে গ্রামের মানুষ একজন অপরজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে।

এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য রবীন্দ্রনাথ সমবায়ের পথকেই বেছে নিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই সমবায় পদ্ধতি বিদেশী ভাবনাপুষ্ট নয়, দেশীয় ঐতিহ্যের আদলে তা গাঁথা। সমবায়কে রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন একটি ঐকমত্যের বাঁধন হিসেবে। ধনী-নির্ধন, জোতদার-রায়ত, হিন্দু-মুসলমান সকলেই জোট বাঁধবে মিলনের, গভীর প্রীতি আর ভালবাসার। তখন উন্নয়নে কোন বাধা থাকবে না— তা আসবে স্বাভাবিকভাবে। রবীন্দ্রনাথ সমবায়কে মুক্তির একমাত্র পথ বলে জেনেছেন। একে তিনি মনুষ্যত্বের মূলনীতি হিসেবে দেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছেন, পৃথিবীতে সকলেই জোট বেঁধে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। এমন অবস্থায় যারা বিচ্ছিন্ন থাকবে তাদের ধ্বংস অনিবার্য। প্রসংগত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথ গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য যখন সমবায়ের কথা বলেছেন, তখন তিনি সমবায়ভিত্তিক কৃষি ও শিল্পে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার এবং সর্বক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বসহ বিবেচনা করেছেন। সমবায়ের সঙ্গে উন্নত প্রযুক্তির

ব্যবহার রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন ভাবনায় একটি বিশেষ ধারার সংযোজন করেছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

> "আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যাকে শুধু তার শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে গ্রহণ করাটা মানুষের কর্তব্য নয়। বরং মনুষ্যত্বের আদর্শের সঙ্গে, সামঞ্জস্য রেখে যন্ত্র ও প্রযুক্তিকে নতুনভাবে নির্ধারণ করাই জরুরি।"[৪১]

সমবায় ছিল রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়নের মূল চাবিকাঠি। এর মাধ্যমেই রবীন্দ্রনাথ ধনী-নির্ধনের বৈষম্য যেমন কমাতে চেয়েছেন তেমনি কৃষ্টি ও শিল্পে ধনবাদের বিকাশকেও স্বাগত জানিয়েছেন। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথই ছিলেন সমবায়ভিত্তিক পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচির প্রথম উদ্যোগী পুরুষ। ১৯০৪ সালে ভারতীয় উপমহাদেশে সমবায় সমিতি আইন গঠিত হয়। প্রাচীন ঐতিহ্যের আলোকে রবীন্দ্রনাথ পঞ্চায়েতী প্রথাকে ঢেলে সাজিয়েছিলেন এবং সুগঠিত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রস্তাবিত পল্লীসমাজের যে কাঠামো নির্মাণ করেছিলেন তা অনেকটাই ইউনিয়ন পরিষদের আদলে গড়া। এ ছাড়া তিনি পল্লীউন্নয়নে 'হিতৈষী সভা' নামে একটি প্রতিষ্ঠানও গড়ে তোলেন। এ কাজে তিনি বালক, যুবক, বৃদ্ধ সকলকেই লাগিয়েছিলেন। কৃষিকাজের উন্নয়নের জন্য তিনি কৃষি খামার, কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি গ্রামীণ অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে কুটিরশিল্প ও তাঁতশিল্পের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। শিক্ষার প্রতি তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করে অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় ও নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করেন। প্রতিটি কাজে প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গঠন করেন।

এমনিভাবে তিনি পল্লীউন্নয়নের ক্ষেত্রে সমষ্টিগত চেতনার বিকাশ ঘটিয়েছিলেন। পরবর্তীতে তাঁর এই প্রচেষ্টা শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী এবং শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রূপলাভ করে। রবীন্দ্রনাথের এই পল্লীউন্নয়ন ভাবনা ও কর্মকাণ্ডের মর্মমূলে ছিল তাঁর ঐতিহ্য চেতনা। তিনি অতীতের গ্রাম ব্যবস্থাপনায় একটি সুগঠিত সমাজকে প্রত্যক্ষ করেন। এই সমাজে নিঃসন্দেহে সামন্তশ্রেণীর প্রভাব ছিল। কিন্তু সেখানে শাসক ও শাসিতের মধ্যে শোষণ থাকলেও তা সর্বাত্মক ছিল না।

এই ব্যবস্থাপনায় গ্রামপতি ও গ্রামবাসীদের মধ্যে রক্ষণ ও আনুগত্যের সম্পর্কটা বড় ছিল। আপাতভাবে সকল ক্ষেত্রে একটি সৌহার্দপূর্ণ অবস্থা ছিল। তখন গ্রামের জমিদার শ্রেণী ও সম্পন্ন ব্যক্তিরা গ্রাম ত্যাগ করতেন না। পল্লীই ছিল তাদের বাসস্থান। এ সময়ে গ্রামে জনসংখ্যার আধিক্য ছিল না, সম্পদও ছিল প্রচুর। ডাকাতি ও রাহাজানি ছিল অত্যন্ত সীমিত। সমাজে ধর্মের প্রভাব অত্যন্ত বেশি ছিল। ধনিক শ্রেণী মানুষের কল্যাণে অর্থব্যয় করতেন। রাস্তাঘাট, পুকুর, বিদ্যালয় ইত্যাদি নানা সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে বিত্তবান শ্রেণীর অংশগ্রহণ ছিল নিয়মিত। এ সময় রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে পল্লীসমাজ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল না। রাষ্ট্রে ক্ষমতার পরিবর্তনে গ্রামে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায় নি। তখনকার পল্লীসমাজে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ছিল প্রতিবেশীসুলভ। সে

সময় গ্রামের অনুষ্ঠানাদিতে মেলা বসতো। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সেসব অনুষ্ঠান ও মেলা উপভোগ করতো।

কিন্তু ব্রিটিশ আমলে এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল সমাজকে গ্রাস করে ফেলেছিল। এ সময়ে বিদেশী বণিক তাদের স্থানীয় সহযোগীদের মাধ্যমে পল্লীসমাজের সম্পদ লুণ্ঠনে তৎপর হয়ে ওঠে। এরা একদিকে যেমন এ দেশের সম্পদ বিদেশে পাচার করেছিল তেমনি ব্যবসায় বাণিজ্যের মাধ্যমে ধনসম্পদও একটি শ্রেণীর হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ছিল।

মণ্ডলীপ্রথা

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জমিদারিতে 'মণ্ডলীপ্রথা' প্রবর্তন করেছিলেন। মণ্ডলীপ্রথা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন :

> "কতকগুলি পল্লী লইয়া একটি মণ্ডলী স্থাপিত হইবে। সেই মণ্ডলীর প্রধানগণ যদি গ্রামের সমস্ত কর্মের এবং অভাব মোচনের ব্যবস্থা করিয়া মণ্ডলীকে নিজের মধ্যে পর্যাপ্ত করিয়া তুলিতে পারে তবেই স্বায়ত্তশাসনের চর্চা দেশের সর্বত্র সত্য হইয়া উঠিবে। নিজের পাঠশালা, শিল্প-শিক্ষালয়, ধর্মগোলা, সমবেত পণ্যভাণ্ডার ও ব্যাঙ্ক স্থাপনের জন্য ইহাদিগকে শিক্ষা সাহায্য ও উৎসাহ দান করিতে হইবে। প্রত্যেক মণ্ডলীর একটি করিয়া সাধারণ মণ্ডপ থাকিবে, - সেখানে কর্মে ও আমোদে সকলে একত্র হইবার স্থান পাইবে এবং সেইখানে ভারপ্রাপ্ত প্রধানেরা মিলিয়া সালিসের দ্বারা গ্রামের বিবাধ ও মামলা মিটাইয়া দিবে।"[৪২]

আজকের পৃথিবীতে সুশাসন বা good governance বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব পাচ্ছে। এই সুশাসন পরিকল্পনার সর্বনিম্ন ধারা বা প্রান্তিক স্তর ইউনিয়ন পরিষদ। ভারতে এই ব্যবস্থার নাম পঞ্চায়েতী প্রথা। অতীতে বাংলাদেশে পঞ্চায়েতী প্রথা চালু ছিল। ব্রিটিশ আমলে এই পঞ্চায়েত বা ইউনিয়ন পরিষদ যেভাবে আমাদের দেশে গড়ে ওঠে তা ব্রিটিশ শাসন ও তোষণ নীতি অনুসরণ করে গ্রামোন্নয়নের পরিবর্তে দুর্নীতি ও দুঃশাসন নিয়ে আসে। এর ফলে গ্রামের সাধারণ মানুষের জীবন বিপর্যস্ত হয়ে ওঠে। গ্রাম ধীরে ধীরে ধ্বংসের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। অবিভক্ত ভারতের পূর্ববাংলা অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশে জমিদার হিসেবে দায়িত্ব নেবার পর রবীন্দ্রনাথ গ্রামের এই করুণ অবস্থা অনুধাবন করেন।

তিনি গ্রামের মানুষের মধ্যে অবিশ্বাস, কলহ এবং বিরোধের পরিচয় পান। অতঃপর পঞ্চায়েতী প্রথার নানা দুর্নীতির সঙ্গেও তার পরিচয় ঘটে। তিনি লক্ষ করেন, গ্রামের মানুষ অতীতে যে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ ছিল, হিন্দু মুসলমানে কোন ভেদাভেদ ছিল না। পরস্পর এক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে তারা বসবাস করতো, ব্রিটিশ অধিকৃত বাংলাদেশে তার দেখা মেলা ভার ছিল। ব্রিটিশ এদেশে এসে হিন্দু মুসলমানকে যেমন বিচ্ছিন্ন করেছিল, তেমনি ধনী নির্ধনের মধ্যেও একটি

বৈষম্য সৃষ্টিকে সহায়তা করেছিল। একদিকে হিন্দুদের বর্ণ বৈষম্য অপরদিকে আশরাফ আতরাফ এবং আজলাফ নামে বর্ণ বৈষম্যের অনুকরণে মুসলমানদের মধ্যে এক সামাজিক স্তর গঠিত হয়। ফলে মানুষ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে লক্ষ করেন, গ্রামের দুরবস্থার মূল কারণ এই বিচ্ছিন্নতা। তিনি সর্বপ্রথম অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিকল্পনা করে গ্রামের সর্বশ্রেণীর মানুষকে সমবায়ের মাধ্যমে জোটভুক্ত করে তুলতে প্রয়াসী হন। এই জোট বাঁধার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বলেন :

> "জোতদার ও চাষা রায়ত যতদিন প্রত্যেকে স্বতন্ত্র থাকিয়া চাষাবাদ করিবে ততদিন তাহাদের অসচ্ছল অবস্থা, কিছুতেই ঘুচিবে না। পৃথিবীতে চারদিকে সকলেই জোট বাঁধিয়া প্রবল হইয়া উঠিতেছে। এমন অবস্থায় যাহারাই বিচ্ছিন্ন এককভাবে থাকিবে তাহাদিগকে চিরদিনই অন্যের গোলামি ও মজুরি করিয়া মরিতে হইবে। অদ্যকার দিনে যাহার যতটুকু ক্ষমতা আছে সমস্ত একত্রে মিলাইয়া বাঁধ বাঁধিবার সময় আসিয়াছে।"[৪৩]

রবীন্দ্রনাথ গ্রামের মানুষকে একত্র করিবার একটি বড় উপায়-মাধ্যম হিসেবে তাঁর সৃষ্ট মণ্ডলীপ্রথাকে বুঝেছিলেন। একে তিনি গণতন্ত্রের ভিত্তিভূমি মনে করে এই প্রতিষ্ঠানটিতে একদিকে সুশাসন বাস্তবায়ন অপরদিকে গ্রামোন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে একে Village Republic-এ পরিণত করতে চেয়েছিলেন। মণ্ডলীকে অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন :

> "যদি এক একটি মণ্ডলীকে অথবা এক একটি গ্রামের সকলে সমবেত হইয়া নিজেদের সমস্ত জমি একত্র মিলাইয়া দিয়া কৃষিকার্যে প্রবৃত্ত হয়, তবে আধুনিক যন্ত্রাদির সাহায্যে অনেক খরচ বাঁচিয়া ও কাজের সুবিধা হইয়া তাহারা লাভবান হইতে পারে। যদি গ্রামের উৎপন্ন সমস্ত ইক্ষু তাহারা এক কলে মাড়াই করিয়া লয় তবে দামি কল কিনিয়া লইলে তাহাদের লাভ বৈ লোকসান হয় না—— পাটের ক্ষেত সমস্ত এক করিয়া লইলে প্রেসের সাহায্যে তাহারা নিজেরাই পাট বাঁধাই করিয়া লইতে পারে। গোয়ালারা একত্র হইয়া জোট করিলে গো-পালন ও মাখন ঘৃত প্রভৃতি প্রস্তুত করা সস্তায় ও ভালোমতে সম্পন্ন হয়। তাঁতিরা জোট বাঁধিয়া নিজেদের পল্লীতে যদি কল আনে এবং প্রত্যেকে তাহাতে আপনার খাটুনি দেয় তবে কাপড় বেশি পরিমাণে উৎপন্ন হওয়াতে তাহাদের প্রত্যেকেরই সুবিধা ঘটে।"[৪৪]

রবীন্দ্রনাথ শহরে এবং নগরের উন্নয়নে সেখানে বড় বড় কলকারখানা স্থাপনার বিরোধী ছিলেন। কারণ, তাতে গ্রামের মানুষ শহরমুখী হয়ে পড়বে এবং গ্রামের নারী পুরুষ নিরানন্দকর কলের কাজে ক্রমশই দুর্গতির মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে পড়বে। রবীন্দ্রনাথ বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, এতে জিনিসপত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও শ্রমজীবী মানুষের ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটবে না। এ কারণে

তিনি উৎপাদনের বিকেন্দ্রীকরণে উৎসাহী ছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

> "...পল্লীবাসীরাই একত্রে মিলিলে যে সকল যন্ত্রের ব্যবহার সম্ভবপর হয় তাহারই সাহায্যে স্বস্থানেই কর্মের উন্নতি করিতে পারিলেই সকল দিক রক্ষা হইতে পারে।"[৪৫]

গ্রামাঞ্চলে 'মণ্ডলী' প্রথার মাধ্যমে এই উন্নয়ন যে সম্ভবপর তা উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশপ্রেমী জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন :

> "দেশের জনগণকে ঐক্যনীতিতে দীক্ষিত করিবার এই একটি উপায়। প্রাদেশিক সভা উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা একটি মণ্ডলীকেও যদি এইরূপে গড়িয়া তুলিতে পারেন তবে এই দৃষ্টান্ত দেখিতে দেখিতে চারদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে।"[৪৬]

রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেম যে কত গভীর ছিল তা বোঝা যায় যখন তিনি বলেন :

> "কল আসিয়া যেমন তাঁতকে মারিয়াছে তেমনি ব্রিটিশ শাসনও সর্বগ্রহ ও সর্বব্যাপী হইয়া আমাদের গ্রাম্য সমাজের সহজ ব্যবস্থাকে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। ...আমাদের যে গ্রাম্যব্যবস্থা ছিল, ছোট হইলেও তাহা আমাদেরই ছিল। ব্রিটিশ ব্যবস্থা যত বড়োই হউক, তাহা আমাদের নহে। সুতরাং তাহাতে যে কেবল আমাদের শক্তির জড়তা ঘটিয়াছে তাহা নহে, তাহা আমাদের সমস্ত প্রয়োজন ঠিকমত করিয়া পূরণ করিতে পারিতেছে না। নিজের চক্ষুকে অন্ধ করিয়া পরের চক্ষু দিয়া কাজ চালানো কখনোই ঠিকমত হইতে পারে না।"[৪৭]

এখানে রবীন্দ্রনাথ কলের ব্যবহারের বিরোধিতা করেছেন বলে মনে হলেও আদতে তিনি তাঁর প্রয়োগ যথাস্থানে ঘটাতে চেয়েছিলেন। প্রকৃত অর্থে তিনি শিল্প সম্পদের উন্নয়নের সাথে মানব সম্পদের উন্নয়নও কামনা করেছিলেন। ব্রিটিশ যে আমাদের শত্রু এবং তাদের শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করা যে অতি বড় প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথ তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু তাঁর পদ্ধতি ছিল ভিন্ন। তিনি প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামবার পূর্বে দেশকে সংবদ্ধ ও সুগঠিত করতে চেয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শান্তিনিকেতন' এবং 'শ্রীনিকেতন' প্রতিষ্ঠানের একনিষ্ঠ পরিচালক এল্‌মহার্স্টের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় বলেন :

> "In India, the real cause of the weakness that cripples our spirit of freedom arises from the impregnable social walls we raise between the different casts. These check the natural flow of fellow feeling among the people who live in our country. The law of love and of mutual respect has been ignored for the sake of retaining an artificial order. This only serves to promote a sense of degeneracy and of defeat. The

> people of India in this way have built their own cage; but by trying to secure their freedom from one another, they only succeed in keeping themselves eternally captive"[৪৮]

এই প্রসঙ্গে এল্‌মহার্স্ট বলেন.

> "For years, centuries perhaps, farmers, landless labourers and craftsmen had been accustomed, in time of need to turn to some local father figure, rajah, landlord or government officer, for help. Tagore had himself raised this problem in our discussion in December. I note here from my diary, written at that time :
>
> "Tagore said that though a Zeminder, he had, when living at Shelaidah, himself urged his own ryots to rise and strike a blow for themselves, and had told them that if they did not, there was little hope for them. He prophesied that from the first we were likely to arouse a variety of bitter opposition and to discover every kind of petty oppression of one group by another"[৪৯]

পল্লীউন্নয়ন ভাবনা রবীন্দ্রনাথকে অন্য জমিদারে পরিণত করেছিল। তিনি সাধারণ মানুষকে নিয়ে প্রত্যক্ষ রাজনীতির পথ পরিহার করে ভিন্ন সংগ্রামে নেমেছিলেন। এ পথ ছিল দুরূহ এবং কঠিন। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতেন এ পথে যে স্বরাজ আসবে তা রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি অর্থনৈতিক মুক্তি আনতেও সক্ষম হবে। এ কারণেই রবীন্দ্রনাথ মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলনে যোগ দেন নি। এ সম্পর্কে লর্ড এল্‌মহার্স্ট একটি চমৎকার বিবরণ দিয়াছেন।এল্‌মহার্স্ট বলেন :

> "While Srinikentaon was strunggling to get established, Gandhi was also busy hammering into shape the political programme of the Indian congress with which he hoped within a few months to win freedom for India from British imperial control. He had tried in October 1921 in a variety of ways to associate Tagore with this programme. But Tagore was too anxious to stand by his own life's work in education and tried to avoid direct implication in a political movement however non-violent."[৫০]

রবীন্দ্রনাথের এই চেতনার একটি বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন এলম্‌হার্স্ট। তাঁর লেখা 'Poet and Plowmen' গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেন যে, একদিন রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ডেকে বলেন :

Not long before you arrived in India, he said, 'Gandhiji came to visit me in Calcutta at my home Jorasanko. He wanted very much to persuade me to take my stand with him in public on one or other of the planks of his political platform. Gandhiji put his case to me thus: "Gunrudev, you were yourself a leader and promoter of the Swadeshi (national) movement some twenty years ago. You always wanted, Indians to stand on their own feet as Indians and not to be poor copies of Westerners. My 'Swaraj' movement today is the natural offspring of your own 'Swadeshi', join now and fight with me for 'Swaraj'.[৫১]

"Gandhiji, I said, the whole world is suffering today from the cult of a selfish and short-sighted nationalism...

I have come to believe that as Indians we not only have much to learn from the west but that we also have something to contribute."[৫২]

রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন গান্ধীর অহিংস আন্দোলন প্রকৃত অর্থে অহিংস থাকবে না। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে মিলন ঘটেছে তা অনেকটা সাময়িক। এবং বাস্তবে তা থাকে নি। রবীন্দ্রনাথ জানতেন একটি দেশের স্বরাজ আসে কোন একজনের আন্দোলনের ফলে নয়। সমগ্র দেশ না জাগলে একটি জাতি কখনও জাগতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ গান্ধীর অবদানকে অস্বীকার করেন নি। কিন্তু তাঁর আন্দোলন অতিমাত্রায় আবেগপ্রসূত হওয়ায় তাকে তিনি গ্রহণ করতে পারেন নি। বাস্তবে তা প্রমাণিতও হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ গান্ধীর মধ্যে একটি একনায়কত্বের ভাব লক্ষ করেছিলেন এবং সে কারণে তিনি তাঁকে বলেন :

"And Gandhiji, why do you allow your followers to call you Mahatma ? Are you a Mahatma? 'No, Gurudev, of course I'm not a Mahatma. But Indians by nature have always been worshippers of symbols, of images. They need an image, Gurudev, a symbol. If they take me for one, will that not help them to mobilise and to suffer for such a noble cause?"[৫৩]

রবীন্দ্রনাথ সেদিন গান্ধীর এই উক্তিতে সন্তোষ প্রকাশ করতে পারেন নি। তাঁর মনে হয়েছিল গান্ধী যেন এই কৌশলে তাঁর নেতৃত্বকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছিলেন। রবীন্দ্রনাথ জেনেছিলেন ভারতবর্ষে নানা ভাষাভাষী মানুষের বসবাস। এদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান দুই প্রধান শক্তি। এ ছাড়াও রয়েছে অস্পৃশ্যতার কারণে হিন্দুদের মধ্যে নানা বর্ণ-বৈষম্য এবং বিভেদ। যথার্থ শিক্ষা এই বিরোধকে দূরীভূত করতে পারে। অতঃপর কর্মযোগের মাধ্যমে সে শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করতে পারে।

শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার মূলে রবীন্দ্রনাথের এই ভাবনাই সক্রিয় ছিল। রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের জন্য হঠাৎ কোন চমক সৃষ্টি করতে চান নি। গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন পরিণামে যে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে, রবীন্দ্রনাথ 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে তার একটি চিত্র তুলে ধরেছেন। সেখানে অসহযোগ আন্দোলনের নায়ক নিজেই সঙ্গোপনে বিদেশী ভাবধারা অনুসরণ করেছে। সারা দিনমান বিদেশী দ্রব্য বর্জন করবার আন্দোলন শেষে নায়ক নিজেই ঘরে বসে বিদেশী সিগারেটে ধূমপানের তৃষ্ণা মিটিয়েছে। প্রেমিকা নারীর বিদেশী খোঁপায় নায়কের মন উচ্চকিত হয়েছে। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে সন্দীপ ও নিখিলেশ দুই প্রধান চরিত্র। এ আচরণ নিঃসন্দেহে তাদের আদর্শ পরিপন্থী। 'গোরা' এবং 'নামঞ্জুর' উপন্যাসেও নায়কদের আচার-আচরণে এমন অনেক বৈপরীত্য পীড়াদায়ক।

রবীন্দ্রনাথ এ দেশের অনেক মানুষের মধ্যে এই বিপরীতধর্মী মনোভাব লক্ষ করেছিলেন। বিলাতি জিনিস বর্জন বা বয়কট করাটা আবেগাশ্রিত। রবীন্দ্রনাথ তা জানতেন। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের লিখিলেশ ও সন্দীপের মধ্যে 'প্রোটেকশন' এবং 'ফ্রি-ট্রেড' নিয়ে আলোচনা অনেকটাই যে অসার এবং কেবলমাত্র 'তুলনার জন্য তুলনা' এ বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ চমৎকার করে দেখিয়েছেন। উপন্যাসে দেখা গেছে, বাইরে যিনি আদর্শবান ভেতরে তিনি নীতিবর্জিত। নিখিলেশ, সন্দীপ এবং কমলার চরিত্রে তা প্রকাশ পেয়েছে।

'ঘরে বাইরে' (১৯১৬) উপন্যাসে দুটি স্তর আছে। প্রথমটি রাজনৈতিক এবং সমাজনীতিমূলক, দ্বিতীয়টি প্রেমমূলক। স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম যুগে দেশপ্রীতির নামে উন্মাদনা যে আত্মপ্রচারে পর্যবসিত হয়েছিল এবং তা যে অনেকক্ষেত্রে আদর্শবিরোধী এবং নীতিবর্জিত হয়ে পড়েছিল, 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ তা তুলে ধরেছেন।

'ঘরে বাইরে'র পূর্বে 'গোরা' (১৯০৯) উপন্যাসেও রবীন্দ্রনাথ এমন একটি বৈপরীত্যের প্রতিই আলোকপাত করেছেন। এসব উপন্যাসের নায়ক-নায়িকারা যেন তাদের কাজে ও কথায় আত্মীয়তা গড়ে তুলতে পারছে না। রবীন্দ্রনাথ সে সময়ের স্বদেশী আন্দোলনে এমন বিপরীতধর্মী চেতনার প্রকাশ লক্ষ করে পীড়িত বোধ করেছিলেন। এবং এসবের অনেক আগেই তিনি 'স্বদেশ' সম্বন্ধে তাঁর নিজের ভাবনার কথা ব্যক্ত করেছিলেন। ১৯০৮ সালে পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনী বক্তব্যে সভাপতির অভিভাষণে তিনি দেশগড়ার ক্ষেত্রে যে দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন তা ছিল ঐতিহাসিক ঘটনা। রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্য যে অসার ছিল না শান্তিনিকেতন এবং শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা করে তিনি তা সপ্রমাণ করেছেন। অবশ্য ১৯০৮ সালের পূর্বেও ১৯০৫ সালে পল্লীউন্নয়ন সম্পর্কে তাঁর নানা বক্তব্যে দেশের প্রতি তাঁর গভীর মমত্ব এবং দায়িত্ববোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, তৎকালীন বাংলাদেশের নানা সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা ও সমাধানের জন্য একটি প্রাদেশিক সম্মিলনীর ব্যবস্থা হয় ১৮৮৮ সাল

থেকে। এই সম্মিলনীর মাধ্যমে বাংলাদেশের নানা মনীষী দেশের দুরবস্থার কথা সরকারের গোচরীভূত করতেন। ১৮৮৮ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং দশ বৎসর এই সম্মেলন কলকাতাতেই আহূত হয়।

১৮৮৮ সালে বোলপুরে 'শান্তিনিকেতন' আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৮৯ সাল থেকে রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশে ঠাকুর এস্টেটের দায়িত্বভার লাভ করেন। এ সময় থেকেই তিনি প্রাদেশিক সম্মিলনীর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত হন। এ সম্মিলনীর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল দেশের সমস্যাদি সম্পর্কে আলোচনা ও আশু সমাধানের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করা। ১৯০৫ সালে রবীন্দ্রনাথ পাবনা সম্মিলনীতে সভাপতির অভিভাষণ বাংলা ভাষায় প্রদান করেন। তাঁর পূর্বে অন্য সকলেই বাংলা ভাষার পরিবর্তে ইংরেজি ভাষায় আলোচনা এবং বক্তৃতা প্রদান করতেন। রবীন্দ্রনাথ সম্মিলনীর ভাষা বাংলার পরিবর্তে ইংরেজি হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন :

> "এ কনফারেন্স দেশকে মন্ত্রণা দিবার জন্য সমবেত, অথচ ইহার ভাষা বিদেশী। আমরা ইংরেজি শিক্ষিতকেই আমাদের নিকটের লোক বলিয়া জানি... আপামর সাধারণকে আমাদের সঙ্গে অন্তরে অন্তরে এক করিতে না পারিলে যে আমরা কেহই নহি, এ কথা কিছুতেই আমাদের মনে হয় না। সাধারণের সঙ্গে আমরা একটা দুর্ভেদ্য পার্থক্য তৈরি করিয়া তুলিতেছি।... পোলিটিক্যাল সাধনার চরম উদ্দেশ্য একমাত্র দেশের হৃদয়কে এক করা। কিন্তু দেশের ভাষা ছাড়িয়া, দেশের প্রথা ছাড়িয়া, কেবলমাত্র বিদেশীর দেয় আকর্ষণের জন্য বহুবিধ আয়োজনকেই মহোপকারী পোলিটিক্যাল শিক্ষা বলিয়া গণ্য করা আমাদেরই হতভাগ্য দেশে প্রচলিত হইয়াছে।"[৫৪]

বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি রবীন্দ্রনাথের এই গভীর শ্রদ্ধাবোধ তাঁর স্বদেশপ্রেম ও দেশাত্মবোধের যথার্থ পরিচয় বহন করে। সে সময় এক শ্রেণীর রাজনীতিবিধ ইংরেজদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ইংরেজি ভাষার চর্চাকে প্রাধান্য দেওয়ায় রবীন্দ্রনাথ তার তীব্র সমালোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রভিনশ্যাল কনফারেন্সে বাংলা ভাষায় বক্তব্য প্রদান করা সে সময়ে নিঃসন্দেহে একটি দুঃসাহসের কাজ ছিল। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আরও বলেন :

> "মনে করো প্রভিশ্যানাল কনফারেন্সকে যদি আমরা যথার্থই দেশের মন্ত্রণার কার্যে নিযুক্ত করিতাম, তবে আমরা কী করিতাম ? তাহা হইলে আমরা বিলাতি ধাঁচের একটা সভা না বানাইয়া দেশী ধরনের একটি মেলা করিতাম। সেখানে যাত্রাগান আমোদ-আহ্লাদে দেশের লোক দূর দূরান্তর হইতে একত্র হইত। সেখানে দেশী পণ্য ও কৃষিদ্রব্যের প্রদর্শনী হইত। সেখানে ভালো কথক কীর্তন গায়ক ও যাত্রার দলকে পুরস্কার দেওয়া হইত। সেখানে ম্যাজিক লণ্ঠন প্রভৃতির সাহায্যে সাধারণ লোকদিগকে স্বাস্থ্যতত্ত্বের উপদেশ সুস্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইত এবং আমাদের যাহা কিছু বলিবার কথা আছে, যাহা কিছু সুখ দুঃখের পরামর্শ আছে, তাহা ভদ্রাভদ্রে একত্রে মিলিয়া সহজ বাংলা ভাষায় আলোচনা করা যাইত।"[৫৫]

১৯০৫ সালের প্রাদেশিক সম্মিলনীর এই সভায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশী সমাজ গঠনে পল্লীউন্নয়নকেই একমাত্র মাধ্যম হিসেবে গণ্য করেন এবং সে কারণে তিনি কোন প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যুক্ত হন নি। তবে তাঁর এই বক্তব্য নিঃসন্দেহে সে সময়ের দেশপ্রেমী রাজনীতিবিদদের প্রভাবিত করেছিল। পল্লীউন্নয়নের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ সাধারণ মানুষের মেলবন্ধনের জন্য গ্রামে গ্রামে 'মেলা'র প্রচলনের কথা বলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছিলেন যে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গ্রামে নানা ধরনের মেলা হয়ে থাকে। পল্লীউন্নয়নের ক্ষেত্রে মেলার গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন :

> "আমাদের দেশ প্রধানত পল্লীবাসী। এই পল্লী মাঝে মাঝে যখন আপনার নাড়ির মধ্যে বাহিরের বৃহৎ জগতের রক্ত-চলাচল অনুভব করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠে, তখন মেলাই তাহার প্রধান উপায়। এই মেলাই আমাদের দেশে বাহিরকে ঘরের মধ্যে আহ্বান। এই উৎসবে পল্লী আপনার সমস্ত সংকীর্ণতা বিস্মৃত হয় ; তাহার হৃদয় খুলিয়া দান করিবার ও গ্রহণ করিবার এই প্রধান উপলক্ষ।... এই মেলা আমাদের দেশে অত্যন্ত স্বাভাবিক। একটা সভা উপলক্ষে যদি দেশের লোককে ডাক দাও তবে তাহারা সংশয় লইয়া আসিবে, তাহাদের মন খুলিতে অনেক দেরি হইবে—— কিন্তু মেলা উপলক্ষে যাহারা একত্র হয় তাহারা সহজেই হৃদয় খুলিয়াই আসে, সুতরাং এখানেই দেশের মন পাইবার প্রকৃত অবকাশ ঘটে। পল্লীগুলি যেদিন হাল লাঙল বন্ধ করিয়া ছুটি লইয়াছে সেইদিনই তাহাদের কাছে আসিয়া বসিবার দিন।
>
> বাংলাদেশে এমন জেলা নাই যেখানে নানা স্থানে বৎসরের নানা সময়ে মেলা না হইয়া থাকে—— প্রথমত এই মেলাগুলির তালিকা ও বিবরণ সংগ্রহ করা আমাদের কর্তব্য, তাহার পরে এই সমস্ত মেলাগুলির সূত্রে দেশের লোকের সঙ্গে যথার্থভাবে পরিচিত হইবার উপলক্ষ আমরা যেন অবলম্বন করি।
>
> প্রত্যেক জেলার ভদ্র শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহাদের জেলায় মেলাগুলিকে যদি নবভাবে জাগ্রত, নবপ্রাণে সজীব করিয়া তুলিতে পারেন, ইহার মধ্যে দেশের শিক্ষিতগণ যদি তাহাদের হৃদয় সঞ্চার করিয়া দেন, এই-সকল মেলায় যদি তাঁহারা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করেন—— কোনো প্রকার নিষ্ফল পলিটিক্সের সংস্রব না রাখিয়া, বিদ্যালয় পথঘাট জলাশয় গোচর জমি প্রভৃতি সম্বন্ধে জেলার যে—— সমস্ত অভাব আছে তাহার প্রতিকারের পরামর্শ করেন, তবে অতি অল্পকালের মধ্যে স্বদেশকে যথার্থই সচেষ্ট করিয়া তুলিতে পারেন।"[৫৬]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবির অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে সাধারণ মানুষের দুঃখ-সুখের কথা উপলব্ধি করেছিলেন বলেই তা নিরসনে এ ব্যবস্থার উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর এই চিন্তা-চেতনা কোন এক জমিদারের 'দিবাস্বপ্ন' ছিল না, বা হঠাৎ কোন চমক সৃষ্টি করে জনগণের বাহবা কুড়োবার জন্যে ঘটে নি। আজীবনকাল তিনি যে দরিদ্র পল্লী দেখেছিলেন যা দেশের উন্নয়নে প্রচণ্ড বাধাস্বরূপ ছিল তা দূর করে পল্লীকে যথার্থ দেশের সকল শক্তির উৎস হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি দেশের উন্নয়নে দেশের অভ্যন্তরে যে

সম্পদ রয়েছে তার ব্যবহারকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন :

> "আমাদের দিশী লোকের সঙ্গে দিশী ধারার মিলিবার যে কী উপলক্ষ হইতে পারে আমি তাহারই একটি দৃষ্টান্ত দিলাম মাত্র এবং এই উপলক্ষটিকে নিয়মে বাঁধিয়া আয়ত্তে আনিয়া কী করিয়া যে একটা দেশ-ব্যাপী মঙ্গল ব্যাপারে পরিণত করা যাইতে পারে তাহারই আভাস দেওয়া গেল।"[৫৭]

এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি স্বাধীনতার জন্য দেশের মানুষকে স্বাবলম্বী হওয়ার কথা বলেছেন। তিনি বিদেশী সরকারের প্রতি নির্ভরশীল হওয়াকে স্বদেশপ্রেমের বিরোধী মনোভাব বলে ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন :

> "আমাদের দেশে সরকার-বাহাদুর সমাজের কেহই নন, সরকার সমাজের বাহিরে। অতএব, যে-কোন বিষয় তাঁহার কাছ হইতে প্রত্যাশা করিব, তাহা স্বাধীনতার মূল্য দিয়া লাভ করিতে হইবে।"[৫৮]

রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে বিদেশী শাসনের মধ্যে স্বদেশ শাসনের একটি কাঠামো নির্মাণের কথা বলেছেন, যা শক্তিশালী হলে সহজেই একটি দেশ স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম। রবীন্দ্রনাথ অতীতের বাংলাদেশ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রসঙ্গে বলেন :

> "যে কর্ম সমাজ সরকারের দ্বারা করাইয়া লইবে, সেই কর্ম সম্বন্ধে সমাজ নিজেকে অকর্মণ্য করিয়া তুলিবে। অথচ এই অকর্মণ্যতা আমাদের দেশের স্বভাবসিদ্ধ ছিল না। আমরা নানা জাতির, নানা রাজার অধীনতাপাশ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু সমাজ চিরদিন আপনার সমস্ত কাজ আপনি নির্বাহ করিয়া আসিয়াছে, ক্ষুদ্রবৃহৎ কোনো বিষয়েই বাহিরের অন্য কাহাকেও হস্তক্ষেপ করিতে দেয় নাই।... আজ আমরা সমাজের সমস্ত কর্তব্য নিজের চেষ্টায় একে-একে সমাজবহির্ভূত স্টেটের হাতে তুলিয়া দিবার জন্য উদ্যত হইয়াছি। ... ইহাতে বুঝা যাইতেছে, যেখানে আমাদের মর্মস্থান, যে মর্মস্থানকে আমরা নিজের অন্তরের মধ্যে সযত্নে রক্ষা করিয়া এতদিন বাঁচিয়া আসিয়াছি, সেই আমাদের অন্তরতম মর্মস্থান আজ অনাবৃত-অবারিত হইয়া পড়িয়াছে সেখানে আজ বিকলতা আক্রমণ করিয়াছে।"[৫৯]

এই বক্তব্যে রবীন্দ্রনাথ বিদেশী শক্তিকে বহিরাগত শক্তি হিসাবে গণ্য করেছেন এবং তাদের হাতে দেশের উন্নয়নকে তুলে দেবার প্রচেষ্টাকে তিনি বিরোধিতা করেছেন। কারণ, তিনি জানতেন একবার এই বিদেশী শক্তি দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারলে দেশের শক্তির উৎস জেনে তাকে বিকল করে দিতে পারে এবং দেশের পরাধীনতাকে আরও দীর্ঘস্থায়ী করতে সক্ষম হবে। রবীন্দ্রনাথ দেশের বিত্তবান মানুষ এবং জমিদারদের নগর এবং শহরের প্রতি আকর্ষণকে দেশের উন্নয়নের অন্তরায় বলে মনে করেছেন। এইসব বিত্তবান এবং জমিদার গ্রাম থেকে সম্পদ আহরণ করে তাদের নিজেদের সুখ শান্তির জন্য শহরে ও নগরে ব্যয় করেছে। এমনটি এ দেশে অতীতে হয় নি। ফলে দেশ নিরানন্দময় হয়ে পড়েছে।

রবীন্দ্রনাথ দেশের উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা যেমন উপলব্ধি করেছেন তেমনি এই

উন্নয়নে বাধা এবং অন্তরায়ের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ধর্মান্ধতাকে তীব্রভাবে সমালোচনা করেছেন। তিনি 'মেলা' র গুরুত্ব যেমন বুঝেছিলেন তেমনি এই 'মেলা' কে-কেন্দ্র করে কিছু সাম্প্রদায়িক শক্তি ধর্মকে 'মেলা'র সঙ্গে যুক্ত করে নিজেদের স্বার্থোদ্ধারের যে প্রচেষ্টা নিয়েছে, তাকে তিনি ঘৃণা করেছেন।[৬০] এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

> "... আমাদের দেশে যে সকল মেলা ধর্মের নামে প্রচলিত আছে তাহাদেরও অধিকাংশ আজকাল ক্রমশ দূষিত হইয়া কেবল যে লোক শিক্ষার অযোগ্য হইয়াছে তাহা নহে, কুশিক্ষারও আকর হইয়া উঠিয়াছে। উপেক্ষিত শস্যক্ষেত্রে শস্যও হইতেছে না, কাঁটাগাছও জন্মিতেছে। এমন অবস্থায় কুৎসিত আমোদের উপলক্ষ এই মেলাগুলিকে যদি আমরা উদ্ধার না করি, তবে স্বদেশের কাছে, ধর্মের কাছে, অপরাধী হইব।"[৬১]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই প্রবন্ধে গ্রামের সকল মানুষের মধ্যে ঐক্য স্থাপনে সকলকে সচেষ্ট হবার প্রতি আহ্বান জানান। হিন্দু-মুসলমানের মিলিত শক্তি দেশকে অগ্রগতির দিকে নিতে পারে। তিনি বলেন :

> "আমি স্বদেশকে বিশ্বাস করি..., আমি আত্মশক্তিকে সম্মান করি—আমি নিশ্চয় জানি যে, যে উপায়েই হউক, আমরা নিজের মধ্যে একটা স্বদেশীয় স্বজাতীয় ঐক্য উপলব্ধি করিয়া আজ যে সার্থকতা লাভের জন্য উৎসুক হইয়াছি তাহার ভিত্তি যদি পরের পরিবর্তনশীল প্রসন্নতার উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়, যদি তাহা বিশেষভাবে ভারতবর্ষের স্বকীয় না হয়, তবে তাহা পুনঃপুনই ব্যর্থ হইতে থাকিবে। অতএব, ভারতবর্ষের যথার্থ পথটি যে কী, আমাদিগকে চারদিক হইতেই তাহার সন্ধান করিতে হইবে। মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয় সম্বন্ধ স্থাপনই চিরকাল ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান চেষ্টা ছিল।"[৬২]

অতীতে সুলতানী আমল ও মোঘল আমলে বহিরাগত মুসলমানদের সঙ্গে ভারতবর্ষের একটি সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল এবং এ দেশে তাদের অবস্থান পরবর্তীতে আত্মীয়তার মাধ্যমে দৃঢ় করে তুলেছিল। শুধু মুসলমানেরাই নয়, অন্যান্য অনেক জাতিই এমনিভাবে এদেশের অধিবাসী হয়ে ভারতবর্ষকে নিজেদের দেশ বলে গ্রহণ করেছে। কিন্তু কেবল ব্যতিক্রম ঘটেছে ইংরেজদের ক্ষেত্রে যারা এদেশকে প্রথম থেকেই লুণ্ঠন এবং শোষণের জন্য ব্যস্ত হয়েছে।

তবে রবীন্দ্রনাথ কোন কোন ক্ষেত্রে হিন্দু সমাজ ও রাজত্বের প্রতিও অধিক গুরুত্ব দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে 'হিন্দু মেলা' উদ্‌যাপনের প্রতি তাঁর আগ্রহের উল্লেখ করা যেতে পারে। এখানে তিনি হিন্দু ধর্মের একটি বিবর্তন আনতে চেয়েছেন। এক্ষেত্রে পল্লীউন্নয়নে তাঁর জমিদারিতে তিনি অনেকটা হিন্দুদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেছেন। শিলাইদহে তিনি হিন্দু অধিবাসীদের প্রতি যে আগ্রহ দেখিয়েছেন এবং তাদের উন্নতির জন্য যে প্রচেষ্টা নিয়েছেন তা সফল হয় নি। অথচ মুসলিম সম্প্রদায় তাঁর কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা দিতে কখনও কার্পণ্য করে নি। ইতোপূর্বে এ কথা আমরা উল্লেখ করেছি।

এতৎসত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ হিন্দু মুসলমানের মধ্যে একটি সেতুবন্ধনও কামনা করেছিলেন। তিনি বলেন :

> "আমাদের দেশে মধ্যে মধ্যে সামান্য উপলক্ষে হিন্দু মুসলমান বিরোধ বাধিয়া ওঠে, সেই বিরোধ মিটাইয়া দিয়া উভয়পক্ষের মধ্যে প্রীতি, শান্তি-স্থাপন, উভয়পক্ষের স্ব স্ব অধিকার নিয়মিত করিয়া দিবার বিশেষ কর্তৃত্ব সমাজের কোনো স্থানে যদি না থাকে, তবে সমাজকে বারে বারে ক্ষতবিক্ষত হইয়া উত্তরোত্তর দুর্বল হইতে হয়।"[৬৩]

বৃটিশ ভারতে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাই তিনি দুই ধর্মের মধ্যে মিলনের একটি সেতুবন্ধন রচনা করতে চেয়েছিলেন। তিনি লক্ষ করেছিলেন বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বিশেষ করে শিলাইদহ পতিসরে মুসলমানেরাই তাঁর উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সহায়তা করেছে। মুসলমানেরা সে সময়ে গ্রামাঞ্চলে সংখ্যায় অধিক ছিল। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন, হিন্দু মুসলমানের উভয়ের সম্মিলনীতে গ্রাম তার আপন মহিমায় জেগে উঠবে। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটে নি। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গের বিপক্ষে ছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ দ্বিজাতিতত্ত্বকে মেনে নিয়ে দেশবিভাগে রাজি হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য তার অনেক আগেই মৃত্যুবরণ করেন। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবিতকালে লক্ষ করেন যে, সুফী ফকিরেরা এদেশে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে একটি সংযোগস্থল গড়ে তুলেছিল এবং তার ফলে বাউল ও বৈষ্ণব শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। বৃহৎ ভারতেও এই প্রক্রিয়ার কারণে এদেশে লালনপন্থি ও কবীরপন্থিদের প্রসার ঘটেছিল। বাংলার বাউলদের গানে তিনি এই মিলনের বাঁশি শুনেছিলেন। তিনি নিজেও তাকে তাঁর জীবনদর্শনে পরিণত করেন। নিজেকে 'রবীন্দ্রবাউল' হিসেবে পরিচয় প্রদান এই মিলন কামনারই প্রতিফলন।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রবীন্দ্রনাথ 'স্বদেশী সমাজ' নামে যে প্রবন্ধটি রচনা করেন যা এতদ আলোচনায় সম্পৃক্ত, তা মূলত, পল্লী অঞ্চলে সাধারণ মানুষের জলকষ্ট নিবারণের ক্ষেত্রে গভর্নমেন্টের প্রতি সাধারণ মানুষের নির্ভরতা প্রসঙ্গে লিখিত। রবীন্দ্রনাথ জলকষ্ট কিংবা সকল প্রকার সমস্যা সমাধানের জন্য গ্রামের সকল শ্রেণীর মানুষের অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এই প্রবন্ধে তিনি অতীতে গ্রামবাসী এবং গ্রামে বসবাসকারী বিত্তবানদের ভূমিকার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর মতে, পরনির্ভরতা কখনও একটি জাতিকে এগিয়ে নিতে পারে না। এক্ষেত্রে তিনি ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের অনুগ্রহের প্রতি নির্ভর না করে দেশের মানুষকে স্বাবলম্বী হতে আহ্বান জানান। তিনি আত্মশক্তিকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন। রবীন্দ্রনাথ দেশের উন্নয়নে গান্ধীর মত ও পথকে আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করবার জন্য দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন। তিনি বলেন :

> "স্বদেশের দায়িত্বকে, কেবল সুতো কাটায় নয়, সম্যকভাবে গ্রহণ করবার সাধনা ছোট ছোট আকারে দেশের নানা জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করা আমি অত্যাবশ্যক মনে করি। সাধারণের মঙ্গল জিনিসটা অনেকগুলি ব্যাপারের

সমবায়। তারা পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তাদের একটাকে পৃথক করে নিলে ফল পাওয়া যায় না। স্বাস্থ্যের সঙ্গে, বুদ্ধির সঙ্গে, জ্ঞানের সঙ্গে কর্মের সঙ্গে, আনন্দের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারলে তবেই মানুষের সব ভালো পূর্ণ ভালো হয়ে ওঠে।

স্বদেশের সেই ভালোর রূপটিকে আমরা চোখে দেখতে চাই। সহস্র উপদেশের চেয়ে তাতে আমরা কাজ পাব। বিশেষ বিশেষ লোকালয়ে সাধারণের কল্যাণ সাধনের দায়িত্ব প্রত্যেকে কোনো না কোনো আকারে গ্রহণ করে একটি সুস্থ জ্ঞানবান শ্রীসম্পন্ন সম্মিলিত প্রাণযাত্রার রূপকে জাগিয়ে তুলেছে, এমন সকল দৃষ্টান্ত চোখের সামনে ধরা দরকার। নইলে স্বরাজ কাকে বলে সে আমরা সুতো কেটে, খদ্দর পরে, কথার উপদেশ শুনে কিছুতে বোঝাতে পারব না। যে জিনিসটাকে সমস্ত ভারতবর্ষে পেতে চাই ভারতবর্ষের কোনো একটা ক্ষুদ্র অংশে তাকে যদি স্পষ্ট করে দেখা যায়, তাহলে আত্মপ্রভাবের যে কী মূল্য তা বুঝতে পারব, ন মেধয়া ন বহনা শ্রুতেন, বুঝব তার সাক্ষাৎ দর্শনের দ্বারা। ভারতবর্ষের একটিমাত্র গ্রামের লোকও যদি আত্মশক্তির দ্বারা সমস্ত গ্রামকে সম্পূর্ণ আপন করতে পারে তাহলেই স্বদেশকে স্বদেশরূপে লাভ করার কাজ সেইখানেই আরম্ভ হবে। ... যে মানুষ গ্রাম থেকে মারী দূর করবার উদ্যোগ করছে তাকে যদি দুর্ভাগ্যক্রমে সম্পূর্ণ একলাও কাজ করতে হয়, তবু তার কাজের আদিতে ও অন্তে সমস্ত গ্রামের চিন্তা নিবিড়ভাবে যুক্ত। এই কাজের দ্বারাই নিজের মধ্যে সমগ্র গ্রামকে সে উপলব্ধি করে। গ্রামেরই সৃষ্টিতে তার সজ্ঞান আনন্দ। তারই কাজে স্বরাজ সাধনার সত্যিকার আরম্ভ বটে। তার পরে সেই কাজে যদি সমস্ত গ্রামের লোক পরস্পর যোগ দেয় তাহলেই বুঝব—গ্রাম নিজেকে নিজে সৃষ্টি করার দ্বারাই নিজেকে নিজে যথার্থরূপে লাভ করবার দিকে এগোচ্ছে। এই লাভ করাকেই বলে স্বরাজ-লাভ। ... যে গ্রামের লোক পরস্পরের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-অন্ন উপার্জনে আনন্দ বিধানে সমগ্রভাবে সম্মিলিত হয়েছে, সেই গ্রামই সমস্ত ভারতবর্ষের স্বরাজলাভের পথে প্রদীপ জ্বেলেছে। তার পরে— একটা দীপের থেকে আর-একটা দীপের শিখা জ্বালানো কঠিন হবে না-স্বরাজ নিজেই নিজেকে অগ্রসর করতে থাকবে, চরকার যান্ত্রিক প্রদক্ষিণ পথে নয়, প্রাণের আত্মপ্রবৃত্ত সমগ্রবৃদ্ধির পথে।"[৬৪]

এই আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ পল্লীউন্নয়নের ক্ষেত্রে তাঁর কর্মপদ্ধতিকে উল্লেখ করেছেন। গান্ধীর পদক্ষেপ ছিল অপূর্ণ এবং সাময়িক। রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা ছিল সর্বাত্মক এবং পূর্ণাঙ্গ। তিনি উন্নতির মাধ্যম হিসেবে সমবায়কে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন।

১৯০৮ সালে রবীন্দ্রনাথ পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীতে সভাপতি হিসেবে যে বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন তার কিয়দংশ ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এই বক্তৃতায় তিনি সমবায়ের পাশাপাশি একটি গ্রামকে কয়েকটি মণ্ডলীতে বিভক্ত করার কথা বলেছিলেন। এতে গ্রামের সকল জনগণকে সম্পৃক্ত করা সম্ভব হবে বলে তিনি ভেবেছিলেন। শিলাইদহ অপেক্ষা পতিসর এলাকায় তাঁর মণ্ডলী প্রথা সফল হয়েছিল।

তবে গ্রামের উন্নয়নে প্রবীণের সঙ্গে যুবককে সংশ্লিষ্ট করবার প্রতিও তিনি গুরুত্ব অর্পণ করেছেন। পল্লীউন্নয়ন প্রসঙ্গে যুবকদের লক্ষ করে তিনি বলেন :

> "তোমরা যে পারো এবং যেখানে পারো এক-একটি গ্রামের ভার গ্রহণ করিয়া সেখানে গিয়া আশ্রয় লও। গ্রামগুলিকে ব্যবস্থাবদ্ধ করো। শিক্ষা দাও, কৃষিশিল্প ও গ্রামের ব্যবহার সামগ্রী সম্বন্ধে নূতন চেষ্টা প্রবর্তিত করো, গ্রামবাসীদের বাসস্থান যাহাতে পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর হয় তাহাদের মধ্যে সেই উৎসাহ সঞ্চার করো; এবং যাহাতে তাহারা নিজেরা সমবেত হইয়া গ্রামের সমস্ত কর্তব্যসম্পন্ন করে সেইরূপ বিধি উদ্ভাবিত করো। এ কর্মে খ্যাতির আশা করিয়ো না, এমনকি গ্রামবাসীদের নিকট হইতে কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে বাধা ও অবিশ্বাস স্বীকার করিতে হইবে। ইহাতে কোন উত্তেজনা নাই, কোনো বিরোধ নেই, কোনো ঘোষণা নাই, কেবল ধৈর্য এবং প্রেম, নিভৃতে তপস্যা—মনের মধ্যে কেবল এই একটিমাত্র পণ যে, 'দেশের মধ্যে সকলের চেয়ে যাহারা দুঃখী তাহাদের দুঃখের ভাগ লইয়া সেই দুঃখের মূলগত প্রতিকার সাধন করিতে সমস্ত জীবন সম্পন্ন করিব।"[৬৫]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জমিদারিতে যুবকদের কাজে লাগিয়েছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশে তাঁর জমিদারি বিলুপ্ত হওয়ায় তিনি বোলপুরে শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পল্লীউন্নয়নে তাঁর প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখেন।

রবীন্দ্রনাথ গ্রাম উন্নয়নে উন্নয়নকর্মীদের প্রশিক্ষণ সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। তিনি বলেন :

> "আমার প্রস্তাব এই যে, বাংলাদেশের যেখানে হোক একটি গ্রাম আমরা হাতে নিয়ে তাকে আত্মশাসনের শক্তিতে সম্পূর্ণ উদ্বুধিত করে তুলি। সে গ্রামের রাস্তাঘাট, তার ঘর বাড়ির পরিপাট্য, তার পাঠশালা, তার সাহিত্যচর্চা ও আমোদ প্রমোদ তার রোগী পরিচর্যা ও চিকিৎসা, তার বিবাদনিষ্পত্তি প্রভৃতি সমস্ত কার্যভার সুবিহিত নিয়মে গ্রামবাসীদের দ্বারা সাধন করাবার উদ্যোগ আমরা করি।
>
> যারা একাজে প্রবৃত্ত হবেন তাঁদের প্রস্তুত করবার জন্য আপাতত কলকাতায় একটা নৈশবিদ্যালয় আবশ্যক। এই বিদ্যালয়ে স্বেচ্ছাব্রতী শিক্ষকদের দ্বারা প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধীয় আইন, জমি-জরিপ ও রাস্তাঘাট ড্রেন পুকুর ঘরবাড়ি তৈরি, হঠাৎ কোনো সাংঘাতিক আঘাত প্রভৃতির উপস্থিতমত চিকিৎসা ও কৃষিবিদ্যা প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে মোটামুটি শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা থাকা কর্তব্য।
>
> পাশ্চাত্য দেশে গ্রাম প্রভৃতির আর্থিক ও অন্যান্য উন্নতি সম্বন্ধে আজকাল যে-সব চেষ্টার উদয় হয়েছে সে সম্বন্ধে সকল প্রকার সংবাদ এই বিদ্যালয়ে সংগ্রহ করা দরকার হবে।"

রবীন্দ্রনাথ বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন, প্রশিক্ষণ ব্যতিরেকে গ্রাম উন্নয়ন দুঃসাধ্য কাজ। যারা গ্রামে কাজ করবে গ্রাম সম্বন্ধে তাদের পরিপূর্ণ ধারণা থাকা অত্যাবশ্যক। গ্রাম সম্বন্ধে যথাযথ ধারণা নেবার পর গ্রামবাসীদের সমস্যাকে চিহ্নিত করে তা

সমাধানের পথ উদ্ভাবন ও গ্রামবাসীদের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন—উন্নয়ন কর্মীদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এ কারণে রবীন্দ্রনাথ প্রশিক্ষণই শুধু নয়, উন্নয়নের ক্ষেত্রে নূতন নূতন তথ্য সংগ্রহের উপরও গুরুত্ব অর্পণ করেছেন। গ্রামের উন্নয়নে রবীন্দ্রনাথ ডাক্তার, শিক্ষক এবং যুবকদের সম্পৃক্ততার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে ডাক্তার এবং শিক্ষক অত্যন্ত সহজেই গ্রামবাসীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা অর্জন করতে সক্ষম। এরা তাঁদের কাজকে লোকহিতের উদ্দেশ্যে করলেই গ্রামের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। রবীন্দ্রনাথ পল্লীউন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা হিসেবে জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে বুঝেছিলেন। তিনি বলেন :

> "মনে করো কোনো গৃহস্থের যদি গৃহস্থালির প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় চাল-ডালের বাঁধা বরাদ্দ অনেকদিন হইতে ঠিক সমানভাবে চলিয়া আসে, অথচ ইতিমধ্যে বৎসরে বৎসরে পরিবারের জনসংখ্যা বাড়িয়া চলে, তবে পূর্বে ঠাকুরদাদা এবং ঠাকুরুন দিদি যেমন হৃষ্টপুষ্ট ছিলেন, তাঁহাদের নাতি-নাতনিদের তেমন চেহারা আর থাকিবে না, ইহাদের হাড় বাহির হইয়া যাইবে, বাড়িবার মধ্যে লিভার পিলে বাড়িয়া উঠিবে। তখন দৈবকে কিংবা কলিকালকে দোষ দিলে চলিবে কেন ? ভাঁড়ার হইতে চাল-ডাল আরও বেশি বাহির করিতে হইবে।
>
> আমাদের চাষি বলে, মাটি হইতে বাপদাদার আমল ধরিয়া যাহা খাইয়া আসিতেছি তাহার বেশি পাইব কি করিয়া ? একথা চাষির মুখে শোভা পায়, পূর্ব প্রথা অনুসরণ করিয়া চলাই তাহার শিক্ষা; কিন্তু এমন কথা বলিয়া আমরা নিষ্কৃতি পাইব না। এই মাটিকে এখানকার প্রয়োজন অনুসারে বেশি করিয়া ফলাইতে হইবে—নহিলে আধপেটা খাইয়া, জ্বরে অজীর্ণরোগে মরিতে কিংবা জীবন্মৃত হইয়া থাকিতে হইবে।"[৬৬]

রবীন্দ্রনাথ জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যার কথা উল্লেখ করলেও তার সমাধানের পথও তিনি নির্দেশ করেছেন। তিনি পল্লীউন্নয়নে দেশী ধারার সঙ্গে আধুনিক প্রযুক্তির সংযোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি বলেন :

> "এই মাটির উপর মন এবং বুদ্ধিখরচ করিলে এই মাটি হইতে যে আমাদের দেশের মোট চাষের ফসলের চেয়ে অনেক বেশি আদায় করা যায় তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। আজকাল চাষকে মূর্খের কাজ বলা চলে না। চাষের বিদ্যা এখন মস্ত বিদ্যা হইয়া উঠিয়াছে।"[৬৭]

তবে রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছিলেন যে চাষির যে জমি আছে সকল জমি চাষ করেও তার অভাব মিটছে না। চাষি ঋণে জর্জরিত থাকছে। ফসলের দাম বাড়লেও চাষি সে দাম পায় না। রবীন্দ্রনাথ চাষের ক্ষেত্রে প্রাচীন পদ্ধতির পরিবর্তে আধুনিক পদ্ধতি অর্থাৎ কলের লাঙল, সেচ, সার ইত্যাদি ব্যবহারের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেন :

> "আজ শুধু একলা চাষির চাষ করিবার দিন নাই, আজ তাহার সঙ্গে বিদ্বানকে, বৈজ্ঞানিককে যোগ দিতে হইবে। আজ শুধু চাষির লাঙলের ফলার সঙ্গে আমাদের মাটির সংযোগ যথেষ্ট নয়—সমস্ত দেশের বুদ্ধির সঙ্গে, বিদ্যার সঙ্গে, অধ্যবসায়ের সঙ্গে তাহার সংযোগ হওয়া চাই।"[৬৮]

রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে বসবাসের সময় লক্ষ করেন যে, কৃষকের জমি জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং উত্তরাধিকার আইন ইত্যাদির কারণে ক্ষুদ্রাকৃতি হয়ে পড়েছে। এবং তার মাধ্যমে কৃষকের উন্নতি আর সম্ভব নয়। এ কারণে তিনি সমবায়ের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেন এবং এ কাজে স্থানীয় শিক্ষিত ও যুবসমাজকে সাধারণের সমস্যা সমাধানে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করার প্রতি আহ্বান জানান।

পল্লীউন্নয়নে রবীন্দ্রনাথের এই প্রচেষ্টার মর্মমূলে ছিল প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর গভীর বিশ্বাস। তিনি ইতিহাস পাঠে, পল্লীউন্নয়ন সম্পর্কে নানা তথ্য এবং প্রয়োগ কৌশল সম্পর্কে অবহিত হন।

সমবায় সম্পর্কে তাঁর ধারণা প্রাচীন ইতিহাস উদ্ভূত। প্রাচীন মধ্যযুগে (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ সালে) বৌদ্ধ গ্রন্থে আঠারোটি সমবায় সংঘের উল্লেখ আছে। এরা সকলেই ছিল পেশাজীবী সমবায় সম্প্রদায়। প্রতিটি সংঘের একজন প্রধান থাকত এবং প্রতিটি সংঘের নিজস্ব নিয়মকানুন ছিল। এসব সংঘের উপর রাজার প্রতিনিধিবৃন্দ এইসব সংঘের কর্মকাণ্ড তত্ত্বাবধান করতেন। রাজ্যের বিভিন্ন উৎসবাদিতে এসব সংঘ অংশগ্রহণ করে থাকত। রাজকীয় তত্ত্বাবধান সমবায় সংঘগুলির স্বকীয় কর্মকাণ্ড বা উদ্যোগকে কখনও ব্যাহত করেনি।[৬৯]

গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে মৌর্যদের এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। তারা জনবহুল এলাকা থেকে অতিরিক্ত লোকদের সরিয়ে এনে নতুন জনবসতি স্থাপন করে ক্ষয়িষ্ণু বসতিগুলো পুনর্বাসিত করতো।

আজকে গুচ্ছ-গ্রামের পরিকল্পনা অনেকটা এই প্রাচীন ঐতিহ্যভিত্তিক। রবীন্দ্রনাথ কুষ্টিয়া শহরের পার্শ্ববর্তী লাহিনী গ্রামে বিভিন্ন পেশাজীবীদের নিয়ে একটি গুচ্ছগ্রাম নির্মাণ করেছিলেন। পরে অবশ্য যশোরের নলডাঙার জমিদার রাতারাতি তা পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেয়। মৌর্য আমলে কৃষকদের জন্য রাষ্ট্রপ্রদত্ত সেচ সুবিধার ব্যবস্থা ছিল। রাজকীয় পদাধিকারীরা জমি জরিপ এবং জলদ্বারগুলো পরিদর্শন করতো এবং সেচের জল শাখা খালগুলোতে বিতাড়িত হতো। এর ফলে সকলেই সেচের সুবিধা ভোগ করতো। অবশ্য সেচের জন্য একটি নির্ধারিত কর প্রদানেরও ব্যবস্থা ছিল। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, এ সময়ে সমগ্র দেশে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হয়েছিল। মৌর্যোত্তর যুগেও সমবায় সংঘের বিকাশ ঘটে। এই সময় আরও অধিক পেশাজীবী সমবায় সংঘের কথা জানা যায়।[৭০]

খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে এইসব সমবায় সংঘের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এরা সুদের মাধ্যমে ব্যবসাতে ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডের জন্য ঋণ প্রদান করত।[৭১] খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকে হস্তশিল্প, তাঁতশিল্প, কুমোর ও কর্মকারসহ নানা শিল্পকর্ম ও কৃষিকাজ সমবায় সংঘের মাধ্যমে সাধারণের মধ্যে অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়।[৭২]

গুপ্ত যুগের একটি বড় বিষয় ছিল সমবায় সংঘের মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থার যথাযথ নিয়ন্ত্রণ। তারা সেচের উদ্দেশ্যে নির্মিত বাঁধের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করতো।[৭৩] গুপ্তযুগের স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতে ব্যবসায়ে অংশীদারি ও সমবায় সংঘের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে বিশদ নিয়মাবলি লিপিবদ্ধ রয়েছে। এই প্রাতিষ্ঠানিক সংস্থাগুলো শুধু যৌথ

চুক্তি সম্পাদন, ব্যবসা পরিচালনা ও টাকাকড়ি জমা নেওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ছাড়াও সদস্যবর্গের মধ্যে বিচারসংক্রান্ত ও প্রশাসনিক কর্তব্যাদিও সম্পাদন করত।[৭৪] এই সময় সমবায় সংঘগুলি মুদ্রা ও সীলমোহরেরই প্রচলন করে নি তাদের অধীনে নাগরিক সেনাদলও ছিল।[৭৫] সর্বক্ষেত্রে এসব সংঘের কার্যক্রম রাজা নিয়ন্ত্রণ ও প্রয়োগ করতেন। তবে কালক্রমে এসব সংঘের স্বশাসিত চরিত্র বিকাশ লাভ করে।

উপরে বর্ণিত সমবায় ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে প্রাচীন ইতিহাস রবীন্দ্রনাথের অজানা ছিল না। সে কারণে তিনি দেশের উন্নয়নে সমবায় সংঘের ভূমিকাকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জমিদারিতে সমবায় নীতি প্রচলনে নানা ব্যবস্থাও নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর জমিদারি চলে যাওয়ায় তাঁকে শান্তিনিকেতনে চলে আসতে হয় এবং এখানে শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠিত করে তিনি তাঁর চিন্তার প্রসার ঘটাতে সক্ষম হন। ১৯২০ সালের ২২শে জুলাই তিনি বিখ্যাত আইরিশ সমবায়ী স্যার হোরেস প্লানকেট এর সঙ্গে তাঁর বাসায় দেখা করেন। সে সময়ে শ্রীনিকেতনে কর্মরত পিয়ারসন এবং কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। এ সম্পর্কে রথীন্দ্রনাথ বলেন :

> "Pearson and myself accompanied father. The conversation was mostly about the cooperative movement in Ireland. Sir Horace was not eloquent but every word he said came out of his thirty years' experience of organising village life in Ireland. He was an idealist but at the same time practical... He discussed some of the main principles of co-operation saying that it was in the economic field that man could really unite and co-operate, more so than even in religion."[৭৬]

স্যার হোরেস রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনাকালে বলেছিলেন যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই মানুষ প্রকৃতপক্ষে যতটা ঐক্যবদ্ধ হতে পারে, ধর্মীয় ক্ষেত্রে ততটা ঐক্যবদ্ধ সে হতে পারে না। এ কারণে রবীন্দ্রনাথ তাঁর উন্নয়ন পরিকল্পনায় কে হিন্দু, কে মুসলমান এসব চিন্তা না করে তাদেরকে 'মানুষ' হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন। এ কারণে সাঁওতাল, মুচি, ডোম সকলের সঙ্গে তাঁর কাজ করতে বাঁধে নি। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের এই মানবতাবোধ তাঁকে একটি শ্রেষ্ঠ মানুষে রূপান্তরিত করেছিল।

রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন বিষয়ক গ্রন্থাদির পর্যালোচনা

স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশে রবীন্দ্রচর্চা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু সে সব রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মকে নিয়েই, কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ইত্যাদি এবং এসবের মধ্যে কখনও কখনও সমাজজীবনের ছবি এসেছে। রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়নের চিন্তা-ভাবনা কোন কোন গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তা নিতান্তই খণ্ডিত।

গোলাম মুরশিদ রচিত 'রবীন্দ্রবিশ্বে পূর্ববঙ্গ পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা' এর প্রায় সবটুকুই সাহিত্যকেন্দ্রিক। তবে তাঁর আলোচনায় সমাজ ও জাতীয়জীবনের কিছু উপাদান এসেছে যা প্রত্যক্ষভাবে রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন সম্পর্কযুক্ত নয়। কিন্তু অপ্রত্যক্ষভাবে উন্নয়নমূলক ভাবনার সহায়ক।

আহম্মদ রফিক বিরচিত 'রবীন্দ্রভুবনে পতিসর' ও 'ছোটগল্প : পদ্মাপারের রবীন্দ্রগল্প' সাহিত্যকর্ম। এখানেও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তা গুরুত্ব পেয়েছে। তবে গোলাম মুরশিদ অপেক্ষা আহমদ রফিকের রচনায় রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তার বিশ্লেষণে পতিসরে রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়নের কিছু কিছু কথা আলোচনায় এসেছে।

এই পর্যায়ে মুহম্মদ মজিবউদ্দীন মিয়া লিখিত "গল্পগুচ্ছের সমাজ ও জীবন' রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মের বিশ্লেষণ হলেও এই গ্রন্থে গ্রামীণ জীবনের আর্থ-সামাজিক বিষয়গুলো উত্থাপিত হয়েছে। তবে একথা বলা যায়, এসব গ্রন্থাদিতে রবীন্দ্রনাথের অসাম্প্রদায়িক ও মানবতাবোধ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে যা তাঁর উন্নয়ন ভাবনার সহায়ক।

আনোয়ার পাশা লিখিত 'রবীন্দ্র-ছোট-গল্প-সমীক্ষা' স্বাধীনতা পূর্বে রবীন্দ্রচর্চার ক্ষেত্রে একটি মূল্যবান গ্রন্থ। এখানে লেখক সাহিত্যের আঙ্গিকে সমাজজীবনকে বিশ্লেষণ করেছেন।

এ ব্যতিরেকে আ. ন. ম. বজলুর রশীদ-এর 'রবীন্দ্রনাথ', আনিসুজ্জামান সম্পাদিত 'রবীন্দ্রনাথ', মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর 'রবীন্দ্রপরিক্রমা' ইত্যাদি গ্রন্থ পুরোপুরিই সাহিত্য নির্দেশনা।

প্রবন্ধে অবশ্য রবীন্দ্রনাথের নানা ভাবনার উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে এখানেও পল্লীউন্নয়নবিষয়ক কোন রচনার তেমন পরিচয় পাওয়া যায় না।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও সমাজজীবনকে নিয়ে লেখা প্রবন্ধাদির মধ্যে আনিসুজ্জামান বিরচিত 'রবীন্দ্রনাথ' : পূর্ব বাংলায়' 'রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তা', আবু হেনা মোস্তফা কামাল-এর গল্পগুচ্ছ 'রবীন্দ্রমানস ও পূর্ব পাকিস্তান,' আবুল ফজলকৃত 'মানবতার কবি রবীন্দ্রনাথ', মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর 'রবীন্দ্রনাথ' ও হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষ', মোহম্মদ মনিরুজ্জামান-এর 'গল্পগুচ্ছের মুসলিম চরিত্র' উল্লেখযোগ্য। এসব প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তা প্রতিফলিত হলেও পল্লীউন্নয়নবিষয়ক কোন আলোচনা বিশদভাবে আসে নি। এই পর্যায়ে আতিউর রহমানের 'রবীন্দ্রভাবনায় আত্মশক্তি ও বাঙালির জাতীয় বিকাশ' প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথের পল্লীভাবনার নানা দিকের উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রবন্ধে প্রবন্ধকার রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তার পাশাপাশি তাঁর সামাজিক ও অর্থনৈতিক চিন্তার দিকগুলোও বিশ্লেষণ করেছেন।

অধ্যাপক আনিসুর রহমান তাঁর লেখা কয়েকটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের পল্লী ভাবনার বিষয়টি আলোচনা করেছেন।

স্বরোচিষ সরকারের 'অস্পৃশ্যতা ও রবীন্দ্রনাথ' বিষয়ক প্রবন্ধটি পল্লীউন্নয়ন সম্পর্কিত না হলেও এই প্রবন্ধে প্রবন্ধকার রবীন্দ্রনাথের বর্ণবাদবিরোধী মানবতাকে অত্যন্ত চমৎকারভাবে ব্যক্ত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ পূর্ববঙ্গে এসে বিশেষকরে, তাঁর জমিদারিতে 'অস্পৃশ্যতাকে' একটি পাপ হিসেবে গণ্য করেছেন এবং এই অপরাধ নিরসনে বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

পশ্চিমবাংলায় রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা ও আলোচনা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনাথ: পল্লী পুনর্গঠন' গ্রন্থটির উল্লেখ করা যায়। তাঁর গ্রন্থটি কলেবরে ছোট হলেও রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন সম্পর্কে একটি ভালো ধারণা জন্মে।

এই পর্যায়ে ড. সুকুমার মল্লিক রচিত রবীন্দ্রনাথ ও পল্লীচিন্তা গ্রন্থটি একটি গবেষণাধর্মী গ্রন্থ। এই গ্রন্থে তিনি যেসব তথ্য প্রদান করেছেন তা কয়েকটি নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন। এই নিবন্ধগুলি নিম্নরূপ :

ব্যাধিরোগ মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম
কৃষি হল কর্ষণ ভূমি সংস্কার
জলসংস্কার
হিন্দু-মুসলমান
সমবায় আন্দোলন
শ্রী নিকেতন,
পল্লীশিক্ষা

এসবের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়নের বিভিন্ন দিকের আলোচনা আছে। কিন্তু তা একটি সামগ্রিক বিবরণ বা 'রিপোর্ট' হিসেবে গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন পরিকল্পনা মুখ্যত পূর্ববঙ্গ বা বর্তমান বাংলাদেশকে নিয়ে হয়েছিল। ঠাকুর এস্টেটের জমিদারি সে সময় কুষ্টিয়া জেলার শিলাইদহ, পাবনা

জেলার শাহজাদপুর এবং রাজশাহীর পতিসর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এসব অঞ্চলে তিনি থেকেছেন, মানুষের সমস্যার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন, অতঃপর সমাধানের পথ খুঁজে বের করতে চেয়েছেন। তাঁর জীবনে একটি পর্যায়ক্রম ছিল। বাংলাদেশে তিনি সফল না হলেও তাঁর পরিকল্পনা তিনি অনেকাংশে বিশ্বভারতীতে শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা করে তা বাস্তবায়িত করার প্রচেষ্টা নিয়েছেন। ড. সুকুমার মল্লিকের গ্রন্থে এই ক্রমবিকাশ এবং ধারাবাহিকতাকে পাওয়া যায় নি। তথাপি এই গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথের পল্লীচিন্তার উপর একটি মূল্যবান আলোচনা।

সুব্রত গুপ্ত ও পরিমল চক্রবর্তী লিখিত 'রবীন্দ্রনাথের অর্থনৈতিক চিন্তা' একটি মূল্যবান গবেষণাগ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়নের মর্মমূলে যে অর্থনৈতিক উন্নয়নই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এ সম্পর্কে গবেষণাধর্মী আলোচনা হয়েছে। তবে পল্লীউন্নয়নের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক চিন্তা খুব স্বাভাবিকভাবেই এসেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি একজন মানুষের পরিপূর্ণ উন্নয়ন কামনা করেছেন। সুব্রত গুপ্ত এবং পরিমল চক্রবর্তী অর্থনীতির অধ্যাপক বিধায় তাঁরা রবীন্দ্রনাথের অর্থনৈতিক চিন্তা সম্বন্ধেও এই গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ভূমিকাতে লেখকদ্বয় বলেন, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা দেখতে পাই প্রজাদরদী এক জমিদার, গ্রামীণ অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট প্রবক্তা। তাঁরা অবশ্য স্বীকার করেছেন। যে শ্রীনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ সমবায়ের ভিত্তিতে সঠিক গ্রামীণ উন্নয়ন ও গ্রামীণ শিল্প পুনর্গঠনের জন্য যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন বর্তমানে ভারতে তার যথার্থ স্বীকৃতি লাভ ঘটেছে সে দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনায়। লেখকদ্বয় উল্লেখ করেন যে, ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় যে সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প গৃহীত হয়েছে, তার রূপরেখা পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন কর্মকাণ্ডে।

পল্লীউন্নয়নে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা যে অসাধারণ ছিল শহর কলকাতা থেকে অনেক দূরে বীরভূমের একটি অখ্যাত অঞ্চলে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি তা সপ্রমানন করেছেন। পৃথিবীর তাবৎ কার্য এবং শিল্পীদের সঙ্গে এইখানে বুঝি রবীন্দ্রনাথ ব্যতিক্রমী। তাঁর পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচি একটি মডেল হিসেবে যে কোন উন্নয়নশীল বা উন্নয়নমুখী দেশ গ্রহণ করতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের এই অনন্য প্রতিভার যথার্থ মূল্যায়ন করা হয়েছে, 'Poet and Plowman.' গ্রন্থে। গ্রন্থকার Leonard K. Elmhirst ছিলেন রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে একজন নিবেদিতপ্রাণ কর্মী। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাজে অনেক বিদেশীদের সহযোগিতা পেয়েছিলেন। কিন্তু এল. কে. এলমহার্স্ট ছিলেন রবীন্দ্রনাথের নিত্যদিনের সঙ্গী। 'বিশ্বভারতীতে' তাঁর অবদান কখনও মুছে যাবার নয়। এ প্রসঙ্গে 'Poet and Plowman` গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক কৃষ্ণা কৃপালিনী বলেন :

> "Rabindranath Tagore was fortunate in his many foreign friends, English, European and American. Some of them came to be closely associate with his new famous experimental centres of education and rural reconstructional at Srinikatan. The memory of Charles Andrews, Willie Pearson and Sylvain Levy each with his unique contrubution, are now part of the history of Sriniketan and Visva-Bharati. In the same way, and indeed more basically and vividly, the contributin of Leonard Elmhirst is an integral part of the history of Sriniketan. One can hardly think of Srinikatan without recalling the debt it owes to Elmhirst's dynamic zeal, devotion and initiative. He did the spade work (literally too) and helped Rabindranath lay the foundation of a complex of activities, Seemingly rustic and lowly but in the long run vital for national regeneration."[৭৭]

লিওনার্ড এল্‌মহার্স্ট বর্ধিষ্ণু ব্রিটিশ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং কেমব্রিজে ইতিহাস বিষয়ে পড়াশেষ করে আমেরিকাতে কৃষি বিষয়ে পড়াশুনা করেন। তার আগে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে আর যুদ্ধে যেতে হয় না এবং সে সময় তিনি ভারতে কিছুদিন অবস্থান করেন এবং এখানকার কৃষিব্যবস্থা এবং পল্লীউন্নয়ন সম্পর্ক তাঁর বেশ আগ্রহ জন্মে। মনে হয় সে কারণেই হয়তোবা তিনি কৃষি বিষয়ে পড়াশুনায় নিবিষ্ট হন। রবীন্দ্রনাথের কাছে এ খবর পৌঁছুলে তিনি এলমহার্স্টকে জরুরিভাবে নিউইয়র্কে তাঁর সাথে দেখা করার জন্য তারবার্তা পাঠান। অতঃপর রবীন্দ্রনাথের সাথে আলাপ-আলোচনা হবার পর এলমহার্স্ট রবীন্দ্রনাথের সাথে কাজ করতে রাজি হন এবং বোলপুরে চলে আসেন। সেই শুরু। অতঃপর শ্রীনিকেতন গড়ে ওঠে তাঁর অমানুষিক পরিশ্রম এবং পরিকল্পনায়। তিনি সুরুল গ্রামে পল্লীউন্নয়নে রবীন্দ্রনাথের ভাবনাকে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। Poet And Plowman তাঁর একদিন প্রতিদিনের কর্মকাণ্ডের এক চমৎকার বিবরণ বিবরণ। বাস্তব, রবীন্দ্রনাথের আদর্শে তিনি উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নিউইয়র্কে তাঁর প্রাথমিক আলাপেরও একটি বর্ণনা দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ সে সময় তাঁকে বলেন:

> "Mr Elmhirst, he started," I have established an educational enterprise in India which is almost wholly academic. It is situated well out in the countryside of West Bengal at Santiniketan, We are surrounded by villages, Hindu, Muslim, Santal except that we employ

a number of these village folk for various menial tasks in my school, we have no intimate contact with them at all inside their own communities. For some reason these villages appear to be in a state of steady decline. Infact, they are in decay. Some years ago I bought from the Sinha family a farm just outside the village of Surul, a little over a mile from my school. I hear that you might be interested in going to live and work on such a farm in order to find out more clearly the causes of this decay." [৭৮]

উপরোক্ত বক্তব্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পল্লীউন্নয়নের আদর্শের কথা এলমহার্স্টকে বুঝিয়েছিলেন। কিন্তু তলমহার্স্ট এখনই রবীন্দ্রনাথের এ প্রস্তাবে রাজি হন নি। তাঁর লেখাপড়া শেষ হবার পর তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বাংলাদেশে সুরুলে আসেন। সেদিন থেকেই তাঁর কাজ শুরু হয়। 'Poet and Plowman' বস্তুত এলমহার্স্টের একটি দিনপঞ্জির মত ছিল। এই গ্রন্থে তিনি রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ভাবনা এবং কর্মপদ্ধতিকে অত্যন্ত সুন্দর করে তুলে ধরেছেন এবং সে সঙ্গে তাঁর অবদানকেও তিনি সংযুক্ত করেন। বলতে কি, গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন সম্পর্কে একজন কর্মীর সপ্রশংস চালচিত্র। এক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন যে শ্রীনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়নের ক্ষেত্রে যে সফলতা এসেছিল - যা মুখ্যত এলমহার্স্ট এবং রবীন্দ্রনাথের আরও কতিপয় সহযোগীদের অবদান ছিল, তা এক অর্থে পূর্ববঙ্গে (বর্তমান বাংলাদেশ) তিনি যে পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচি করেছিলেন তারই ফলশ্রুতি। রবীন্দ্রনাথ বোলপুর অঞ্চলে নিজের খরিদকৃত ভূখণ্ডে নির্বিবাদে তাঁর চিন্তা-চেতনার প্রয়োগ ঘটাতে পেরেছিলেন। এলমহার্স্ট তাঁর সময়কালে রবীন্দ্রনাথের এই কর্মকাণ্ডের একটি দিনপঞ্জিকা সম্বলিত বিবরণ দিয়েছেন। গ্রন্থটিতে এলমহার্স্ট রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়নভাবনা সম্পর্কে ব্যক্তিগত ধ্যানধারণার প্রতিফলন ঘটেছে। এলমহার্স্ট রবীন্দ্রনাথকে কবি হিসেবে এবং পল্লীউন্নয়নের কর্মযোগী হিসেবে ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন। গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথের মন ও মননশীলতা এবং পল্লীউন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সম্যক ধারণালাভে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রেমচাঁদ লাল কৃত 'Reconstruction And Education in Rural India' গ্রন্থটিতে গোটা ভারতবর্ষের গ্রামীণজীবনের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচির বিবরণ যেমন দেওয়া হয়েছে তেমনি এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কর্মকাণ্ডের একটি মূল্যায়ন করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের ভূমিকা লেখক। এখানে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পল্লীউন্নয়ন সম্পর্কে চিন্তা-চেতনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের এই চিন্তা-চেতনা ও তার প্রয়োগ ঘটেছে পশ্চিমবঙ্গে যা বর্তমানে ভারতের অন্তর্ভুক্ত। তবে পশ্চিমবঙ্গে তিনি পল্লীউন্নয়নের যে কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন তা যে পূর্ববঙ্গে তাঁর কর্মসূচিরই একটি সম্প্রসারণ—তা

সহজেই বোঝা যায়। এখানেই রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের অবহেলিত নারীসমাজের সঙ্গে গ্রামের তুলনা করেছেন।

তিনি বলেছেন,

Villages are like women in their keeping is the cradle of the race, According to us, the poverty is not the most important, the problem of unhappiness is the great problem. Wealth, which is the synonym for the production and collection of things, men can make use ruthlessly. They can crush life out of earth and flourish. But happiness, which may not compete wealth in its list of materials, is final; it is creative; Therefore it has its source of riches within itself. Our object is to try to flood the choked bed of village life with the stream of happiness.

এই বক্তব্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পল্লীউন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মূল উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করেছেন। তিনি অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিস্ফোরণ ঘটাতে চান নি, চেয়েছেন-মনের শান্তি যাকে তিনি 'মনের মুক্তি' বলেও অভিহিত করেছেন। তাঁর এই বক্তব্যের যৌক্তিকতা সম্পর্কে তিনি ভূমিকার শেষে বলেন :

"Most of us who try to deal with the poverty problem think of nothing but a greater intensive effort of production, forgetting that this only means a greater exhaustion of materials, as well as of humanity. This only means giving exaggerated opportunity for profit to a few, at the cost of many. It is food which nourishes, not money; it is fullness of life which makes one happy, not fullness of purse. Multiplying materials intensifies the inequality between those who have and those who have not, and this deals a fatal wound to the social system, through which the whole body is eventually bled to death." [৭৯]

পল্লীউন্নয়নের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের এই উদ্দেশ্য শুধু যে অসাধারণ, তা শুধু নয়, বরং এমন বলা অসংগত হবে না যে, তিনি মানুষের সার্বিক উন্নয়ন যা মানুষকে এক পরম প্রশান্তি এনে দিতে পারে তারই কামনা করেছিলেন। উন্নয়নের ক্ষেত্রে এমন মহৎ ভাবনা অদ্যাবধি আমরা দেখতে পাই না।

প্রেমচাঁদ লাল তাঁর গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের এই মহৎ ভাবনাকে সামনে রেখেই তাঁর কর্মকাণ্ডের মূল্যায়ন করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে বিদেশীর মধ্যে যাঁরা জড়িত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে এলমহার্স্ট নিঃসন্দেহে প্রধান। ইতোপূর্বে তাঁর লেখা "Poet and Plowman"-এ দিনপঞ্জি আকারে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর মতামতসংক্রান্ত গ্রন্থের উল্লেখ করেছি।

অতঃপর রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনা সম্পর্কে এলমহার্স্ট এবং রবীন্দ্রনাথের নানা রচনা এবং এ সম্পর্কে উভয়ের মধ্যে ভাববিনিময়সম্বলিত "Rabindranath Tagore, Pioneer in Education" এই নামে একটি প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশিত হয়। এই সংকলনের ভূমিকা লিখেছেন এলমহার্স্ট। এই সংকলনে রবীন্দ্রনাথের ৪টি প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

০১. Poet's and School
০২. Philosophical Approach to Sriniketan
০৩. The Parrot's Training.
০৪. Art of Movement in Education

এলমহার্স্ট লিখেছেন ভূমিকাসহ দুটি প্রবন্ধ

০১. The Foundation of Srinikatan
০২. Sikha Satra

রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন উন্নয়নের জন্য শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। শিক্ষা মানুষের আত্মবোধকে জাগ্রত করে যা পরবর্তীতে আত্মশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের যা উন্নয়ন ঘটে তা মানুষকে পশু আচরণ থেকে মানবীয়তায় রূপান্তরিত করে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন মানুষকে বিত্তবান করে তোলে ঠিকই, কিন্তু কেবলমাত্র বিত্ত মানুষকে শান্তিদানে সক্ষম নয়। শান্তির জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষাভিত্তিক উন্নয়ন। রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়নের মর্মমূলে এই চেতনাই সক্রিয় ছিল। তাঁর সকল নিবন্ধে তিনি তাঁর এই চেতনাকে প্রতিফলিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষা' অর্থে প্রচলিত শিক্ষাকেই বোঝেন নি, এই শিক্ষা আমাদের লোকসংস্কৃতি বা ফোকলোরের অংশভাগ যা সমাজে 'লোকশিক্ষা' নামে আবহমানকাল ধরে প্রচলিত। রবীন্দ্রনাথ পল্লীউন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষাকেই গুরুত্ব অর্পণ করেছিলেন। Rabindranath Tagore, Pioneer in Education এলমহার্স্ট ও রবীন্দ্রনাথের রচনাবলিতে উপরোক্ত ভাবনার প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং পশ্চিমবাংলার বোলপুরে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করে শান্তিনিকেতন এবং শ্রীনিকেতন দুটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তার সফল প্রয়োগ ঘটিয়ে যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন তার একটি পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করেছেন Kuryenson তাঁর Rural Recants chain নামক গ্রন্থে। এই গ্রন্থে তিনি গ্রাম বাংলার পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সৃষ্টিত শ্রীনিকেতনের কর্মকাণ্ডের একটি বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। সমগ্র ভারতবর্ষের পল্লী অঞ্চলের সমস্যার প্রেক্ষিতে তিনি রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে

পর্যালোচনা করেছেন। প্রসংগত উল্লেখ্য, স্বাধীন ভারতের জন্য মহাত্মা গান্ধী রবীন্দ্রনাথের এই পল্লীউন্নয়ন কার্যক্রম প্রয়োগের সুপারিশ করেছেন। একদিন তিনি রবীন্দ্রনাথের নিকট থেকে স্বরাজের যথার্থ উদ্দেশ্য বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর মতে Swaraj for me means freedom for the meanest of our countrymen,

রবীন্দ্রনাথ এই স্বরাজের ভিত্তি গড়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন কর্মকাণ্ড যে একজন বিত্তবান কবির কল্পনাবিলাস ছিল না, ইতোপূর্বে, আমাদের আলোচনায় তা উল্লেখ করেছি। এই প্রসঙ্গে আরও দুটি গ্রন্থের লেখক হাশিম আমির আলী। বই দুটির নাম,

০১. The Environs of Tagore
০২. Then and Now

এই দুটি গ্রন্থে হাশিম আমির আলী রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী সংলগ্ন এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের উপর রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন কার্যক্রম কি প্রভাব রাখতে পেরেছে সে সম্বন্ধে তাঁর গবেষণালব্ধ তত্ত্ব এবং তথ্যের পর্যালোচনা করেন। এই দুটি গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রভাবে গড়ে ওঠে কয়েকটি গ্রামের বর্তমান অবস্থাকে তুলে ধরা হয়েছে।

গ্রামবাংলার ঐতিহাসিক পটভূমি

প্রাচীনকালে গোটা বাংলাদেশই ছিল একটি বিশাল গ্রাম। জনসংখ্যার আধিক্য না থাকায় প্রচুর খাদ্যোৎপাদন হতো। মানুষের তেমন অভাব ছিল না। মাঠভরা ধান, পুকুরভরা মাছ আর গোয়ালভরা গরু। তখন গ্রাম ছিল স্বয়ংশাসিত। এসব গ্রাম ছিল মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মিলনকেন্দ্র। গ্রামে গ্রামে নানা ধরনের উৎসব হতো। সংগীতের আসর বসত দিনের শেষে জমিদার বা কোন ধনী ব্যক্তির বাহির বাড়িতে। আশেপাশের গ্রাম থেকে মেয়ে পুরুষ ভিড় করত এসব অনুষ্ঠানে। কোন কোন অনুষ্ঠান ছিল ধর্মনির্ভর, কোনটা ছিল কেবল চিত্তবিনোদনের জন্য। যাত্রা, পালাগান, ভাবগান, ধূয়ো ইত্যাদি অনুষ্ঠান গভীর রাত অবধি চলত। গ্রামে তখন আইন-শৃঙ্খলার বিঘ্ন ঘটত। ক্বচিৎ ডাকাতি বা খুনের কথা জানা যেত। কিন্তু মানুষ যে একেবারেই অভাবী ছিল না তা নয়। তবে তাদের সংখ্যা ছিল নেহাতই সীমিত। বিত্তবান মানুষেরা তাদের অভাব মোচন করতেন। গ্রামে গ্রামে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি ছিল। একই গ্রামে ধর্মীয় গোষ্ঠী হিসেবে পাড়ার বিভাজন ছিল। হিন্দুদের মধ্যে অবশ্য বর্ণবিভেদ ছিল। ফলে হিন্দুপাড়া নানা নামে পরিচিত হতো। গ্রামের মানুষ রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। কারা দেশ শাসন করছে বা কারা দেশ দখল করছে এ নিয়ে তেমন মাথাব্যথা ছিল না। তারা নিজেরা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত থাকত। ১৯১২ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একটি বিবরণে তৎকালীন গ্রাম সম্পর্কে উল্লেখ আছে :

> Under the simple form of municipal government the inhabitants of the country have lived from time immemorial ... , the inhabitants give themselves no trouble about the breaking up and division of kingdoms. While the villagers remain entire, they care not to what power it is transferred or to what sovereign it devolves. Its internal autonomy remains unchanged.[৭৭]

এই বিবরণ থেকে যেটা স্পষ্ট তা হল গ্রামের মানুষ রাজ্যের ভাঙা-গড়া, উত্থান-পতন ইত্যাদির খবর যদিও বা জানত তা গ্রামের জীবনযাত্রায় কোন

প্রভাবই ফেলত না বলেছি - এসব গ্রাম ছিল স্বয়ংশাসিত। গ্রামের মানুষ নিজেরাই ঠিক করে দিত কাদের হাতে গ্রাম পরিচালনার ভার দিয়ে তারা নিশ্চিত হবে। ইতিহাস পাঠে জানা যায় এদেশ প্রাচীনকালে নানা বিদেশী আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছে। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়েছে কিন্তু গ্রামবাসীদের তাতে কিছু যায় আসে নি। এর কারণস্বরূপ বলা চলে সে সময় রাজ্য পরিচালনায় যারা ছিলেন তাঁরা গ্রামব্যবস্থাপনা নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। যথাসময় রাজস্ব আদায় হলেই তাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়ে যেত। এই প্রসঙ্গে Sir Travelyan বলেন :

> "One foreign conqueror after another has swept over India, but the village municipalities have stuck to soil like their own kusha grass."[৭৮]

এমনিভাবে Sir Charles Matcalfe তৎকালীন ভারতবর্ষের গ্রাম সম্পর্কে উল্লেখ করেন :

> "Dynasty after dynasty tumbles down, revolution succeeds revolution, Hindu, Pathan, Mughal, Maratha, Sikh, English all are masters in turn, but the village communities remain the same. In times of trouble they arm and fortify themselves. A hostile army passes through the country, the village community collect their cattle within their walls and let the army pass unprovoked."

অতঃপর তিনি আরো বলেন :

> "This union of village communities, each one forming a separate little state in itself as I conceive contributed more than any other cause to the preservation of the peoples of India through all revolutions and changes which they have suffered and it is a high decree conducive to their happiness and to the enjoyment of a great portion of freedom and independence."[৭৯]

ভারতবর্ষের তৎকালীন গ্রামসমূহকে প্রাচীন গ্রিসের 'city state' এর সাথে তুলনা করা যেতে পারে। এসব গ্রাম ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ বা স্বয়ংশাসিত। ব্রিটিশদের আগ্রাসনের পূর্বে যারা এদেশ শাসন করেছে তারা গ্রাম নিয়ে কখনওভাবে নি কারণ সে সময়ের গ্রাম ছিল রাজ্য পরিচালনায় নির্লিপ্ত, ভূমিকাহীন। বিদেশীদের রাজ্য পরিচালনায় এসব গ্রাম থেকে কোন বাধাও কখনও আসে নি ফলে বিদেশী রাজা-বাদশাদেরও কোন মাথাব্যথা ছিল না এসব গ্রামের উপর। কিন্তু ব্রিটিশভারতে গ্রামগুলো ক্রমে ক্রমে রাজ্য পরিচালনা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। এর প্রথম কারণ ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থা, দ্বিতীয়ত, ইংরেজ শাসকদের গ্রামলুণ্ঠনে

তৎপরতা। দীর্ঘ দুশো বছর ধরে ইংরেজ শাসনব্যবস্থায় গ্রাম ভাঙতে শুরু করে। গ্রামের বিত্তবান মানুষ শহর অভিমুখী হয়ে পড়ে। এর একটি বড় কারণ নতুন ভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাব। ইংরেজদের আগে যারা এদেশ শাসন করেছে তারা সকলেই এদেশের অধিবাসী হয়ে এসেছিল। সুলতানী আমল থেকে মোঘল পর্যন্ত এই ধারা কার্যকর ছিল। তারা এদেশে বিবাহ ইত্যাদি করে এদেশের সংস্কৃতিকে গ্রহণ করেছিল। ফলে এদেশের গ্রামবাংলার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে তারা হস্তক্ষেপ করে নি। কিন্তু ব্রিটিশদের ক্ষেত্রে উলটোটা ঘটেছিল। ব্রিটিশদের লুণ্ঠনের কারণে গ্রাম হয়ে ওঠে শ্রীহীন। 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে পরিচিত দুর্ভিক্ষ গ্রামের অর্থনৈতিক কাঠামো একেবারে ভেঙে দিয়েছিল।

ইংরেজদের দ্বারা ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশের গ্রামসমূহ পরিপূর্ণভাবে লুণ্ঠিত হবার যে কাঠামো এবং অবয়ব নিয়ে দাঁড়িয়েছিল তার একটি বিবরণ পাওয়া যায় 'ইম্পেপরিয়াল গেজেটিয়ার' এ। ডক্টর. জন মাথায় এখানে উল্লেখ করেছেন:

> "The typical Indian village has its central residential site with and open space for corn an cattles hed. Stretching around this nucleus lie the village land consisting of a cultivated area and (very often) grounds for grazing and wood cutting. The arable lands have their several boundry marks and their little sub-divisions of earth ridges made for retaining rain or irrigation water. The inhabitants of such a village pass their life in the midst of these simple surroundings welded together in a little community with its own organisation and government which differ in character in the various types of villages, its body of detailed customary rules and its little staff of functionaries and traders."[৮০]

ড. জন মাথায় গ্রামের প্রশাসনিক কাঠামোকে নিম্নোক্তভাবে সাজিয়েছেন :-

(১) গ্রামপ্রধান (২) হিসাবরক্ষক (৩) চৌকিদার (৪) সীমানা নির্ধারক (৫) পুকুর ও পানিসম্পদের তত্ত্বাবধায়ক (৬) পুরোহিত/ইমাম (৭) বিদ্যালয় শিক্ষক (৮) গণক (৯) কামার (১০) কুমার (১১) ছুতোর (১২) ধোপা (১৩) নাপিত (১৪) গোয়ালিনী (১৫) ডাক্তার-কবিরাজ (১৬) নাচওয়ালী (১৭) কবি ও সঙ্গীতশিল্পী (বয়াতী/গায়েন)।

গ্রামপ্রধান ছিলেন গ্রামের সঠিক তত্ত্বাবধায়ক ও ব্যবস্থাপক। গ্রামের রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে দায়িত্বও ছিল তাঁর।

হিসাবরক্ষক গ্রামের চাষ-বাস ও উৎপাদনের হিসাব রক্ষা করতেন। এক্ষেত্রে ব্যবহৃত জমি-জমার কাগজপত্রের রুক্ষণাবেক্ষণও তাকে করতে হতো।

চৌকিদারকে গ্রামের চুরি-ডাকাতি, খুন-জখম ইত্যাদি অপরাধজণিত কার্যকলাপ সম্পর্কে খবর রাখতে হতো। অন্য গ্রাম হতে আগত গ্রামে ভ্রমণকারীদের নিরাপত্তা বিধান করতে হতো। গ্রামের শস্যাদি রক্ষণাবেক্ষণ এবং ফসলের পরিমাণ ও ওজন কাজে চাষিদেরকে সাহায্য করতে হতো।

সীমানা নির্ধারককে গ্রামের সীমানা নির্ধারণ করে দিতে হতো এবং এক্ষেত্রে কোন বিরোধ দেখা দিলে তার নিষ্পত্তি করতে হতো।

পুকুর ও পানিসম্পদ তত্ত্বাবধায়ক কৃষিকাজে পানি বা কলের ব্যবহার ও বিতরণ যথাযথ হচ্ছে কি-না তা রাখতে হতো।

পুরোহিত গ্রামে পূজা-অর্চনার জন্য দায়ী থাকতো এবং এ বিষয়ে তাকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হতো।

গণককে সাধারণত ধানের বপন, রোপনন ও পরবর্তীকালে শস্য কর্তনের সময় দিন-কাল-ক্ষণ গণনা করে তা নির্ধারণ করে দিতে হতো। কামার, কুমোর এবং ছুতোরকে কৃষিকাজ ও গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও ব্যবহার সামগ্রী প্রস্তুত করতে হতো।

গ্রামপ্রধান, হিসাবরক্ষক এবং চৌকিদার গ্রাম-ব্যবস্থাপনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হতো। এর মধ্যে গ্রামপ্রধানের পদ ছিল অত্যন্ত সম্মানের। গ্রামে যিনি সকলের মান্যবর এবং শ্রদ্ধার পাত্র বিবেচিত হতেন তাঁকেই এই পদ প্রদান করা হতো। তিনি কোন বেতন বা ভাতাদি পেতেন না এবং যতদিন জনগণের আস্থা তাঁর উপর থাকত ততদিন তিনি উক্ত পদে থাকতে পারতেন। গ্রামপ্রধান সংখ্যাগরিষ্ঠভাবে নির্বাচিত হতেন। এ পদের জন্য সকলের ঐকমত্যের প্রয়োজন হতো। গ্রামপ্রধানের দায়িত্ব ছিল বিশাল। ছোটোখাটো বিষয় তিনি নিজেই নিষ্পত্তি করতে পারতেন। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রে তাঁকে পঞ্চায়েতের মতামত অবশ্যই নিতে হতো। গ্রাম পরিচালনায় পঞ্চায়েতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাঁরা বেতনাদির পরিবর্তে ধান, চাল বা বস্তুসামগ্রী লাভ করতেন। গ্রামপ্রধান এবং পঞ্চায়েতগণই ছিলেন গ্রামের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী। সকল বিষয়ে তাদের সিদ্ধান্ত প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হতো। গ্রামপ্রধান ও পঞ্চায়েতদের সুশাসনে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গ্রামের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণ গ্রামভিত্তিক এই ব্যবস্থাপনাকে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। কার্ল মার্কস তাঁর 'দাস ক্যাপিটাল'-এ বলেন :

> "The small and extremely ancient Indian communities which still exist to some extent are based upon the communal ownership of the land, upon a direct linking of manual agriculture and handicraft and upon a fixed form of division of labour, which is adapted as a cut and dried scheme whenever new communities were found. They constitute self-sufficient productive

entities, the area of land upon which production is carried on ranging from a hundred to several thousand acres. The greater part of the products is produced for the satisfaction of the immediate needs of the community, not as commodities and production itself is therefore, independent of the division, of labour, which the exchange of commodities has brought about in Indian society as well ... in different regions of India we find different form of such communities. In the simplest form the land is commonly tilled and its produce is divided among the members of the community while every family carries on spinning, weaving, etc., as an accessory occupation. The simplicity of the productive organism in these self sufficient communities ... unlocks for us the mystery of the unchangeableness of the Asiatic Society which contrasts so strongly with the perpetual dissolutions and reconstructon of the Asiatic states, and the increasing changes of dynastics. The structure of the elements of the society remains unaffected by the storms of the political weather."[৮১]

কার্ল মার্কস প্রদত্ত এই বিস্তারিত বিবরণে তৎকালীন গ্রাম ও গ্রামসমাজ সম্পর্কে আমাদের একটি স্পষ্ট ধারণা জন্মে। কার্ল মার্কস গ্রামপরিষদের কর্মকাণ্ডের একটি বিশদ ব্যাখ্যাও এখানে প্রদান করেছেন। এখানে লক্ষণীয় যে, তৎকালীন ভারতবর্ষের গ্রামসমাজ যেভাবে স্বয়ংশাসিত ছিল এমনটি পৃথিবীর আর কোন দেশে লক্ষ করা যায় না। গ্রাম পরিচালনায় সততা ও নিষ্ঠাই ছিল এই স্বয়ংশাসনের ভিত্তি। প্রতিটি গ্রামীণ সম্প্রদায় এমনিভাবে স্বয়ংশাসিত ছিল যা বিস্ময়কর।

প্রতি গ্রামে বিভিন্ন সময়ে মেলা বসত পূজা-পার্বণ উপলক্ষে। এসব মেলায় কৃষি সামগ্রী, তাঁতবস্ত্র, পুতুলসহ নানা গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় বস্তু পাওয়া যেত। পালাগান, যাত্রাগান, বাউল, ধূয়ো, জারি, সারি, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া ইত্যাদি সংগীতানুষ্ঠান হতো।

অতীতের এই গ্রামপরিষদ বা গ্রাম সরকারের একটি বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পঞ্চায়েতী প্রথা। পঞ্চায়েত শব্দটির অর্থ পঞ্চজন সম্বলিত গ্রামসংগঠন। অবশ্য পঞ্চায়েত প্রথা বাস্তবে অনেক সময় 'পাঁচজনে' সীমাবদ্ধ থাকে নি। সমগ্র গ্রাম এই পঞ্চায়েতী প্রথায় পরিচালিত এবং শাসিত হতো। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, যখন আর্যসম্প্রদায় ভারতবর্ষ আক্রমণ করে তখন দেশে পঞ্চায়েত প্রথা চালু

ছিল। বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণ গ্রন্থে 'জনপদ' এ উল্লেখ আছে যা কয়েকটি গ্রামপরিষদের একটি জোট ব্যবস্থা বলে পরিগণিত হতো।

আলেকজান্ডারের আক্রমণকালে এদেশে পঞ্চায়েত প্রথার শাসনকার্য পরিচালিত হবার কথা জানা যায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে 'পঞ্চায়েত'-এর উল্লেখ আছে। মেগাস্থিনিসও এ সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন। সে সময় পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কর আদায়ের ব্যবস্থা ছিল। মামলা-মোকদ্দমা ইত্যাদিও নিষ্পত্তি হতো এই পঞ্চায়েত, এর শাসনব্যবস্থায়। পঞ্চায়েত সম্বলিত গ্রামপরিষদ কৃষি, সেচ, পুকুর খনন ও নদীসংস্কার, বিদ্যালয়, মন্দির ইত্যাদি কর্মকাণ্ড নিয়মিত পরিচালনা করত। এ ছাড়া শস্য ক্রয় ও তা শস্যাগারে সংরক্ষণ ইত্যাদি দায়িত্বও 'পঞ্চায়েত'দের পালন করতে হতো। সাধারণ শস্যাগারে রক্ষিত শস্যবীজ সংরক্ষণ এবং জরুরি সময়ের জন্য ব্যবহৃত হতো। পরবর্তীকালে এই শস্য ভালো দামে বিক্রয় হতো। ফলে গ্রামের চাষিরা লাভবান হতো। গ্রামের জমিজমা যথাযথ বিলিবণ্টন তদারকি এবং খাল-বিলের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ছিল পঞ্চায়েতের উপর। 'পঞ্চায়েত'-এর একটি বড় বৈশিষ্ট্য ছিল সমবায় প্রথায় সকল কার্যক্রম সম্পাদন। কৃষি, মৎস্য, সেচ, রাস্তানির্মাণ, পুকুরখনন সব কিছুতেই সমবায় প্রথা কার্যকর ছিল। বিভিন্ন কার্যের জন্য বিভিন্ন কমিটি গঠিত হতো এবং তারা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সব কাজ নিষ্পত্তি করত। 'পঞ্চায়েত' এর মধ্যে নারী সদস্য অন্তর্ভুক্ত হতো। কাউকে পঞ্চায়েত হতে হলে নিম্নলিখিত যোগ্যতা অনুসরণ করা হতো :

০১. গ্রামে তার করযোগ্য জমি থাকতে হবে।
০২. গ্রামে নিজের জমিতে স্থায়ী আবাস থাকতে হবে।
০৩. তার বয়স ৩৫ বছরের উর্ধ্বে এবং ৭০ বছরের নিচে হতে হবে।
০৪. শাস্ত্র এবং মন্ত্র ইত্যাদি সম্বন্ধে তার বিশেষ জ্ঞান থাকতে হবে।
০৫. ব্যবসা ইত্যাদি পরিচালনার ক্ষেত্রে তার জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়।
০৬. তাকে সৎ ও নিষ্ঠাবান হতে হবে।
০৭. তাকে ইতোপূর্বে ৩ বৎসর মেয়াদী কোন কমিটিতে সদস্য থাকা চলবে না।
০৮. কোন সদস্য তার নিজের ও পরিবার পরিজনদের সঠিক আয়-ব্যয় না থাকলে তাকে সদস্যপদ দেয়া যাবে না।
০৯. কোনভাবে কেউ কখনও নির্দিষ্ট বিষয়ে দোষে দোষী সাব্যস্ত হলে তাকে সদস্যপদ দেওয়া যাবে না।

'পঞ্চায়েত'দের সদস্যপদের জন্য এই যোগ্যতা নিঃসন্দেহে অভিনব এবং যুগান্তকারী। অতীতে মানুষের সততা ও নিষ্ঠার প্রতি এত বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় বিধায় উন্নয়নের কাজ ব্যাহত হয় নি। গ্রাম হয়েছে শান্তির আবাসভূমি। সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় অধিকাংশের মতামতের উপর গুরুত্ব না দিয়ে যা সঠিক

এবং ন্যায়সংগত তা মতবিনিময়ের মাধ্যমে গৃহীত হতো। বিশেষ বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় প্রায় সময় প্রধান ও বিজ্ঞদের সুচিন্তিত অভিমত বিবেচিত হতো। তবে সিদ্ধান্ত সব সময় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হতো। এ সম্পর্কে Sir Herbart Risley বলেন,

> "The people get together and they talk and eventually an opinion emerges from their talk which is the opinion of all of them. There is no majority for they are unanimous: there is no minority for the minority has been talked over and casts in their lot with the majority."[৮২]

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আজকে যাকে আমরা 'গণতন্ত্র' নামে অভিহিত করছি, অতীতে গ্রামবাসীদের নিকট এই পদ্ধতি অজানা ছিল না। সে সময়ে তারা প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পঞ্চায়েতী নির্বাচন সমাধা করত। অনেকক্ষেত্রে মনোনয়নও দেয়া হতো। সেক্ষেত্রে একটি তিন বৎসরের শিশুকে একটি পাত্রে রাখা নাম লেখা কাগজের মধ্য থেকে গ্রামবাসীর সামনে প্রয়োজনীয়সংখ্যক কাগজ তুলতে বলা হতো এবং যেসব নাম উঠত তারা পঞ্চায়েত হতে পারতেন। Kuryenson পঞ্চায়েতদের নির্বাচনের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন,

> "The village with its 12 streets was divided into thirty wards. Every one who lived in these wards wrote a name on a ticket. The tickets were first arranged in separate bundles representing the thirty wards. Each bundle bore the name of the ward to which it belonged. The bundles were then collected and then put into a pot and placed before the general inhabitants of both young and old in meeting assembled. The oldest priest among those present then took the pot and 'looking' upwards so as to be seen by all the people`` called one of the young boys standing closely" who does not know what is inside" to pick out one of the bundles. The tickets in this bundle we then removed to another pot. After it had been shuffled the boy took one ticket out of this bundle and handed it to an officer called the arbitrator who received it "on the palm of his hand with the five fingers open``. He read out the name and it was then shouted out by the priests present in the assembly.

> Thirty names were selected representing each of the wards."[৮৩]

অতীতে গ্রামোন্নয়নের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতের ভূমিকাই ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। গ্রামের কোন বিষয়ই তাদের নজর এড়াত না। গ্রামের আবর্জনা দূরীকরণ এবং স্বাস্থ্যসেবা ছিল তাদের অন্যতম প্রধান কাজ। নিষ্কাশন এবং সেচসুবিধার জন্য পুকুরখনন, পানীয়জলের জন্য নলকূপ এবং রাস্তাঘাট নির্মাণ ও তার ব্যবস্থাপনা পঞ্চায়েতদের গুরুত্বপূর্ণ কাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পুকুরখননের মাধ্যমে সেচসুবিধা প্রদানের এই ব্যবস্থা যা পঞ্চায়েতদের অবদান ছিল সে সম্পর্কে Kuryenson বলেন :

> "It is in the Madras Presidency, says the report on Indian irrigation 1901-03 that irrigation by small tanks and channels is most numerons where they have been estimated to Irrigate collectively an area equal to that irrigated by all the larger works which have been constructed by the British Government in that Presidency. All these tanks were excavated and maintained by the village people. This public works were generally financed from contributions by wealthy individuals to whom such works appealed as an attractive form of charitable endowment. There has also been a considerable amount of communal effort by the village as a whole in raising capital effort by the village as a whole in raising capital and this fact is another evidence of the corporate life of the village, which tragically enough disappeared with the advent of British rule."[৮৪]

Kuryenson প্রাকব্রিটিশ পর্বে বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনের উন্নয়নের কথা বলতে গিয়ে ব্রিটিশ শাসন আমলে যে এই উন্নয়নের ধারা ব্যাহত হয়েছে এবং তার জন্য যে ব্রিটিশরাই দায়ী একথা উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে হিন্দুযুগে গ্রামোন্নয়নের যে ধারাটি অনুসরণ করা হয়েছিল সুলতানী এবং মোঘল আমলে তা শুধু অব্যাহত থাকে নি বরং উন্নয়নের ফলে দেশ আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। পঞ্চায়েতী পদ্ধতিতে দেশে যে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল Kuryenson তার একটি বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

> "The dominant position of the Panchayats is traceable to a number of factors, Firstly the absence of factions or quarrels, such as disfigure the village life of the present

day. There were no party politics. Communalism was absent and competent leadership was available. There being no exodus of talents from villages to towns, such as which took place during later times. The standard of honesty was generally high and people were scrupulous to honour their words or pledges."[৮৫]

ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে প্রাচীন বাংলাদেশের পল্লীসমাজে ধনোৎপাদন ব্যবস্থা ও সামাজিক জীবন বিন্যাসের ফলে প্রাচীন বাঙালি জীবনের ভারসাম্য কখনও বিনষ্ট হয় নি। গ্রামীণজীবনে আনন্দোৎসব ছিল কিন্তু তা নগরের অসংযত কামনা-বাসনার পরিচয় বহন করে নি। সাধারণ গ্রামবাসীরা নগরের এসব অশ্লীল জীবনাচরণ কখনও পছন্দ করে নি এবং সেসব কিছু তারা বিষবৎ পরিত্যাগ করেছে। এসব গ্রামের পঞ্চায়েতগণের দৃষ্টি সদাজাগ্রত ছিল। এ প্রসঙ্গে কবি গোবর্ধনাচার্য বলেন :

ঋজুনা নিধেহিচরণৌ পরিহার সখি নিখিলনাগরাচাবম
ইহ ডাবিনীতি পল্লীপতিঃ কটাক্ষেহপি দশুয়াত ॥

ওগো সখি, ঋজুভাবে পদক্ষেপ করিয়া চল, নাগরাচার সব পরিত্যাগ কর। কটাক্ষপাত করিলেও গ্রামপতি এখানে ডাকিনি বলিয়া ভর্ৎসনা করে।[৮৬]

প্রাচীনকালে হিন্দু অধ্যুষিত বৃহত্তর পল্লীসমাজে জীবনের একটি সরল শান্ত এবং মহৎ চালচিত্র দেখা যায় কবি শভাঙ্কের একটি বিবরণে :

বিষয়পতির লুব্ধ ধেনুভিধাম পূতং
কাতচিদাভমতায়াং সীম্নি সীরা বহন্তি
শিথিলয়াত চ ভার্যা নাতি সপর্য্যাম
ইতি সুকৃতিমনেন ব্যঞ্জিতং নঃ ফলেন ॥

বিষয়পতি (অর্থাৎ স্থানীয় শাসনকর্তা) লোভহীন ধেনু দ্বারা গৃহ পবিত্র, নিজ-নিজ ক্ষেত্রে উপযুক্ত চাষ হয়, অতিথি পরিচর্যার গৃহিণী কখনও ক্লান্ত হয় না- এইসব ফল দ্বারা ইহার পুণ্য (বা সুকৃতি) আমাদের নিকট ব্যঞ্জিত হইয়াছে।[৮৭]

তখনকার পল্লীজীবন ছিল কৃষিনির্ভর এবং সমৃদ্ধ। এই প্রসঙ্গে নীহাররঞ্জন রায় 'সদুক্তিকণামৃত' থেকে একটি উদ্ধৃতির বঙ্গানুবাদ করেছেন :

"বর্ষায় প্রচুর জল পাইয়া ধান চমৎকার গজাইয়া উঠিয়াছে। গরুগুলি ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে, ইক্ষুর সমৃদ্ধিও দেখা যাইতেছে। অন্য কোন ভাবনা আর নাই। ঘরে গৃহিণী সারা দিনের শেষে প্রসাধনরতা। বাহিরে আকাশ হইতে জল ঝরিতেছে প্রচুর। গ্রাম্যযুবক সুখে নিদ্রা যাইতেছে।"[৮৮]

অন্য আর একটি বিবরণ :

"হেমন্তে কাটা শালী ধান্যে চাষির গৃহাঙ্গন স্তূপীকৃত; নবহাত শ্যামল যবাঙ্কুর ক্ষেত্রসীমা ছাড়িয়ে যেন বিস্তৃত; গরু, ষাঁড় ও ছাগলগুলি ঘরে ফিরিয়া আসিয়া নূতন খড় খাইয়া তৃপ্তি ও আনন্দ পাইতেছে; গ্রামগুলি ইক্ষুপেষণ যন্ত্রের শব্দে মুখর আর নূতন গুড়ের গন্ধে আমোদিত।"[৮৯]

উপরোক্ত বিবরণ থেকে তৎকালীন কৃষিজীবী সমাজের সমৃদ্ধির একটি পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এইটিই সব নয়। এখানেও দারিদ্র্য ছিল। মানুষ জীর্ণবস্ত্র ক্ষুধায় কাতর হয়ে দিন যাপন করত। 'সদুক্তিকর্ণামৃত'[৯০] গ্রন্থে তখনকার একটি দারিদ্র্যপীড়িত ছবি :

নিরানন্দে যেই শীর্ণ, পরিধানে জীর্ণবস্ত্র; ক্ষুধায় শিশুদের চক্ষু ও পেট কুক্ষিগত, আকুল হইয়া তাহারা খাদ্য প্রার্থনা করিতেছে। দীনা, দুস্থা গৃহিণী চক্ষুর জলে নয়ন ধৌত করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন, এক মণ তাম্বুলে যেন তাদের একশত দিন চলে।

সেন আমলে (দশম-দ্বাদশ শতক) বৌদ্ধ চর্চাগীতিতে তৎকালীন দারিদ্র্যপীড়িত একটি পরিবারের চিত্র পাওয়া যায়।

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী
হাঁড়িতে ভাত নাহি নিত্তি আবেশী
বেঙ্গ সংসার বড় হিল জা অ
দুহিলু দুধু কি বেন্টে যামা অ

টিলাতে আমার ঘর, প্রতিবেশী নাই। হাঁড়িতে ভাত নাই; নিত্যই ক্ষুধিত। (অথচ আমার) ব্যাঙ এর সংসার বাড়িয়াই চলিয়াছে। দোহা দুধ আবার বাঁটে যাইতেছে।

চর্যাগীতিকার এই পদ দেহতত্ত্বমূলক সাধনসংগীত। এই গানের ভাষা প্রতীকী ভাবনাজাত এবং দ্ব্যর্থবোধক। এ গানের যথার্থ অর্থ কেবলমাত্র দীক্ষিতজনের গোচরীভূত। এতৎসত্ত্বেও যে বিবরণ এখানে পাওয়া যায় তা নিঃসন্দেহে দারিদ্র্যপীড়িত। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। কৌটিল্য তৎকালীন রাষ্ট্র পরিচালনায় রাজাকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে মুখ্য ভূমিকা পালনকারী বলে উল্লেখ করেছেন এবং প্রতিটি কাজের জন্য একজন করে অধ্যক্ষ নিযুক্তির কথা উল্লেখ করেন। অর্থশাস্ত্রে গীতাধ্যক্ষ, কোষাধ্যক্ষ, পণ্যাধ্যক্ষ, পৌতাধ্যক্ষ, লক্ষণাধ্যক্ষ, সূত্রাধ্যক্ষ, শুল্কাধ্যক্ষ প্রভৃতি অনেক অধ্যক্ষের উল্লেখ আছে এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য নির্ধারিত করা ছিল।[৯১]

বাংলাদেশসহ ভারতবর্ষের অন্যান্য গ্রামে যে পঞ্চায়েতী প্রথা চালু ছিল, তা অনেকাংশে রাষ্ট্র পরিচালনার অনুরূপ ছিল। তখনকার গ্রাম স্বশাসিত ছিল এবং

পঞ্চায়েতী প্রথায় গ্রামের সকল কার্য সম্পাদন হওয়ার কারণে গ্রাম স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে।

প্রাচীন ভারতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমবায়-সঙ্ঘের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। বৌদ্ধগ্রন্থে চারটি সমবায়-সঙ্ঘের উল্লেখ আছে : কাষ্ঠশিল্পী, ধাতুশিল্পী, চর্মশিল্পী এবং চিত্রকর সমবায়সঙ্ঘ।[৯২]

প্রতিটি সঙ্ঘের একজন প্রধান থাকত এবং সঙ্ঘের নিজস্ব নিয়ম-কানুন ছিল। প্রাচীন অর্থনীতির বিকাশে মৌর্যদের এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। সমবায় প্রথা ছিল এই উন্নয়নের একটি বড় মাধ্যম।[৯৩] মৌর্যরাই সর্বপ্রথম একটি সুসংবদ্ধ রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলে যা মধ্যগাঙ্গেয় অঞ্চলে উৎপাদনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করত। এই সময় শিল্পী সমবায়সঙ্ঘের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। এই শিল্পী বা কারিগরবৃন্দ একজন প্রধানের অধীনে কাজ করত। এই যুগে সমবায়সঙ্ঘের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। গুপ্তযুগে সমবায় কর্মকাণ্ড আরো সুগঠিত হয়। গুপ্তযুগের স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতে ব্যবসায়ে অংশীদারি ও সমবায়সঙ্ঘের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। এ সকল সংস্থা শুধু যৌথ চুক্তি সম্পাদন, ব্যবসা পরিচালনা ও টাকা-কড়ি জমা নেওয়ার মত গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থনৈতিক কাজকর্মই করত না, তারা বিচারসংক্রান্ত ও প্রশাসনিক দায়িত্বও সম্পাদন করত। সমবায় ও রাষ্ট্রের মধ্যে একটি সুসম্পর্ক ছিল এবং প্রায় ক্ষেত্রে সমবায়সঙ্ঘগুলো স্বশাসিত ছিল।

এখানে উল্লেখ্য যে, মৌর্য ও গুপ্তযুগে কৃষিকাজ বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষিপ্রধান ভূমিকা পালন করেছিল। এ সময়ে ভূমিদান প্রথা তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এই ভূমিদানের ফলে কৃষকের উৎপাদনের উপর নির্ভর করে ভূস্বামী শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে এবং খ্রিস্টীয় চতুর্থ ও সপ্তম শতকের মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এমনিভাবে কৃষক ও ভূস্বামীর মধ্যে একটি সুস্পষ্ট বিভেদ ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। ভূস্বামীবৃন্দ জমির মালিক হিসেবে কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করত। ভূমিদান প্রথার ফলে দেশের কোন কোন অংশে জমির আত্তীকরণ শুরু হয়ে যায়। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় কৃষিঅর্থনীতির বিকাশ সাধিত হয়েছিল এবং স্থানীয় প্রয়োজন স্থানীয়ভাবে মেটানোর ব্যবস্থা ছিল।

এ সময় বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের জন্য বেতন অর্থমূল্যে দেওয়া হতো না, দ্রব্য প্রদান করা হতো।[৯৪] গ্রামীণ জীবনেও এ পদ্ধতি কার্যকর ছিল। ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের বিশেষত্ব ছিল ভূস্বামীদের পরিবর্তে ক্ষুদ্র কৃষকদের দ্বারা উৎপাদনের প্রচলন। জমি, বলদ ও কৃষির অন্যান্য উপকরণ কৃষকের নিজের অধিকারে ছিল।

গ্রামের উন্নয়নের জন্য সমবায়ভিত্তিক সেচব্যবস্থা চালু ছিল। গ্রামে পুকুর, খাল ইত্যাদি সমবায়ের মাধ্যমে খনন করা হতো। খালখনন ব্যক্তিবিশেষের সাধ্যের বাইরে ছিল বলে এসবের খনন হতো সমবায় বা যৌথউদ্যোগে। খালের মাধ্যমে বৃহৎ ভূখণ্ডে সেচের ব্যবস্থা ছিল। গ্রামীণসমাজ অথবা ক্ষুদ্ররাজনৈতিক

সংগঠনের যৌথউদ্যোগে খাল নির্মাণ করা হতো। খালে পানি সরবরাহ শুরু হলে স্বল্প ... বিস্তৃত ভূখণ্ডে সেচের ব্যবস্থা করা সম্ভব হতো। এর ফলে অনেক গ্রাম এর সুবিধা লাভ করতে পারত।[৯৫]

খাল ব্যতিরেকে জলাধার বা পুকুর, কূপ ইত্যাদির মাধ্যমেও সেচের কাজ করা হতো। নদীতে বাঁধ ও পাড় বেঁধে জলসেচের ব্যবস্থা ছিল।[৯৬]

কোন কোন খাল ইট ইত্যাদি দ্বারা বেঁধে জলাধার নির্মাণ করে সেচ সুবিধা দেওয়া হতো। তবে অধিকাংশ পাড় বাঁধানোর কাজ মাটি দিয়ে করা হতো। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে পানি উত্তোলন এবং কৃষিভূমিতে পানি সেচের ব্যাপারে নানা পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। বালতির মাধ্যমে কূপ ও ক্ষুদ্র জলাধার থেকে আশেপাশের জমিতে সেচ দেওয়া হতো। জলসেচে ইঞ্জিনের ব্যবহার সম্পর্কেও জানা যায়।[৯৭] সেচকার্য এবং সেচ সুবিধার জন্য জলকর ইত্যাদি সীতাধ্যক্ষ বা কৃষি অধ্যক্ষের দায়িত্বে ছিল। ব্যক্তিগত উদ্যোগেও জলাধার ও পুকুর নির্মাণ করা হতো। 'মনু স্মৃতিতে' আয়করের দ্বারা গৃহ, জলাশয়, ফলের বাগান ও কৃষিজমি দখল করার বিরুদ্ধে আইন প্রণয়নের উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় জলাশয় ইত্যাদিতে ব্যক্তিবিশেষের অধিকার ছিল। নদী ও খালের পাড় বাঁধানো ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানের কথাও জানা যায়।[৯৮]

বাংলাদেশ নদীমাতৃক হওয়ায় এখানে ব্যাপক সেচের ব্যবস্থা ছিল না। গঙ্গা (পদ্মা), ব্রহ্মপুত্র (যমুনা), মেঘনা প্রভৃতি নদী এবং তার উপনদী দ্বারা এসব অঞ্চলে কৃষিকাজ হতো। এ ছাড়া বর্ষা মৌসুমে প্রচুর বৃষ্টিপাতের জন্য পানির অভাব হতো না। কেবলমাত্র খরা মৌসুমে সেচের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিত।

সমকালীন ধর্মশাস্ত্রে জলাধার বিনষ্টকারীকে কঠিন দণ্ডদানের বিধান আছে বলে জানা যায়।[৯৯] মনুর বিধান অনুসারে কেউ দিঘির পাড় ভাঙলে তাকে জলে ডুবিয়ে মারা হতো অথবা শিরচ্ছেদ করা হতো। অপরাধী পাড় মেরামত করে দিলে তাকে উত্তম সাহসদণ্ড দেওয়া হতো।[১০০] এসবের উদ্দেশ্য ছিল যথাযথ ব্যবহারের জন্য পানি সংরক্ষণ ও জমিকে প্লাবনের হাত থেকে রক্ষা করা।

একাদশ শতকে বাংলাদেশ ও ভারতে কৃষি-ব্যবস্থার মন্ত্র-তন্ত্র ও জাদুবিশ্বাসের কথা জানা যায়। হলকর্ষণ ও বীজবপনের জন্য শুভ সময় নির্ধারণ ও অনুষ্ঠানাদির কথাও নানা গ্রন্থাদিতে উল্লেখ আছে। হঠাৎ ব্যাঙের ডাক, পিঁপড়ের ডিম মুখে নিয়ে গর্ত থেকে বেরিয়ে আসা, ময়ূর নাচ, সাপের গাছে ওঠা ইত্যাদি বর্ষণের সম্ভাবনা - এমন বিশ্বাস জনগণের মধ্যে ছিল।

একাদশ শতকে জ্যোতিষশাস্ত্রের ব্যাপক প্রসার ঘটে।[১০১] এ কারণে গ্রাম সমাজে গণকের প্রাধান্য ছিল এবং তা পঞ্চায়েতী ব্যবস্থায় 'গণক' গ্রাম ব্যবস্থাপনায় নীতি নির্ধারণে সহায়তা প্রদান করত।

দশম - দ্বাদশ শতকে সেন আমলে বর্ণবৈষম্য প্রকট আকারে দেখা দেয়। এ আমলে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সেন রাজাদের অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে যায়।

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা সংস্কৃত ভাষা বাদ দিয়ে বাংলা ভাষায় কথোপকথন ও সাহিত্য চর্চা করত বলে তাদেরকে নিগৃহীত করা হতো। চর্যাগীতিকায় তার নিদর্শন আছে।[১০৪]

ইতিহাস পাঠে জানা যায় হিন্দু সেন আমলে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা তেমন উন্নত ছিল না। মুদ্রা তৈরির প্রয়োজনীয় ধাতব পদার্থের অভাব ছিল। ঐতিহাসিক মিনহাজের মতে - মুসলমান বিজেতারা এদেশ দখলের সময় কোন রকম স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা দেখতে পান নি। ক্রয়বিক্রয়ে কড়ি ব্যবহার হতো।[১০৫] মুসলমান শাসনামলে স্বর্ণ ও রৌপ্যের প্রচলন ঘটে। সুলতানী ও মোঘল আমলে গ্রামাঞ্চলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় ছিল। এ সময় সমগ্র দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছিল এবং গ্রামাঞ্চল স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বনির্ভর ছিল।

সুলতানী ও মুঘল আমলে গ্রাম বাংলা ঐশ্বর্যে পূর্ণ ছিল। শ্রীহট্ট থেকে নৌকাযোগে ভ্রমণের সময় মেঘনা নদীর উভয় পার্শ্বে শস্যসম্ভার দেখে জনৈক পরিব্রাজক লেখেন :

> "নদীপথে মিসরের নীলনদের মতো ডানে ও বামে ছিল অসংখ্য চাকা, উদ্যানরাজি এবং গ্রাম। ... আমরা গ্রাম ও উদ্যানরাজির মধ্য দিয়ে পনেরো দিন নৌকাপথে চলেছি, আমাদের মনে হয়েছে যেন আমরা একটি বাজারের মধ্য দিয়ে চলেছি।"[১০৬]

তৎকালীন বাংলাদেশ সম্পর্কে একজন চৈনিক দূত মন্তব্য করেন :

> "সপ্তস্বর্গ পৃথিবীর স্বর্ণভাণ্ডার যেন এ রাজ্যে ছড়িয়ে দিয়েছে। এখানকার লোকের সম্পদ এবং চরিত্রের সততা বোধ হয় পালেমবাগ অতিক্রম করে যায় এবং তা একেবারে 'জাভা'র সমান।"[১০৭]

বাংলাদেশ সম্পর্কে চৈনিক দূত বলেন :

> "এর ভূমি খুবই উর্বর এবং উৎপন্ন দ্রব্যাদি প্রচুর। কেননা, প্রত্যেক বছর তারা দুটো ফসল পায়। তারা তাদের জমির আগাছা পরিষ্কার করে না। তারা নারী পুরুষ সকলে মাঠে কাজ করে এবং ঋতু অনুসারে তাতে বস্ত্র বয়ন করে থাকে (ফসলাদির সময় ছাড়া অন্য সময়ের)।"[১০৮]

আবুল ফজলের মতে বাংলার মাটি উর্বর ছিল এবং তাতে বছরে তিনটি ফসল হতো।[১০৯] বাংলাদেশে প্রচুর সুতিবস্ত্র তৈরি হতো। বিশেষ করে মসলিন সুতিবস্ত্র পৃথিবীতে চমক সৃষ্টি করেছিল। এ প্রসঙ্গে আমীর খসরু বলেন :

> "এ বস্ত্র এত বেশি সূক্ষ্ম ও মিহিন ছিল যে, এর একশত গজ কাপড় মাথায় জড়ানোর পরেও তার ভেতর দিয়ে মাথার চুল দেখা যেত।"[১১০]

ব্রিটিশভারতে শ্রীহীন গ্রাম ও তার চালচিত্র :

মুঘল আমলের শেষে এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমল শুরু হবার পর ভারতবর্ষের বিভিন্ন গ্রাম ও বাংলাদেশের এই চেহারা আর থাকে নি। ইংরেজদের লুণ্ঠনের ফলে গ্রামগুলো শ্রীহীন হয়ে পড়েছিল। প্রথম দিকে এদেশের উন্নয়নে ইংরেজদের কোন মাথাব্যথা ছিল না। অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে যাওয়ায় কৃষকশ্রেণী দারিদ্র্য-পীড়িত হয়ে পড়ল। বিত্তবান হিন্দু ও মুসলমান গ্রাম ছেড়ে নগরে ও শহরে চলে আসল। ফলে গ্রামসমূহ নানা দুরবস্থার সম্মুখীন হয়ে পড়ল। ১৯৫০ সালে দক্ষিণ ভারতের একটি গ্রাম সম্পর্কে জনৈক বীরণা পিল্লাই যে বিবরণ দিয়েছেন তা নিম্নরূপ :

> "The population of the village is in the vicinity of four hundred. The people live mostly in dilapidated huts. These huts are absolutely unfit for human habitation, and they number about sixty. There are a few tiled houses. Although some of them have tin roofs, most of them have only thatched roofs, with holes here and there. These huts look very ancient. A good shower would make these wretched inhabitants homeless, as the roofs are leaky and the huts could be easily flooded by the street water... Children seem to be underfed. The grown-ups bear the marks of starvation and fatigue on their bodies. ... .. Both the children and the grown-up people are most wretchedly clothed. Particularly the children are practically naked. Most of the older people are half-naked and they do not have a change of clothes. It is a problem to get their clothes washed, as they have not got another set. Their garments are dirty and their bodies are exposed to the sun and the weather. There are, of course, exceptions.
>
> ... Malaria is quite common among the people ... There is no trained doctor in the village or in any nearby village.
>
> ... The village has no school. Just a few months ago, a pre-basic school was organised to engage the pre-school children of the village ... there is no provision for adult education. Some village children go to a nearby village for schooling. There is hardly a

matriculate in the whole village. There is no impetus for learning.

Excepting agriculture, the village has no other industry. A bicycle can be seen once or twice in a whole week. No modern machinery of any description has so far found its way into this village ... Education does not seen to be a primary concern of the people. Industrialism has not found its way into the village life.

... Recreational facilities are altogether absent in this village. In this respect, this village does not differ from other villages. ... The village festivals come only once or twice a year.

...To start with, the British established a centralised system of administration and this proved the deathknell to village autonomy. The story of the decline and fall of the Mughal empire might have told them of the necessity for a strong centralised administation with little or no initiative for the component parts. The Britishers believed obviously in the efficacy of direct rule and never wanted any agency between them and the masses. Village autonomy with the Panchayats as their symbol, therefore, passed by the board and villages were henceforth made to look to the top for everything. R.C. Dutt observes, "One of the saddest results of the British rule in India is the effacement of that system of self government which was developed earliest and preserved longest in India among all the countries of the earth." Allied to this is the fact that the motives behind the British administration were mainly commercial and hence they were concerned chiefly with capitalizing their political position rather then promoting the welfare of the masses. "It is the Indian poor— the Indian peasant, the patient humble silent millions, the 80 percent who subsist by agriculture, who know very little of politics but who profit or suffer by their results ... "

এই বিবরণ থেকে জানা যায় ব্রিটিশ শাসনই গ্রাম বাংলার শ্রীহীন হওয়ার মূলে দায়ী। তাদের একনায়কত্ব এবং প্রশাসনের স্বার্থে আবহমান কাল ধরে

গ্রামবাংলার সুশাসনকে তারা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছে। তারা বুঝেছিল এদেশে দীর্ঘকাল তাদের শাসনকে টিকিয়ে রাখতে গেলে প্রশাসনকে কেন্দ্রীভূত করতে হবে। বলা যেতে পারে এই ব্যবস্থার কারণেই ব্রিটিশরা এদেশে দুশো বৎসর ধরে শাসন ও শোষণ করে গেছে। তারা দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করেছে দেশের জনগণকে অভাবী রাখার জন্য। কারণ, অভাবের ফলে জনগণ কখনও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না এবং এর সাথে তারা গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত তাদের শাসনকে সুদৃঢ় করেছে তাঁবেদারি ব্যক্তিদের দ্বারা। গ্রামবাংলার মূল উৎপাদনের ক্ষেত্র ছিল কৃষি। ব্রিটিশ আমলে বাংলাদেশের শতকরা ৯০ জন কৃষিনির্ভরশীল ছিল। কিন্তু এখানে বৃষ্টিপাত হলেও কখনও কখনও খরা বা অনাবৃষ্টি ফসলকে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করত। এর ফলে গ্রাম পঞ্চায়েত ভারতবর্ষের সকল গ্রামেই খালখনন, পুকুর নির্মাণ ইত্যাদির মাধ্যমে কৃষককে সেচ সুবিধা প্রদান করত। কিন্তু ইংরেজ শাসন আমলে পঞ্চায়েতী প্রথা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং কৃষকেরা সেচ-সুবিধা লাভে বঞ্চিত থাকে। কেবলমাত্র বৃষ্টির উপর নির্ভর করে যে ফসল উৎপাদন করা হতো তা এক বৎসর ভালো হলেও পরবর্তী বৎসর খারাপ এবং ভালোর মাঝামাঝি থাকত। এর ফলে কৃষকের ফসল আশানুরূপ হতো না।

ইতোমধ্যে জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং উত্তরাধিকার আইনের কারণে একটি জমি নানাভাবে খণ্ডবিখণ্ড হয়েছে। অনেক সময় যৌথ পরিবার ভেঙে যাওয়ায় জমি খণ্ডিত হয়েছে। এর ফলে পঞ্চায়েতদের মাধ্যমে সমবায় প্রথায় যে চাষাবাদ হতো তা আর সম্ভব হয় নি। পঞ্চায়েতী আমলে কোন কোন অঞ্চলে পশুপালনের জন্য চারণভূমি নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ আমলে পশু সম্পদ রক্ষার জন্য তেমন কোন ব্যবস্থা ছিল না। গ্রামাঞ্চলে ব্রিটিশ সরকার শিল্প বা কলকারখানা স্থাপন করে নি। অতীতে গ্রামাঞ্চলে কৃষিজাত শিল্পপণ্য তৈরি হতো এবং সেসব গ্রামের প্রয়োজন মেটাত। কিন্তু কিছু কিছু প্রধান নগর ও শহরে শিল্প ও কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় দেশীয় কৃষিজাত শিল্পদ্রব্য প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারে নি। এ ছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক পীড়নের কারণে গ্রামে গ্রামে তেমন কোন উৎসব হতো না। শ্রমজীবী মানুষ শহরাঞ্চলে মিল কারখানা ইত্যাদি শ্রম সুবিধা লাভের জন্য গ্রাম ত্যাগ করেছে ফলে গ্রামের অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়েছে। কৃষকেরা একদিকে জমিদারের খাজনা ও ফসলের যথাযথ দাম না পাওয়ায় ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। ব্রিটিশ সরকার সে সময় একর প্রতি মাত্র ১ (এক) আনা কৃষিখাতে ব্যয় করেছে এবং সে তুলনায় যুক্তরাজ্যে কৃষিখাতে ব্যয় করা হতো একর প্রতি ১১-শিলিং এর বেশি। ১৮৯০ সাল থেকে ভারতবর্ষে কৃষকের ঋণ ক্রমাগত বেড়ে চলেছিল। ১৮৯১ সালে পল্লীঋণের পরিমাণ ছিল ১০০ কোটি টাকা। ১৯৩৫ সালে তা বেড়ে হয়েছিল ৯০০ কোটি টাকা। এজন্যে সে সময় একটি প্রবাদ ছিল : ভারতবর্ষে কৃষকেরা ঋণ মাথায় নিয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং সারাজীবন এই ঋণের বোঝা তার সঙ্গে থাকে এবং মৃত্যুর সময় এই ঋণের বোঝা আরও দুই গুণ বৃদ্ধি পেয়ে তার শেষ নিশ্বাসের সাথে যুক্ত হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে Kuryenson বলেন :

"The impecunosity of the average villager has its repercussion in every sphere of life. He is unable to meet the cost of a balanced diet. A witness observed before the Royal Commission on Indian Agriculture (1926) that more people died in this country of malnutrition than by famine or epidemics. Only 39 percent of the total population are well nourished. 41 percent under-naurished and 20 percent ill-nourished. The daily energy requirment of an adult without manual labour is 2400 calories. Those with moderate work require 2500-2600 and those with heavy manual labour 2800-3000. But the usual diet of an average Indian is only 1750 calories. It is an anknowledged fact that public health and economic conditions act and react on each other."

উপরোক্ত বিবরণ থেকে এদেশের মানুষের এক নিদারুণ অসহায়ত্বের চিত্র ভেসে আসে। অপুষ্টিজনিত কারণে মৃত্যুর হার ছিল সর্বাধিক। মহাজনের ঋণের বোঝার সঙ্গে নানাধরনের ঋণ এবং তার সুদ চক্রবৃদ্ধিহারে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রাখত একজন দরিদ্র কৃষককে। এরপর ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি রোগে মৃত্যু ছাড়া তার আর কোন পথ থাকত না।

ব্রিটিশভারতে গ্রামের অবস্থা ছিল চরম দুর্দশাগ্রস্ত। কোন গ্রামেই, বলতে কি স্কুল কলেজ ছিল না। শহর এবং নগরে দু-একটি সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকলেও গ্রামে কোন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বা মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। ফলে গ্রামের অধিকাংশ মানুষই ছিল অশিক্ষিত। শিক্ষার অভাবে কোন দক্ষ শ্রমিক গড়ে ওঠে নি। অতীতে গ্রামবাংলায় যে কয়েকটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা বিত্তবানদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে। কোন গ্রামে তেমন কোন রাস্তা ছিল না। বর্ষার সময় গ্রামে যাওয়া অনেকটা অসম্ভব ছিল। ফলে শহর এবং নগরের সঙ্গে কোন যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হতো না।

প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ বা ইংরেজরা এদেশ দখল করেছিল তাদের বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের জন্য। তারা যেমন এদেশ থেকে সম্পদ লুট করে নিয়ে গেছে তেমনি তাদের শিল্প সংস্কৃতি ইত্যাদি এদেশের জনগণের মধ্যে প্রচলন রয়েছে। এদেশের উন্নয়নের জন্য তাদের কোন আগ্রহ ছিল না এবং এদেশের গ্রামাঞ্চলে যে পঞ্চায়েতী প্রথা ছিল তা তারা বিলুপ্ত করেছিল তাদের নিজেদের স্বার্থের জন্য। কিন্তু তদস্থলে নূতন কোন পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া তারা স্থাপন করে নি বা করতে চায় নি। ব্রিটিশভারতে গ্রামের যে অবস্থা ছিল সে সম্বন্ধে মন্তব্য প্রসঙ্গে ড. এন.এন. গাঙ্গুলী বলেন :

"Poverty, low standard of living, bad sanitation, malnutrition and transport, a medieval social structure, these are some of the outstanding features of the Indian countryside."[১১৩]

বাংলাদেশের গ্রাম সম্পর্কে এই বিবরণ সত্য। ব্রিটিশ শাসনে শহর ও নগরের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু গ্রামসমূহ ধ্বংস হয়েছে। এই দৈন্যদশার মর্মমূলে ব্রিটিশ প্রশাসন তদানীন্তন ব্রিটিশভারতে যে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল তার একটি তালিকা দিলে এদেশের দুরবস্থার একটি চিত্র পাওয়া যাবে।

১৮০০ - ১৮২৫ সাল পর্যন্ত দুর্ভিক্ষের সংখ্যা পাঁচ

১৮২৫ - ১৮৫০ সাল অবধি দুর্ভিক্ষের সংখ্যা দুই

১৮৫০ - ১৮৭৫ সাল অবধি দুর্ভিক্ষের সংখ্যা ছয়

১৮৭৫ - ১৯০০ সাল অবধি দুর্ভিক্ষের সংখ্যা আঠারো

এসব দুর্ভিক্ষ খরা ও বন্যায় ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার জন্য হলেও ব্রিটিশ আমলাদের ফসল লুণ্ঠন এবং তা থেকে চড়াদাম আদায় ইত্যাদি অনেকাংশে দায়ী। তবে এখানে একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, তৎকালীন গ্রামসমূহের প্রতি সরকার আদৌ মনোযোগী ছিল না। অতীতে গ্রাম ও দেশের উন্নয়নের জন্য কৃষকদের ফসল উৎপাদনের জন্য যে সেচ সুবিধার ব্যবস্থা ছিল ব্রিটিশভারতে তা হয়নি। নদ-নদী, খাল-বিল মজে গেছে, তা সংস্কার করা হয় নি। পানি সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা ছিল না। 'পঞ্চায়েত' প্রথার পরিবর্তে যে ইউনিয়ন পরিষদ গঠন করা হয়েছিল তা দেশের উন্নয়নের পরিবর্তে ব্রিটিশ সরকারের শাসনব্যবস্থা অটুট রাখার জন্য কাজ করেছে। তবে একথা সত্য যে, ইংরেজ শাসনামলে ইংরেজি শিক্ষার দ্রুত প্রসার হওয়ায় পাশ্চাত্য জগতের সঙ্গে এদেশের সম্পর্ক ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রের সঙ্গে এদেশের রাজনীতিবিদদের একটি সম্যক পরিচয় ঘটে। পাশ্চাত্যের প্রভাবে এদেশের মানুষের মনন ও চেতনায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। একটি আধুনিক মানসিকতা ক্রমান্বয়ে বিকাশলাভ করে।

পূর্ববাংলায় ঠাকুর এস্টেটের জমিদারি ও রবীন্দ্রনাথ

অতীতে বাংলাদেশের সম্পদ ও প্রাচুর্যের কাহিনী রবীন্দ্রনাথের অজানা ছিল না। পুকুরভরা মাছ গোলাভরা ধান ইত্যাদি নিয়ে যে সোনার বাংলা আমাদের কবিতা ও গানে রূপ নিয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ যে সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন তার সমকালে ইংরেজ আমলে তা মৃতপ্রায় একটি দেশে পরিণত হয়েছিল। অতীতে ভূমি ব্যবস্থায় কৃষকেরা জমির মালিক ছিল। এ সময় জমির মালিকানা জমিদার শ্রেণী বা রাষ্ট্রের হাতে সরাসরি ছিল না। কিন্তু মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর এ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। অতঃপর কোম্পানির শাসনামলে প্রথমে একসালা, পরে পাঁচসালা এবং দশসালা বন্দোবস্তের মাধ্যমে ভূমিরাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। এ সময় ইংরেজ শাসকেরা উৎপাদিতব্যের পরিবর্তে কেবলমাত্র মুদ্রায় খাজনা দানের জন্য কৃষকদেরকে বাধ্য করে। কৃষকেরা ফসল বিক্রি করে খাজনা দিত। সে সময় কোম্পানির ইংরেজ আমলারা নগদ অর্থে ফসল কিনে অবাধ ধনসম্পদের মালিক হয়ে পড়ে। তারা চালের ব্যবসা করে প্রচুর মুনাফা অর্জন করে। ইতিহাস পাঠে জানা যায় ১৭৬৯ সালে ফসল ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এসব মুনাফালোভী আমলা ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশের সব অঞ্চল থেকে ফসল কিনে গুদামজাত করে এবং ১৭৭০ সালে এই ফসল চাল হিসেবে কয়েকগুণ বেশি দামে বিক্রি করে। ফলে খাজনা আদায়ে সর্বস্ব হারানো কৃষকদের পক্ষে উচ্চমূল্যে এ চাল কেনা সম্ভব হয় নি। ১৭৭০ সালে বাংলাদেশের সব অঞ্চলে চরম খাদ্যাভাব দেখা দেয়। অতঃপর এ অবস্থা ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে চরম আকারে পৌঁছে গেলে গোটা দেশে দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়। ইতিহাসে একে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বলা হয়।[১১৪] ৮ এই দুর্ভিক্ষের ফলে কমপক্ষে ১ (এক) কোটি লোক মারা যায়। কিন্তু এখানেই শেষ ছিল না। দুর্ভিক্ষের পরবর্তী বছর খাজনা শতকরা দশভাগ বৃদ্ধি করা হয়।[১১৫] দুর্ভিক্ষের পূর্বে ১৭৬৮ সালে বাংলাদেশের রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১, ৫২, ০৪, ৮৫৬ টাকা। দুর্ভিক্ষের পরবর্তী বছরে মোট রাজস্ব বৃদ্ধি পায় ১, ৫৭, ২৬, ৫৭৬ টাকা। উইলিয়াম হান্টার এই দুর্ভিক্ষের বিবরণ দিয়েছেন তার গ্রন্থে।[১১৬] এ সময় বাংলাদেশের মোট অধিবাসীদের ৩ (তিন) ভাগের ১ (এক) ভাগ মৃত্যুবরণ করে।[১১৭]

অতঃপর ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নামে স্থায়ী জমিদারি ব্যবস্থার প্রচলন করেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে কৃষকদের কাছ

থেকে আদায়কৃত খাজনার নয় দশমাংশ জমিদারেরা প্রতিবৎসর কোম্পানিকে দেখিয়ে জমিদারি চিরস্থায়িভাবে ভোগ করার সুযোগ লাভ করে। কিন্তু খাজনা কোম্পানিকে যথাসময়ে না দিতে পারলে জমিদারি বাতিল হয়ে যেত। এর ফলে অনেক নতুন জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিল। এসবের মধ্যে ছিল মধ্যস্বত্বভোগী আর এক শ্রেণী যারা জমিদারের সহায়ক ভূমিকা পালন করত। জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের অত্যাচারে বাংলাদেশের কৃষক শ্রেণী নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল। এমনি অবস্থার মধ্যে নীলকর নামক এক শ্রেণীর বিদেশী বণিক কৃষকদের নীল চাষে বাধ্য করে। কৃষকরা নীল চাষে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নীলকরদের অত্যাচারে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভেঙে পড়ে।

দ্বারকানাথ ঠাকুর ও ঠাকুর-এস্টেট

রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরদা প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর কুষ্টিয়া, পাবনা ও রাজশাহী অঞ্চলে জমিদারি ক্রয় করেন। এ সময় এতদঞ্চলে নীল চাষ হতো। দ্বারকানাথ ঠাকুরের জমিদারিতে সাবেক নদীয়া (বর্তমানে কুষ্টিয়া) জেলার বিরাহিমপুর পরগনা (সদর শিলাইদহ), পাবনা জেলার সাজাদপুর পরগনা (সদর সাজাদপুর), রাজশাহী জেলার কালীগ্রাম পরগনা (সদর পতিসর) এবং ওড়িশ্যার কটক জেলার পাণ্ডুয়া বালিয়া প্রহরাজপুর শরগড়া ইত্যাদি। এ ছাড়াও বাংলাদেশ ও পশ্চিমবাংলার আরও কিছু অঞ্চল দ্বারকানাথ ঠাকুরের জমিদারিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। দ্বারকানাথ ঠাকুরের জমিদারি সম্পদ সম্পর্কে তাঁর পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন,

> "আমার পিতা ১৭৬৩ শকের পৌষ মাসে (৯ই জানুয়ারি, ১৮৪২) য়ুরোপে প্রথম যান। তখন তাঁহার হাতে হুগলী, পাবনা, রাজশাহী, কটক, মেদিনীপুর, রঙ্গপুর, ত্রিপুরা প্রভৃতি জেলার বৃহৎ বৃহৎ জমিদারি এবং নীলের কুঠি, সার, চিনি, চা প্রভৃতি বাণিজ্যের বিস্তৃত ব্যাপার। ইহার সঙ্গে আবার রাণীগঞ্জে কয়লার খনির কাজও চলিতেছে। তখন আমাদের সম্পদের মধ্যাহ্ন সময়। তাঁহার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতে এই সকল বৃহৎ কার্যের ভার আমাদের হাতে পড়িলে আমরা তাহা রক্ষা করিতে পারিব না। আমাদের হাতে পড়িয়া যদি বাণিজ্য ব্যবসায় -কার্যের পতন হয়, তবে স্বোপার্জিত যে সকল বৃহৎ বৃহৎ জমিদারি আছে তাহাও তাহার সঙ্গে বিলুপ্ত হইবে, এবং পৈতৃক বিষয় বিরাহিমপুর ও কটকের জমিদারি থাকিবে না। তাঁহার বাণিজ্য-ব্যাপারের ক্ষতিতে আমরা যে পূর্বপুরুষদিগের বিষয় হইতেও বঞ্চিত হইব, এইটি তাহার মনে অতিশয় চিন্তার বিষয় ছিল। অতএব, য়ুরোপ যাইবার পূর্বে, ১৭৬২ শকে (১৮৪০ সালের ২০শে আগস্ট) আমাদের পৈতৃক বিষয় বিরাহিমপুর ও কটকের জমিদারির সঙ্গে তাহার স্বোপার্জিত ডিহি সাজাদপুর ও পরগনা কালীগ্রাম একত্র করিয়া, এই চারিটি সম্পত্তির ওপরে একটি ট্রাস্ট-ডীড লিখিয়া

তিনজন ট্রাস্টি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ঐ সমস্তের অধিকারী তাঁহারাই রহিলেন, আমরা কেবল তাহার উপস্বত্ব-ভোগী রহিলাম। তাঁহার এই কার্যে আমাদের প্রতি তাঁহার স্নেহ ও সূক্ষ্ম ভবিষ্যৎ দৃষ্টি, উভয়ই প্রকাশ পাইয়াছে।"[১১৮]

এই বিবরণ থেকে জানা যায় যে, দ্বারকানাথ ঠাকুর অত্যন্ত সচেতন ব্যক্তি ছিলেন। এই প্রথম ১২৯১ বঙ্গাব্দে (১৮৯৪ সাল) চাষিদের নিকট থেকে পাওয়া ঠাকুর এস্টেটের খাজনার উল্লেখ করা যায়।[১১৯]

মৌজে শিলাইদহসহ বিরাহিমপুর পরগনার আদি ইতিহাস তেমন পাওয়া যায় না। বিভিন্ন তথ্য থেকে যা জানা যায় তাহলো বিরাহিমপুর পরগনার জমিদারি দ্বারকানাথ ঠাকুরের নানা সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এসব সমস্যার মধ্যে ঠাকুর এস্টেট বা দ্বারকানাথ ঠাকুরের ঋণশোধের বিষয় প্রাধান্য পেয়েছিল।[১২০]

দ্বারকানাথ ঠাকুরের পরে দেবেন্দ্রনাথের আমলে জমিদারির প্রসার না ঘটলেও জমিদারি ব্যবস্থাপনা অনেকাংশে সুসংহত হয়েছিল। তাঁর সময়ে দেবেন্দ্রনাথ জমিদারির ভাগ বাঁটোয়ারা করে দেন। ১৮৯৯ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর তিনি যে উইল করে দেন তা থেকে জানা যায় যে, তিনি তার ৩য় পুত্র সোমেন্দ্রনাথকে ওড়িশ্যার সম্পত্তি প্রদান করেন।[১২১]

দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ একত্রে পান নদীয়ার বিরাহিমপুর ও রাজশাহীর কালীগ্রাম। অতঃপর কনিষ্ঠ ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথের স্ত্রী ত্রিপুরা সুন্দরী দেবীর জন্য মাসিক বরাদ্দ হয় ১০০০ টাকা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিঃসন্তান ছিলেন বিধায় তাঁর মাসহারা ছিল ১২৫০ টাকা। সোমেন্দ্রনাথ, বায়ুরোগগ্রস্ত তিনি পেলেন মাসিক ২০০ টাকা। বীরেন্দ্রনাথ উন্মাদ, তার জন্য বরাদ্দ ছিল মাসিক ১০০ টাকা। তাঁর স্ত্রী প্রফুল্লময়ী দেবীর জন্য ছিল মাসিক ১০০ টাকা। বীরেন্দ্রনাথের পুত্রবধূ ও বলেন্দ্রনাথের স্ত্রী সাধনা দেবীর জন্য বরাদ্দ ছিল মাসিক ১০০ টাকা। দেবেন্দ্রনাথের অন্য দুই পুত্র পুণ্যেন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ শৈশবেই মারা যান। কন্যাদের জন্য তাদের জীবিতকাল পর্যন্ত মাসিক বরাদ্দ ছিল সৌদামিনী দেবী ২৫টাকা, শরৎকুমারী দেবী ২০০টাকা, স্বর্ণকুমারী দেবী ৮৭৷৷· এবং বর্ণকুমারী দেবী ৮৭ ৷৷·। পরবর্তীকালে স্বর্ণকুমারী ও বর্ণকুমারীর জন্য বরাদ্দ বাড়িয়ে ১০০টাকা করে দেয়া হয়। কন্যা সুকুমারী অল্প বয়সে মারা যান। সৌদামিনী দেবী পিতৃগৃহে থাকতেন বিধায় তার স্বামী সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্য বরাদ্দ ছিল মাসিক ৫০ টাকা। এ ছাড়া দেবেন্দ্রনাথের বড়ো নাতি জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ পেতেন ৫০০টাকা। দেবেন্দ্রনাথ জমিদারির আয় থেকে ব্রাহ্মসমাজকে দিতেন মাসিক ২০০ টাকা, শান্তিনিকেতন ট্রাস্টকে মাসিক ৩০০ টাকা এবং দেব সেবার জন্য সেবায়েত খরচ বার্ষিক ২০০০টাকা। সব মিলিয়ে বার্ষিক ৫২, ৪০০টাকা খরচ হতো।

এসব টাকার জন্য দায়বদ্ধ ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ।

১৯১২ সালে দ্বিজেন্দ্রনাথ তার নিজস্ব অংশ থেকে এক-তৃতীয়াংশ ৯৯৯ বছরের ইজারা বাট্টা দেন সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথকে। জমিদারিতে লাভ-লোকসান হোক আর নাই হোক প্রতিবছর দ্বিজেন্দ্রনাথকে এ কারণে ৪৫হাজার টাকা দিতে হতো সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথকে। সত্যেন্দ্রনাথের পর রবীন্দ্রনাথকে এই টাকার জন্য দায়বদ্ধ থাকতে হয়। এসবে খরচ হতো মোট ৯৭, ৪০০টাকা। পারিবারিক ব্যয়, জোড়াসাঁকো বাড়ির ব্যয় এবং জমিদারি পরিচালনা ব্যয়ের জন্য রবীন্দ্রনাথকে বছরে প্রায় তিন লক্ষ টাকা খরচ করতে হতো। এ সময়ে সরকারকে তিনটি পরগনা ও ওড়িশ্যার জন্য খাজনা দিতে হতো ৫০, ০০০ টাকারও অধিক। দেবেন্দ্রনাথের পর কিছুদিন জমিদারি দেখেন দ্বিজেন্দ্রনাথ, বড়ো জামাই সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথের বড় ছেলে দ্বিপেন্দ্রনাথ ও মেজো ছেলে অরুনেন্দ্রাথ, সারদাপ্রসাদের ছেলে সত্যপ্রসাদ এবং সর্বশেষে রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথ যখন জমিদারির দায়িত্বভার পেলেন তখন তাঁর বয়স ২৮/২৯ বৎসর। সময়কাল ছিল ১৮৮৯/৯০। এ সময়টায় প্রথম পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এস্টেটের এই এজমালি জমিদারি পর্যবেক্ষক হিসেবে থেকেছেন। পুরো দায়িত্ব নিয়েছেন ১৮৯৬ সালের ৮ই আগস্ট। এ সময় পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে পাওয়ার অব এ্যাটর্নি দান করেন। এই এজমালি সম্পত্তি বেশ কয়েক বৎসর রবীন্দ্রনাথ স্বহস্তে পরিচালনা করেন। জমিদারি পরিচালনা হাতে নেওয়ার দু-তিন বছরের মধ্যে জমিদারির অভ্যন্তরীণ অবস্থা, প্রজাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক অভিজ্ঞতা লাভের পর তিনি জমিদারি ব্যবস্থায় সঠিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। সে সময় শিলাইদহ সদর কাছারির অধীনে নয়টি ডিহি কাছারি ছিল। রবীন্দ্রনাথ নয়টি ডিহি কাছারিকে ভেঙে তিনটি বিভাগীয় কাছারি তৈরি করলেন শিলাইদহ সদর কাছারির অধীনে। ফলে প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নতি ঘটল। রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষভাবে প্রজাদের অবস্থা নিরীক্ষণ করতে সক্ষম হলেন। সে সময় কুষ্টিয়াতে আরও কয়েক জন ছোট ছোট জমিদার ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যিক হওয়ায় অনুভূতিপ্রবণ এবং সংবেদনশীল ছিলেন। তাঁর জমিদারিতে প্রজাদের দুরবস্থা দেখে তিনি তাদের উন্নয়নের জন্য নানা রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। জমিদার হিসেবে তিনি লক্ষ করেছিলেন যে, ইংরেজ শাসকেরা এ দেশকে কেবল শোষণ করে চলেছে এবং তাদের সহায়তা করেছে এ দেশের জমিদার শ্রেণী। ইংরেজদের এই মানসিকতা তাঁকে ক্ষুব্ধ করে। তিনি লক্ষ করেন প্রতিটি গ্রাম মৃতপ্রায়। সর্বত্রই শিক্ষার দারুণ অভাব। তিনি বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন শিক্ষা ব্যতিরেকে সাধারণ মানুষের উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাঁর কবিমন ও স্বদেশপ্রেম তাঁকে এসব কারণে পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে।

জমিদার রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পল্লীউন্নয়ন ভাবনার সূচনা

রবীন্দ্রনাথ পল্লীউন্নয়ন ভাবনা গড়ে উঠেছিল জমিদারি দায়িত্ব নেবার পরপরই। তবে পুরো কাজটা হাতে নিতে তিনি কিছুটা দেরি করেছিলেন। এই সম্পর্কে তিনি বলেন :

> "এখানকার গ্রাম সম্পর্কে আমি যেসব কথা ভাবছি তা' এখনই কাজে লাগাবার সময় হয় নি, এখন কেবলমাত্র অবস্থাটা জানার চেষ্টা করছি। ভূপেন প্রধানত তথ্য সংগ্রহ করেছেন, সেগুলো ভাল করে জমে উঠলে তখন প্লান ঠিক করতে হবে। আমি যথার্থভাবে স্বরাজ স্থাপন করতে চাই।"[১২২]

রবীন্দ্রনাথের এই পল্লীউন্নয়ন ভাবনা গড়ে উঠেছিল বাংলাদেশের গ্রামীণ দুরবস্থার কারণে, কিন্তু কৃষকদের এমন দুর্ভাগ্য এক দিনে আসে নি। সুলতানী এবং মুঘল যুগে চাষিদের অবস্থা কমবেশি ভাল ছিল। সে সময় ভূমি ব্যবস্থা তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। খলিসা (সরকারি), জায়গীর (দান), তালুক (রাজস্ব-ব্যবস্থা)। ২ এসবের অধিকারীবৃন্দকে ভূঁইয়া, তালুকদার এবং জমিদার বলা হতো। তাঁরা কৃষকদের নিকট থেকে খাজনা পেতেন। কিন্তু জমির মালিক ছিল স্থানীয়ভাবে কৃষকশ্রেণী। মুঘল আমলে এসব ভূঁইয়া বা জমিদার শ্রেণী কৃষকদের নিকট থেকে যথারীতি খাজনা পেলে তাদের ওপর অযথা পীড়ন করে। তবে শেষ পর্যায়ে এই ব্যবস্থার অবক্ষয় ঘটে। বাংলাদেশে মুর্শিদকুলী খাঁ বড় এবং ছোট জমিদার শ্রেণী করেন এবং এ সময়ে সৃষ্টি মধ্যস্বত্বভোগী তালুকদার, চৌধুরী, মোড়ল/মণ্ডল প্রভৃতির সৃষ্টি হয়। ৩ ইজারাদারী প্রথার ব্যাপক প্রসারে বাংলাদেশের কৃষিব্যবস্থা অনেকটা ভেঙে পড়ে এবং কৃষকসমাজ এ সবের মাধ্যমে শোষিত হতে থাকে। বাংলাদেশের ভূমিব্যবস্থা ইংরেজ শাসনামলে প্রথমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং পরবর্তীকালে ব্রিটিশ আওতাধীন হয় এবং কৃষকদের শোষণ অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পায়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে একটি নির্দিষ্টসংখ্যক জমিদার শ্রেণী গড়ে ওঠে। ব্রিটিশ সরকারকে নির্ধারিত সময়ে খাজনা দেবার নিশ্চয়তা প্রদান করে জমিদারি লাভ সম্ভব হয়। কিন্তু এতে সাধারণ কৃষকের শোষণের মাত্রা আগের মতই থেকে যায়। এসব জমিদার কৃষক বা গ্রামোন্নয়নের জন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন না। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান হলেও এখানে অতীতকাল থেকে নানা ধরনের শিল্প তৈরি হয়েছে। তন্মধ্যে ঢাকার মসলিন বস্ত্রশিল্প ছিল অন্যতম। ব্রিটিশ শাসনামলে এ ধরনের শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে

রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর "The Economic History of India in the Victorian Age" এ বলেন :

> "The sources of a nation's wealth are agriculture, commerce and manufactures and sound financial administration. British rule has given India peace; but British administration has not promoted or widened these sources of national wealth in India."

অতঃপর তিনি আরও বলেন :

> "The production of raw material in India for British industries and the consumption of British manufactures in India where were the two fold objects of the early commercial policy of England the twofold objects of the early commercial policy of England...
>
> Coarse Indian goods, which did not in any way compete with Lancashire goods, were taxed as well as finer fabrics. The miserable condition of the miserable Indian labourer, earning less than 2½ d. a day, was taxed by a jealous Government. The infant mill industry of Bombay instead of receiving help and encouragement was repressed by an excise duty unknown in any other part of the civilized world."[১২৩]

এখানে বলা প্রয়োজন যে, তৎকালীন ভারতবর্ষে গ্রাম্য শিল্পের ধ্বংসের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকারের অবহেলা একমাত্র কারণ ছিল না। এসবের অন্যতম কারণ হিসেবে জাতিভেদ প্রথাকেই সবিশেষ দায়ী করা চলে। আরও বলা যায় যে সে সময় ভারতে বিশাল ধনসম্পদের অধিকারী মানুষের বসবাস করতেন যাদের ধনসম্পদ ছিল কিংবদন্তীর মতো। অপরদিকে বিত্তহীন এবং নির্ধনের সংখ্যা ছিল অগণিত। এদের ঘরবাড়ি ছিল কাদামাটির এবং রোগ ও শোক ছিল তাদের নিত্যসঙ্গী। ভারতবর্ষের এই বিশাল জনগোষ্ঠী যে দারিদ্র্য এবং অভাবের মধ্যে বসবাস করতো সেজন্যে তাদের উন্নয়নের জন্য ব্রিটিশ সরকার নানা লোকদেখানো উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। উন্নয়নের একটি পূর্বশর্ত হলো শিক্ষা। ব্রিটিশ সরকার এদিকে মোটেই দৃষ্টিপাত করেননি। এ প্রসঙ্গে ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়াম টি. হ্যারিস বলেন :

> "England`s educational policy in India is a blight on civilization. I have studied the problem pretty closely. In the latter part of the eighteenth century, writtenforce, the English philanthropists, proposed to send school

teachers to India, but a director of the East India Company objected, saying: "We have lost America from our folly in allowing the establishment of schools and colleges, and it would not do for us to repeat the same act of folly in regard to India...

There are no free public schools in British India and no compulsory system of primary education ... Young Indians are hungry for education and it is England's duty to do whatever, she can to help the spread of education; in that great country of ancient cultures and wonderful philosophy."[১২৪] (Mr. William T Harris, The US Commissioner of Education presented this address before the American National Council of Education at a meeting in Cleaveland in 1903)."[১২৫]

সে সময় ব্রিটিশ-ভারত ছিল পুরোপুরি একটি বিরাট গ্রাম যেখানে অধিকাংশ মানুষই গ্রামে বসবাস করত। তৎকালীন 'Ninth Quinquennial review' এ উল্লেখ করা হয় যে, সমগ্র ব্রিটিশ ভারতে ৭ লক্ষ ৩০ হাজার গ্রামের জন্য ১ লক্ষ ৬২ হাজার ৬৬৬টি প্রাইমারি বিদ্যালয় ছিল এবং এসব প্রাইমারি বিদ্যালয়ে আদৌ কোন শিক্ষা-উপকরণ ও সরঞ্জাম ছিল না।[১২৬] এসব প্রাইমারি বিদ্যালয়ে যারা শিক্ষকতার কাজে নিয়োজিত ছিলেন তাদের শিক্ষাগত যেমন কোন যোগ্যতা ছিল না তেমনি তাদের বেতনের অবস্থাও ছিল একবারে নগণ্য।

১৯৩০ সালের পূর্বে ব্রিটিশ ভারতে এবং বাংলাদেশে প্রাইমারি শিক্ষা বাধ্যতামূলক ছিল না। এ সময় বাংলাদেশে (অবিভক্ত বাংলা) প্রাইমারি শিক্ষা অ্যাক্ট গঠিত হয়। কিন্তু এই ব্যবস্থা প্রথমদিকে কয়েকটি শহরে এবং নগরে প্রচলিত থাকে। প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য সরকার তেমন অর্থ বরাদ্দ করতেন না এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থা আরও করুণ ছিল। কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করার পর ভালো চাকুরির ব্যবস্থা না থাকায় অধিকাংশই বেকার হয়ে পড়ত। সামান্যসংখ্যক সরকারের অধীনে কেরানিগিরি লাভ করলেও কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাস করা যুবক-যুবতীদের জন্য তেমন কোন সুযোগ ছিল না। এ প্রসঙ্গে All Bengal College and University and Teachers Association-এর সম্মুখে প্রফেসর রাধাকৃষাণ-এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন :

"The educational Policy of the Government trains men into docile tools of an external authority, it does not help them to become self respecting citizens of a free

nation. Love of one's native land is the basis of all progress. This principle is recognized in all countries But in our unfortunate country it is the other way. A conquered race feels its heart sink. It loses hope, courage and confidence. Our political subjection carries with it the suggestion that we cannot consider ourselves the equals of free nations. Indian history is taught to impress on us the one lesson that "India has failed". The worst form of bondage is that of despair and dejection which creeps on defeated peoples, breeding in them loss of faith in themselves. The aim of true education should be to keep alive the spark of national pride and self respect. If we lose our wealth and resources we may recover them tomorrow, if not today; but if we lose our national consciousness, there is no hope for us."[১২৭]

প্রফেসর রাধাকৃষ্ণাণ তাঁর বক্তব্যে ব্রিটিশ ভারতে শিক্ষার দুরবস্থা এবং একটি পরাজিত জাতির অসহায়ত্বকে তুলে ধরছেন। তাঁর মতে একমাত্র যথার্থ শিক্ষাই একটি দেশের উন্নয়নের জন্য যেমন প্রয়োজন তেমনি তার ভাগ্যকে গড়ে নিতে এই শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। এই প্রসঙ্গে 'Understanding India'-এর লেখিকা Mrs, Gertrude Williams-এর বক্তব্য গুরুত্বপূর্ণ:

"It is education; it is schools; it is popular intelligence. All superstitions and evils which we see in India have their root in the illiteracy, the want of education of the masses of the people. Wipe out the illiteracy, give the people schools and these jungle growths will be swept away. An educated India will not tolerate purdah, child marriage, the disabilities of widows and the rest. It is apalling to compare the influence of a body of 3, 00, 000, 000 illiterate men and women with the potential power that education would give them for progress and advancement. Education would bring a new atmoshphere of common sense and wholesome interests into Indian life, a release to the women and a stimulus to the men ... It would be a levelling influence between the castes, laying bare the artificialities of the system. It would weaken the supersitious credulity which makes

ভাবনায় শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্ব পেয়েছিল। ১২৯৯ সালে তিনি জমিদারি দায়িত্ব নেবার পর শিক্ষার 'হের-ফের' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধের এক স্থানে তিনি উল্লেখ করেন :

> "বাল্যকাল হইতে আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই। কেবল যাহা কিছু নিতান্ত আবশ্যক তাহাই কণ্ঠস্থ করিতেছি। তেমন করিয়া কোন মতে কাজ চলে মাত্র, কিন্তু বিকাশ লাভ হয় না। হাওয়া খাইলে পেট ভরে না, আহার করিলে পেট ভরে কিন্তু আহারটি রীতিমত হজম করার জন্য হাওয়া খাওয়া দরকার। তেমনি একটি শিক্ষা পুস্তককে হজম করিতে অনেকগুলো পাঠ্যপুস্তকের সাহায্য আবশ্যক। আনন্দের সহিত পড়িতে পড়িতে পড়িবার শক্তি অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে ; গ্রহণশক্তি, ধারণাশক্তি, চিন্তাশক্তি বেশ সহজে এবং স্বাভাবিক নিয়মে বল লাভ করে।"[১৩০]

অপর এক স্থানে রবীন্দ্রনাথ আবারও বলেন :

> "চিন্তাশক্তি এবং কল্পনাশক্তি জীবনযাত্রা নির্বাহের পক্ষে দুইটি অত্যাবশ্যক শক্তি, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অর্থাৎ যদি মানুষের মত মানুষ হইতে হয় তবে ঐ দুটো পদার্থ জীবন হইতে বাদ দিলে চলে না। অতএব, বাল্যকাল হইতে চিন্তা ও কল্পনার চর্চা না করিলে কাজের সময় যে তাহাকে হাতের কাছে পাওয়া যাইবে না, এ কথা অতি পুরাতন। কিন্তু আমাদের বর্তমান শিক্ষায় সে পথ একপ্রকার রুদ্ধ।"[১৩১]

ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষে যে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন তা একটি জাতির উন্নতির জন্য সহায়ক ছিল না। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন :

> "The portion of education alloted to us is so raggedly insufficient that it ought to outrage the sense of decency of a Western humanity. We have seen in the countries how the people are encouraged and trained and given every facility to fit themselves for the great movements of commerce and industry spreading over the world; while in India the only assistance we get is merely to be jeered at by the nation for lagging behind ... If we must believe our schoolmaster in his taunt that after nearly two centuries of his tutelage India not only remains unfit for self government, but also unable to display originality in her intellectual atttainments, we must ascribe it to something in the nature of Western culture and our inherent incapacity to receive it, or to the judicious niggardliness of the

> the masses the easy prey to thousands of beggar priests. It would undermine the Indian's blind fatalism and make him begin to take account of economics and bacteria. It is the want of schools and education that makes the Indian people ignorant of the rudiments of sanitation and of hygiene, a prey to superstitious fears of gods and evils. India's only protection from ruthless exploitation, her only hope for the future lies in free compulsory education. the three R's for the masses" [১২৮]

এই বক্তব্যে প্রাইমারি শিক্ষাসহ সব শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং শিক্ষার মাধ্যমে ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশকে একটি উন্নয়নমুখী জাতি হিসেবে গড়ে তোলার ভাবনাও প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, অতীতে এই উপমহাদেশে শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। এই প্রসঙ্গে Mr.Ramsay MacDonald লিখিত The Government of India গ্রন্থের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> "Education in India is as old as Hindu ritual and was originally connected with it and the life of the student was the first stage in the great pilgrimage to his being's accomplishment. The relation of teacher and pupil was as close and tender as that of father and son; the young man who sought instruction was praised and he found schools and teachers available... but with the break up of Indian Government after Aurangzeb, misery and anarchy submerged education and it sank to such a low level that it ceased to have any influence on the country, Still the tradition survived and if it can not be said that education flourished, schools existed in very large numbers."[১২৯]

লক্ষ করা যায় যে ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশে (পূর্ববঙ্গ) শিক্ষার ইতিহাস অতি প্রাচীন। ধর্মের ভিত্তিতে যে শিক্ষা গড়ে উঠেছিল তা মনুষ্যত্বের যথার্থ বিকাশকে সম্ভব করে তুলেছিল। কিন্তু আওরঙ্গজেবের পরে এই শিক্ষার অবক্ষয় নেমে আসে এবং ব্রিটিশ ভারতে তা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে পড়ে।

ব্রিটিশ ভারতের এই শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি রবীন্দ্রনাথের কোন আস্থা ছিল না। তিনি নিজেও এই প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাকে অনুসরণ করেন নি। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকে উন্নয়নের সর্বপ্রধান বাহন বলে জেনেছিলেন। অবশ্য এই শিক্ষা, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে কেবলমাত্র পুঁথিগত বিদ্যা ছিল না, এ শিক্ষার সঙ্গে তিনি যুক্ত করেছিলেন কর্মকে যা জীবনকে বিকশিত করে। এইজন্য তাঁর পল্লীউন্নয়ন

nation that has taken upon itself the burden of civilizing the East.[১৩২]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাল্যকাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বাংলাদেশকে ভালোবেসেছেন। শিক্ষাকে তাই তিনি দেশের কাজে লাগাতে চেয়েছেন। একজন যথার্থ শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে উন্নয়ন মুখীন হওয়া সম্ভবপর এ কথা তিনি বিশ্বাস করতেন। তাই তিনি ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণে তার এই প্রত্যয় ব্যক্ত করলেন :

> "কলেজের বাইরে যে দেশ পড়িয়া আছে তাহার মহত্ত্ব একেবারে ভুলিলে চলিবে না। কলেজের শিক্ষার সঙ্গে দেশের একটা স্বাভাবিক যোগ স্থাপন করিতে হইবে। সে সকল দেশের কলেজ দেশেরই একটা অঙ্গ অন্যদেশে সে যোগ চেষ্টা করিয়া স্থাপন করিতে হয় না। সে সকল দেশের কলেজ দেশেরই একটা অঙ্গ। সমস্ত দেশের আভ্যন্তরিক প্রকৃতি তাহাকে গঠিত করিয়া তোলাতে দেশের সহিত কোথাও তাহার কোনো বিচ্ছেদের রেখা নাই। আমাদের কলেজের সহিত দেশের ভেদ চিহ্নহীন সুন্দর ঐক্য স্থাপিত হয় নাই।...
>
> এজন্য কাহাকেও দোষ দেওয়া যায় না। আমাদের দেশের যথার্থ বিবরণ আজ পর্যন্ত প্রস্তুত হইয়া ওঠে নাই ; সেই জন্য যদিও আমরা স্বদেশে বাস করিতেছি তথাপি স্বদেশ আমাদের জ্ঞানের কাছে সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র হইয়া আছে।"[১৩৩]

এই প্রবন্ধের অপর স্থানে রবীন্দ্রনাথ বলেন :

> "আমরা নৃতত্ত্ব অর্থাৎ ethnology বই যে পড়ি না তাহা নহে। কিন্তু যখন দেখিতে পাই সে বই পড়ার দরুন আমাদের ঘরের পাশে যে হাঁড়ি, ডোম, কৈবর্ত, বাগদি রহিয়াছে তাহাদের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইবার জন্য আমাদের লেশমাত্র ঔৎসুক্য জন্মে না তখনই বুঝিতে পারি পুঁথি সম্বন্ধে আমাদের কত বড়ো একটা কুসংস্কার জন্মিয়া গেছে। পুঁথিকে আমরা কত বড় মনে করি এবং পুঁথি যাহার প্রতিবিম্ব তাহাকে কতই তুচ্ছ বলিয়া জানি। কিন্তু জ্ঞানের সেই আদিনিকেতনে একবার যদি জড়ত্ব ত্যাগ করিয়া প্রবেশ করি তাহা হইলে আমাদের ঔৎসুক্যের সীমা থাকিবে না। আমাদের ছাত্রগণ যদি তাহাদের এই সকল প্রতিবেশীদের সমস্ত খোঁজে একবার ভালো করিয়া নিযুক্ত হন তবে কাজের মধ্যেই কাজের পুরস্কার পাইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।
>
> সন্ধান ও সংগ্রহ করিবার বিষয় এমন কত আছে তাহার সীমা নাই। আমাদের ব্রত পার্বণগুলি বাংলার এক অংশে যে রূপ অন্য অংশে সে রূপ নহে। স্থানভেদে সামাজিক প্রথার অনেক বিভিন্নতা আছে। এ ছাড়া গ্রাম্য ছড়া, ছেলে ভুলাইবার ছড়া, প্রচলিত গান প্রভৃতির মধ্যে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় নিহিত আছে।"[১৩৪]

উপরিউক্ত বক্তব্যসমূহে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যকে যেমন তুলে ধরেছেন তেমনি এই শিক্ষা যে একটি জাতির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ও সহায়ক

ভূমিকা পালন করতে পারে তা উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ এই দর্শনকে সামনে রেখেই বাংলাদেশে তাঁর পল্লীউন্নয়নের কর্মসূচি গ্রহণে তৎপর হয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন তাঁর এই কর্মকাণ্ডে শিক্ষিত সমাজের অংশগ্রহণ স্বরাজকে ত্বরান্বিত করবে। শিক্ষা ও কর্মকে তিনি একটি বৃন্তের দুটি ফুল হিসেবে গণ্য করেছিলেন। এরই বাস্তব চালচিত্র পরিলক্ষিত হয় শান্তিনিকেতন আশ্রমে বিশ্বভারতী ও শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিক্ষাকে তিনি জীবনের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণে রবীন্দ্রনাথ একটি দারিদ্র্যপীড়িত জাতিকে আত্মশক্তির প্রতি বিশ্বাসী হতে শিখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে উন্নয়ন কেবলমাত্র একটি কোন বিশেষ দিকের বিকাশকে বুঝায় না - এ উন্নয়ন খণ্ডিত নয়- - পূর্ণাঙ্গ। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে শিক্ষা অর্থ উন্নয়ন এবং উন্নয়নই শিক্ষা।

পল্লীউন্নয়নে রবীন্দ্রনাথ এই শিক্ষাকেই সম্পৃক্ত করতে বলেছেন। ব্রিটিশ ভারতে বিদেশী প্রবর্তিত শিক্ষা কেবল কেরানিকুলের জন্ম দিতে পারে— মনুষ্যত্বের যথার্থ বিকাশ সেখানে সম্ভব নয়। এ কারণেই রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদেরকে জীবন-ঘনিষ্ঠ শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা অর্জনকে সকল উন্নয়ন এবং মনুষ্যত্বের যথার্থ বিকাশ হওয়াকেই বুঝেছিলেন। শিক্ষানীতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রধান বক্তব্য ছিল, মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষদান এবং এমন শিক্ষা অর্জন যা বিশ্বমানব মনের সঙ্গে আমাদের যোগসাধন করে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন মাতৃভাষা ছাড়া জনসমাজকে আলোকের পথে নিয়ে যাবার জন্য অন্য কোন বিকল্প নেই। বিদ্যা অর্জনের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র চাকরিলাভ নয়, প্রয়োজন আমাদের মনের মুক্তি সাধন। রবীন্দ্রনাথ বলেন :

> "তুমি কেরানির চেয়ে বড়, ডেপুটি মুনসেফের চেয়ে বড়ো, তুমি যাহা শিক্ষা করিতেছ তাহা হাওইয়ের মতো কোনো ক্রমে স্কুল মাস্টারী পর্যন্ত উড়িয়া তাহার পেনশন ভোগী জরাজীর্ণতার মধ্যে ছাই হইয়া মাটিতে আসিয়া পড়িবার জন্য নহে, এই মন্ত্রটি জপ করিতে দেওয়ার শিক্ষাই আমাদের দেশে সকলের চেয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষা— এই কথাটা নিশিদিন মনে রাখিতে হইবে। এইটে বুঝিতে না পারার মূঢ়তাই আমাদের সকলের চেয়ে বড় মূঢ়তা।"[১৩৫]

বস্তুত, রবীন্দ্রনাথ উন্নয়নকে কোনোভাবেই কেবলমাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়ন বোঝেন নি। জীবিকা অর্জনের শিক্ষা মানুষকে জড়ধর্মী করে ফেলে। সেখানে মানুষের আত্মার মৃত্যু ঘটে। মন ও মনন কিংবা চিত্তের ঐশ্বর্য সৃষ্টি করে তোলাই শিক্ষার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রনাথ তাই দুঃখ করে বলেন, "চিত্তের ঐশ্বর্যকে অবজ্ঞা করে জীবনযাত্রার সিদ্ধিলাভকেই একমাত্র প্রাধান্য দিয়েছি।" রবীন্দ্রনাথ পল্লীউন্নয়নের ক্ষেত্রে নিজেকে নিয়োজিত করলে তথাকথিত শিক্ষিত জনগণের উপেক্ষার পাত্র হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর মতে,

"আমাদের কোনো ত্যাগ নেই, আদর্শ এবং মানবিক মূল্যবোধ নেই। আমাদের মুক্তবুদ্ধি নেই। আমরা তাই নিজের কাছে নিজেই পরাধীন।"

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকে স্বাধীনতার বাহন বলে বুঝেছিলেন। তাঁর স্বদেশপ্রেমের মর্মমূলে ছিল ভারতীয় ঐতিহ্য। তাঁর মতে, ভারতীয় ঐতিহ্য একটি ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ নয় — তা বিশ্বজাগতিক। রবীন্দ্রনাথ বলেন :

"আমাদের দেশের বিদ্যানিকেতনকে পূর্ব পশ্চিমের মিলনকেতন করে তুলতে হবে। এই আমাদের কামনা। বিষয়লাভের ক্ষেত্রে মানুষের বিরোধ মেটেনি, সহজেই মিটতেও চায় না। সত্য লাভের ক্ষেত্রে মিলনের বাধা নেই।"[১৩৬]

রবীন্দ্রনাথ পল্লীউন্নয়নের মধ্যে বিশ্ববোধকে জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন। বিদ্যাই কেবলমাত্র এই বোধকে উসকিয়ে দিতে পারে। বিদ্যার কোনো ভৌগোলিক রূপ নেই। জ্ঞান ঐক্যের সাধনা করে। বিদ্যা হচ্ছে মানুষের মিলনসূত্র। বিদ্যার মাধ্যমে একটি জাতিবিশেষের মুক্তি সাধিত হলে তা এক অর্থে নিখিল মানুষেরই মুক্তি। গ্রাম উন্নয়নে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন। বলা যেতে পারে এজন্যেই শিক্ষা মানুষের মধ্যকার বৈষম্যকে দূর করে মানুষকে মানবে পরিণত করে। শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী ও শ্রীনিকেতনকে একত্রীভূত করে রবীন্দ্রনাথ মানুষের মধ্যে এই ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। গ্রামোন্নয়নে শিক্ষিতজনের ভূমিকা সম্পর্কে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'ছাত্রসম্ভাষণ' প্রবন্ধে বলেন :

"সমস্ত দেশের সংস্কৃতি সৌভ্রাত্র সচ্ছলতা একদা বিকীর্ণ ছিল আমাদের গ্রামে। আজ সেখানে প্রবেশ করলে দেখতে পাবে, মরণদশা তার বুকে খড়্গ বিদ্ধ করেছে একটা রক্তশোষী শ্বাপদের মতো। অনশন দুঃখ দারিদ্র্যের সহচর মজ্জাগত মারী সমস্ত জাতির জীবনীশক্তিকে জীর্ণজর্জর করে দিয়েছে। এর প্রতিকার কোথায় সে কথা ভাবতে হবে আমাদের নিজেকে —অশিক্ষিত কল্পনার দ্বারা নয়, ভাষাবিহ্বল দৃষ্টির বাষ্পকুলতা দিয়ে নয়। এই পণ করে চলতে হবে যে পরাস্ত যদি হতেও হয় সে যেন প্রতিকূল অবস্থার কাছে ভীরুর মতো হাল ছেড়ে দিয়ে নয়, যেন নির্বোধের মতো নির্বিচারে আত্মহত্যার মাঝ দরিয়ায় ঝাঁপ দিয়ে পড়াকেই গর্বের বিষয় না মনে করি।"[১৩৭]

'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষিত তরুণ ছাত্রসমাজকে গ্রামোন্নয়নে বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি এবং লোকজীবন সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে বলেন :

"... আর আজ সাহিত্য পরিষদ তোমাদিগকে যে আহ্বান করিতেছে তাহার ভাষা মাতৃভাষা ও তাহার কার্য মাতার অন্তঃপুরের কার্য বলিয়াই কি তাহা ব্যর্থ হইবে— দেশের কাব্যে, গানে, ছড়ায়, প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষে, কীটষ্ট পুঁথির জীর্ণপত্রে, গ্রামপার্বণ, ব্রত কথায়

পল্লী কৃষিকুটীরে পরিষদ যেখানে স্বদেশকে সন্ধান করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন সেখানে বিদেশী লোকে কোনোদিন বিস্ময়ে দৃষ্টিপাত করে না, সেখান হইতে সংবাদপত্র বাহন খ্যাতি সমুদ্রপারে জয় ঘোষণা করিতে যায় না, সেখানে তোমাদের কোনো প্রলোভন নাই— কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেহ মাতার নিঃশব্দ আশিসমাত্রকে যদি রাজমহিষীর ভোজ্যাবশেষের চেয়ে অধিক মনে করিতে পারো তবে মাতার নিভৃত অন্তঃপুরচারী এই সকল মাতৃসেবকদের পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হও এবং দিনের পর দিন বিনা বেতনে, বিনা পুরস্কারে, খ্যাতিবিহীন কর্মে স্বদেশপ্রেমকে সার্থক কর।"[১৩৮]

রবীন্দ্রনাথ ও লোকসংস্কৃতি

দেশকে জানতে গেলে দেশের মানুষকে জানতে হয়। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছিলেন বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ (শতকরা ৯০ ভাগ) গ্রামে বসবাস করে। এদের অবস্থার উন্নয়ন না ঘটলে দেশের অবস্থারও উন্নয়ন সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ গ্রামোন্নয়ন বলতে গ্রাম বা লোকসংস্কৃতিরও উন্নয়ন বুঝেছিলেন। তিনি জানতেন একজন মানুষ কেবল ভাত কাপড় নিয়েই বেঁচে থাকতে পারে না তার মনের খোরাক পূরণ করে তার সংস্কৃতি—লোকসংস্কৃতি। একদিন যে গ্রামবাংলায় লোকসংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটেছিল— আজ তা বিলুপ্তির পথে। বাংলাদেশের মসলিন পৃথিবীতে 'চমক' সৃষ্টি করতে পেরেছিল— আজ তা ধ্বংস হয়ে গেছে। একটি জাতির পরিচয় লেখা থাকে তার সংস্কৃতিতে। রবীন্দ্রনাথ সে কথা জানতেন বলেই তিনি লোকসংস্কৃতির উদ্ধার ও তার বিকাশকে উন্নয়নের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তিনি নিজেও এ বিষয়ে উৎসাহী হয়ে সংগ্রহ কার্যে ব্রতী হন।

গ্রামের প্রতি মমত্ববোধ না থাকলে রবীন্দ্রনাথ লোকসংস্কৃতি এবং লোকজীবন সম্পর্কে আগ্রহী হতেন না। আধুনিক উন্নয়ন কর্মীরা নারীদের প্রতি সমাজের অবহেলাকে উন্নয়নের অন্তরায় বলে মনে করেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন নারীদের যোগ্য আসনে না বসানো হলে একটি দেশ বা জাতির অগ্রগতি কোনোভাবেই সম্ভব নয়। গ্রাম-উন্নয়নে তাই নারীদের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ এ কথা সে সময়েই উপলব্ধি করেছিলেন। আমাদের লোকসংস্কৃতির অধিকাংশ কর্মশাস্ত্রেই বলা যেতে পারে, নারীদের আধিপত্য। কিন্তু এই নারীসমাজই নানাভাবেই অবহেলিত হয়েছে পুরুষের মাধ্যমে। পুরুষপ্রধান সমাজে নারী নিয়ত নিগৃহীত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তা বুঝেছিলেন বলেই নারীদেরকে গ্রামের সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বলেনঃ

> "Villages are like women. In their keeping is the cradle of the race. They are nearer to nature than towns and are, therefore in close touch with the fountain of life.
>
> They have the atmosphere which possesses a natural power of healing. It is the function of the village, like that of woman to provide people with their elemental needs, with food and joy, with the simple poetry of life,

> and with those ceremonies of beauty which the village spontaneously produces and in which she finds delight. But when constant strain is put upon her through the extortionate claim of ambitions; when her resources are exploited through the excessive stimulus of temptation, then she becomes poor in life and her mind becomes dull and uncreative. From her time- honoured posittion of the wedded partner of the city she is degraded to that of maid-servent, while in its turn, the city, in its intense egotism and pride, remains unconscious of the devastation it constantly works upon the very source of its life and health and joy".[১৩৯]

রবীন্দ্রনাথের উপরিউক্ত মন্তব্য গ্রাম সম্পর্কে বাংলাদেশের পুরুষ অধ্যুষিত সমাজের পুরুষেরা নারীদের প্রতিই প্রযোজ্য। নারীদের প্রতি যেমন উদাসীন ও অবহেলা দেখিয়েছে শহরও ঠিক তেমনি গ্রামের প্রতি তার নির্মমতা প্রদর্শন করেছে।

গভীর দেশানুরাগ থেকেই রবীন্দ্রনাথ পল্লীর অভ্যন্তরে শুধু নয়, একেবারে তার অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ লোকসংস্কৃতির উপর অধিক গুরুত্ব অর্পণ করেছিলেন এজন্য যে, এরই মধ্যে পল্লীর প্রাণ নিহিত। এর মধ্যেই দেশের মৌলিক সৃষ্টিপ্রতিভার পরিচয় রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ লোকসংস্কৃতি সংরক্ষণ ও চর্চাকে দেশের কাজ বলে ভেবেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন লোকসংস্কৃতির উন্নয়নের মাধ্যমে সাধারণের মধ্যে এক নতুন প্রাণশক্তির সঞ্চার করা সম্ভব। ঐতিহ্যের প্রতি মমত্ববোধ তার আত্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে সক্ষম। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন, গ্রামকে উন্নয়ন বা সুষ্ঠুভাবে সংগঠিত করার জন্যে লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে। একথা সত্য যে, রবীন্দ্রনাথই প্রথম বাঙালি যিনি স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে লোকসংস্কৃতি সংগ্রহে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রেখেছিলেন। এরই মাধ্যমে তিনি গ্রাম সম্বন্ধে যথাযথ ধারণা করে নিতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ জমিদারির দায়িত্ব নেবার পর গ্রাম উন্নয়নে যেসব পদক্ষেপ নিয়েছিলেন সে সম্পর্কে একটি বক্তব্য প্রদান করতে গিয়ে তিনি বলেন :

> "গ্রামের উন্নতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করবো, আমার উপর এই ভার। অনেকে হয়তো মনে মনে আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন, তুমি কে হে শহরের পোষ্যপুত্র, গ্রামের খবর জান? আমি কিন্তু এখানে বিনয় করতে পারবো না। গ্রামের কোলে মানুষ বাঁশবনের ছায়ায় কাউকে খুড়ো কাউকে দাদা বলে ডাকলেই যে গ্রামের সম্পূর্ণ জানা যায় একথা সম্পূর্ণ মানতে পারি না। কেবলমাত্র অলস নিশ্চেষ্ট জ্ঞান কোনো কাজের জিনিস নয়। কোনো উদ্দেশ্যের মধ্য দিয়ে জ্ঞানকে

> উত্তীর্ণ করে নিয়ে গেলে সে জ্ঞান যথার্থ অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়। আমি সেই রাস্তা দিয়ে কিঞ্চিত পরিমাণে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। তার পরিমাণ অল্প হতে পারে কিন্তু তবুও সেটা অভিজ্ঞতা। সুতরাং তার মূল্য বহু পরিমাণ অলস জ্ঞানের চেয়ে বেশি।"[১৪০]

গ্রাম্যজীবন ও লোকসংস্কৃতি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই অভিজ্ঞতাকে কম গুরুত্বপূর্ণ বলে ভাবেন নি। রবীন্দ্রনাথ যখন জমিদার হিসেবে গ্রামের সঙ্গে মিলিত হলেন তখন গ্রামের ভগ্নদশা। গ্রামে আনন্দ বা বিনোদনের কোন ব্যবস্থা নেই। আধুনিক শিল্পচর্চার কারণে লোকসংস্কৃতি বিলীয়মান। অতঃপর রবীন্দ্রনাথ নিজেই লোকসংস্কৃতি পুনরুদ্ধারে ব্রতী হন। কবি মোহিতলাল মজুমদার শিলাইদহে বেড়াতে এলে লক্ষ করেন যে, এক জায়গায় কয়েকটি মাটির ঘরের মডেল রক্ষিত, তাদের খড়োচালে বিভিন্ন স্টাইল। পাশে কতকগুলো কাঁথা অপূর্ব সূঁচি-শিল্পের নিদর্শন। রজ্জু শিল্পের নিদর্শন হিসেবে কয়েকটি 'শিকা'ও রক্ষিত ছিল।

আরো নানা ধরনের গ্রাম্য-শিল্পকলার নমুনাও সেখানে ছিল। আলপনা সংরক্ষণের প্রতিও রবীন্দ্রনাথ সচেষ্ট ছিলেন। মোহিতলাল মজুমদার এ বিষয়ে ঔৎসুক্য দেখালে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেন :

> "আমি কিছু দিন যাবৎ একটা বিষয়ে উদ্বিগ্ন বোধ করিতেছি। বাংলার নিজস্ব আর্ট আইডিয়া ক্রমেই বিদেশী প্রভাবে নষ্ট হইয়া যাইতেছে, আর কিছু দিন পরে আমাদের খাঁটি দেশীও শিল্পের নিদর্শনগুলি লোপ পাইবে। তাই আমি এই সকল নমুনা সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি।"[১৪১]

এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে একবার রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

> "চাঁটগা অঞ্চলে মেয়েলি শিল্প যা কিছু প্রচলিত আছে তা সংগ্রহ করে দিতে পারবেন? ওরা লক্ষ্মী পূজা, বিবাহ প্রভৃতি উপলক্ষে যে সমস্ত আলপনা এঁকে থাকে সেইগুলি কোনো শিল্পপটু মেয়েকে দিয়ে কাগজের উপর আলতার রঙ্গে আঁকিয়ে পাঠাতে পারেন? খাঁটি সেকেলে জিনিস হওয়া চাই। শিকে কাঁথা প্রভৃতি গৃহস্থালির শিল্পদ্রব্য সংগ্রহ করতে চাই। আর একটি জিনিস চাই- -চাঁটগাঁ অঞ্চলে যত বিভিন্ন রীতির কুঁড়েঘর আছে তার ফটো বা অন্য কোন রকমের প্রতিকৃতি। আপনার ছাত্রদের লাগিয়ে দিলে এটা দুঃসাধ্য হবে না।
>
> এখানে জনসাধারণের মধ্যে মাটির কড়ির, বাঁশের বা বেতের শিল্পকাজ কি রকম চলিত আছে ভালো করে খোঁজ নেবেন। আমরা বাংলার প্রত্যেক জেলা থেকে এই সমস্ত গণশিল্প সংগ্রহ করতে ব্রতী। আপনার নিজের জেলার প্রতিও দৃষ্টি রাখবেন।"[১৪২]

উপরিউক্ত বক্তব্য থেকে অতি সহজেয় অনুমান করা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের কাছে লোকসংস্কৃতি সংগ্রহ কোন খেয়াল বা বিলাসিতা ছিল না। গ্রাম এবং গ্রামের মানুষদের প্রতি তাঁর অপরিসীম ভালবাসা এসব সংগ্রহে রবীন্দ্রনাথকে

উদ্বুদ্ধ করেছিল। এসবের মাধ্যমে তিনি হারানো বাংলাকে পুনর্গঠনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে লোকসাহিত্যের সংরক্ষণে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি' গ্রন্থের ভূমিকাতে রবীন্দ্রনাথ বলেন :

> 'ঠাকুরমার ঝুলিটির' মতো এতবড়ো স্বদেশী জিনিস আমাদের দেশে আর কি আছে? কিন্তু হায়! এই মোহন ঝুলিটিও ইদানীং ম্যাঞ্চেস্টারের কল হইতে তৈরি হইয়া আসিতেছিল। এখনকার কালে বিলাতের Fairy tales আমাদের ছেলেদের একমাত্র গতি হইয়া উঠিবার উপক্রম করিয়াছে। স্বদেশের দিদিমা কোম্পানি একেবারে দেউলে।
>
> ... কিন্তু কোথায় গেল- -রাজপুত্র, পাত্তরের পুত্র কোথায় বেঙ্গুমা-বেঙ্গামী, কোথায় সাতসমুদ্র তেরো নদীর পারে, সাত রাজার ধন মাণিক। এ সমস্ত ক্রমে মরা নদীর মতো শুকাইয়া আসাতে বাংলাদেশের পল্লীগ্রামে যেখানে রসের প্রবাহ নানা শাখায় বহিত সেখানে শুধু বালু বাহির হইয়া পড়িয়াছে।...
>
> এক্ষণে আমার প্রস্তাব এই যে বাংলাদেশের আধুনিক দিদিমাদের জন্য অবিলম্বে একটা স্কুল খোলা হউক এবং দক্ষিণাবাবুর এই বইখানি অবলম্বন করিয়া শিশু শয়ন রাজ্যে পুনর্বার তাহারা নিজেদের গৌরবের স্থান অধিকার করিয়া বিরাজ করিতে থাকুন।"[১৪৩]

গ্রাম উন্নয়নে রবীন্দ্রনাথ তাই কেবল আর্থিক উন্নয়নের প্রাধান্য দেন নি, রবীন্দ্রনাথ গ্রাম উন্নয়ন সম্পর্কে যা বুঝেছিলেন তাহল গ্রামের সার্বিক ও পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থাপনা। এই ব্যবস্থাপনায় তিনি ধনী-নির্ধন, জমিদার, রাজা এবং প্রজা, রায়ত, নারী, যুবক ও প্রবীণদের একটি মেলবন্ধন ঘটাতে চেয়েছিলেন। সমবায় সমিতি ছিল এই মেলবন্ধনের মাধ্যম।[১৪৪]

রবীন্দ্রনাথ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রবীন্দ্রনাথ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি লক্ষ করেছিলেন হিন্দু মুসলমান উভয়েই বাংলাদেশের অধিবাসী। ধর্মীয় আচার-আচরণে পার্থক্য থাকলেও উভয়ের মধ্যে ভাষা ও জীবনাচরণে, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে একটি মেলবন্ধন আছে। এই সম্প্রীতি উন্নয়নের সহায়ক। কিন্তু জাতিভেদ প্রথা এবং অস্পৃশ্যতা উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণ, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে একটি বিশাল পার্থক্য সৃষ্টি করে যা পরিত্যাজ্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জমিদারিতে এমন পার্থক্য হিন্দু মুসলমান উভয়ের মধ্যে লক্ষ্য করেছিলেন। মুসলমানেরা ছিল অপেক্ষাকৃত উদার।

জাতিভেদ প্রথার কারণে ভারতীয় তথা এদেশীয় সমাজব্যবস্থায় অস্পৃশ্যতা এমন এক সংস্কার, যার ফলে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা নিম্নবর্ণের হিন্দু যারা শূদ্র নামে পরিচিত তাদেরকে অপবিত্র ভেবে অস্পৃশ্য জ্ঞান করে। বাংলাদেশের মুসলমানদের প্রতিও উচ্চবর্ণের হিন্দুদের একই ধরনের মনোভাব রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের জমিদারিতে হিন্দু ও মুসলমান পাড়া আলাদা আলাদা ছিল। উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দেখাদেখি অন্যান্য হিন্দুবর্ণের লোকরাও মুসলমানদের অস্পৃশ্য জ্ঞান করত। ফলে সামাজিক অনুষ্ঠানে মুসলমানদের জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা রাখা হতো। এমনকি তাদেরকে একসাথে বসারও ব্যবস্থা রাখা হতো না। বর্ণ বৈষম্য ও অস্পৃশ্যতার বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন শিলাইদহে তাঁর জমিদারিতে এসে। তাঁর অন্যান্য জমিদারি অঞ্চল যেমন সাজাদপুর এবং পতিসরে তিনি এমন বৈষম্য লক্ষ করেছিলেন। বাংলাদেশে এসে তিনি নিম্নবর্ণীয় হিন্দুকে অস্পৃশ্য এবং সংখ্যাগুরু মুসলমানদেরকে ম্লেচ্ছ বলে চিহ্নিত করার প্রয়াস উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে লক্ষ করেন। প্রথম জীবনে বর্ণাশ্রম বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তা প্রকাশ্যে তেমন দেখা যায় নি। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে জমিদারি তদারকি উপলক্ষে স্থানীয়ভাবে শিলাইদহে বসবাসের সময় তিনি লক্ষ করেন যে, কাছারিতে মুসলমান প্রজারা এলে তাদেরকে জাজিমে বসতে দেওয়া হতো না। জাজিমের এক প্রান্ত তুলে মেঝেতে তাদেরকে বসতে দেওয়া হতো।[১৪৫] শুধু মুসলমানদের ক্ষেত্রে নয়, নিম্নবর্ণের হিন্দুদেরকেও অস্পৃশ্য জ্ঞান করে সামাজিক কর্মকাণ্ড থেকে তাদেরকে দূরে রাখা হতো। রবীন্দ্রনাথ বলেন :

> "আদি পল্লীগ্রামে;দেখিয়া আসিলাম সেখানে নমঃশূদ্রের ক্ষেত্র অন্যজাতিতে চাষ করে না, তাহাদের ধান কাটে না, তাহাদের ঘর তৈরি করিয়া দেয় না- অর্থাৎ পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে মানুষের কাছে মানুষ যে সহযোগিতা দাবি করিতে পারে আমাদের সমাজ ইহাদিগকে তাহার অযোগ্য বলিয়াছে, বিনা অপরাধে আমরা ইহাদের জীবনযাত্রাকে দুরূহ ও দুঃসহ করিয়া তুলিয়া জন্মকাল হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত ইহাদিগকে প্রতিদিনই দণ্ড দিতেছি।"[১৪৬]

১৮৯১ সালের লোকগণনার প্রতিবেদনে জানা যায় যে, সে সময় নদীয়া, পাবনা ও রাজশাহী জেলার মুসলমান জনসমাজ ছিল যথাক্রমে ৫৮%, ৭৪%, ও ৭২%। এ সময় মুসলমানদের অধিকাংশ ছিল কৃষিজীবী এবং নিম্নবিত্তের। অন্যদিকে হিন্দুদের মধ্যে শতকরা ১০ জন ছিলেন উচ্চবর্ণ, বাকি ৯০% ছিলেন নিম্নশ্রেণী। এরা জাতির দিক থেকে ছিল নিম্নবিত্তের।"[১৪৭]

রবীন্দ্রনাথ বর্ণবিরোধী হলেও তিনি শান্তিনিকেতনকে বর্ণাশ্রম আদর্শে আদর্শায়িত করেন। এ নিয়ে অবশ্য রবীন্দ্রনাথ খুব বিড়ম্বনার সম্মুখীন হন নি। ক্রমে ক্রমে বাংলাদেশে আসবার পর তিনি সচেতনভাবে বর্ণবিরোধী হয়েছিলেন। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে 'ধর্ম'সম্বন্ধে একটি আলোচনায় তিনি বলেন :

> "জগৎ কাহাকেও একঘরে করে না ধোপা নাপিত বন্ধ করে না। চন্দ্র, সূর্য, রোদ-বৃষ্টি জগতের সমস্ত শক্তি সমগ্রের এবং প্রত্যেক অংশ সমগ্রের দাসত্ব করিতেছে। তাহার কারণ এই জগতের মধ্যে যে কেহ বাস করে কেহই জগতের বিরোধী নহে।"[১৪৮]

বাউল লোকধর্ম

রবীন্দ্রনাথ পূর্ববঙ্গে এসে এখানকার বাউল বৈষ্ণবদের সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত হন। বাউল তথা লালন ফকিরের গান তাঁকে দারুণ আকৃষ্ট করে। বাউলদের মধ্যেই তিনি তাঁর ধর্মের প্রতিচ্ছবি খুঁজে পান। এর পরেই তিনি The Religion of Man নামে একটি গ্রন্থ লেখেন। বাংলায় এর নাম হয়েছিল মানবধর্ম। বাউলেরা কোন জাত মানে নি। তাদের কোন সংসার নেই। মানুষকে ভালোবাসা এবং মানুষ ভজনা করাই তাদের লক্ষ। রবীন্দ্রনাথ বাউল সাধনার গভীরে যান নি। গেলে ব্যাপারটি হয়তো অন্য রকম হতো। তিনি তাদের গানের ভিতর যে তত্ত্বকথা পেয়েছিলেন তা নিয়েই তিনি 'গীতাঞ্জলি' লিখতে সমর্থ হয়েছিলেন। এই 'গীতাঞ্জলি' এবং আরও কিছু গান ও কবিতা তাঁকে নোবেল পুরস্কার পাইয়ে দিয়েছে। বাউল গানে তিনি এক অসাধারণ অসাম্প্রদায়িক বোধের পরিচয় পেয়েছিলেন। বাউল গানের সঙ্গে চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ভাবনা মিশে এক মহাভাব সৃষ্টি করেছিল। রবীন্দ্রনাথ বলেন :

> "আমাদের মধ্যে এক বৃহৎ ভাবের বন্যা আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। আমাদিগকে সর্বসাধারণের সহিত একাকার করিয়া দেবার চেষ্টা

করিতেছে। সমস্ত একাকার হইয়া গেল। কিন্তু আমার মনে আজ এই বলিয়া আনন্দ হইতেছে যে, আজ সমস্তই 'একাকার' হইবার উপক্রম হইয়াছে বটে। আমরা যখন বাঙালি হইব তখন একবার একাকার হইব আর বাঙালি যখন মানুষ হইবে তখন আরও একাকার হইবে।"[১৪৯]

রবীন্দ্রনাথ পল্লীউন্নয়নের কাজ হাতে নিলে তৎকালীন পূর্ববঙ্গের বাস্তবসমাজ চিত্রের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। বর্ণবৈষম্য এবং হিন্দু মুসলমানের সম্পর্কের পাশাপাশি বাউল গান তাঁকে এক অভিনয় ও নতুন দর্শন উপহার দিল। রবীন্দ্রনাথ বলেনঃ

"কয়েকদিন হল পল্লীগ্রামে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের দুইজন বাউলের সঙ্গে আমার দেখা হয়। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করলুম, তোমাদের ধর্মের বিশেষত্ব কি আমাকে বলতে পার? একজন বললে, বলা বড় কঠিন, ঠিক বলা যায় না। আর একজন বললে, বলা যায় বৈকি — কথাটা সহজ। আমি বলি এই যে, গুরুর উপদেশ গোড়ায় আপনাকে জানতে হয়। যখন আপনাকে জানি, তখন সেই আপনার মধ্যে তাঁকে পাওয়া যায়। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, তোমাদের এই ধর্মের কথা পৃথিবীর লোককে, সবাইকে শোনাওনা কেন? কেউ বললে যার পিপাসা হবে সে আকাঙ্ক্ষার কাছে আপনি আসবে।"[১৫০]

এরপর রবীন্দ্রনাথ বলেন :

"I felt that I had found my religion at last, the religion of man, in which the infinite become affixed in humanity and come close to me so as to need my love and cooperation. This idea of mine found at a later date its expression in songs of my poems addressed to what I called Jiban-Devata, the lord of my life... It spoke of an intense yearning of the heart for the divine which is in man and not in the temple or scriptures, in images and symbols." (Rabindranath Tagore : The Religion of Man)

অতঃপর রবীন্দ্রনাথ বলেন :

"আমাদের দেশে যাঁরা নিজেদের শিক্ষিত বলেন তাঁরা প্রয়োজনের তাড়নায় হিন্দু মুসলমানের মিলনের নানা কৌশল খুঁজে বেড়াচ্ছেন। অন্যদেশের ঐতিহাসিক স্কুলে তাঁদের শিক্ষা। কিন্তু আমাদের দেশের ইতিহাস আজ পর্যন্ত প্রয়োজনের মধ্যে নয়, পরন্তু মানুষের অন্তরতর গভীর সত্যের মধ্যে মিলনের সাধনাকে বহন করে এসেছে। বাউল সাহিত্যে বাউল সম্প্রদায়ের সেই সাধনাকে দেখি। ... এ জিনিস হিন্দু মুসলমান উভয়েরই; একত্র হয়েচে অথচ কেউ কাউকে আঘাত করে নি। এই মিলনে সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় নি, এই মিলনে গান জেগেছে, সেই গানের ভাষা ও সুর অশিক্ষিত মাধুর্যে সরস। এই গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু মুসলমানের কণ্ঠ মিলেচে, কোরান পুরাণে ঝগড়া বাঁধেনি...

বাংলাদেশের গ্রামের গভীর চিত্তে উচ্চসভ্যতার প্রেরণা স্কুল কলেজের অগোচরে আপনা আপনি কী রকম কাজ করে এসেচে, হিন্দু মুসলমানের জন্য এক আসন রচনার চেষ্টা করেচে, এই বাউল গানে তাঁরই পরিচয় পাওয়া যায়।"[১৫১]

উল্লিখিত বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, রবীন্দ্রনাথ পূর্ববঙ্গ এলাকায় তাঁর জমিদারিতে পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন এই উদ্দেশ্যে যে, একজন মানুষের পরিচয় হবে মানুষ হিসেবে, তার ধর্ম নিয়ে নয়। কাউকে 'ভদ্রলোক' কিংবা 'ছোটলোক' হিসাবে অথবা অস্পৃশ্য কিংবা ম্লেচ্ছ এ অভিধায় চিহ্নিত করা যাবে না। এমনটি হলে পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচি ব্যাহত হবে। রবীন্দ্রনাথ বলেন :

"আমরা বহুশত বৎসর পাশে পাশে থাকিয়া এক ক্ষেতের ফল, এক নদীর জল, এক সূর্যের আলোক ভোগ করিয়া আসিয়াছি, আমরা এক ভাষায় কথা কই, আমরা একই সুখ দুঃখে মানুষ, তবু প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর যে সম্বন্ধ মনুষ্যচিত, যাহা ধর্ম বাহিত, তাহা ধরিয়া এমন একটি পাপ আমরা পোষণ করিয়াছি যে, একত্রে মিলিয়াও আমরা বিচ্ছেদ ঠেকাইতে পারি নাই। এ পাপকে ঈশ্বর কোনমতেই ক্ষমা করিতে পারেন না। আমরা জানি বাংলাদেশের অনেক স্থানে এক ফরাশে হিন্দু মুসলমান বসে না — ঘরে মুসলমান আসিলে জাজিমের এক অংশ তুলিয়া দেওয়া হয়, হুঁকার জল ফেলিয়া দেওয়া হয়।"[১৫২]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচিতে মুসলমান ও হিন্দুর মধ্যে এই মেলবন্ধন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন তাঁর এই ভূমিকায় মুসলমানেরা অনুপ্রাণিত হয়েছে এবং তাঁর সব কর্মসূচিকে তাঁরা সফল করে তুলবার জন্য পূর্ণ সহযোগিতা করেছে। রবীন্দ্রনাথ জানতেন হিন্দু মুসলমান একত্রে মিলিত না হলে তাঁর এই পরিকল্পনা কোনমতেই সফল হবে না। শুধু হিন্দু মুসলমানের ক্ষেত্রেই নয়, নিম্নবর্ণের মানুষের সঙ্গে উচ্চবর্ণের মানুষের মিলনকেও রবীন্দ্রনাথ প্রত্যাশা করেছেন। জমিদারি তদারকি উপলক্ষে শিলাইদহ এসে রবীন্দ্রনাথ ক্রমশ নিম্নশ্রেণীর লোকদের সঙ্গে মিশতেন। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন রবীন্দ্রনাথকে পূর্ববঙ্গ এবং এখানকার মানুষের বিষয়ে অধিক সচেতন করে তোলে। এ সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথের অসাম্প্রদায়িক চেতনারও বিকাশ শুরু হয়। 'গীতাঞ্জলি'তে তিনি সম্প্রদায় নিরপেক্ষ হয়ে সকল ধর্ম ও বর্ণের মানুষকে এক মিলন মেলায় আহ্বান করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'গীতাঞ্জলি'তে বলেন :

আমার ঘরে
যার খুশি সেই আয়রে তোরা
যার খুশি সেই আয় রে॥[১৫৩]

কিন্তু বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ এই অস্পৃশ্যতা নিবারণে তেমন সফল হতে

পারেন নি। ১৯৩২ সালের ১লা ডিসেম্বর রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে অস্পৃশ্যতা-বিরোধী কার্যক্রম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি এখানে 'সংস্কার-সমিতি' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। এই সমিতির মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ অস্পৃশ্যতার অভিশাপ সম্পর্কে সকলকে অভিহিত করেন। এই সংস্কার সমিতির নামে বাংলাদেশের সমগ্র জেলায় জেলায় ও শহরে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে তা বিতরণ করা হয়েছিল।[১৫৪] এই বিজ্ঞপ্তিতে নিম্নোক্ত বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছিল।

০১. কাহাকেও আমরা সামাজিকভাবে হীন মনে করিব না, অস্পৃশ্য করিয়া রাখিব না। সকল জাতিকেই জল-চল করিয়া লইতে হইবে।
০২. সাধারণ মন্দির, পূজার স্থান ও জলাশয় সকলের জন্যই সমানভাবে উন্মুক্ত হইবে।
০৩. বিদ্যালয় তীর্থক্ষেত্র, সভা-সমিতি প্রভৃতিতে কোথাও কাহারও আসিবার বাধা থাকিবে না।
০৪. কাহারও জাতি লক্ষ করিয়া আত্মসম্মানে আঘাত করিবার অন্যায় ব্যবস্থা থাকিবে না।[১৫৫]

অতঃপর রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে সকল কর্মীদের নিকট থেকে নিম্নোক্ত প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর নিয়েছিলেন,

> "এতকাল হিন্দুসমাজে যাহারা অন্ত্যজ জাতি বলিয়া গণ্য, অদ্য হইতে তাহাদের সহিত পানাহারে সামাজিক বাধা মানিব না। ইহাতে সমাজে তিরস্কৃত হইলেও এই প্রতিজ্ঞা পালন করিব।"[১৫৫]

অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ নিঃসন্দেহে তাঁকে উদার মানবতাবাদী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে আন্দোলনে ছাত্র-ছাত্রী, দায়িত্বশীল কর্মী ও অধ্যাপকগণকে সম্পৃক্ত করেন। সংস্কার সমিতির পক্ষে নিম্নোক্ত কর্মকাণ্ড নিয়মিত অনুসরণ করা হতো।

সংস্কার সমিতির ব্যবস্থাপনায় ছাত্র-ছাত্রী, দায়িত্বশীল কর্মী ও অধ্যাপকগণ কর্তৃক কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে প্রতিবেশী পল্লীগ্রামে সপ্তাহে সপ্তাহে অস্পৃশ্যতা-বিরোধী বক্তব্য প্রচার করা হতো। শান্তিনিকেতনের ভূবনডাঙ্গা, গোয়ালপাড়া, আদিত্যপুর, সর্পলেহনাসহ আটটি গ্রামে বৈঠক বসত ও ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা হতো। ধর্মসভায়ও পাঠ ও কীর্তনের সঙ্গে প্রসংগত সামাজিক বিধি-বিধানের সম্বন্ধেও আলোচনা হতো। এসব অনুষ্ঠানে সার্বজনীন ভোজের আয়োজন করা হতো। গ্রামের সকল শ্রেণীর মানুষ এইসব অনুষ্ঠান ও ভোজের উদ্যোগ গ্রহণ করত। হারি, ডোম, বাগদী, মেথর, মুচি ইত্যাদি জনের সঙ্গে বর্ণ হিন্দুগণ একত্রে বসতেন এবং ভোজনে অংশ নিতেন।[১৫৬]

১৯৩৩ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি শ্রীনিকেতনের সাম্বৎসরিক উৎসবের দিনে অস্পৃশ্যতা বর্জনের দাবিতে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায়

বিধুশেখর শাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন সেন প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় রবীন্দ্রনাথ বলেন :

> "আমার লজ্জা বোধহয়, মানুষ মানুষকে ভালবাসবে এই সহজ কথাটি এত শাস্ত্রবচন ও তর্ক দিয়ে আমাদের এই দুর্ভাগা দেশকে এখনও বলতে হয়। হাজার হাজার বৎসর ধরে এদের পেছনে ফেলে রেখেছি, সব দেশকে অন্ধকারে মগ্ন করে রেখেছি, আমরা শিক্ষিতেরা। আজ কি তাদের এত করে শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে বলতে হবে?...
>
> আজ সময় এসেছে মিলবার। ভগবানের আকাশের দিকে চেয়ে পরস্পর পরস্পরকে বুকে তুলে নিতে হবে। পুরানো শাস্ত্র ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবার দিন চলে গেছে। জগন্নাথ দেব আজ তোমাদের সহায়। তোমরা তার উদ্দেশ্যে তোমাদের প্রণাম জানিয়ে সকলকে এক করে নাও। (আনন্দ বাজার পত্রিকা, ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩)[১৫৭]

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন প্রচেষ্টা নিছক কোন খেয়াল বা চমক সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য ছিল না। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথ সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য নিজেকে নিবেদিত করেছিলেন। বাংলাদেশের পল্লীগ্রামে বসবাস করে তিনি মানুষে মানুষে বিভেদের এই চালচিত্র প্রত্যক্ষ করেন এবং সে কারণেই তিনি বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন যে অস্পৃশ্যতা এবং বর্ণবৈষম্য দূর করা না গেলে যথাযথ উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই তিনি শ্রীনিকেতনে অস্পৃশ্যতা ও বর্ণবিভেদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করে সাধারণ মানুষকে একটি মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। পল্লীউন্নয়নে তাঁর সবচেয়ে বড় সফলতা ছিল এখানে। তিনি তাঁর কাব্য, নাটক, ছোটগল্প এবং সংগীতে নানাভাবে তাঁর অস্পৃশ্যতা-বিরোধী মনোভাবকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছিলেন ধর্মের প্রতি এক ধরনের অন্ধ বিশ্বাস ধর্মকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে। পল্লীউন্নয়নের এই অন্ধবিশ্বাস ছিল প্রধান অন্তরায়। রবীন্দ্রনাথ কখনও ধর্মকে অস্বীকার করেন নি। কারণ, ধর্ম যেমন মানুষকে কল্যাণের পথ নির্দেশ করে, তেমনই তাকে মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে।

রবীন্দ্রনাথ পারিবারিকভাবে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আস্থাশীল ছিলেন। কিন্তু কালক্রমে তা পাল্টে যায়। কখনও কখনও তিনি নিজেও কোনটি সঠিক বুঝে উঠতে সক্ষম হন নি। এ কারণে তিনি প্রতিমাপূজাবিরোধী হয়েও তিনি সাধারণ হিন্দু প্রতিমাপূজাকে অস্বীকার করেন নি; বরং কখনও কখনও তাঁর প্রতি তিনি আকর্ষণও অনুভব করেছেন। হিন্দু মেলার উন্নয়ন এবং শিবাজীসংক্রান্ত কাব্যে তিনি হিন্দু জাতিদের প্রতি তাঁর প্রীতিময়তার কথা উল্লেখ করেছেন।[১৫৮] কিন্তু হিন্দু জাতিদের মাধ্যমে যে বর্ণবাদ ছড়িয়ে পড়েছিল রবীন্দ্রনাথ তাঁকে শুধু অস্বীকার করেন নি, বলা যেতে পারে, তার বিরুদ্ধে তিনি ক্ষোভ এবং ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন :

"... পশুর প্রতি আমরা যে ব্যবহার করি মানুষকে যদি তারচেয়েও অধম স্থান দিই, তবে সেই অধম কি আমাদের সমস্ত সমাজের বুকের ওপর চেপে বসবে না?

মানুষকে মানুষ বলে দেখতে না পারার মত সর্বনেশে অন্ধতা আর নেই। এই বন্ধন এই অন্ধতা নিয়ে কোন মুক্তি আমরা পাব না। যে মোহে আবৃত হয়ে মানুষের সত্য রূপ দেখতে পেলুম না সেই অপ্রেমের অবজ্ঞার বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাক, যথার্থভাবে পবিত্রতাকে যেন সভ্য করে গ্রহণ করতে পারি।"[১৫৯]

বাউলদের সংস্পর্শে এসে রবীন্দ্রনাথের সনাতন ধর্মবিশ্বাসে চিড় ধরেছিল। তিনি যে অস্পৃশ্যতাবিরোধী আন্দোলনে নেমে পড়েছিলেন তার অন্যতম কারণ বাউলদের অস্পৃশ্যতাবিরোধী অসাম্প্রদায়িক চেতনা। আমরা গভীর কৌতূহল নিয়ে লক্ষ করেছি তাঁর ধর্মবিশ্বাস নির্মাণে বাউলের কী অসামান্য প্রভাব পড়েছে। পূর্ববঙ্গ বা বাংলাদেশে পল্লীউন্নয়নের কর্মসূচি গ্রহণ করে তাঁর নিজেরও উন্নতি ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের এই মানবতাবাদী ধর্মবিশ্বাসকে আবুসায়ীদ আয়ুব[১৬০] ইউরোপীয় নাস্তিক মনীষীদের অবদান বললেও একে প্রাচ্যের সুফী প্রভাব বলে অভিহিত করাই সমীচীন। বাউলেরা ছিল সুফী আশ্রিত একটি লোকায়ত ধর্মগোষ্ঠী। রবীন্দ্রনাথ আজীবনকাল তাদের প্রতিই তাঁর বিশ্বাসকে অর্পণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মানবধর্ম পাশ্চাত্যের নাস্তিকতাভিত্তিক মানবতাবাদ নয়। ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর এই অভিজ্ঞতা একাধারে ধর্ম এবং অপরদিকে সুফী মতাদর্শের একটি সার্থক সমন্বয়। সকল মানুষের মধ্যে স্রষ্টার উপলব্ধি সুফী নির্দেশক। রবীন্দ্রনাথ সব সবকিছুকেই স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাঁর এই ধর্ম ভাবনাও এই সমীকরণের প্রত্যক্ষ ফসল। পূর্ববঙ্গে বাউলদের সংস্পর্শে এসে তাঁর এই চৈতন্যোদয় হয়েছিল। এদেশের অভিজ্ঞতা নিয়েই তিনি গড়ে তুলেছিলেন শ্রীনিকেতন এবং বিশ্বভারতী।

গ্রাম সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা

রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন ভাবনার উন্মেষ ঘটেছিল বাংলাদেশে (পূর্ববঙ্গ) জমিদারি দায়িত্ব নেবার পর। রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সংবেদনশীল মন নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছেলেবেলা থেকে প্রচলিত শিক্ষাকে পরিহার করে প্রকৃতিগত শিক্ষা লাভ করেছিলেন। তাঁর কবিত্ব এবং সাহিত্যপ্রতিভা তাঁকে মানুষকে জানতে সাহায্য করেছিল। নগরে জন্মগ্রহণ করবার ফলে নাগরিক জীবনের ঐশ্বর্য এবং অসারতাকে যেমন তিনি লক্ষ করেছিলেন তেমনি পল্লীজীবনের সঙ্গে পরিচিত হবার পর তিনি এই দুই জীবনকে যথার্থ তুলনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি সাধারণ মানুষের খুব কাছাকাছি এসেছিলেন। তিনি লক্ষ করেছিলেন জমিদারেরা কিভাবে মানুষকে শোষণ করে তাদের ঐশ্বর্যের ভিত গড়ে তোলে। ঠাকুরদা দ্বারকানাথ ঠাকুরের বিশাল জমিদারি এবং ঐশ্বর্যের প্রতি তিনি ছেলেবেলা আকৃষ্ট হন নি। ছেলেবেলা থেকেই ব্যতিক্রমী হওয়ার ফলে তাঁর সাহিত্যপ্রতিভা বিশেষ করে তাঁর রোমান্টিক চেতনা যা ওয়ার্ডওয়ার্থ, কীটস, শেলীর জীবনদর্শনের সঙ্গে একীভূত ছিল তেমনি পাশ্চাত্যের শিল্পবিপ্লব, রুশবিপ্লব, ফরাসিবিপ্লব এবং গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ তাঁকে সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর একটি দায়িত্ববোধকে জাগ্রত করেছিল। সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে সহমর্মিতা উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর বিভিন্ন কবিতা, সাহিত্য রচনার মধ্যে তাঁর এই মনোভঙ্গি অত্যন্ত সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

জমিদারি দায়িত্ব নিয়ে তিনি তাই অন্য জমিদারে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁর সাহিত্যপ্রতিভা তাঁকে বাস্তবের সঙ্গে পরিচিত করে তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টির সহযোগিতায় তাঁকে ভিন্ন মানুষে রূপান্তরিত করেছিল। ফলে তিনি সাধারণ মানুষের জীবন সরাসরি প্রত্যক্ষ না করলেও তাঁর কল্পনাশক্তি তাঁকে সাধারণ মানুষের ঘরের মানুষ করে তুলেছিল। ইতোমধ্যে তিনি পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেছিলেন এবং সেসব দেশের মনীষীদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। তিনি তাঁদের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। এমনিভাবে পাশ্চাত্যের এবং বিশেষ করে তৎকালীন রুশ সাহিত্যিকদের গণমুখী রচনা পাঠ করে তিনি সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তিনি ব্রিটিশবিরোধী নানা আন্দোলন প্রত্যক্ষ করবার ফলে তাঁর অন্তরে স্বদেশের প্রতি তাঁর গভীর মমত্ব যেমন সৃষ্টি হয়েছিল, তেমনি এদেশের মুক্তির জন্য কর্মসূচি গ্রহণেও তিনি উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন।

জমিদারি দায়িত্ব তাঁকে এই সুযোগ এনে দিয়েছিল। তবে তৎকালীন নানা ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের প্রতি তাঁর প্রত্যক্ষ সহযোগিতা না থাকলেও পরোক্ষভাবে এসবের প্রতি তাঁর সমর্থন যে ছিল না এমন নয়। তিনি তাৎক্ষণিক এবং উচ্ছ্বাসজনিত কর্মকাণ্ডের প্রতি বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি জানতেন দেশের প্রতি ভালোবাসা হঠাৎ কোন 'চমক' সৃষ্টির মাধ্যমে হয় না। মানুষের অন্তরে দেশের প্রতি প্রেম-ভালোবাসাকে যথাযথভাবে প্রোথিত করতে না পারলে তার কোনো স্থায়িত্ব আসে না। এজন্য রবীন্দ্রনাথ গান্ধীর আহ্বানে তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দিতে পারেন নি। তাঁর নানা সাহিত্যকর্মে তিনি তাঁর এই বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন।

পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচি ছিল তাঁর এই দেশপ্রেমের বাস্তবমুখী কর্মপদ্ধতি। তিনি দেখেছিলেন এদেশের অধিকাংশ মানুষ অশিক্ষিত এবং কুশিক্ষিত। তাদের মধ্যে কোনো অধিকারবোধ তো দূরের কথা নিজেদের প্রতিই ছিল তারা সম্পূর্ণ উদাসীন। পরনির্ভরতা অলস-জীবনযাপন, বর্ণবৈষম্য এবং অস্পৃশ্যতা এবং ভাগ্যের প্রতি নিজেকে সমর্পণ করার অভিপ্রেত ইত্যাদি তাঁদের জীবনকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলেছিল। তিনি লক্ষ করেছিলেন গ্রামের মানুষ কোনো কাজেই সংগঠিত নয়। বিত্তবানদের প্রতি তাদের অসন্তোষ এবং ঘৃণা রয়েছে। এদের মধ্যে সম্প্রদায়গত চিন্তা গভীরভাবে থাকার ফলে মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে। হিন্দু-মুসলমান একই গ্রামে বসবাস করেও একে অপর থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। বিত্তবানদের মধ্যে অনেকেই গ্রামের দুরবস্থার কারণে এবং শহর ও নগরের ঐশ্বর্যের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার ফলে গ্রাম ছেড়ে শহর ও নগরে চলে গেছে। ফলে গ্রাম হয়েছে নানা দুর্দশার সম্মুখীন।

সমবায় চিন্তা: গ্রাম সংগঠন

এমনি অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ গ্রামকে সুগঠিত করে তুলতে চেয়েছেন। সমবায়ের মাধ্যমে বিত্তবান এবং রায়তের মধ্যে একটি যোগ-সাজস করে দেবার পরিকল্পনা করেছেন। অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে দূরীভূত করে হিন্দু-মুসলমান, ধনী-দরিদ্র, উচ্চবর্ণ এবং নিম্নবর্ণের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে উৎসবের প্রচলন করতে চেয়েছেন। সর্বোপরি, তিনি প্রতিগ্রামে শিক্ষার আলোক ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। তিনি লক্ষ করেছিলেন বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান এবং নদীমাতৃক হওয়া সত্ত্বেও এখানে কৃষির উন্নতি ঘটে নি। মান্ধাতা আমলের কৃষি অনুসরণের ফলে ফলন বাড়ে নি। মহাজনের দেনার দায়ে কৃষক হয়েছে বিপর্যস্ত। তাই তিনি প্রথমেই বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষি ব্যাংক ও সমবায় গড়ে তুলেছেন। কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক পদ্ধতি এবং তাঁর নোবেল পুরস্কারের সমস্ত অর্থ কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে বিনিয়োগের ব্যবস্থা নিয়েছেন।

তবে রবীন্দ্রনাথের এই পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচি কেবলমাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে চায় নি, এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করা।

এর জন্য তিনি অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটাতে চেয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন গ্রামের মানুষ যখন শিক্ষিত হয়ে উঠবে এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে তাদের মধ্যে ঐক্যমত্বতা আসবে, সম্প্রদায়গত চিন্তা দূরে ফেলে যখন হিন্দু-মুসলমানসহ সব ধর্মাবলম্বী একসাথে মিলবার সুযোগ পাবে তখন দেশ আপনি জেগে উঠবে। তখন স্বরাজ আর দূরে থাকবে না।

শিলাইদহ, সাহাজাদপুর এবং পতিসরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপরিউক্ত ভাবনার প্রতিফলন ঘটাতে চেয়েছিলেন। বলতে কি, তিনি অনেকাংশেই এখানে সফলতার আলোও দেখতে পেয়েছিলেন। কিন্তু শরীকদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং তার ফলে জমিদারির ভাগ-বণ্টন, দেনার দায়ে জমিদারি বিক্রয় এবং সবশেষে জমিদারি উচ্ছেদ আইন-প্রণয়ন তাঁর এই উদ্যোগ পূর্ববঙ্গে সফল হতে পারে নি। ফলে রবীন্দ্রনাথকে বোলপুরে নিজেদের ক্রয়কৃত জমিতে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগ নিতে হয়েছে। প্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছে শান্তিনিকেতন। অতঃপর গড়ে তুলতে হয়েছে তাঁর শিক্ষার আদর্শ বিশ্বভারতী এবং শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠান।

এখানে রবীন্দ্রনাথ পুঁথিগত বিদ্যাশিক্ষার পাশাপাশি কার্যভিত্তিক শিক্ষার প্রবর্তন ঘটিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সাধারণ শিক্ষাকে অস্বীকার করেন নি, কিন্তু তাঁকে জীবন অন্বিষ্ট করতে গিয়ে শ্রীনিকেতন মূলত পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচিভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা। বিশ্বভারতীর গ্রামসমূহ ছিল এই কর্মভিত্তিক শিক্ষার ক্ষেত্রভূমি। এখানে ছাত্রবৃন্দ হাতেকলমে কাজ করে থাকে।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর অদ্যাপি শান্তিনিকেতন এবং শ্রীনিকেতন বিশ্বভারতীর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়নের আদর্শের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আধুনিক শিক্ষা এবং প্রযুক্তি। রবীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতনের পার্শ্ববর্তী আদিবাসী সাঁওতালদের নিয়ে পল্লীউন্নয়নের কাজ শুরু করেছিলেন। আজ তাদের জীবন পরিবর্তিত হয়েছে। তারা আজ শিক্ষাদীক্ষা এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে আদর্শস্থানীয় হয়েছে। একদিন বাংলাদেশে (পূর্ববঙ্গ) রবীন্দ্রনাথ পল্লীউন্নয়নের যে ভাবনা লালন করেছিলেন তা আজ সফলতার শীর্ষে পৌঁছে গেছে। রবীন্দ্রনাথ আজ শুধু মহৎ কবি হিসেবে নন; সর্বকালের একজন মহৎ মানুষ হিসেবে তিনি জনগণনন্দিত।

তথ্যসূত্র

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ছিন্নপত্রাবলী, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা ১৩৩৬।
২. ঐ ছিন্নপত্র, ২০ সেপটেম্বর, ১৮৯৪ দিঘাপতিয়ার জলযানে।
৩. রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৪শ খণ্ড, গ্রন্থ পরিচয়, পৃ- ৫৩৮-৫৩৯।
৪. রবীন্দ্রনাথ, দ্র. সুধীরকরণ, লোকায়ত রবীন্দ্রনাথ, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ- ৪০-৪১।
৫. রামমোহন রায়, রামমোহন রচনাবলী, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা ১৯৭০, পৃঃ ৫৯৬।

৬. সুব্রত গুপ্ত ও পরিমল চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথের অর্থনৈতিক চিন্তা, মডার্ন কলাম, কলকাতা পৃ- ১২-১৩।
৭. সুব্রত গুপ্ত, ও পরিমল চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ-৯১।
৮. বদরুদ্দিন ওমর, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাংলাদেশের কৃষক, ঢাকা ১৯৮৩ পৃ- ১৯।
৯. তাপস বসু, বাংলাদেশে কৃষির বিবর্তন, কৃষক সমাজ ও সাহিত্য, পুস্তক বিপণী, কলকাতা ১৪০০ পৃ-৫৬।
১০. বিনয় ঘোষ, সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-৩৭।
১১. Prem Chad Lal, Reconstruction and Education in India, London 1932, p- 27.
১২. বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫০ দ্বিতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, পৃ- ২৯৬, দ্র অমিতাভ চৌধুরী, জমিদার রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী ১৯৭৬ পৃ- ১৪।
১৩. প্রমথ চৌধুরী, রায়তের কথা, রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা, সবুজপত্র ১৩৩৩।
১৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পল্লীপ্রকৃতি, পৃ- ৭-৮। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা ১৩৯৩।
১৫. অমিতাভ চৌধুরী, জমিদার রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা ১৯৭৬।
১৬. রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রাবলী, দ্র. অমিতাভ চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ-৪৩।
১৭. রবীন্দ্রনাথের চিঠি, দ্র. অমিতাভ চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ- ২৫।
১৮.অমিতাভ চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ- ৩১-৩২।
১৯. প্রতিমা দেবীকে লেখা চিঠির অংশবিশেষ, দ্র. অমিতাভ চৌধুরী প্রাগুক্ত, পৃ- ৩৩।
২০. রবীন্দ্রনাথের চিঠি, দ্র. অমিতাভ চৌধুরী দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ- ৩৩-৩৪।
২১. অমিতাভ চৌধুরী, প্রাগুক্ত পৃ- ৪২।
২২. রবীন্দ্রনাথের চিঠি, অমিতাভ চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ- ৪২-৪৩।
২৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঐকতান, সঞ্চয়িতা, পুনমুর্দ্রণ ১৩৫৬ আশ্বিন কলিকাতা পৃ- ৮১৯-৮২৩।
২৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ওরা কাজ করে, প্রাগুক্ত, পৃ-৮২৮।
২৫. দ্র. অমিতাভ চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ- ২২।
২৬. প্রাগুক্ত, পৃ-২২।
২৭. প্রাগুক্ত, পৃ-২২।
২৮. প্রাগুক্ত, পৃ-২৪।
২৯. প্রাগুক্ত, পৃ-২২।
৩০. অমিতাভ চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ-৪৩।
৩১. রাশিয়ার চিঠি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্র. অমিতাভ চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ-২১।
৩২. রবীন্দ্র রচনাবলী, ৩য় খণ্ড পৃ-৬-৭, কলকাতা ১৩৪৭।
৩৩. দ্র. অমিতাভ চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ-২০।
৩৪. অমিতাভ চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ- ৭৭- ৭৮।
৩৫. অমিতাভ চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ- ৭৮।
৩৬. অমিতাভ চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ- ৭৮-৭৯।
৩৭. অমিতাভ চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ- ৭৮-৭৯।
৩৮. সবুজ যাত্রী, ভাদ্র ১৩২৮ (১৯২১) প্রবাসী আশ্বিন ১৩২৮।
৩৯. ঐ স্বদেশী সমাজ, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, পৃ-২৩।
৪০. ঐ, প্রাগুক্ত, পৃ- ২৪।
৪১. পল্লীপ্রকৃতি, পৃ- ১।

৪২. পল্লীপ্রকৃতি, পৃ- ২।
৪৩. পল্লীপ্রকৃতি, পৃ- ২।
৪৪. পল্লীপ্রকৃতি, পৃ- ২।
৪৫. পল্লীপ্রকৃতি, পৃ- ৩।
৪৬. পল্লীপ্রকৃতি, পৃ- ৩। ৪৭.
৪৭. পল্লীপ্রকৃতি, পৃ- ৪।
৪৮. Elmhirst, Rabindranath Tagore Pioneer in Education, London P-23
৪৯. Elmhirst, op. cit. P-12
৫০. Ibid
৫১. Ibid
৫২. L.K. Elmhirst, Ibid
৫৩. Ibid.
৫৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বদেশী সমাজ সংকলন সম্পাদনা : পুলিন বিহারী সেন, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পুনমুর্দ্রণ : ফাল্গুন ১৩৯৩, ১৯০৮, পৃ-১২। বাংলাদেশের জলকষ্ট নিবারণের সম্বন্ধে গভর্নমেন্টের মন্তব্য প্রকাশিত হওয়ার পর এই প্রবন্ধ লিখিত হয়। লিখিবার তারিখ ১৩১১।
৫৫. ঐ, স্বদেশী সমাজ প্রাগুক্ত, পৃ-১২।
৫৬. ঐ, পৃ-১৩।
৫৭. ঐ, পৃ-১৫।
৫৮. ঐ, পৃ-৯।
৫৯. ঐ, পৃ-৯।
৬০. ঐ, পৃ-১৪।
৬১. ঐ, পৃ-১৫।
৬২. ঐ, পৃ-২৫।
৬৩. ঐ, পৃ-৯৪-৯৫।
৬৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পল্লীপ্রকৃতি, পুলিন বিহারী সেন কর্তৃক সংকলিত, (প্রাগুক্ত) পৃ-১১।
৬৫. ঐ, পল্লীর উন্নতি, প্রাগুক্ত, পৃ-৩৪-৩৫।
৬৬. ঐ, পল্লী প্রকৃতি, ভূমিলক্ষ্মী, পৃ-৩৮।
৬৭. ঐ, পৃ-৩৯।
৬৮. ঐ, পৃ-৩৯-৪০।
৬৯. রামশরণ শর্মা, প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস, অনুঃ অঞ্জন গোস্বামী, ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলকাতা ১৯৯৬ পৃ-১৪১।
৭০. রামশরণ শর্মা, প্রাগুক্ত, পৃ-১৫৭।
৭১. ঐ, প্রাগুক্ত, পৃ-১৫৭।
৭২. ঐ, প্রাগুক্ত, পৃ-১৫৯।
৭৩. রামশরণ শর্মা, প্রাগুক্ত, পৃ-১৬৭।
৭৪. ঐ প্রাগুক্ত পৃ-১৬৭।
৭৫. ঐ পৃ- ১৬৭।

৭৬. Rabindranath Tagore, On the Edges of Time, Orient Longmans Pvt. Ltd. Calcutta, 1958, P-135.
৭৭. Kuryenson, Rural Reconstruction Principles and Methods, Madras 1950, P-7. The Committee of Secretary of East India Company reported in 1812.
৭৮. Ibid.
৭৯. Kuryenson, op, cit, P-7-8.
৮০. Kuryenson, op, cit, P-8-9.
৮১. Kuryenson, op, cit, P-10-11.
৮২. Kuryenson, op, cit, P-13.
৮৩. Kuryenson, op, cit, P-14-15.
৮৪. Kuryenson, op, cit, P-15.
৮৫. Kuryenson, , Ibid.
৮৬. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালির ইতিহাস, আদিপর্ব, কলকাতা, ২য় সংস্করণ, ১৪০২, পৃ-৩১১।
৮৭. প্রাগুক্ত, পৃ-৪৬৭।
৮৮. প্রাগুক্ত, পৃ-৩১৩।
৮৯. নীহাররঞ্জন রায়, পৃ-৩১১।
৯০. নীহাররঞ্জন রায়, পৃ-৩৪৭।
৯১. রামশরণ শর্মা, প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস, অনুবাদ, অঞ্জ গোস্বামী, কলকাতা ১৯৯৬, পৃ-৩০।
৯২. প্রাগুক্ত, পৃ-১৪১।
৯৩. প্রাগুক্ত, পৃ-১৪৬।
৯৪. প্রাগুক্ত, পৃ-৫১।
৯৫. প্রাগুক্ত, পৃ-১৯২।
৯৬. প্রাগুক্ত, পৃ-১৯৩।
৯৭. প্রাগুক্ত, পৃ-১৯৩, বৌধ্যায়ন ধর্মশ্রাস্ত্র, দ্র, রামশরণ শর্মা।
৯৮. প্রাগুক্ত, পৃ-১৯৩।
৯৯. প্রাগুক্ত, পৃ-১৮৫।
১০০. প্রাগুক্ত, পৃ-১৮৫।
১০১. প্রাগুক্ত, পৃ-১১৯।
১০২. প্রাগুক্ত, পৃ-১১৯।
১০৩. প্রাগুক্ত, পৃ-১১৯।
১০৪. অতীন্দ্র মজুমদার, চর্যাপদ, নয়াপ্রকাশ, কলকাতা, ২য় সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ ১৩৭৯।
১০৫. এম. এ. রহিম, বাংলা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৫ম পৃ-৩৪২।
১০৬. N.K. Bhatasali, Ibn. Battuta, Coins and chronology of the Early Independent Sultans of Bengal, Cambridge 1922, P-142.
১০৭. Ibid.
১০৮. Ibid.

১০৯. বিশ্বভারতী এ্যানালস, ১৯৪৫, ১ম খণ্ড, পৃ-৯৯-১৩২।
১১০. প্রাগুক্ত। দ্র. আইন-ই-আকবরী, আল্লামা আবুল ফজল, বিবলিয়োথিকা, ইণ্ডিকা, কলকাতা, অনুবাদ জ্যারেট, ১ম খণ্ড, পৃ-১৩০।
১১১. Virana Pillai, Rural India, Women's Welfare Journal, Madras, India 1950. Kuryenson, op, cit P-19-24.
১১২. Kuryenson, op, cit P-32-33.
১১৩. Kuryenson, op, cit P-41.
১১৪. মোহাম্মদ সাদেক ও আব্দুল হালিম বাংলাদেশের সমষ্টি উন্নয়ন ও পল্লী পুনর্গঠন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭৬, পৃ- ৩৬
১১৫. প্রগুক্ত।
১১৬. হান্টার, ডব্লিউ, পল্লী বাংলার ইতিহাস (অনুবাদ), বাংলা একাডেমী ১৯৬৯, পৃ-৩০।
১১৭. বদরুদ্দীন উমর, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাংলাদেশের কৃষক, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা ১৩৭৯, পৃ-৫।
১১৮. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মজীবনী (সম্পাদনা সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, পরিবর্তিত সংস্করণ, কলকাতা ১৯৬২, পৃ-৮৫-৮৬ দ্র.
১১৯. শচীন্দ্রনাথ অধিকারী, শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ কলকাতা ১৯৭৪, পৃ-৪৩।
১২০. অমিতাভ চৌধুরী, জমিদার রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী কলকাতা, ১৯৭৬, পৃ-৯-১০।
১২১. প্রাগুক্ত।
১২২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পল্লীপ্রকৃতি, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা ১৯৬২, পৃ-২২৪-২২৫।
১২৩. R.C. Dutt, The Economic History of India in the Victorian Age K London Paul, Trench, London.
১২৪. Trilrener London 2Co.
১২৫. Quoted in Premchand Lal, Reconstruction and Education In Rural India, London George Allen and Unuin Ltd. Museum Street, 1932, P-32
১২৬. Prem Chand Lal, op. cit p-33.
১২৭. Prem Chand Lal, op. cit p-33.
১২৮. Prem Chand Lal, op. cit p-34.
১২৯. po. eit. P-34-35
১৩০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিক্ষার হেরফের, শিক্ষা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা ১৩৯৭, পৃ-৮।
১৩১. ঐ, প্রাগুক্ত, পৃ-১০-১১।
১৩২. Rabindranath Tagore, Nationalism, Viswa-Bharati, Calcutta, P-31-32.
১৩৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ছাত্র সম্ভাষণ, শিক্ষা, ঐ, প্রাগুক্ত, পৃ-২৫৮-২৫৯।
১৩৪. ঐ, প্রাগুক্ত, পৃ-২৪-২৫।
১৩৫. ঐ, প্রাগুক্ত, পৃ-১৩২।
১৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ-১৯৭।
১৩৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ছাত্র সম্ভাষণ, শিক্ষা, ঐ, প্রাগুক্ত, পৃ-২৫৮-২৫৯।
১৩৮. ঐ, প্রাগুক্ত, পৃ-২৯-৩০।
১৩৯. Prem Chand Lal, Reconstruction and Education in Rural India, Introduction by Rabindranath Tagore, London 1932, P-15.

১৪০. দ্র. সুধীরকরণ, লোকায়ত রবীন্দ্রনাথ, কলকদাতা, ১৯৯৪ পৃ-১০৫।
১৪১. মোহিতলাল মজুমদার, রবি-প্রদক্ষিণ, কলকাতা, দ্র. সুধীরকরণ, প্রাগুক্ত, পৃ-১১৫।
১৪২. বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৬৩ দ্র. সুধীরকরণ, প্রাগুক্ত, ১১৬।
১৪৩. দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, ঠাকুরমার ঝুলি; ভূমিকা
১৪৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুধীরকরণ, প্রাগুক্ত, পৃ-১১৪-১১৫।
১৪৫. রবীন্দ্রনাথ, হিন্দু মুসলমান, কালান্তর, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৩ শ খণ্ড, জন্মশত সংস্করণ, কলকাতা ১৯৬৯, পৃ-৬৮।
১৪৬. উদ্ধৃতি, দ্র. সুধীরকরণ, কল্যাণবতী, রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা, পৃ-৬৮।
১৪৭. গোলাম মুরশিদ, রবীন্দ্রবিশ্বে পূর্ববঙ্গ ; পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮১, পৃ-৪৭।
১৪৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ধর্ম, রবীন্দ্র রচনাবলী (অচলিত) ২, পৃ-৩৬।
১৪৯. চিঠিপত্র, ৬ সংখ্যক, রবীন্দ্র রচনাবলী, ২ পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা, বিশ্বভারতী ১৯৬৫, পৃ-৫২৭।
১৫০. রবীন্দ্র রচনাবলী, ষোড়শ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃ-৩৫৬-৩৫৭।
১৫১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আশীর্বাদ, মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন, হারামণি (৮ম খণ্ড) বাংলা একাডেমী ঢাকা, জুন ১৯৭৬ পৃ-১-৪।
১৫২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্যাধি ও প্রতিকার, রবীন্দ্র রচনাবলী, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃ-৯০৯।
১৫৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবারিত, খেয়া, রবীন্দ্র রচনাবলী, পৃ-২৬১।
১৫৪. সুধীরচন্দ্র কর, কল্যাণবতী, রবীন্দ্রনাথ, প্রাগুক্ত, পৃ-৬৭।
১৫৫. রবীন্দ্র জীবনী, প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, পৃ-৪৫৬।
১৫৬. রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কার সমিতি, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, পৃ-১৫৭।
১৫৭. আনদবাহার পত্রিকা, ১৩ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩, কলিকাতা।
১৫৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নবযুগ, কলকাতা, পৃ. ৩৯৪।
১৫৯. নেপাল মজুমদার ভারতের জাতীয়তা, কলকাতা পৃ. ৩৮৩।
১৬০. আর সায়ীদ আইয়ুব, নাস্থজনের শাখা, কলকাতা, পৃ. ১৮৩।

দ্বিতীয় অধ্যায়
শিলাইদহ পর্ব

শিলাইদহ পরিচিতি

নীহাররঞ্জন রায় রচিত 'বাঙালির ইতিহাস' আদিপর্বে শিলাইদহকে একটি নদী নামে অভিহিত করা হয়েছে। গড়াই, মাথাভাঙা নদীর মতো শিলাইদহ একটি নদী হতে পারে এমন ধারণা নীহাররঞ্জন রায়ের হয়েছিল। ফরিদপুরে প্রাপ্ত ধর্মাদিত্যের একটি পট্টোলিতে শিলাকুণ্ড নামে একটি জলাশয়ের উল্লেখ থাকায় তাঁর মনে হয়েছিল শিলাকুণ্ড এবং শিলাইদহ অনেকটা একই হতে পারে। 'কুণ্ড' এবং 'দহ'- এই দুয়ের অর্থ এক। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য, মুঘল আমল পর্যন্ত কুষ্টিয়ার চতুর্দিক একটি বিস্তীর্ণ জলাশয়ে নিমগ্ন ছিল। এই বিশাল জলাশয়ের মধ্যে কুষ্টিয়া ছিল একটি ছোট ভূখণ্ড। একারণে এই ভূখণ্ডকে মুঘল আমলে 'কোস্তাহ' নামে অভিহিত করা হয়। 'কোস্তাহ' ফারসি শব্দ এবং এর অর্থ ছোট দ্বীপ বা ভূখণ্ড। এদিক থেকে বিবেচনা করলে শিলাইদহ অতীতে যে একটি জলাশয় ছিল এমন ধারণা অসংগত নয়। বৌদ্ধযুগে লিখিত চর্যাগীতিকায় গঙ্গাকে বড়গাঙ এবং পদ্মা'কে 'খাল' নামে অভিহিত করা হয়েছে। শিলাইদহ নামকরণের ক্ষেত্রে কেউ-কেউ নীলকর শেলীর নাম যুক্ত করতে চায়। কারণ, শেলী ছিল একজন অত্যাচারী নীলকর ব্যবসায়ী। সে অনেক সময় গ্রামের নীলবিদ্রোহীদের পদ্মানদীর আবর্তে ফেলে দিত। অবশ্য এই প্রস্তাবনা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। কারণ, শিলাইদহ এই নামটি অতি প্রাচীন এবং একটি জলাশয়ের নাম হিসেবে ইতিহাসে তা চিহ্নিত ছিল। সে যাই হোক, কালক্রমে গাঙ্গেয় অঞ্চল যেমন ভরাট হয়ে গেছে তেমনি পদ্মাও। এই প্রসঙ্গে সমগ্র বঙ্গদেশকে নিয়ে আধুনিক কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত একটি কবিতার উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে:

ভৌগোলিক
হিমালয় নাম মাত্র,
আমাদের সমুদ্র কোথায়?
টিমটিম করে শুধু খেলে দুটি বন্দরের বাতি।
সমুদ্রের দুঃসাহসী জাহাজ ভেড়ে না সেথা;
-তাম্রলিপ্তি সকরুণ স্মৃতি।
দিগন্ত-বিস্তৃত স্বপ্ন আছে বটে সমতল সবুজ খেতের,

কত উগ্রণদী সেই স্বপনেতে গেল মজে-হেজে;
একা পদ্মা মরে মাথা কুটে।
উত্তরে উত্তুঙ্গ গিরি
দক্ষিণেতে দুরন্ত সাগর
যে দারুণ দেবতার বর
মাঠভরা ধান দিয়ে শুধু
গান দিয়ে নিরাপদ খেয়াতরণীর
পরিতৃপ্ত জীবনের ধন্যবাদ দিয়ে
তারে কভু তুষ্ট করা যায়!
ছবির মতন গ্রাম
স্বপনের মতো শহর
যত পারো গড়ো,
অর্চনার চূড়া তুলে ধরো
তারাদের পানে;
তবু জেনো আরো এক মৃত্যুদীপ্ত মানে
ছিল এই ভূখণ্ডের,
-ছিল সেই পাহাড়ের দেবতার মনে।
সেই অর্থ লাঞ্ছিত যে, তাই
আমাদের সীমা হল
দক্ষিণে সুন্দরবন
উত্তরে টেরাই।

এই কবিতায় অনেক ঐতিহাসিক-তথ্য রয়েছে। কীভাবে একদিন নদীমাতৃক বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিল এবং তারপর প্রায় সব নদীই 'হেজে-মজে' গেছে। বাকি থেকেছে যে পদ্মা, তাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ, তাও আজ শুষ্ক হয়ে পড়েছে পানির প্রবাহ না থাকায়। এই পদ্মার বুক চিরে আজ পথ বেরিয়ে এসেছে– এ দুঃখতো বাংলা ভাষা-ভাষী সকল মানুষের। যা হোক, বর্তমান কুষ্টিয়া জেলা ব্রিটিশ আমলের নদীয়া জেলার একটি মহকুমা যা তখনকার অন্য দুটি মহকুমা চুয়াডাঙ্গা এবং মেহেরপুরকে নিয়ে বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলায় পরিণত হয়েছিল। সাম্প্রতিককালে অতীতের কুষ্টিয়া মহকুমাকে নিয়েই গড়ে উঠেছে বর্তমান কুষ্টিয়া জেলা। এই জেলায় বর্তমানে ছয়টি উপজেলা, যেমন :

০১. দৌলতপুর
০২. ভেড়ামারা
০৩. মীরপুর
০৪. কুষ্টিয়া সদর
০৫. কুমারখালি
০৬. খোকসা

কুষ্টিয়া সদরের পূর্ব পাশে কুমারখালি উপজেলার অন্তর্ভুক্ত একটি গ্রামের নাম শিলাইদহ। কুষ্টিয়া শহর থেকে এর দূরত্ব প্রায় আট মাইল। কুমারখালি

থেকে দূরত্ব প্রায় ৪ মাইল। কুষ্টিয়া শহর থেকে গড়াই নদী অতিক্রম করে অপর পাশের ঘোড়াঘাট থেকে শিলাইদহের কুঠিবাড়ির দূরত্ব ছয় মাইল। রেলযোগে কুমারখালি বা চড়াইকোল স্টেশন অথবা কুষ্টিয়া অথবা কুষ্টিয়া কোর্টস্টেশনে নেমে সড়ক ও নদীপথে শিলাইদহে যাওয়া যায়। ঘোড়াঘাট থেকে সরাসরি কুঠিবাড়ি পর্যন্ত রাস্তার নাম রবীন্দ্রসড়ক। এখানে প্রচুর রিকসা-ভ্যান পাওয়া যায়। সড়কপথে গড়াইব্রিজ অতিক্রম করে চড়াইকোল দিয়ে সহজেই শিলাইদহের কুঠিবাড়ি যাওয়া যায়। শিলাইদহের উত্তর পাশে পদ্মা এবং দক্ষিণে গড়াই। নদীপথে গড়াই দিয়ে কিছুটা পশ্চিমে এসে তালবাড়িয়া গ্রামের পূর্বপাশ দিয়ে প্রবাহিত পদ্মানদী দিয়ে শিলাইদহে যাওয়া যায়। তালবাড়িয়া গ্রামের পূর্ব পাশের ছোটো ভূখণ্ড বর্তমানে পুরাতন কুষ্টিয়া নামে পরিচিত। অতীতে এখানে স্টিমার ও লঞ্চঘাট ছিল। রবীন্দ্রনাথ কুষ্টিয়া থেকে নদীপথে বজরা নিয়ে কখনও কখনও এই পুরাতন কুষ্টিয়ার পাশ দিয়ে শিলাইদহে গেছেন। পদ্মা ও গড়াই নদীর এক সময়ের সঙ্গমস্থল শিলাইদহের কুঠিরহাট। বর্তমানে এই সঙ্গমস্থল আরও পশ্চিমে সরে গেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কোপাই' কবিতায় এই কুঠিরহাটের কথা বলেছেন। শিলাইদহের অনতিদূরে পূর্ব পাশে গোপীনাথের মন্দির সংলগ্ন খোরশেদপুর বাজার। অতীতে ব্রিটিশ শাসনামলে কুমারখালি থানা পাবনা জেলার একটি শহর ছিল। শিলাইদহের উত্তর পার্শ্বে পাবনা শহর। শিলাইদহ থেকে দূরত্ব প্রায় ৮ মাইল। এখনও পায়ে-চলা পথে কুমারখালি থেকে শিলাইদহ এসে পদ্মানদী পার হয়ে পাবনা শহরে যাওয়া যায়।

পদ্মা থেকে ইছামতি নদী বের হয়ে পাবনা শহরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত। বর্তমানে ইছামতি নদী বিশাল চরে পরিণত হয়েছে। পাবনা শহর সংলগ্ন গঞ্জ-বাজিতপুর পদ্মানদীর উত্তর সীমায়। পাবনা শহরও পদ্মাতীরে। শিলাইদহ একসময়ে নীলচাষের জন্য বিখ্যাত ছিল। এখানে একসময়ে শেলী নামে এক অত্যাচারী সাহেব বসবাস করত। শিলাইদহ রবীন্দ্রকুঠির সন্নিকটে ছিল বুনো-বাগদী, বিন্দিদের পাড়া। রবীন্দ্রনাথ এদেরকে 'রাজবংশী' বলে তাঁর 'কোপাই' কবিতাটিতে অভিহিত করেছেন। এই কবিতায়ও নীলকরদের কুঠিবাড়ির কথা বলা হয়েছে। নীলকরদের এই কুঠিবাড়ি তিনতলাবিশিষ্ট ছিল। পাশে ছিল ঝাউগাছের সারি। এখানে নীলকর শেলী এবং তাঁর মেমসাহেবের কবর আছে। আমি ১৯৫৫-৫৬ সালে এই নীলকুঠি ভগ্নাবস্থায় দেখেছি। এই কুঠির পশ্চিমে ছিল কুঠিরহাট এবং গঞ্জ।

শিলাইদহ জমিদারি এস্টেট

পৈতৃক সূত্রেই রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশে তাঁদের 'ঠাকুর-এস্টেট'-এর জমিদার হয়েছিলেন। তাঁর আগে তাঁর দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং অন্যদের ওপর এই দায়িত্ব অর্পিত ছিল। কিন্তু অন্যরা যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হওয়ায় পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথকেই এই দায়িত্ব প্রদান করেন। 'ঠাকুর-এস্টেট'

সম্পর্কে জানা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পিতামহ নীলমণি ঠাকুর ছিলেন ঠাকুর এস্টেটের প্রতিষ্ঠাতা।[১] রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন যশোরের পিরালি ব্রাহ্মণ। এই বংশের পুরুষোত্তম কুশারীর বংশধর পঞ্চানন কুশারী যশোর ছেড়ে কলকাতায় আসেন। তিনি ইংরেজ সাহেবদের সঙ্গে কলকাতা বন্দরে কাজ করবার সময় ঠাকুর পদবি লাভ করেন। পঞ্চাননের পৌত্র ও জয়রামের জ্যেষ্ঠপুত্র নীলমণি ঠাকুর কলকাতায় ব্যবসা করে প্রচুর ধনসম্পদের মালিক হন। অতঃপর তিনিই জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির পত্তন ঘটান। আজ যে ভবনটি 'রবীন্দ্রভারতী' নামে পরিচিত সেটিও তৈরি করেছিলেন 'নীলমণি ঠাকুর'।

নীলমণির ভাই দর্পণারায়ণ পাথুরিয়াঘাটায় জমি কিনে সেখানে বসবাস শুরু করেন। নীলমণি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিতে চাকরি করতেন। এই নীলমণি ঠাকুরের পৌত্র ছিলেন রবীন্দ্রনাথের পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। দ্বারকানাথ ঠাকুর পিতা রাজমণি ঠাকুরের দ্বিতীয় সন্তান ছিলেন। নীলমণি ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ সন্তান এবং রাজমণির অগ্রজ রামলোচনের কোনো সন্তানাদি না থাকায় তিনি দ্বারকানাথকে পালকপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। রামলোচন ও তাঁর পিতা নীলমণির মতো বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন এবং অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে বেশ কিছু ভূসম্পত্তি খরিদ করেন। অতঃপর রামলোচন ও দ্বারকানাথ নদীয়া (বর্তমানে কুষ্টিয়া) জেলার বিরাহিমপুর (ইব্রাহিমপুর?) পরগনা (সদর শিলাইদহ), পাবনা জেলার সাজাদপুর পরগনা (সদর সাজাদপুর), রাজশাহী জেলার কালীগ্রাম পরগনা (সদর পতিসর) এবং ওড়িশার কটক জেলার পাণ্ডুয়া, বালিয়া, প্রহরাজপুর, শরগড়া ইত্যাদি তৌজির জমিদারি লাভ করেন। এর আগেই নীলমণি ঠাকুর ওড়িশার জমিদারি খরিদ করেছিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুরই বলা চলে, এসব সম্পত্তি নিজবুদ্ধি-বলেই খরিদ করেছিলেন। এ ছাড়াও তিনি আরও বেশ কিছু ভূসম্পত্তি ক্রয় করেছিলেন, যেমন পশ্চিমবঙ্গে নূরনগর পরগনা, হুগলির মৌজা আয়মা- হরিপুর, পাবনার পত্তনী-তালুক তরফ চাপড়ি, রংপুরে স্বরূপপুর, যশোরে মহম্মদশাহী ইত্যাদি এলাকা। পশ্চিমবাংলার মেদিনীপুর ও ত্রিপুরা রাজ্যের কমলপুর মহকুমায় বেশ কিছু জমিদারি দ্বারকানাথ খরিদ করেছিলেন বলে শোনা যায়। কিন্তু এসবের কোন দলিল ইত্যাদি পাওয়া যায় নি।

বস্তুত, নীলমণি ঠাকুর এবং তাঁর পুত্র রামলোচন জমিদারির গোড়াপত্তন করলেও জমিদারি শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছিলেন দ্বারকানাথ। ঠাকুর এস্টেট সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'আত্মজীবনী' তে। এখানে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন :

> "আমার পিতা ১৭৬৩ শকের পৌষমাসে (৯ই জানুয়ারি ১৮৪২) য়ুরোপে প্রথমবার যান। তখন তাঁহার হাতে হুগলী, পাবনা, রাজশাহী, কটক, মেদিনীপুর, রংপুর, ত্রিপুরা প্রভৃতি জেলার বৃহৎ বৃহৎ জমিদারি এবং নীলের কুঠি সোরা, চিনি, চা প্রভৃতি বাণিজ্যের বিস্তৃত ব্যাপার। ইহার সঙ্গে আবার রাণীগঞ্জে কয়লার খনির কাজও চলিতেছে। তখন আমাদের সম্পদের মধ্যাহ্ন সময়। তাঁহার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে তিনি

> বুঝিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতে এই সকল বৃহৎ কার্যের ভার আমাদের হাতে পড়িলে আমরা তাহা রক্ষা করিতে পারিব না। আমাদের হাতে পড়িয়া যদি বাণিজ্য-ব্যবসায় কার্যের পত্তন হয়, তবে স্বোপার্জিত যে সকল বৃহৎ বৃহৎ জমিদারি আছে তাহাও তাঁহার সঙ্গে বিলুপ্ত হইবে, এবং পৈতৃক বিষয় বিরাহিমপুর ও কটকের জমিদারিও থাকিবে না। তাঁহার বাণিজ্য ব্যাপারের ক্ষতিতে আমরা যে পূর্বপুরুষদিগের বিষয় হইতেও বঞ্চিত হইব, এইটিই তাঁহার মনে অতিশয় চিন্তার বিষয় ছিল। অতএব, য়ুরোপে যাইবার পূর্বে, ১৭৬২ শকে (১৮৪০ সালের ২০শে আগস্ট) আমাদের পৈতৃক বিষয় বিরাহিমপুর ও কটকের জমিদারির সঙ্গে তাঁহার স্বোপার্জিত ডিহি সাহাজাদপুর ও পরগনা কালীগ্রাম একত্র করিয়া এই চারিটি সম্পত্তির উপরে একটি ট্রাস্টডীড লিখিয়া তিনজন ট্রাস্টি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ঐ সমস্তের অধিকারী তাঁহারাই হইলেন, আমরা কেবল তাহার উপস্বত্বভোগী রহিলাম। তাহার এই কার্যে আমাদের প্রতি তাঁহার স্নেহ ও সূক্ষ্ম ভবিষ্যৎদৃষ্টি, উভয়ই প্রকাশ পাইয়াছে।
>
> তিনি প্রথমবার য়ুরোপ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহার ছয় মাস পরে, ১৭৬৫ শকের ভাদ্রমাসে (১৬ই আগস্ট ১৮৪৩) একটা উইল করিলেন। তাহাতে তাঁহার সমুদয় বিষয় আমাদের তিন ভাইকে সমানভাগে বিভাগ করিয়া লিখিয়া দিয়াছিলেন। ভদ্রাসন বাড়ি আমাকে, তেতলার বৈঠকখানা বাড়ি আমার মধ্যমভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথকে এবং বাড়ি নির্মাণের জন্য ২০০০০/= টাকার সহিত ভদ্রাসন বাড়ির পশ্চিম প্রাঙ্গণের ভূমি সমুদয়টা আমার কনিষ্ঠভ্রাতা নগেন্দ্রনাথকে দিয়া গিয়াছিলেন।"[২]

জমিদারি ঠাকুর এস্টেটের প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ভোগদখল করেন। অতঃপর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই সম্পত্তি লাভ করেন এবং এর যথাযথ পরিচালনার ব্যবস্থা নেন। ঠাকুর এস্টেটের দেখাশুনার জন্য তিনি প্রায় চার বার শিলাইদহে গিয়েছিলেন। তবে এ সময়ে তিনি ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে বেশ ব্যস্ত থেকেছেন। শেষ বয়সে তিনি শিলাইদহ অঞ্চলে জমিদারি দেখতে না পারায় তাঁর জ্যৈষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তার পরে দ্বিপেন্দ্রনাথ এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উপর দায়িত্ব অর্পণ করেন। কিন্তু তাঁরা অনেকটা ব্যর্থ হওয়ায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর দৌহিত্র সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপর জমিদারি দেখাশুনার ভার দেন। সত্যপ্রসাদ শিলাইদহে স্থায়িভাবে বসবাস করেন এবং এখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর এ দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথের উপর বর্তায় রবীন্দ্রনাথ ১৮৮৩ সালে ৭ নভেম্বর ২২ বৎসর বয়সে এবং বিবাহের দুদিন পূর্বে পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক ঠাকুর এস্টেটের জমিদারি দেখা-শুনার সাময়িক দায়িত্ব লাভ করেন। অন্য কোন পুত্র এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারবে না এমন বিশ্বাসের কারণে রবীন্দ্রনাথের উপর এই গুরু দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল।

এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে লেখা পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠির উল্লেখ করা যেতে পারে।

> "এইক্ষণে তুমি জমিদারি কার্য পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য প্রস্তুত হও। প্রথমে সদর কাছারিতে নিয়মিত রূপে বসিয়া সদর আমিনের নিকট হইতে জমা ওয়াশীল বাকি ও জমাখরচ দেখিতে থাক এবং প্রতিদিনের আমদানি-রফতানি পত্র সকল দেখিয়া তার সারমর্ম নোট করিয়া রাখ। প্রতি সপ্তাহে আমাকে তাহার রিপোর্ট দিলে উপযুক্ত মতে তোমাকে আমি উপদেশ দিব এবং তোমার কার্যে তৎপরতা ও বিচক্ষণতা আমার প্রতীতি হইলে আমি তোমাকে মফস্বলে কার্য করিবার ভার অর্পণ করিব।"
>
> তারিখ ২২ অগ্রহায়ণ ৫৪ ব্রাহ্মঅব্দ। (শচীন্দ্রনাথ অধিকারী, শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭৪ সং পৃ.১০। প্রভাতকুমার মুখোপধ্যায়ের রবীন্দ্রজীবনী ১ম খণ্ডে পত্রটি উদ্ধৃত। ১৩৫৩ সং পৃ. ১৪৯।)

দেবেন্দ্রনাথ প্রথমেই রবীন্দ্রনাথকে ঠাকুর এস্টেটের সর্বময় কর্তৃত্ব প্রদান করেন নি। পরীক্ষামুলকভাবে দায়িত্ব পালন শুরু করলেও নিষ্ঠা ও সততার মাধ্যমে কাজ করে পিতার বিশ্বাস অর্জন করার পরই ১৮৯০ সাল থেকে তিনি পুরোপুরিভাবে জমিদারি পরিদর্শনের দায়িত্ব লাভ করেন। অতঃপর একাজে তাঁর বিচক্ষণতা ও দক্ষতা দেখে পিতা দেবেন্দ্রনাথ ১৮৯৬ সালের ৮ আগস্ট অ্যাটর্নির মাধ্যমে বিধিবধ্যভাবে রবীন্দ্রনাথের হাতে সমস্ত জমিদারির দায়িত্ব অর্পণ করেন। এতে লেখা আছে:

> "The said Devendranath Tagore desirous of nominating constituting and appointing his son Rabindranath Tagore of no.6 Dwaraknath Tagore`s Lane in Calcutta aforesaid his true and lawful attorney for his and in his name and on his behalf to enter into carryout and complete the said agreement and the said partition now know ye that I, said Devendranath Tagore have nominated constituted and appointed and do hereby nominate constitute and appoint my said son Rabeindranath Tagore, my true and lawful attorney for me, in my name and on my behalf to enter into make sign seal execute deliver acknowledged presented and perform any contract, agreement, petition, deed, writing or things that may in the opinion of my said attorney be necessary or proper to be entered into made signed sealed executed delivered acknowledged presented and performed for effectuating the purposes aforesaid or any of them..."

এই পাওয়ার অফ অ্যাটর্নিতে দেবেন্দ্রনাথ স্বাক্ষর করেছেন। অ্যাটর্নি হিসেবে স্বাক্ষর আছে মোহিনীমোহন বন্দোপধ্যায়ের। রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষর রয়েছে। রেজিস্ট্রি হয়েছে ১০ই আগস্ট ১৮৯৬। (রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত পারিবারিক কাগজপত্র, নথি নং ৬৯, তারিখ ৮ আগস্ট-১৮৯৬; Ace n – no. 41) তিনি তা সফলতার সাথে পালন করেন। শিলাইদহে ঠাকুর এস্টেটের জমিদারি থাকাকালীন শিলাইদহের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে নাটোর, কাশিমবাজার, নড়াইল, নলডাঙ্গা প্রভৃতি রাজাদের রাজ্য ছিল।

বিরাহিমপুর পরগনার জমিদারি ঠাকুরবাবুদের হলেও পদ্মানদীর জলকরের মালিক ইজারাসূত্রে ছিলেন কুষ্টিয়ার আমলা সদরপুরের জমিদার গোপীসুন্দরী দাসী। তিনি রবীন্দ্রনাথের উপর অনেকটা নির্ভরশীল ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ জলকর সম্পর্কীয় মামলার ক্ষেত্রে জমিদার গোপীসুন্দরী দাসীকে সহায়তা করেন ও সেসবের নিষ্পত্তি করে দেন।[৩] শিলাইদহ অঞ্চলে রবীন্দ্রনাথের কয়েক মাইলব্যাপী চরমহল ছিল। এসব চরমহল থেকে রবীন্দ্রনাথের জমিদারিতে মোটা অঙ্কের আয় আসত। এই চরমহলের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রবীন্দ্রনাথ যথাযথ ব্যবস্থা করেন- যা তাঁর জমিদারি পরিচালনার ক্ষেত্রে বিচক্ষণতার পরিচয় ছিল। ঠাকুর এস্টেটের জমিদারির মালিকানা নিম্নোক্তভাবে নির্ধারিত ছিল :

০১. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর– বিরাহিমপুর পরগনার (শিলাইদহ) নদীয়া জেলা।

০২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর– কালীগ্রাম পরগনার (পতিসর) রাজশাহী জেলা।

০৩. দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর– ইজারাসূত্রে বিরাহিমপুর এবং কালীগ্রামের এক-তৃতীয়াংশ।

প্রাথমিক পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিলাইদহ অঞ্চলেই ঠাকুর এস্টেটের জমিদারি দেখাশুনা করেছেন এবং এখানেই তিনি পল্লীউন্নয়ন সম্পর্কীয় নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন।

শিলাইদহ বিরাহিমপুর পরগনার অন্তর্গত ছিল এবং এটিই ছিল ঠাকুর এস্টেটের প্রাচীন জমিদারি। সাজাদপুরের জমিদারির মালিক ছিলেন রবীন্দ্রনাথের কাকা গিরীন্দ্রনাথ (১৮২০-৫৪) পরে তাঁর পুত্র গুণেন্দ্রনাথ (১৮৪৭-৮১)। তিনি তিন নাবালক-পুত্র গগণেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ এবং অবনীন্দ্রনাথকে রেখে মারা যান। জমিদারি আলাদা হলেও নাবালকদের অভিভাবক হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে এই সম্পত্তি দেখাশুনা করতে হতো। সাজাদপুরের জমিদারি শিলাইদহ অপেক্ষা দ্বিগুণ বড় ছিল। ওড়িশার (উড়িষ্যা) কটক জেলায় ঠাকুর এস্টেটের যে জমিদারি ছিল তার মালিক ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ভাই এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথ (১৮৪৪-১৮৮৪)। তাঁর মৃত্যুর পর হেমেন্দ্রনাথের সন্তানেরা নাবালক হওয়ায় এ সম্পত্তির দেখাশুনার ভারও রবীন্দ্রনাথের উপর

পড়ে। এ জমিদারিও ছিল বেশ বড়। প্রসংগত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শিলাইদহ ও পতিসর এই দুই জমিদারির মালিক দ্বিজেন্দ্রনাথ (১৮৪০-১৯২৬), সত্যেন্দ্রনাথ (১৮৪২-১৯২৩) ও রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) হলেও মূল দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথকেই পালন করতে হয়েছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবিতকালে ঠিক হয় যে, ইজারাসূত্রে সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ এই দুই জমিদারির মালিক থাকবেন এবং তারা উভয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বার্ষিক ৪৫ হাজার টাকা দেবেন। প্রাথমিক পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথকে চার জমিদারি দেখাশুনার ভার দেওয়া হয় এবং পরবর্তীকালে পাওয়ার অব অ্যাটর্নির মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথকে এই চার জমিদারির সর্বময় দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘদিন সফলতার সাথে এই চার জমিদারি দেখাশুনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর পরিশ্রম অতিশয় হয়ে যাওয়ায় রবীন্দ্রনাথের বাবা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরবর্তীতে তাঁকে বিরাহিমপুর পরগনার শিলাইদহ এবং কালীগ্রাম পরগনার পতিসর এই দুই জমিদারির কর্তৃত্ব প্রদান করেন। রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথ সরকারি পদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন এবং জমিদারি পরিচালনার বিষয়ে নির্লিপ্ত ছিলেন। ফলে এই দুই জমিদারি পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথ নিজপুত্র রথীন্দ্রনাথ ও জামাতা নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীকে এবং ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথকে সম্পৃক্ত করেন। ১৯০৫ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর পর জমিদারি ভাগ হয়ে যায়। শিলাইদহের মালিক হন সত্যেন্দ্রনাথের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। অবশ্য এর আগে ঠাকুরবাড়ির জামাতা সত্যেন্দ্রনাথের কন্যা ইন্দিরা দেবীর স্বামী প্রমথ চৌধুরী কিছুদিন ম্যানেজিং এজেন্টরূপে কাজ করেন। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমলেই শিলাইদহের জমিদারির অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। অতঃপর শিলাইদহ জমিদারি ভাগ্যকুলের জমিদারদের নিকট প্রথমে বন্ধক ও পরে দেনার দায়ে তা হস্তান্তরিত হয়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথ দায়িত্বপ্রাপ্ত জমিদার হিসেবে শিলাইদহ জমিদারিতে পল্লীউন্নয়নের যে পরিকল্পনা ও কর্মকাণ্ড শুরু করেন তা সফলতার দিকে এগুলেও মালিকানা অন্যের হাতে চলে যাওয়ায় রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এসব পরিকল্পনা শিলাইদহে বাস্তবায়ন করা সম্ভবপর হয় নি। কিন্তু কালীগ্রাম পরগনার পতিসরে তাঁর নিজস্ব জমিদারিতে তিনি পল্লীউন্নয়নের কাজে অনেকটা সফলতা অর্জন করেন। পতিসরে তাঁর জমিদারি পরবর্তীকালে শেষ হবার পর রবীন্দ্রনাথ তাঁর পল্লীউন্নয়ন পরিকল্পনা পশ্চিমবাংলার বোলপুরে প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন এবং শ্রীনিকেতনে সফলতার সঙ্গে বাস্তবায়িত করেন।

শিলাইদহের কুঠিবাড়ি

শিলাইদহ এবং শিলাইদহের কুঠিবাড়ি রবীন্দ্রনাথের কল্যাণে জগৎদ্বিখ্যাত হয়েছে। জমিদারি দায়িত্ব নেবার পর রবীন্দ্রনাথ স্থায়িভাবে শিলাইদহে থেকেছেন। এখান থেকেই তিনি তৎকালীন পূর্ববাংলা এবং বর্তমানের বাংলাদেশে তাঁর জমিদারি যা কুষ্টিয়া, পাবনা এবং রাজশাহী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল-- ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং এখান থেকেই তিনি যেমন তাঁর সাহিত্য ও সংগীতের উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন তেমনি এতদঞ্চলে তিনি তাঁর পল্লীউন্নয়নের কর্মসূচিও প্রয়োগ করেছিলেন। শিলাইদহ ব্যতিরেকে সাজাদপুর এবং পতিসরে কুঠিবাড়ি থাকলেও শিলাইদহেই তিনি দীর্ঘকাল স্থায়িভাবে বসবাস করেছেন। ফলে দেশী-বিদেশী অভ্যাগতগণ এখানেই তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়েছেন।

ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথ যখন শিলাইদহে প্রথম আসেন তখন শিলাইদহের জমিদারি দেখাশুনার ভার ছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উপর। এ সময় পর্যন্ত বর্তমান কুঠিবাড়ি নির্মিত হয় নি।

রবীন্দ্রনাথ এবং পরিবারের অন্যরা তখন নীলকর সাহেবদের কুঠিবাড়িতে বসবাস করতেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছেলেবেলা' সম্পর্কে বলতে গিয়ে শিলাইদহে নীলকর সাহেবদের কুঠি সম্বন্ধে বলেন :

> "পুরোনো নীলকুঠি তখনো খাড়া ছিল। পদ্মা ছিল দূরে। নিচের তলায় কাছারি, উপরের তলায় আমাদের থাকবার জায়গা। সামনে খুব মস্ত একটা ছাদ। ছাদের বাইরে বড় বড় ঝাউগাছ, এরা একদিন নীলকর সাহেবের ব্যবসার সঙ্গে বেড়ে উঠেছিল। আজ কুঠিয়াল সাহেবের দরবার একেবারে থমথম করছে।"[৪]

রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ ভবন নির্মিত হয় ১৮৯২ সালের শেষদিকে।[৫] নীলকর সাহেবদের ভগ্নকুটিরের মাল-মশলা নিয়ে বর্তমান 'রবীন্দ্রকুঠি' নির্মিত হয়। শিলাইদহ গ্রামের উত্তরপ্রান্তে প্রায় তেরো বিঘা জমির উপর 'রবীন্দ্রকুঠি' অবস্থিত। কুঠিবাড়ির মধ্যস্থলে বাগানের মধ্যে প্রায় ছয় বিঘা জমির উপর পদ্মানদীর ঢেউখেলানো দৃশ্যের অনুরূপ প্রাচীরবেষ্টিত আড়াইতলা ভবন। একপার্শ্বে পুত্র রথীন্দ্রনাথের বাল্যশিক্ষক লরেন্স সাহেবের বাংলো এবং বাঁধানো চাতাল। কুঠিবাড়ির কামরা সংখ্যা সতেরো। দ্বিতলের উপরে পূর্ণাঙ্গ চিলেকোঠা। এখানে বসে পুরো পদ্মাকেই দেখা যেত। এখানে আরামকেদারায় শুয়ে-বসে

রবীন্দ্রনাথ প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং গ্রামের মানুষের কাজকর্ম, নদীতে মাঝি-মাল্লার আনাগোনা সব অবলোকন করতেন। দ্বিতলের পূর্ব পাশের ঘরে রবীন্দ্রনাথ থাকতেন। এই ঘরের অলিন্দে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রায়শ ভোরের সূর্য-তারা দেখতেন। মৃণালিনী দেবী থাকার ফলে কুঠিবাড়ি সব সময় প্রাণবন্ত থাকত, গৃহস্থালির কাজও গোছানো থাকত। মৃণালিনী দেবী কুঠিবাড়ির অভ্যন্তরে এবং বাইরে নানা সবজি বাগান, ফল-ফুলের বাগান তৈরি করেছিলেন। এ সময়ে নানা আম গাছ ও কাঁঠাল গাছে ভরা ছিল রবীন্দ্রভবনের চৌহদ্দি। কুঠিবাড়ির একতলায় একটি বড় হলঘর আছে। এখানে আমলা ও প্রজাদের দরবার বসত। হলঘরের পূর্ব দিকের ঘরে, রবীন্দ্রনাথের অফিস ঘর ছিল। পশ্চিমের ঘরে অতিথিবর্গের থাকার ব্যবস্থা ছিল। একটি ঘরে এ্যান্ড্রুজ সাহেব থাকতেন। মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর পরে তিনতলার চিলেকোঠায় রবীন্দ্রনাথের জন্য একটি কামরা ও স্নানের ঘর তৈরি করা হয়েছিল। এখানেই রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘক্ষণ থাকতেন এবং সাহিত্যসাধনা করতেন। এই ঘরে থেকেই রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলি রচনা ও তার ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন। রবীন্দ্রসাহিত্যের ক্ষেত্রে তে'তলার এই কক্ষটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে বসেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর কল্পনাকে পদ্মানদীর মতো বিস্তৃত এবং আকাশ ও প্রকৃতির মতো উদার করে গড়ে তুলেছিলেন।

শিলাইদহে ঠাকুর এস্টেটের যে জমিদারি ছিল তার গুরুত্ব শতগুণে বেড়েছিল রবীন্দ্রনাথের দায়িত্ব নেবার পর থেকে। রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব-পরিচিতির মূলে তাঁর কবি-প্রতিভা। শিলাইদহে আসবার পর থেকেই তাঁর প্রতিভা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এখানে আসবার পর থেকেই তাঁর লেখা সমৃদ্ধ হয়েছে। সাহিত্যের প্রায় সবদিকগুলোকে তিনি কেবল স্পর্শই করেন নি বরং তাঁর কল্যাণে সব শাখাই ফুলে-ফলে বৃদ্ধি পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এখানে এসেই বাংলাদেশের নদ-নদী ও প্রকৃতির সঙ্গে যেমন ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন করেছেন, তেমনি এ দেশের জনপদ এবং সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের অংশীদারও হয়েছেন। জমিদারি-দায়িত্ব তাঁকে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের সঙ্গে পরিচিত করেছে ঠিকই কিন্তু তাঁর কবি-প্রতিভা তাঁকে এসব সাধারণ মানুষের পরম-আত্মীয় করে নিয়েছে। তিনি তাদেরই 'লোক' বলেই গণ্য হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক ও কর্মজীবন ক্রমান্বয়ে যে একটি পরিণতির দিকে এগুচ্ছিল– একথা আজ সত্যে পরিণত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সাহিত্যে তাঁর দুটি আকাঙ্ক্ষা আছে–সুখ-দুঃখ-বিরহ-মিলনপূর্ণ মানবসমাজে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষা, অন্যধারে নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যলোকের সাথে পরিপূর্ণ একাত্ম হবার আকাঙ্ক্ষা। জমিদারি তদারকিতে বাংলাদেশে এসে রবীন্দ্রনাথের এই দুটি আকাঙ্ক্ষাই পরিতৃপ্ত হয়েছে। পদ্মায় চাঁদ উঠবার সাথে সাথে বাংলার হৃদয়দেশ পল্লীর বুকে গান জেগেছে। ঢাকের কাঠির ঢাককুরকুর শব্দ-সংকেতে কবি-জমিদার অসাধারণে সাধারণ হয়েছেন। আর এই অসাধারণে সাধারণ হয়ে তিনি নিত্যকালের অসাধারণই রয়ে গেলেন। শ্রী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে বলেন:

> "ইতঃপূর্বে রবীন্দ্রনাথকে জীবনের কোন কঠিন দায় বা দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয় নাই। সাহিত্যজীবনের বিচিত্র মাধুর্যের মধ্যে হঠাৎ আসিয়া পড়িল বিপুল জমিদারি তদারকির কাজ। কিন্তু কবি হইলেও তাহার সহজ বুদ্ধি এত প্রখর ছিল যে, তিনি আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে মানাইয়া লইলেন ; শুধু মানাইয়া লইলেন না, তাহাকে নিপুণভাবে সুসম্পন্ন করিতে লাগিলেন, যেমন নিজের পারিবারিক জীবনের প্রত্যেকটি ছোটোখাটো কাজকর্ম করিতেছিলেন, তেমনভাবেই। জীবনের দিক হইতে এই ঘটনাটি খুব বড়ো। বাস্তবকে প্রকৃতির সহিত মিশাইয়া জীবনে এমন নিবিড়ভাবে পাইবার সুযোগ ইতঃপূর্বে হয় নাই। প্রকৃতি ও মানুষ মিলিয়া বিশ্বের সৃষ্টি সৌন্দর্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল হইতে প্রকৃতিকে অন্তরঙ্গভাবে জানিয়াছিলেন, মানুষকে তেমন নিবিড়ভাবে জানিতে সুযোগ লাভ করেন নাই। জমিদারি পরিদর্শন ও পরিচালনা করিতে আসিয়া বাংলার অন্তরের সঙ্গে তাহার যোগ হইল-- মানুষকে তিনি পূর্ণদৃষ্টিতে দেখিলেন। তাঁর কাব্যের মধ্যে হৃদয়াবেগের আতিশয্য এ যুগে বহুল পরিমাণে মৃদু হইয়া আসিল; পদ্মা তাঁহার কাব্যে ও অন্যান্য রচনায় নতুন রস, নতুন শক্তি, নতুন সৌন্দর্য দান করিল।"[৬]

বস্তুত, শিলাইদহ ছিল রবীন্দ্রনাথের ধাত্রীমাতা সমতুল্য। প্রমথনাথ বিশীর ভাষায়, "এ তাঁর জন্মস্থান নয়, এখানে এসে পৌঁছুতে তাঁর কিছু বিলম্ব হয়েছে– তাই তাঁর প্রতিভাস্ফুরণেও কিছু বিলম্ব।"[৭] প্রমথনাথ বিশী বলেন :

> "মনে হয় এই সময়ে অর্থাৎ শিলাইদ হ অঞ্চলে এসে স্থায়ী হওয়ার পরে তার রসলোকে যেন একটা রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটেছিল, যার ফল নৌকাভরা সোনার ধান। বাংলাদেশের অখ্যাত এক অঞ্চলে, অখ্যাত তার কতকগুলি পল্লী, আর পদ্মানদী ছাড়া তার নদীনালা খালবিলগুলোও অখ্যাতপ্রায়--এই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের চতুর্থদশকের জগৎ। এই ভূমিখণ্ডে কোন আদিম প্রাণের ভূমিকা সঞ্চিত ছিল যার স্পর্শ এক মহাকবিকে, তার বিবিধ নির্দিষ্ট পথের উপরে এনে দাঁড় করিয়ে দিল। যে প্রতিভা এতকাল অসহায়ভাবে হাতড়িয়ে যোগ্য আসনটি খুঁজে মরছিল, ভুল আসনে বসে ভগ্নহৃদয়ে লিখছিল, আঁকছিল সেই সব নরনারী যারা কোন বিশিষ্ট দেশের অধিবাসী নয়, অন্ধকল্পনা রাজ্যের ছায়া, উপচ্ছায়া মাত্র, কিংবা অনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক জগতের অস্পষ্ট প্রেতমূর্তি মাত্র, হঠাৎ তার সম্মুখে উদ্ঘাটিত হয়ে গেল Human habitation and name এর বাস্তব পৃথিবী। ... বাংলাদেশের এই অখ্যাত অজ্ঞাত পল্লীগুলিই ভূতলের স্বর্গখণ্ড। ভঙ্গুর মাটির ভাণ্ডে অমৃত নিয়ে অপেক্ষা করছিল এই জনপদ। কবি সেখানে এসে পৌঁছুতেই তাঁর ভালে অঙ্কিত করে দিল অমৃতের টীকা।"[৮]

প্রকৃত অর্থে বলতে গেলে শিলাইদহ রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব বিকাশের যেমন ধাত্রী, তেমনি তাঁর সময়ে সর্বকর্মযজ্ঞেরও প্রেরণার উৎস। এই শিলাইদহে থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কাব্য রচনা করেছেন। 'সোনার তরী'

'চিত্রা' 'চৈতালী' 'ক্ষণিকা' 'কল্পনা' 'কথা ও কাহিনী' 'নৈবদ্য' ইত্যাদি শিলাইদহ অবস্থানকালে তাঁর শেষকাব্য ফসল। কাব্যগুলি ১৯০০-১৯০১ সালের মধ্যে প্রকাশিত। এই সময়েই রচিত হয়েছে 'পুরাতন ভৃত্য' এবং 'দুই বিঘা জমি'। শুধু কাব্য নয়, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের বুননও এই অখ্যাত পল্লীর মানবজীবন ও প্রকৃতির টানাপোড়েনে ভাস্বর। রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রাবলীতে শিলাইদহের প্রকৃতি ও মানুষের যে চাল-চিত্র ফুটে উঠেছে তারই ছবি দেখি 'গল্পগুচ্ছে'।

ইতোপূর্বে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বলা চলে, শিলাইদহে বসতি স্থাপন করে রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের মানুষের ঘনিষ্ঠ রূপটি খুঁজে পেয়েছিলেন। বাংলাদেশের খড়ে ছাওয়া মাটির ঘরের বাসিন্দাদের সুখ-দুঃখভরা জীবনের সাথে তিনি পরিচিত হয়েছেন আর তাদের সেই দুঃখ-শোকে ভরা জীবনপাতা, রোদনভরা বসন্ত দূরীভূত করবার জন্য কবি পরিকল্পনা করেছেন পল্লীউন্নয়নের। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহসহ তাঁর অন্যান্য জমিদারিতে প্রজাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে বুঝেছিলেন যে, তাদের জীবনে পরিবর্তন আনতে হলে জমিদারি-ব্যবস্থার আনুপূর্বিক সংস্কারের প্রয়োজন। এই কাজটি স্বল্প সময়ে সম্ভব ছিল না। কিন্তু কাজটি যে প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথ তা বুঝতে পেরেছিলেন। শিলাইদহ থেকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর দরিদ্র প্রজাদের সম্বন্ধে উল্লেখ করেন :

> "...আমার এই দরিদ্র চাষি-প্রজাগুলোকে দেখলে আমার ভারী মায়া করে, এরা যেন বিধাতার শিশুসন্তানের মতো নিরুপায়। তিনি এদের মুখে নিজের হাতে কিছু তুলে না দিলে এদের আর গতি নেই। পৃথিবীর স্তন যখন শুকিয়ে যায় তখন এরা কেবল কাঁদতে জানে– কোনোমতে একটুখানি ক্ষুধা ভাঙলেই আবার তখনই সমস্ত ভুলে যায়। স্পেশালিস্টরা যে সমস্ত পৃথিবীময় ধনবিভাগ করে দেয় সেটা সম্ভব কি অসম্ভব ঠিক জানিনে– যদি একেবারেই অসম্ভব হয় তা হলে বিধির বিধান বড়ো নিষ্ঠুর, মানুষ ভারী হতভাগ্য। কেননা পৃথিবীতে যদি দুঃখ থাকে তো থাক কিন্তু তার মধ্যে এতটুকু একটু ছিদ্র একটু সম্ভাবনা রেখে দেওয়া উচিত যাতে সেই দুঃখ মোচনের জন্য মানুষের উন্নত অংশ অবিশ্রান্ত চেষ্টা করতে পারে; একটা আশা পোষণ করতে পারে। যারা বলে কোনোকালে পৃথিবীর সকল মানুষকে জীবনধারণের কতকগুলি মূল আবশ্যক জিনিসও বণ্টন করে দেওয়া নিতান্ত অসম্ভব অমূলক কল্পনামাত্র, কখনোই সকল মানুষ খেতে-পরতে পাবে না, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ চিরকালই অর্ধাশনে কাটাবেই, এর কোনো পথ নেই– তারা ভারী কঠিন কথা বলে। কিন্তু এসমস্ত সামাজিক সমস্যা এমন কঠিন। বিধাতা আমাদের এমনি একটি ক্ষুদ্র জীর্ণ দীন বস্ত্রখণ্ড দিয়েছেন, পৃথিবীর একদিক ঢাকতে গিয়ে আর একদিকে বেরিয়ে পড়ে-- দারিদ্র্য দূর করতে গেলে ধন চলে যায়, এবং ধন গেলে সমাজের কত যে শ্রী-সৌন্দর্য উন্নতির কারণ চলে যায় তার আর সীমা নেই।"[৯]

শিলাইদহে থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথ কৃষকদের নানা সমস্যার কথা জেনেছেন। এমনকি কখনও তা স্বচক্ষে দেখেছেনও। পদ্মানদীতে বর্ষায় বন্যা এলে চরের ধান ডুবে গিয়ে চাষির সর্বনাশ করে– কবি জমিদার তা দেখেছেন ; বোটে চলতে চলতে শিলাইদহ থেকে এমনি একটি চিঠিতে কৃষকদের দুর্ভাগ্যের ছবি এমনিভাবে ভেসে উঠেছে :

> "...এবারে এত জলও আকাশে ছিল! আমাদের চরের মধ্যে নদীর জল প্রবেশ করেছে। চাষিরা নৌকা বোঝাই করে কাঁচাধান কেটে নিয়ে আসছে-- আমার বোটের পাশ দিয়ে তাদের নৌকা যাচ্ছে আর ক্রমাগত হাহাকার শুনতে পাচ্ছি-- যখন আর কয়দিন থাকলে ধান পাকত তখন কাঁচাধান কেটে আনা চাষার পক্ষে যে কী নিদারুণ তা বেশ বুঝতে পারা যায়। যদি ঐ শিষের মধ্যে দুটো চারটে ধান একটু শক্ত হয়ে থাকে এই তাদের আশা। প্রকৃতির কার্যপ্রণালীর মধ্যে দয়া ব্যাপারটা কোনো এক জায়গায় আছে অবশ্য নইলে আমরা পেলুম কোথা থেকে— কিন্তু সেটা যে ঠিক কোনখানে আছে খুঁজে পাওয়া শক্ত। এই শতসহস্র নির্দোষ হতভাগ্যের নালিশ কোনো জায়গায় গিয়ে পৌঁচচ্ছে না, বৃষ্টি যেমন পড়বার তেমনি পড়ছে, নদী যেমন বাড়বার তেমনি বাড়ছে। বিশ্বসংসারে এ সম্বন্ধে কারও কাছে কোনো দরবার পাবার জো নেই। মনকে বোঝাতে হয় যে, কিছু বোঝাবার জো নেই– কিন্তু জগতে যে দয়া এবং ন্যায়বিচার আছে এটুকু বোঝা নিতান্ত আবশ্যক।..."[১০]

উপরিউক্ত চিঠি থেকে বোঝা যায় যে রবীন্দ্রনাথ কৃষকদের দুঃখে অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিলেন। তিনি তাদের দুরবস্থার কথা জানতেন এবং তা দূরীকরণের জন্য নানা ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহের কুঠিবাড়ির তে'তলা থেকে দেখতেন কীভাবে কৃষকের জমি পারিবারিক কারণে ভেঙে যাচ্ছে। জমি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে পড়ছে। ফলে তেমন কোন ফসল পাওয়া যাচ্ছে না। অর্থাভাব এবং দারিদ্র্য পরিবারকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলছে।

রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছিলেন যে, ইংরেজ সরকার চিরস্থায়ী-বন্দোবস্ত কায়েম করে জমিদারদের নানা সুযোগ-সুবিধা দিয়েছিলেন। এর ফলে জমিদারদের বিলাস-ব্যসন যেমন বেড়েছিল তেমনি প্রজাপীড়নও চরমে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ প্রজাপীড়নে কখনও সমর্থন জানান নি। কিন্তু বাবা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর জমিদারিতে রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য রবীন্দ্রনাথকে নির্দেশ দিলেন, কারণ, তা না হলে জমিদারির নানা-খরচ মেটানো সম্ভব হয় না। রাজস্ব বৃদ্ধির ফলে বেশ কিছু কৃষক বিদ্রোহী হয়ে উঠল। রবীন্দ্রনাথ তখন অত্যন্ত কৌশলে প্রজাদের বুঝিয়ে রাজস্ব বৃদ্ধি করেন। এতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের প্রতি দারুণ আস্থাশীল হয়ে পড়েন। তবে রাজস্ব বৃদ্ধি করলেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর জমিদারিতে প্রজাদের কল্যাণে নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এ সময়ে শিলাইদহে সদর-কাছারির অধীন নয়টি

ডিহি-কাছারি ছিল। এসব পরিচালনার জন্য নানা আমলার প্রয়োজন হয়ে পড়ত। এসব কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ নানাভাবে প্রজাদের শোষণ করে জমিদারের পাশাপাশি নিজেরাও বড়লোক হয়ে যেত। রবীন্দ্রনাথ তা বুঝে নয়টি ডিহি-কাছারি নিয়ে তিনটি বিভাগীয় কাছারি-তৈরি করলেন শিলাইদহ সদর-কাছারির অধীনে। ফলে প্রজা এবং জমিদারের সম্পর্ক অনেকটাই প্রত্যক্ষ হয়ে পড়ল এবং শোষণের মাত্রাটি অনেকাংশেই কমে গেল। এসব পরিবর্তন আনবার কারণে আমলাদের অনেকেই রবীন্দ্রনাথের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ে। এই অসন্তোষ বার্ষিক পুণ্যাহ অনুষ্ঠানে প্রকাশ পেলে রবীন্দ্রনাথ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিকট জমিদার হিসেবে প্রজাদের প্রতি তাঁর দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করেন। কিন্তু তাতে তেমন কোন ফল লাভ হয় না। এতৎসত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর জমিদারিতে প্রজা হিতৈষীমূলক নানা কার্যপদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

শিলাইদহ গ্রামের দক্ষিণ-পূর্ব পার্শ্বে একটি মাধ্যমিক-ইস্কুল আছে এবং শিলাইদহের কুঠিবাড়ির দক্ষিণ-পূর্ব পাশ দিয়ে একটি রাস্তা চলে এসেছে কুষ্টিয়া শহর পর্যন্ত। এই রাস্তাটি রবীন্দ্র-সড়ক নামে পরিচিত। রবীন্দ্রনাথ এই রাস্তাটি নির্মাণ করেন। কুঠিবাড়ির অভ্যন্তরে একটি ইংরেজি-স্কুল খোলা হয়েছিল কুঠিবাড়ির ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা করার জন্য। এই স্কুলে একজন ইংরেজ-শিক্ষকের নাম ছিল লরেন্স। এই স্কুলে গণিত পড়াতেন জগদানন্দ রায়। তিনি ছিলেন ঠাকুর এস্টেটের কর্মচারী। এ ছাড়া সংস্কৃত শেখাবার জন্য এসেছিলেন শিবধন বিদ্যার্ণব। শিলাইদহ কুঠিবাড়ির পেছনদিকে উত্তরপূর্ব পাশে ছিল তহসিল বা কাছারিবাড়ির দ্বিতলভবন। এর একপাশে ছিল পোস্ট-অফিস। বাউলফকির গগণ হরকরা এই পোস্ট-অফিসের ডাকহরকরা ছিলেন। তাঁর রচিত একটি গান ও সুর রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করে। এই গানটি ছিল :

আমার মনের মানুষ যে রে
আমি কোথায় পাব তারে
হারায়ে সেই মানুষে
তার উদ্দেশ্যে
দেশ-বিদেশে বেড়াই ঘুরে॥

রবীন্দ্রনাথ এই গানের সুর তাঁর রচিত 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানে ব্যবহার করেছিলেন। তবে গগণ হরকরার গানের সুর যে রবীন্দ্রনাথ হুবহু ব্যবহার করেছিলেন তা নয়– তাঁর কোন গানেই এমন হয় নি। রবীন্দ্রনাথের গানে দেশীয় লোকসংগীতের অনেক সুরও ছিল। যা হোক, কুঠিবাড়ির আরও একটু পুবে গেলে খোরশেদ ফকিরের মাজার, গোপীনাথের মন্দির এবং খোরশেদপুর বাজার। খোরশেদ ফকিরকে নিয়ে অনেক কিংবদন্তি আছে।[১১] শোনা যায়, পারের কড়ি না থাকায় তাকে নৌকার মাঝি নেমে যেতে বললে তিনি পদ্মা নদীতেই নেমে পড়েন এবং সেখানে একটি চর জেগে ওঠে এবং এই অঞ্চল খোরশেদপুর নামে অদ্যাপি পরিচিত। সুফী ফকিরদের নিয়ে এমন অনেক অলৌকিক ঘটনার কথা এদেশে প্রচলিত রয়েছে।

এখন যেখানে খোরশেদপুর বাজার বসে তার একটু পুবে গোপীনাথের মন্দির। নাটোরের রাণী ভবানী এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। পরবর্তীকালে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর কর্তৃক এতদঞ্চলের জমিদারি খরিদ করার সময় গোপীনাথের মন্দিরও তাঁর জমিদারির অন্তর্ভুক্ত হয়। তখন থেকেই এই মন্দিরের দেখাশোনার দায়িত্ব পড়ে ঠাকুর-এস্টেটের উপর এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁর সময়ে এই মন্দিরের সংস্কার করেন।

রবীন্দ্রনাথ এই শিলাইদহে নীলকুঠির পাশে পদ্মানদীর তীরে পিতার নামে 'মহর্ষি দাতব্য চিকিৎসালয়' নির্মাণ করেছিলেন। এতদঞ্চলে বেশ কয়েকটি বড় দিঘি ছিল–তার একটি গোপীনাথের দিঘি। রবীন্দ্রনাথও এতদঞ্চলে কয়েকটি দিঘি খনন করেছিলেন মানুষের জলকষ্ট নিবারণের জন্য। শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ প্রতিমাদেবী একটি বালিকা বিদ্যালয় চালাতেন। রবীন্দ্রনাথের সময়েই শিলাইদহের কুঠিবাড়ি অনেকটা বাগানবাড়ির ভূমিকা পালন করত। বাড়ির অভ্যন্তরে বড় বড় গোলাপসহ নানা ফুলের সমারোহ ছিল। ঢেউখেলানো প্রাচীরের পাশে শিশুগাছগুলো ছিল শ্রেণীবদ্ধ। কুঠিবাড়ির সন্নিকটে রবীন্দ্র-সড়কেও শিশুগাছ লাগানো ছিল। কুঠিসংলগ্ন উভয় পাশের বাগান আম-কাঁঠালে ভরা ছিল।

ঠাকুর এস্টেটের একসময়ের কর্মচারী এবং শিলাইদহনিবাসী শচীন্দ্রনাথ অধিকারী তাঁর 'শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে উল্লেখ করেন– "রবীন্দ্রনাথের বিশাল সাহিত্যসৃষ্টির সম্ভবত অর্ধাংশেরও বেশি জন্মলাভ করে শিলাইদহে। তাঁর প্রৌঢ়কাল পর্যন্ত প্রকাশিত অধিকাংশ রচনাই শিলাইদহের প্রাকৃতিক পটভূমিকায় রচিত। তাঁর কর্মযজ্ঞের নানা পরীক্ষার উৎপত্তিস্থানও শিলাইদহে। শিলাইদহের মতো নিভৃত পল্লীনিকেতন কবি আরও পেয়েছিলেন তাঁর অপর জমিদারি সাজাদপুরে ও পতিসরে। কিন্তু রীতিমত সুরুচিপূর্ণ ঘর বেঁধে একজন অভিজাত ভদ্র-গৃহস্থের বাস করবার মতো উপযুক্ত করেই শিলাইদহ কুঠিবাড়ি, বাগান, পুকুর, প্রাচীর তৈরি করা হয়েছিল। এইরকম সুরম্য সুন্দর বাসভবন কবির আর কোনো জমিদারিতে ছিল না। কারণ, রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ কুঠিবাড়িতেই সেকালে সপরিবারে নিজ গৃহস্থালি গড়ে তুলবার আয়োজন করেছিলেন। শান্তিনিকেতনে কবি সতীশচন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পর ১৩১১ সালের মাঘ মাস থেকে গ্রীষ্মাবকাশ পর্যন্ত শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় শিলাইদহে স্থানান্তরিত হয়। শিলাইদহ, সাজাদপুর এবং পতিসরের প্রকৃতি ও পদ্মানদী তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির উৎস। এখানে তিনি বিশ্ব-প্রকৃতি ও বিশ্বমানবের অন্তরের মণিকোঠায় তিনি প্রবেশ করতে পেরেছিলেন এভাবেই। 'ছিন্নপত্র' ও অন্যান্য পত্র-সাহিত্য রবীন্দ্রমানসের বিভিন্ন গতি-প্রকৃতির যে সাক্ষ্য দিচ্ছে তার প্রধানতম পটভূমিকা শিলাইদহ। এই শিলাইদহেই তিনি বাংলার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাউল ও বৈষ্ণব সাধকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার এবং এখানেই তিনি যৌবনের প্রারম্ভে প্রাচীন গ্রামীণ বাংলার মর্মকথা গভীরভাবে অনুধাবনের সুযোগ পেয়েছিলেন।

এই শিলাইদহের স্মৃতি কবি পরিণত বয়সে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে যখন রাশিয়ায় বসে চিরক্রন্দিতের ঊর্মিচাঞ্চল্য প্রত্যক্ষ করেছেন তখনও তা তাঁর মনকে আলোড়িত করেছিল–

> "কেবলই ভাবছি, আমাদের দেশজোড়া চাষিদের দুঃখের কথা। আমার যৌবনের আরম্ভকাল থেকেই বাংলাদেশের পল্লীগ্রামের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। তখন চাষিদের সঙ্গে আমার প্রত্যহ ছিল দেখাশুনা– ওদের সব নালিশ উঠেছে আমার কানে।"[১২]

ঠাকুর পরিবারের বাংলাদেশে তিনটি জমিদারি– শিলাইদহ, সাজাদপুর ও পতিসর। তিনটি গ্রামেই কবির যৌবনের স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত করবার প্রাণপণ চেষ্টা হয়েছিল। কোথাও কবি নীড় বাঁধতে পারেন নি, শিলাইদহের পল্লীকুঞ্জেই বাসযোগ্য সুরম্য-ভবন নির্মিত হয়েছিল তাঁর ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসার স্থায়ী পটভূমিরূপে।

বস্তুত, এই শিলাইদহেই রবীন্দ্রনাথ কবি ও কর্মযোগী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। পুত্র রথীন্দ্রনাথকে আমেরিকায় কৃষিবিদ্যা শিখবার জন্য পাঠিয়েছিলেন। সেখান থেকে তাঁর ফিরে আসবার পর কুঠিবাড়ির উত্তরে ও পশ্চিমে ৮০ বিঘা জমি খাসখামারে এনে বৈজ্ঞানিক ফসলের ফলন ইত্যাদি পরীক্ষা হতো। দুটি পুকুর থেকে পাম্পের সাহায্যে জলসেচের ব্যবস্থা ছিল। এখানে নানা কৃষি-যন্ত্রপাতি ও লাঙল আনা হয়েছিল। প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কৃষি ব্যাংক ইত্যাদি। আলু ও রেশমশিল্পের কাজও এখানেই শুরু করা হয়েছিল। পল্লীসংগঠনের চিন্তাও এখানেই সর্বপ্রথম হয়েছিল এবং তার বাস্তব পদক্ষেপ কবি এখানেই গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই কুঠিতে পরিবারসহ নিজেই যে শুধু বসবাস করেছিলেন তা নয়, ঠাকুর-পরিবারের অনেকেই বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ প্রায়শ বসবাস করেছেন। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র, নাটোরের জমিদার জগদিন্দ্রনাথ, লোকেন্দ্র পালিত, প্রমথ চৌধুরী, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সিস্টার নিবেদিতা, এ্যান্ড্রুজ, লরেন্সসহ অনেক বিদেশী পুরুষ-মহিলা গুণিব্যক্তিরা এখানে এসেছেন ও কবি-সান্নিধ্য লাভ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ কুঠিবাড়ির পশ্চিমের সান-বাঁধানো ঘাটের প্রবেশপথের দুধারে স্বহস্তে দুটি বকুলবৃক্ষ রোপণ করেন। বর্তমানে এই বৃক্ষের দুটিই মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার কুঠিবাড়িটিকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিয়েছেন। প্রতিবৎসরই সরকারি ও স্থানীয় উদ্যোগে রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকী পালিত হয়ে থাকে। এখানে কুঠিবাড়ির সম্মুখে একটি রেস্ট হাউসের পাশে দক্ষিণে, পিকনিক ও ভ্রমণবিলাসীদের জন্য যে-সব কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে তা কুঠিবাড়ির সৌন্দর্যকে অনেকাংশে ম্লান করে দিয়েছে। এখানে নানা পিকনিক পার্টির আগমনে এবং আধুনিক ও হিন্দিগানের ব্যবহারে রবীন্দ্র-কুঠির পরিবেশ বিনষ্ট হতে চলেছে। ইতোমধ্যেই রবীন্দ্রকুঠির অনেক আম-কাঁঠাল ও শিশুগাছ

কর্তিত হয়েছে। নূতন করে কোন গাছ লাগাবার উদ্যোগ নেই। সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনার ব্যবস্থাও নেওয়া হয় নি।

রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কোন স্মৃতিই এখানে আজ নেই। বিশাল কৃষিফার্ম, তাঁত বয়নশিল্প, রেশম শিল্প—কিছুই আজ অবশিষ্ট নেই। মহর্ষি দাতব্য চিকিৎসালয়ও সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে। কুঠিবাড়িতে রক্ষিত অনেক আসবাব-পত্র চুরি হয়ে গেছে। তহসিল আফিসের কাগজপত্র বিনষ্ট এবং চুরি হয়ে গেছে। গগণ হরসরায় 'পোস্ট-অফিস', প্রতিমা বিদ্যালয়——কোন কিছুই অবশেষ নেই। বুনো-বাগদী, বিন্দি আদিবাসীরা ভারতে চলে গেছে। বন্যায় প্লাবিত হয়ে পড়ছে রবীন্দ্রনাথের কুঠিবাড়ি।

রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচি : শিলাইদহ

এক ॥

বাংলাদেশে (পূর্ববাংলা) রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচি শুরু হয়েছিল শিলাইদহে। কারণ, এখানেই তিনি ছেলেবেলা থেকে এসেছিলেন এবং পরবর্তীতে জমিদার হিসেবে অনেকটা স্থায়িভাবে সপরিবারে থেকেছেন। এখান থেকেই তাঁর কাব্যচর্চা ও পল্লীউন্নয়নচর্চা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন: "আমার যৌবন ও প্রৌঢ়বয়সের সাহিত্যরস সাধনার তীর্থস্থান ছিল পদ্মাপ্রবাহচুম্বিত শিলাইদহ-পল্লীতে।"

বিভিন্নজনের নিকট লেখা চিঠিপত্রে এবং ১৮৮৭ থেকে ১৮৯৫ সাল পর্যন্ত লেখা প্রায় সকল চিঠিতে যা 'ছিন্নপত্রাবলী'তে স্থান পেয়েছে এবং এর প্রায় অধিকাংশ চিঠি শিলাইদহ থেকেই লেখা-- এসব চিঠিপত্রে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের আনন্দ-বেদনা, ইচ্ছা এবং অনিচ্ছা ও কর্মভাবনা সব কিছুই অন্তর্ভুক্ত করেছেন। শিলাইদহের উত্তর-পশ্চিমে ছিল পদ্মানদী এবং দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্বে প্রবাহিত ছিল গড়াইনদী। শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের প্রবল আকর্ষণ ছিল পদ্মা। এই পদ্মার মধ্যেই তিনি তাঁর যৌবন এবং প্রৌঢ়ত্বের জীবনবোধকে অবলোকন করেছেন। পদ্মাকে লক্ষ করে তাই তিনি বলেন:

একদিন জনহীন তোমার পুলিনে
গোধূলির শুভলগ্নে হেমন্তের দিনে,
সাক্ষী করি পশ্চিমের সূর্য অস্তমান
তোমারে সঁপিয়াছিনু আমার পরান।
... ..
নিভৃতে শরতে গ্রীষ্মে শীতে বরষায়
শতবার দেখাশুনা তোমায় আমায়।
[পদ্মা, চৈতালি-১৩০২।]

পদ্মানদী এবং শিলাইদহের কুঠিবাড়ির স্মৃতি রবীন্দ্রনাথ আজীবন মনে রেখেছিলেন। পূর্ববাংলায় জমিদারির অবসান হলে পশ্চিম-বাংলায় শান্তিনিকেতনের বাসভবন থেকে তিনি মানসচক্ষে পদ্মানদীকে দেখেছেন। 'পুনশ্চ' কাব্যের 'কোপাই' কবিতায় তিনি পদ্মানদী এবং শিলাইদহের ছবি এঁকেছেন:

"পদ্মা কোথায় চলেছে দূর আকাশের তলায়,
মনে মনে দেখি তাকে।
এক পারে বালুচর,
নির্ভীক কেন না নিঃস্ব, নিরাসক্ত-
অন্যপারে বাঁশবন, আমবন,
পুরোনো এই, পোড়ো ভিটে,
অনেকদিনের গুঁড়িমোটা কাঁঠাল গাছ-
পুকুরের ধারে সর্ষেখেত,
পথের ধারে বেতের জঙ্গল,
দেড়শোবছর আগেকার নীলকুঠির ভাঙা ভিত,
তার বাগানে দীর্ঘ ঝাউগাছে দিনরাত মর্মরধ্বনি।
ঐখানে রাজবংশীদের পাড়া,
ফাটলধরা খেতে ওদের ছাগল চরে,
হাটের কাছে টিনের ছাদওয়ালা গঞ্জ-
সমস্ত গ্রাম নির্মম নদীর ভয়ে কম্পান্বিত
পুরাণে প্রসিদ্ধ এই নদীর নাম,
মন্দাকিনীর প্রবাহ ওর নাড়িতে।
ও স্বতন্ত্র। লোকালয়ের পাশ দিয়ে চলে যায়-
তাদের সহ্য করে, স্বীকার করে না।
বিশুদ্ধতার আভিজাতিক ছন্দে
একদিকে নির্জন পর্বতের স্মৃতি আর-
একদিকে নিঃসঙ্গ সমুদ্রের আহ্বান।
একদিন ছিলেম ওরই চরের ঘাটে,
নিভৃতে, সবার হতে বহুদূরে।
ভোরের শুকতারাকে দেখে জেগেছি,
ঘুমিয়েছি রাতে সপ্তর্ষির দৃষ্টির সম্মুখে
নৌকার ছাদের উপর।

রবীন্দ্রনাথ এই কবিতায় তাঁর হারানো স্মৃতিকে রোমন্থন করেছেন। এখানে শুধু যে পদ্মানদীই তার আপন মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে দেখা দিয়েছে তা শুধু নয় ; শিলাইদহের আশেপাশের সব স্মৃতি– দেড়শো বছরের নীলকুঠির ভাঙা-ভিত, তার চৌহদ্দিতে ঝাউগাছের মর্মরধ্বনি, রাজবংশীদের পাড়া, শিলাইদহ কুঠিবাড়ির অনতিদূরে কুঠিরহাট, পদ্মানদীর ভাঙনে কম্পিত সমস্ত গ্রাম। এমনকি শিলাইদহের কুঠিবাড়ির পাশে আমবন, বাঁশবন, পুরোনো বটবৃক্ষ, পোড়ো ভিটে, গুড়ি-মোটা কাঁঠাল গাছ এমনকি কুঠিবাড়ির পশ্চিম গ্রামে পুকুরের ধারে সর্ষেখেত– কোনোকিছু তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি।

এ থেকেই বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ কত গভীরভাবে ভালোবেসেছিলেন বাংলাদেশকে। পদ্মা ছিল এই ভালোবাসার প্রতীক। অত্যন্ত তীক্ষ্মদৃষ্টি এবং সূক্ষ্ম অনুভূতি নিয়ে তিনি সাধারণ মানুষের জীবনকে অবলোকন করেছিলেন। এসব মানুষের দিন-রাত্রির সুখ-দুঃখ তাঁর মনে যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তা

তিনি তাঁর সকল সাহিত্যকর্মে ফুটিয়ে তুলেছেন। শুধু তা-ই নয়, তাদের দুঃখ-শোককে নিবারণের জন্য তিনি উন্নয়নের কর্মসূচিও গ্রহণ করেছিলেন।

শিলাইদহেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পল্লীর প্রথম ঘনিষ্ঠ সংযোগ। পশ্চিমবাংলার কোনো গ্রামে কিছুকাল থাকলেও পরিচয়ের এমন নিবিষ্টতা সেখানে জন্মেনি। এখানে এসেই তিনি দেখেছেন বাংলার কৃষক, গৃহস্থ, মজুর-শ্রমিক, মাঝি-মাল্লা, গাঁয়ের বধূ, বাউল-বৈষ্ণব, রোগে-শোকে-পীড়িত মানুষ, অশিক্ষা-কুশিক্ষায় গড়ে ওঠা হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবী। আজন্ম দারিদ্র্যের কশাঘাতে বিপন্ন মানুষ–কোনো কিছুই তাঁর দৃষ্টি থেকে সরে যায় নি। এই শিলাইদহে জমিদারির দায়-ভাগ সারতেই তিনি নিয়েছিলেন পল্লীউন্নয়নের ব্রতকথা–দেশসেবার যথার্থ উদ্যোগ। রবীন্দ্রনাথ পল্লীউন্নয়নের প্রেরণা কীভাবে পেয়েছিলেন তাঁর বিবরণ পাই তাঁর নিজস্ব ভাষ্যে:

> "বাংলাদেশের নদীতে নদীতে গ্রামে গ্রামে তখন ঘুরে বেড়াচ্ছি, এর নতুনত্ব, চলার বৈচিত্র্যের নতুনত্ব। শুধু তা-ই নয়, পরিচয়ে-অপরিচয়ে মেলামেশা করেছিল মনের মধ্যে। বাংলাদেশকে তো বলতে পারিনে বেগানা-দেশ; তার ভাষা চিনি, তার সুর চিনি। ক্ষণে-ক্ষণে যতটুকু গোচরে এসেছিল তার চেয়ে অনেকখানি প্রবেশ করেছিল মনের অন্দরমহলে আপন বিচিত্র রূপ নিয়ে। সেই নিরন্তর জানাশোনার অভ্যর্থনা পাচ্ছিলুম অন্তঃকরণে, যে উদ্‌বোধন এনেছিল তা স্পষ্ট বোঝা যাবে ছোটো-গল্পের নিরন্তর ধারায়। ... আমি শীত-গ্রীষ্ম মানিনি, কতবার সমস্ত বৎসর ধরে পদ্মার আতিথ্য নিয়েছি, বৈশাখের খররৌদ্র-তাপে, শ্রাবণের মুষলধারা বর্ষণে। পরপারে ছিল ছায়াঘন পল্লীর শ্যামশ্রী, এপারে ছিল বালুচরের পাণ্ডুবর্ণ জনহীনতা, মাঝখানে পদ্মার চলমান স্রোতের পটে বুলিয়ে চলেছে দ্যুলোকের শিল্পী প্রহরে প্রহরে নানাবর্ণের আলোছায়ার তুলি। এইখানে নির্জন- সজনের নিত্যসঙ্গম চলেছিল আমার জীবনে। অহরহ সুখদুঃখের বাণী নিয়ে মানুষের জীবনধারার বিচিত্র কলরব এসে পৌঁছচ্ছিল আমার হৃদয়ে। মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে আমার মনকে জাগিয়ে রেখেছিল। তাদের জন্য চিন্তা করেছি, কাজ করেছি, কর্তব্যের নানা সংকল্প বেঁধে তুলেছি, সেই সংকল্পের সূত্র আজও বিচ্ছিন্ন হয়নি আমার চিন্তায়। সেই মানুষের সংস্পর্শেই সাহিত্যের পথ এবং কর্মের পথ পাশাপাশি প্রসারিত হতে আরম্ভ হল আমার জীবনে। আমার বুদ্ধি এবং কল্পনা এবং ইচ্ছাকে উন্মুখ করে তুলেছিল এই সময়কার প্রবর্তনা।"[১৩]

বস্তুত, পদ্মা এবং পদ্মাতীরের শিলাইদহ এবং অন্যান্য অঞ্চলের সহজ-সরল সাধারণ-গ্রাম্যজীবনের অধিবাসীবৃন্দ কী দারুণ প্রভাব ফেলেছিল কবির জীবনে তা তাঁর সকল সাহিত্যকর্মে প্রতিফলিত হয়েছে। শিলাইদহের প্রতি রবীন্দ্রনাথের যে কী গভীর মমত্ববোধ ছিল নিম্নের চিঠিতে তা ব্যক্ত হয়েছে।

> "দুই-একদিন থেকে এখানকার প্রকৃতি শীত এবং বসন্তের মধ্যে ইতস্তত করছে। সকালে হয়তো উত্তরের বাতাসে জলে-স্থলে হী হী ধরিয়ে দিয়ে গেল, সন্ধ্যাবেলায় শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নায় দক্ষিণে বাতাসে চারদিকে হু হু করে উঠল। বসন্ত অনেকটা এসে পৌঁছেছে, বেশ বোঝা যাচ্ছে। অনেকদিন আজকাল ওপারের বাগান থেকে একটা পাপিয়া ডাকতে আরম্ভ করেছে। মানুষের মনটাও কতকটা বিচলিত হয়ে উঠেছে। আজকাল সন্ধ্যা হলে ওপারের গ্রাম থেকে গান-বাজনার শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে লোকে দরজা-জানলা বন্ধ করে মুড়িসুড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বার জন্যে তেমন উৎসুক নয়। আজ পূর্ণিমা রাত। ঠিক আমার বাঁ দিকের খোলা জানলার উপরেই একটা মস্ত চাঁদ উঠে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে; বোধ হয় দেখছে আমি চিঠিতে তার সম্বন্ধে কোনো নিন্দে করছি কিনা। সে হয়তো মনে করে তার জ্যোৎস্নার চেয়ে তার কলঙ্কের কথা নিয়েই পৃথিবীর লোকে বেশি কানাকানি করে।"[১৪]

এমনি আর একটি চিঠির অংশবিশেষ :

> "সকাল থেকে সুন্দর বাতাস দিচ্ছে, কোনো কাজ করতে ইচ্ছে করছে না। ... তাই চুপচাপ বসে আছি। নদীর জল অনেকটা শুকিয়ে এসেছে, কোথাও এক কোমরের বেশি জল আর প্রায় নেই, তাই বোটটাকে নদীর প্রায় মাঝখানে বেঁধে রাখা কিছুই শক্ত হয়নি। আমার ডানদিকের পারে চরের উপর চাষারা চাষ করছে এবং মাঝে মাঝে গোরুকে জল খাইয়ে নিয়ে যাচ্ছে; আমার বামপারে শিলাইদহের নারকেল এবং আমবাগান, ঘাটে মেয়েরা কাপড় কাচছে, জল তুলছে, স্নান করছে এবং উচ্চৈঃস্বরে বাঙাল ভাষায় হাস্যালাপ করছে; যারা অল্পবয়সী মেয়ে তাদের জলক্রীড়া আর শেষ হয় না। একবার স্নান সেরে উপরে উঠছে, আবার ঝুপ করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। তাদের নিশ্চিন্ত উচ্চহাস্য শুনতে বেশ ভালো লাগে। পুরুষরা গম্ভীরভাবে এসে গোটাকতক ডুব মেরে তাদের নিত্যকর্ম সমাপ্ত করে চলে যায়– কিন্তু মেয়েদের যেন জলের সঙ্গে বেশি ভাব। পরস্পরের যেন একটি সাদৃশ্য এবং সখিত্ব আছে। জল এবং মেয়ে উভয়েই বেশ সহজেই ছলছল জ্বলজ্বল করতে থাকে– একটা বেশ সহজ গতি ছন্দ-তরঙ্গ, দুঃখতাপে অল্পে অল্পে শুকিয়ে যেতে পারে, কিন্তু আঘাতে একেবারে জন্মের মতো দুখানা হয়ে ভেঙে যায় না। সমস্ত কঠিন পৃথিবীকে সে বাহুবন্ধনে আলিঙ্গন করে আছে, পৃথিবী তার অন্তরের গভীর রহস্য বুঝতে পারে না। সে নিজে শস্য উৎপাদন করে না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে না থাকলে পৃথিবীতে একটি ঘাসও গজাতে পারত না। মেয়েকে পুরুষের সঙ্গে তুলনা করে টেনিসন বলেছেন, Water upto wine! আমার আজকে মনে হচ্ছে জল Upto স্থল। এজন্য মেয়েতে ও জলেতে বেশ মিশ খায়। আমি দেখেছি, মেয়েরা জল ভালোবাসে, কেননা উভয়ে স্বজাত।"[১৫]

উপরিউক্ত দুটো চিঠি থেকে বেশ বোঝা যায়, শিলাইদহের কুঠি এবং আশেপাশের পরিবেশ ও সাধারণ মানুষের জীবনকে কবি গভীর মমতায় অবলোকন করেছেন। সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর এই প্রীতিময়তার পেছনে একদিকে তাঁর কবিসত্তা যেমন কাজ করেছে তেমনি তাদের প্রতি একটি দায়বদ্ধতারও সৃষ্টি হয়েছে ক্রমান্বয়ে। প্রকৃত অর্থে শিলাইদহ কুঠিবাড়ি এবং তার পাশ দিয়ে প্রবাহিত পদ্মানদী তাঁর জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। এ প্রভাব তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে যখন তিনি শিলাইদহ এবং পদ্মার নিকট থেকে দূরে চলে গেছেন। কিন্তু আবার ফিরে এলেই তাঁর সে মনোকষ্টের অবসান হয়। ছিন্নপত্রাবলীর একটি চিঠিতে তাঁর এই মনোভাব অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

> "... প্রতিভার এই পদ্মার উপর আসবার আগে ভয় হয়, আমার পদ্মা বোধহয় পুরোনো হয়ে গেছে। কিন্তু যখনই বোট ভাসিয়ে দিই, চারদিকে জল কুলকুল করে ওঠে– চারদিকে একটা স্পন্দন কম্পন আলোক আকাশ মৃদু কলধ্বনি, একটি সুকোমল নীল বিস্তার, একটি সুনবীন শ্যামলরেখা, বর্ণ এবং নৃত্য এবং সংগীত এবং সৌন্দর্যের একটি নিত্য-উৎসব উদঘাটিত হয়ে যায়, তখন আবার নতুন করে আমার হৃদয় যেন অভিভূত হয়ে যায়। এই পৃথিবীটি আমার অনেকদিনকার এবং অনেক জন্মকার ভালোবাসার লোকের মতো আমার কাছে চিরকাল নতুন; আমাদের দুজনকার মধ্যে একটা খুব গভীর এবং সুদূরপ্রসারী চেনাশোনা আছে। ... আমরা দুজনে একলা মুখোমুখী করে বসলেই সেই বহুকালের পরিচয় যেন অল্পে অল্পে মনে পড়ে। আমার বসুন্ধরা এখন 'একখানি রৌদ্রপীত 'হিরণ্য-অঞ্চল' পরে ঐ নদীতীরের শস্যক্ষেত্রে বসে আছেন। আমি তাঁর পায়ের কাছে, কোলের কাছে গিয়ে লুটিয়ে পড়ছি।"[১৬]

এ এক অসাধারণ প্রেমের ছবি এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ। শিলাইদহ এবং পদ্মাই ছিল তাঁর বসুন্ধরা। সেই ছেলেবেলায় ছিল তাদের প্রথম দেখাশোনা। তারপর যতবার দেখা হয়েছে সে প্রেম গভীর থেকে গভীরতম রূপ পরিগ্রহ করেছে। দয়িতার প্রতি কবির এই ভালোবাসা তাঁকে নতুন জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ করেছে। পদ্মাকে নিয়ে তাঁর এই ভাবনার এক অসাধারণ চিত্রময়তা ফুটে উঠেছে ছিন্নপত্রাবলীর আর একটি চিঠিতে।

> "পদ্মাকে এখন খুব জাঁকালো দেখতে হয়েছে– একেবারে বুক ফুলিয়ে চলেছে ; ওপারটা একটিমাত্র কাজলের নীল রেখার মতো দেখা যায়। আমি এই জলের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবি, বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে গতিটাকে যদি কেবল গতিভাবেই উপলব্ধি করতে ইচ্ছা করি তা হলে নদীর স্রোতে সেটি পাওয়া যায়। মানুষ-পশুর মধ্যে যে চলাচল তাতে খানিকটা চলা খানিকটা না-চলা, কিন্তু নদীর আগাগোড়াই চলছে– সেইজন্য আমাদের মনের সঙ্গে, আমাদের চেতনার সঙ্গে, তার একটি সাদৃশ্য পাওয়া যায়। ... সেইজন্য এই ভাদ্রমাসের

> পদ্মাকে একটা প্রবল মানসশক্তির মতো বোধ হয়; সে মনের ইচ্ছার মতো ভাঙছে-চুরছে এবং চলেছে, মনের ইচ্ছার মতো সে আপনাকে বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গে এবং অস্ফুট কলসংগীতে নানা প্রকারে প্রকাশ করবার চেষ্টা করছে। বেগবান একাগ্রগামিনী নদী আমাদের ইচ্ছার মতো, আর বিচিত্রশস্যশালিনী স্থিরভূমি আমাদের ইচ্ছার সামগ্রীর মতো।"[১৭]

উপরের সবগুলি চিঠিতেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রেমের ছবি এঁকেছেন। রবীন্দ্রনাথ যৌবনে ত্রিশবছর বয়সে শিলাইদহে এসেছিলেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতো রবীন্দ্রনাথ পদ্মানদীর মধ্যেই তাঁর জীবনের ধ্রুব সত্যকে খুঁজে পেয়েছিলেন। এ এক বিস্ময়কর অনুভূতি। পদ্মা বুঝি এক তন্বী-যুবতী যার প্রেমে রবীন্দ্রনাথ আজীবন অবগাহন করেছেন। মাঝে- মধ্যে মনে প্রশ্ন জাগে পদ্মার আড়ালে কাউকে কি তিনি স্মরণে আনতে চেয়েছেন? যার মধ্যে শিলাইদহ, পদ্মা এবং বাংলাদেশ একাকার হয়েছে, যার জন্য তিনি বারবার শহর ছেড়ে দিয়ে এসেছেন পল্লীর নিভৃত অঞ্চলে! মনে হয় কবির মধ্যে এক বিরহবোধ নিয়তই তাঁকে পীড়িত করেছে। কবি তাঁর এই আবেগকে খুঁজে পেয়েছিলেন শিলাইদহে পদ্মার প্রবহমানতায়। সেখানে তার এক অসাধারণ গতিময়তা- যা জীবনকে পত্র-পুষ্পে সুশোভিত করে তোলে। কিন্তু এই পদ্মার বুকে যখন চর জেগে ওঠে, যখন সেখানে ধু-ধু বালুচর–তখনতো তাতে আর প্রাণের স্পন্দন জেগে ওঠে না– কিন্তু তখনও তো পদ্মা বয়ে চলে। রবীন্দ্রনাথ তো সে পদ্মাকে আর বুঝি চিনে উঠতে পারেন না– তখনতো তিনি একান্তই একলা।

শিলাহদহ থেকে লেখা এমন একটি চিঠিতে কবি নিজেকে মেলে ধরেছেন এক অসাধারণ বিরহ- কাতরতায়।

> "দিগন্তের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত বালিরচর ধু-ধু করছে-- তাতে না আছে ঘাস, না আছে গাছ, না আছে বাড়িঘর, না আছে কিছু। আকাশের শূন্যতা, সমুদ্রের শূন্যতা আমাদের চিরাভ্যস্ত; তার কাছে আমরা আর কিছু দাবি করি নে, কিন্তু ভূমির শূন্যতাকে সবচেয়ে বেশি শূন্য বলে মনে হয়। কোথাও গতি নেই, জীবন নেই, বৈচিত্র্য নেই; যেখানে ফলে শস্য তৃণে, পশুপক্ষীতে ভরে যেতে পারত সেখানে একটি কুশের অঙ্কুর পর্যন্ত নেই-- কেবল একটা উদাস কঠিন নীরবচ্ছিন্ন বৈধব্যের বন্ধ্যাদেশ। ঠিক পাশ দিয়ে পদ্মা চলে যাচ্ছে; ওপারে ঘাট, বাঁধা নৌকো, স্নানরত লোকজন, নারকেল এবং আমের বাগান, অপরাহ্নে নদীর ধারের হাটে কলধ্বনি; দূরে পাবনার পারে তরুশ্রেণীর ঘননীল রেখা– কোথাও গাঢ়নীল, কোথাও পান্তনীল, কোথাও সবুজ, কোথাও মাটির ধূসরতা- আর তারই মাঝখানে এই রক্তশূন্য মৃত্যুর মতো ফ্যাকাসে সাদাসন্ধ্যা। সন্ধ্যাবেলা সূর্যাস্তের সময় এই চরের ওপর আর কিছুই নেই, কেউ নেই, কেবল আমি একেলা।"[১৮]

কবির এ এক ব্যতিক্রমী জীবনবোধ। এ যেন কীটস-এর নাইটিঙ্গেল পাখির সুধাসম গানের ভুবন থেকে হঠাৎ বুঝি ফিরে আসা জীবনের কাঠিন্যে– যেখানে

সব ভালোবাসা জীবনের সব আনন্দ নিঃশেষিত হয়ে যায় ক্রমে ক্রমে। নাইটিঙ্গেলের গানে দুঃখবোধ ছিল না। জরামৃত্যু দুঃখের ঊর্ধ্বে তার জগৎ। কীটস নাইটিঙ্গেল পাখির গানের ভুবনে যেতে চেয়েছিলেন তার সুধারসে সিক্ত হয়ে এক সাহসী নতুন পৃথিবীর জন্ম দিতে। তা তিনি পারেন নি। তাঁকে ফিরে আসতে হয়েছে কঠিন-পৃথিবীতে। একটি ঘণ্টাধ্বনি তাঁকে ফিরিয়ে এনেছে বাস্তবতার সম্মুখ সমরে। রবীন্দ্রনাথও বুঝি এমনটিই চেয়েছিলেন। পদ্মার মধ্যে যে ঐশ্বর্য তিনি দেখেছিলেন তাকে ধারণ করে যে স্বপ্নসৌধ রচনা করতে চেয়েছিলেন কবি, কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখী হয়ে সে সৌন্দর্যালোকে যাওয়া তার হল না। কিন্তু কবির কল্পনা তো মিথ্যে হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ পলিপড়া পদ্মাবিধৌত বাংলাদেশে জীবনকে শুকিয়ে যেতে দেখেছিলেন। অশিক্ষা-কুশিক্ষার ফলে জরামৃত্যু, শোক-দুঃখ এবং অভাব-অনটন মানুষের জীবনকে নিঃশেষিত করে ফেলছিল। রবীন্দ্রনাথ তাই এই দুঃখ-শোককে দূরীভূত করতে জমিদারের শক্তিকে প্রয়োগ করতে চাইলেন কল্যাণব্রতে। শিলাইদহ, সাজাদপুর এবং পতিসরে তিনি পল্লীউন্নয়নের কর্মসূচি গ্রহণ করে তার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মুক্তির পথ খুঁজতে চেয়েছিলেন। এখানে তিনি অনেকটাই সফল হয়েছিলেন। কিন্তু পারিবারিক কারণে জমিদারি হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় বাংলাদেশে তাঁর এই পরিকল্পনা অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। কিন্তু পশ্চিমবাংলায় শান্তিনিকেতন এবং শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা করে বাংলাদেশের এই পরিকল্পনাকে তিনি সেখানে কাজে লাগিয়েছিলেন এবং তা সফলও হয়েছিল।

দুই ॥

রবীন্দ্রনাথ পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচি সর্বপ্রথম গ্রহণ করেন শিলাইদহে। এখান থেকেই তিনি পাবনার সাজাদপুর এবং রাজশাহীর পতিসরে গিয়েছেন। সেখানেও তাঁর জমিদারিতে থাকবার জন্য কুঠিবাড়ি ছিল এবং মাঝেমধ্যে তিনি সেখানে থেকেছেনও। তবে প্রায়শ তাঁর দিন কেটেছে বজরায়। এখান থেকেই তিনি প্রকৃতিকে অবলোকন করেছেন। পদ্মানদীকে তিনি তাঁর সাথী হিসেবেই পেয়েছেন। তাঁকে প্রতীকী কল্পনায় শৈশব-কৈশোরের খেলার সাথী, যৌবনে মানসী এবং প্রৌঢ়কালে জীবনদেবতার আসনে সমাসীন করেছেন। বাংলাদেশে জমিদারি-দায়িত্ব নেবার পর কবি-জমিদারের একটি আপাত-বিরোধী ভাবনার মধ্য থেকে একটি ব্যতিক্রমী জীবনবোধ তাঁর সকল কাজকর্মকে প্রভাবিত করেছে। তিনি জন্মগ্রহণ করেই পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসেছেন। পাশ্চাত্যের ভালো-মন্দ উভয় দিকই তাঁর নজরে পড়েছে। এ ছাড়াও পারিবারিক প্রভাবে তিনি হিন্দু সনাতনী ধর্ম ও জীবনের নানা কর্মকাণ্ড যেমন পরিলক্ষিত করেছেন তেমনি পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কারণে মুসলিম-ঐতিহ্য, সুফীদর্শন এবং পরবর্তীতে ব্রাহ্মদর্শনের সান্নিধ্যে এসেছেন। গোটা পরিবারের উপর প্রিন্স

দ্বারকানাথ ঠাকুরের অসাধারণ প্রভাব ছিল। তিনি ছিলেন পাশ্চাত্যের বিনিয়োগকামী কর্মব্যবস্থাপনার আদর্শে গড়ে ওঠা সফল মানুষ। ফলে উনিশ শতকে যে রেনেসাঁস-এর জন্ম হয়েছিল এদেশে রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে তাঁর দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। তিনি রাশিয়ার বিপ্লব, ফ্রান্সের প্রতিবিপ্লব এবং পাশ্চাত্যের শিল্পবিপ্লবকে গভীর অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে দেখেছিলেন। এসবের কারণে তাঁর অন্তর ও বাহিরে নানা দ্বন্দ্ব ও বিরোধের তিনি সম্মুখীন হয়েছিলেন। একদিকে জমিদারি-ঐতিহ্য, বিলাস-ব্যসন তাঁর মধ্যে কাজ করেছে, অপরদিকে সমকালীন জীবন থেকে নেওয়া একটি মানবিক মূল্যবোধ তাঁর অন্তরে ক্রমান্বয়ে দানা বেঁধেছে। শিলাইদহে এসে জমিদারি তদারকি করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের সান্নিধ্যে এসে তাঁর কবি-মনে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিল তাতে তিনি নিজেকেই অভিযুক্ত করে ফেললেন। বিচারের ভার অন্যের উপর সমর্পণ না করে নিজেই তার সমাধানের পথ বের করে নিতে চাইলেন। একদিকে জমিদার-পিতার প্রত্যাশা জমিদারির উন্নয়ন, অপরদিকে অসহায় মানুষের ক্রন্দন। রবীন্দ্রনাথ এ দুটোকেই অসাধারণ বুদ্ধি ও কৌশলে মেলাতে পেরেছিলেন। এতে সাপ মরেছে এবং লাঠিও ভাঙে নি। রবীন্দ্রনাথ জমিদারি ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়েই পল্লী তথা প্রজা উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি যথানিয়মে খাজনা নিয়েছেন কিন্তু প্রতিরোধের সম্মুখীন হন নি। এটা তাঁর ব্যবহার ও আচরণের কারণেই সম্ভব হয়েছিল। এস্টেটের কর্মকর্তা ও প্রজাদের মধ্যে বিরোধ বাধলে তিনি প্রজাদেরকেই সমর্থন করেছেন। কারণ, তিনি জানতেন প্রজারা অত্যাচারিত না হলে তারা প্রতিবাদ করে না। ইতোমধ্যেই তিনি প্রজাদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, তিনি তাদের হিতৈষী-- তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নই তাঁর কাম্য। মনে হয় এ কারণে আশেপাশের জমিদারিতে কৃষক-বিদ্রোহ হলেও রবীন্দ্রনাথের জমিদারিতে এমন হয় নি। তিনি জমিদারি দায়িত্ব নেবার পর খাজনা আদায়কারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে দরিদ্র প্রজাদের অবস্থা বিবেচনা করে খাজনা আদায়ের কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়নের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল কৃষকের দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে গোটা গ্রামকে শিক্ষা-স্বাস্থ্য ইত্যাদির উন্নয়নের সঙ্গে এর অধিবাসীগণকে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে উদ্বুদ্ধ করে তোলা। একটি গ্রাম জাগলে একটি দেশ জাগবে– রবীন্দ্রনাথের এই চেতনা একদিকে যেমন তাঁকে স্বদেশপ্রেমী করে তুলেছিল তেমনি এই দেশকে পূর্ণাঙ্গভাবে স্বনির্ভর হিসেবে গড়ে তোলাও তাঁর অভিপ্রেত ছিল। তবে পল্লীউন্নয়নের মাধ্যমে হঠাৎ করে তিনি স্বদেশী রাষ্ট্র গঠনের কোন ইচ্ছা পোষণ করেন নি। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল একটি আত্মনির্ভর এবং আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী একটি সংগঠিত সমাজ। কারণ, তিনি বিশ্বাস করতেন দেশে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হলেই যে দেশের সকল সমস্যা দূর হবে– তা নয়। দেশের লোক এ বিষয়ে সচেতন না হলে এই স্বরাজ রক্ষা করা যাবে না। রবীন্দ্রনাথ বলেন :

> "মানুষ আপন দেশকে আপনি সৃষ্টি করে। ... আমাদের দেশের মানুষ দেশে জন্মাচ্ছে মাত্র, দেশকে সৃষ্টি করে তুলছে না, এজন্য তাদের

> পরস্পর মিলনে কোন উপলক্ষ নেই, দেশের অনিষ্টে তাদের প্রত্যেকের অনিষ্টবোধ জাগে না। দেশকে সৃষ্টি করার দ্বারাই দেশকে লাভ করবার সাধনা আমাদের ধরিয়ে দিতে হবে।"[১৯]

রবীন্দ্রনাথের জীবনে রাজনীতি যে ছিল না তা নয়, তবে সমাজ-ধর্মকেই তিনি প্রধান জ্ঞান করেছিলেন। তাঁর মতে, সমাজধর্মের সঙ্গে মানবধর্ম একসূত্রে গাঁথা। রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনদর্শনের অঙ্গ। তিনি প্রগতিবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। এই প্রগতিবাদ ছিল উচ্চ-নীচের সমন্বয়ে গঠিত এবং এক অর্থে মানবতাবাদ বা তাঁর ভাষায় 'মানবধর্ম' বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়নের মধ্যে এই স্বাদেশিকতা বা স্বদেশপ্রেম সমাজপ্রেমে পর্যবসিত হয়েছিল। 'স্বদেশের লোক স্বদেশের লোককে সাহায্য করবে, ইহাই স্বদেশ-হিতৈষিতার প্রকৃতচর্চা।' রবীন্দ্রনাথের এই স্বদেশপ্রেম যা একান্ত করেই গ্রামবাংলাকে নিয়ে গড়ে উঠেছিল তা দুটি পথ নির্দেশক।

এক, স্বদেশ পরিচয়ের জন্য প্রয়োজন স্বদেশী শিক্ষানীতি। কারণ, দেশের প্রতি মমতা জন্মায় তখনই যখন আমরা দেশের মানুষকে ভালোবাসব। তবে তিনি ইংরেজি-শিক্ষাকে অবহেলা করেন নি কিন্তু তাকে প্রাধান্যও দেন নি। শিক্ষাকে তিনি জীবনধর্মী এবং জীবন্ত করে তুলতে চেয়েছিলেন এবং এ কাজই তিনি শিলাইদহে ও পতিসরে শুরু করেছিলেন কিন্তু সেখানে তিনি সফল হতে পারেন নি। অতঃপর শান্তিনিকেতনে তিনি তাঁর প্রচেষ্টাকে সফল করে তোলেন যা কর্মযোগের শিক্ষা হিসেবে শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে এবং অবশেষে সামগ্রিকভাবে 'বিশ্বভারতী'-তে একটি পূর্ণাঙ্গরূপ পরিগ্রহ করে।

দুই, স্বদেশ সংস্কৃতিতে তাঁর গভীর বিশ্বাস। তাঁর মতে স্বদেশের ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলনসহ স্বদেশের সংস্কৃতি যা লোককথা, লোকসংগীতের মধ্যে প্রতিফলিত, তার সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং তা থেকে আত্মশক্তি এবং আত্মজ্ঞান লাভ করা যা সমাজ উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে।

রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছিলেন দেশের প্রভু ইংরেজ হওয়ায় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে রাজনীতিবিদগণ ইংরেজি ভাষা ব্যবহারে যত্নবান। তিনি এই মানসিকতার বিরোধিতা করে, ১৯০৮ সালে বাংলাদেশের প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতি হিসেবে বাংলায় বক্তৃতা করে বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা ও বিশ্বাসের বিষয়টি জানিয়ে দেন। এটা সে সময়ের জন্য তাঁর একটি বড় বিদ্রোহ ছিল। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই চেতনাকে রাজনীতির সঙ্গে না জড়িয়ে স্বদেশপ্রেম হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তাঁর দেশপ্রেম অনেকটা ভারতপ্রেমে রূপান্তরিত হয়েছিল। তিনি 'হিন্দু মেলা'র প্রবর্তন করে ভারতবন্দনাকে সূচিত করেছিলেন। এখানে হিন্দুপ্রীতি তাঁর কার্যক্রমকে অনেকটা একপেশে করে ফেলেছিল, যা পরবর্তীতে গ্রামবাংলার মুসলমানদের সংস্পর্শে এসে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যে রূপান্তরিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে বলেন, "ধর্ম বলিতে রিলিজিয়ন নহে, সামাজিক কর্তব্যতন্ত্র-- তাহার মধ্যে যথাযোগ্যভাবে রিলিজিয়ন পলিটিকস সমস্তই আছে।"[২০] রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা ছিল স্বদেশী-সমাজ গঠনের পরিকল্পনার মধ্যে। এই কাজ তিনি শুরু করেছিলেন শিলাইদহে। তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল আত্মনির্ভরতা এবং আত্মশক্তির উদ্‌বোধন। তিনি বিশ্বাস করতেন পল্লীর উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মধ্যেই এই সত্য নিহিত। রবীন্দ্রনাথ হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ তাঁর জমিদারিতে গিয়েই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি লক্ষ করেছিলেন হিন্দুদের অপেক্ষা মুসলমানেরা অনেক উদার এবং তাঁর কর্মকাণ্ডে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানেরাই সহযোগী। তিনি তাই সকলকে আহ্বান করে বলেন, "পল্লীর মাঝখানে যাও, জ্ঞান দাও, আনন্দ দাও, আশা দাও, সেবা করো।"

রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন, ভেদ শুধু ইংরেজ সৃষ্টি করেনি, ভেদ আমাদের মধ্যে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা হিন্দু-মুসলমানের বিরোধকে অপসারিত করতে চেয়েছিল। এজন্য তিনি বলেন : "মানুষকে চাহিলে মানুষের সেবা করিতে হয়। পরস্পরের ব্যবধান দূর করিতে হয়– নিজেকে নম্র করিতে হয়।" (সদুপায়, সমূহ) এই মিলনের জন্য রবীন্দ্রনাথ পল্লীউন্নয়নে সমবায়কে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। এই পদ্ধতিতেই হিন্দু-মুসলমান এবং উচ্চ-নীচ, ধনী ও গরিবকে একত্রিত করা সম্ভব। ১৯০৮ সালে রবীন্দ্রনাথ পাবনা প্রাদেশিক সম্মেলনে বলেছিলেন:

> "চাকরি ও সম্মানের ভাষা মুসলমান ভ্রাতাদের চেয়ে আমাদের অংশে বেশি পড়িয়াছে সন্দেহ নাই। এইরূপে আমাদের মধ্যে একটা পার্থক্য ঘটিয়াছে। এইটুকু কোনোমতে না মিটিয়া গেলে আমাদের ঠিক মনের মিলন হইবে না... যে রাজপ্রাসাদ এতদিন আমরা ভোগ করিয়া আসিয়াছি আজ প্রচুর পরিমাণে তাহা মুসলমানদের ভাগে পড়ুক ইহা আমরা যেন সম্পূর্ণ প্রসন্ন মনে প্রার্থনা করি। ..." (পাবনা অভিভাষণ)

রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে লক্ষ করেছিলেন বাংলাদেশে গ্রাম-গঞ্জে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানদের সংখ্যা অনেকাংশেই বেশি। সুতরাং গ্রামের উন্নয়নে মুসলমানদের সম্পৃক্ত না করতে পারলে দেশে কোনো উন্নয়নই ঘটবে না। তাই তিনি 'গোরা' উপন্যাসে নায়কের মাধ্যমে এক অবিস্মরণীয় উক্তি করেছেন :

> "আমি আজ ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান কোনো সমাজের কোনো বিরোধ নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকলের জাতই আমার জাত; সকলের অন্নই আমার অন্ন।"

রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়নের মধ্যে একটি মহাজাতিক ঐক্যের প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেন:

> "... যে দেশে একটি মহাজগৎ বাঁধিয়া ওঠে নাই, সে দেশে স্বাধীনতা হইতেই পারে না। কারণ, স্বাধীনতার 'স্ব' জিনিসটা কোথায়? সাধারণ মানুষের সঙ্গে সাধারণ আত্মীয়তার যে বৃহৎ সম্বন্ধ তাহাকে স্বকীয় করিবার সম্বল আমরা কিছুই উদ্বৃত্ত রাখি নাই। সেই কারণে– আমরা

দ্বীপপুঞ্জের মতোই খণ্ডখণ্ড হইয়া আসিয়াছি, মহাদেশের মতো ব্যস্ত, বিস্তৃত ও এক হইয়া উঠিতে পারি নাই। ..."[২১]

রবীন্দ্রনাথের মনের মধ্যকার এই ক্ষোভ ছিল যথার্থ। শিলাইদহেও তিনি লক্ষ করেছিলেন হিন্দু বা মুসলমানদেরকে সেখানে অন্যান্য নীচুজাতের মতো অস্পৃশ্য বলে মনে করা হতো।

রবীন্দ্রনাথ গভীর দুঃখের সাথে লক্ষ করেছিলেন ভারতে রাজনীতিবিদদের মধ্যে স্বদেশী আন্দোলন অনেকটাই একপেশে হয়ে পড়েছিল। স্বজাতির উন্নতিই হিন্দু নেতৃবৃন্দের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে পড়ে। এ কারণে তিনি তথাকথিত 'স্বদেশী' আন্দোলন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ১৯০৮ সালে তিনি ফিরে আসেন শিলাইদহে– তাঁর নিজস্ব ভুবনে। এখানেই তিনি পল্লীসমাজ গঠনের কাজ শুরু করেন। এখানে তিনি তাঁর জমিদারিতে হিন্দু-মুসলমানের বিভেদকে দূর করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ঠাকুরবাড়ির সভায় মুসলমানদের জন্য একাসনের ব্যবস্থা করেছিলেন। এতে গোঁড়া হিন্দুরা ক্রোধান্বিত হলেও মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথ তাতে ভ্রূক্ষেপ করেননি। এখানেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব। পল্লীর সাথে তাঁর সংযোগ হওয়াতে তিনি মানুষ মানুষে বিভেদের দৃশ্যটি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ শুধু যে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য চেয়েছিলেন– তা নয়, তিনি জাতিভেদ প্রথার ঘোর বিরোধী ছিলেন। শিলাইদহ অঞ্চলেই তিনি এই অস্পৃশ্যতাকে প্রকট আকারে দেখেছিলেন। এখানেই তিনি তাই তাঁর পল্লীউন্নয়নের কার্যক্রম শুরু করেছিলেন। এ সম্পর্কে অবলা বসুকে ১৯০৮ সালের এপ্রিলে লেখা একটি চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন :

"আমি সম্প্রতি পল্লীসমাজ নিয়ে পড়েছি। আমাদের জমিদারির মধ্যে পল্লীগঠন কার্যের দৃষ্টান্ত দেখাব বলে স্থির করেছি। কাজ আরম্ভ করে দিয়েছি। কয়েক জন পূর্ববঙ্গের ছেলে আমার কাছে ধরা দিয়েছে। তারা পল্লীর মধ্যে থেকে সেখানকার লোকদের সঙ্গে বাস করে তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিচার প্রভৃতি সকল কাজের ব্যবস্থা তাদের নিজেদের দিয়ে করাবার চেষ্টা করছে। তাদের দিয়ে রাস্তাঘাট বাঁধানো, পুকুর খোঁড়ানো, ড্রেন কাটানো, জঙ্গল সাফ করানো প্রভৃতি সমস্ত কাজের উদ্যোগ হচ্ছে। আমাদের পল্লীর ভিতরে সমস্ত দেশ ব্যাপ্ত করে এমন সুগভীর নিরুদ্দম যে দেখলে স্বরাজ স্বাতন্ত্র্য প্রভৃতি কথাকে পরিহাস বলে মনে হয়। — ও সকল কথা মুখে উচ্চারণ করতে লজ্জাবোধ হয়। কিন্তু যাঁরা সবচেয়ে উচ্চৈঃস্বরে একেবারেই সপ্তমে গলা চড়িয়ে এই সকল শব্দ ঘোষণা করেন তারাই এই বিষয়টাতে সকলের চেয়ে নিশ্চেষ্ট। এঁরা কেবলই কথা নিয়ে কলহ করেছেন, কাজেই আমার মতো জরাজীর্ণকেও কাজের ক্ষেত্রে নামতে হয়েছে। আমি সভাস্থলের আহ্বানে আর সাড়া দিচ্ছিনে — কিন্তু সেজন্যেই দেশের যেটা সকলের চেয়ে প্রয়োজন সেটা সাধনের জন্যে আমার যেটুকু সাধ্য তা প্রয়োগ করতেই হবে। আপনারা যখন ফিরে আসবেন— আশা

করছি ততদিনে আমাদের শিলাইদহের গ্রামগুলি অনেকটা গঠিত হতে পারবে।"[২২] চিঠিপত্র ৬, এপ্রিল-১৯০৮।

শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ পল্লীউন্নয়নের কাজ কীভাবে শুরু করেছিলেন তার একটি বিবরণ দিয়েছেন শিলাইদহের অধিবাসী এবং পরবর্তীকালে ঠাকুর-এস্টেটের কর্মচারী শ্রী শচীন্দ্রনাথ অধিকারী তাঁর 'শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে। তিনি বলেন : রবীন্দ্রনাথের পল্লী সংগঠনের প্রথম পর্ব শুরু হয়েছিল শিলাইদহে ১৯০৭/০৮ সালের দিকে। দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়েছিল কালীগ্রাম পরগনায় রাজশাহীর পতিসরে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ ও বাঙালির স্বদেশী আন্দোলন সফল করবার জন্য তিনি শিলাইদহে বিরাট আকারে একটি সংগঠনের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর প্রধান কাজ ছিল গ্রামে গ্রামে তাঁতের প্রচলন ও কাপড় ইত্যাদি বোনা, শরীর-চর্চা, স্বদেশী মেলার আয়োজন ও পল্লীশিল্পের প্রচার ইত্যাদি। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহের কিশোরদের নিয়ে যে, সংগঠন করেন তার নাম ছিল কিশোরব্রতী-বালকদল। শচীন্দ্রনাথ বলেন যে তারা খুব দুরন্ত ছিল এবং রবীন্দ্রনাথ সরাসরি তাদের সাথে যোগাযোগ করে এই কাজে লাগিয়ে দেন। শচীন্দ্রনাথ অধিকারী সেই কিশোরব্রতী বালকদের কাজের একটি বিবরণ দিয়েছেন তাঁর গ্রন্থে :

"... আমরা সে বয়সে রবীন্দ্রনাথের কর্মপ্রণালী ভালোরকম বুঝতে না পারলেও তাঁর কথাগুলোর মধ্যে এমন উৎসাহ উদ্যম ও নবজীবনের সন্ধান পেলাম যে আমরা বেশ স্বাভাবিকভাবে নতুন স্ফূর্তি নিয়ে এই কাজে মেতে উঠলাম। পল্লীর সেবা বললেই আজকাল ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর একটা বিকট দায়িত্বের কল্পনায় মনটা মুষড়ে পড়ে। আমাদের আদৌ সে রকম হল না। ... আমাদের কর্মধারা ছিল প্রধানত তিনটি – (১) হাতেকলমে কৃষি শিক্ষা (২) আদর্শ গ্রাম তৈরি (৩) ব্রতীবালকদল গঠন। প্রত্যহ ইস্কুল ছুটির পর আমাদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে এক ঘণ্টা করে কাজ করতে হতো। শনি ও রবিবারের কাজ ছিল অবশ্যকরণীয়, বেলা ২ টা থেকে ৬ টা পর্যন্ত। খেলা শেষ হতে অনেকদিন সাতটা বেজে যেত।

আমাদের প্রথম কাজ ছিল শিলাইদহ কুঠিবাড়ির ফুলবাগানে। গাছের যত্ন করা, গাছ পুঁততে শেখা, জল দেওয়া, নিড়ানো, সার দেওয়া ইত্যাদি। আমাদের নাম লিখে প্রত্যেককে পাঁচটি করে গোলাপ গাছের ভার দেওয়া হয়েছিল। ফুলের গাছ বাদেও কুঠিবাড়ির পাশের জমিতে চিনেবাদাম, আলু, মটরশুটি, পেঁয়াজ, কপি ইত্যাদির যে বাগান ছিল তার পরিচর্যাও আমাদের হাতেকলমে করতে হতো। আমরা সেখানে এবং আমাদের প্রত্যেকের বাড়িতে নানারকম তরকারি উৎপন্ন করেছিলাম এবং এসব কাজে বেশ দক্ষ হয়ে উঠেছিলাম। বেশ মনে আছে, পুকুর থেকে বাঁকে করে গাছের জন্য জল তুলতে তুলতে ঘাড় ব্যথা হত, কোদালে ক্ষেত কুপিয়ে হাতে ফোস্কা পড়ে যেত। ...

গোবর, খইল পাতা পচিয়ে সার তৈরি করতে আমাদের প্রতিযোগিতা চলত। ...

আমাদের দ্বিতীয় কাজ ছিল কুঠিবাড়ির পাশেই ছোট্ট একখানা গ্রামের (কোমরকাঁদি গ্রাম) সংস্কার করা। এর নাম ছিল 'আদর্শ গ্রাম তৈরি'। আমরা কর্মী ছিলাম প্রায় চব্বিশ জন, তার মধ্যে নিয়মিত কাজ করতাম ষোলজন। গ্রামখানিতে ছিল নিরক্ষর চাষিদের বাস। আমাদের প্রত্যেকের ভাগে পাঁচখানা করে গৃহস্থের বাড়ি দেওয়া হয়েছিল। আমাদের কাজ ছিল, (১) ঐ বাড়িগুলোর বুড়োগুঁড়ো সবাইকে অ আ ক খ শেখানো আর কুঠিবাড়িতে স্থাপিত প্রাইমারি ইস্কুলে ঐসব বাড়ির ছেলেদের পাঠানো, এবং (২) তাদের জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য উপদেশ দেওয়া। তারা আমাদের উপদেশ না শুনলে নিজেরাই দা-কোদাল-কুড়ুল নিয়ে তাদের বাড়ির আগাছা জঙ্গল সাফ করতাম, সে জায়গা কুপিয়ে লঙ্কা, বেগুন ইত্যাদি বোনার ব্যবস্থা করতাম। এতে তাদের কর্মপ্রবণতা ও উৎসাহ বাড়ত। রবীন্দ্রনাথের উপদেশ ছিল– গ্রামের বুড়োরা হয়তো তোমাদের কথা শুনতে চাইবে না ; তখন তোমরা নিজেরাই দা–কোদাল নিয়ে তাদের কাজ করে দেবে। তাদের বাড়ির রোগীদের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার জন্য কুঠিবাড়িতে নিয়ে আসবে; আর কঠিন রোগীদের সরকারি ডাক্তারখানায় পাঠানোর ব্যবস্থা করবে। খবরদার, ঝাড়ফুঁক করতে দেবে না। তাহলেই দেখবে, বুড়োরা, তোমাদের মত শিশুকর্মীদের কথা নিশ্চয় শুনবে। তোমাদের কাছে তারা সত্যিকার ভালোবাসা পাবে, আর তোমাদের মানবে না– এও কি কখনো হয়?

সত্যিই তাই, আমাদের প্রত্যেকের নির্দিষ্ট চাকলার বাড়ির মালিকেরা প্রথমে আমাদের ছেলেমানুষ বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করত, কিন্তু আমাদের সারল্য ও নিষ্ঠা দেখে তারা সত্যিসত্যিই আমাদের বেশ মান্য করত। শুধু তা-ই নয়, তারা সময়ে সময়ে যত্ন করে দুধচিড়ে দিয়ে সরের গুড় (টাটকা ফেনাওয়ালা গরম আখের গুড়) খাওয়াত। ঐ জিনিসটা আমরা বাড়িতে পেতাম না।"[২৩]

রবীন্দ্রনাথ ব্রতীদলকে সংঘবদ্ধ করবার জন্য শরীরচর্চাকে বিষয়ভুক্ত করেছিলেন। অনেক নতুন খেলা প্রবর্তন করায় যুবকদের অনেকেই ব্রতীদলে ভর্তি হবার জন্য আগ্রহী হতো। রবীন্দ্রনাথ আদর্শ-গ্রাম তৈরির ক্ষেত্রে প্রথমেই জরিপ কার্যের উপর গুরুত্ব অর্পণ করেছিলেন। এই জরিপের মাধ্যমে একটি গ্রামের বাসিন্দাদের বিবরণ, প্রত্যেক বাড়ির মালিকের নাম, পরিবার সংখ্যা, জাতি, বয়স, স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকাদের সংখ্যা, চাষের জমি, আয়ের উপায় ও পরিমাণ, গরু-বাছুর, মহিষের সংখ্যা, রোগের বিবরণ, জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি সংগ্রহ করা হতো। প্রায়ক্ষেত্রে ব্রতীবালকদের সহযোগিতা নেওয়া হতো।

রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথ নিজেও 'হোমিও'

চিকিৎসার মাধ্যমে বহু রোগী চিকিৎসা করেছেন। বাইওকেমিক চিকিৎসার মাধ্যমে তিনি চিকিৎসা করেছেন। বাইওকেমিক চিকিৎসায়ও রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতা ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিষ্ঠিত আদর্শ-গ্রামে গ্রামবাসীদের জন্য নিজেই ওষুধ দিতেন। এ সময় রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীর চেষ্টায় কুঠিবাড়িতে 'প্রতিমা বালিকা-বিদ্যালয়' গড়ে উঠেছিল। কোমরকাঁদি গ্রামে বয়স্ক শিক্ষার জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছিল। কৃষক ও অন্যান্য পেশাজীবী সম্প্রদায় সেখানে রাত্রে পড়াশুনার জন্য আসত।

পল্লীউন্নয়নের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সব শ্রেণীর মানুষকে একত্রিত করা সম্ভব। এই উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে 'কাত্যায়িনী' মেলা নামে একটি স্বদেশী মেলার প্রবর্তন করেছিলেন। এই মেলায় রবীন্দ্রনাথ কামার-কুমোর, ছুতোর, তাঁতি সকলকেই আহ্বান করেছিলেন তাদের শিল্পসম্ভার নিয়ে মেলা বসাতে। মেলাতে লাঠিখেলা, কুস্তিখেলা ইত্যাদির ব্যবস্থা ছিল। যাত্রা-নাটক, বাউল-বৈষ্ণব, পাঁচালি, কবি, তরজা, কীর্তন ইত্যাদি সংগীতমেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং সারারাত এইসব গান গ্রামবাসীরা শুনত। শিলাইদহে পরপর তিন বৎসর এই মেলা হয়েছিল। এইসব অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের বন্ধু আচার্য জগদীশ চন্দ্রবসু, নাটোর-রাজ জগদীন্দ্রনাথ যোগ দিয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে তাঁত শিল্পের প্রসার ঘটাতে চেয়েছিলেন। স্বদেশী মেলায় তাঁতবস্ত্রের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছিল এবং শিলাইদহে ১৯০৫ সালে তিনি একটি তাঁতের কারখানাও তৈরি করেছিলেন। কুমারখালি এবং শিলাইদহ অঞ্চলে তখন তাঁত ব্যবসার বেশ প্রসার হয়েছিল। এসব অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমান উভয়েই তাঁত ব্যবসায়ী ছিল। রবীন্দ্রনাথ পল্লীউন্নয়নের জন্য শিলাইদহে থাকতে নানা ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এ সম্পর্কে তাঁর নিজের বক্তব্য ছিল নিম্নরূপ :

"শিলাইদহে কুঠিবাড়ির চারদিকে যে জমি ছিল প্রজাদের মধ্যে নতুন ফসল প্রচারের উদ্দেশ্যে সেখানে নানা পরীক্ষায় লেগেছিলেম। এই পরীক্ষার ব্যাপারে সরকারি কৃষিবিভাগের বিশেষজ্ঞদের সহায়তা অত্যধিক পরিমাণে মিলেছিল। তাঁদের আদিষ্ট উপাদানের তালিকা দেখে চিচেস্‌টরে যারা এগ্রিকালচারাল কলেজে পাশ করেনি এমন সব চাষিরা হেসেছিল, তাদেরই হাসিটা টিকেছিল শেষ পর্যন্ত। মরার লক্ষণ আসন্ন হলেও শ্রদ্ধাবান রোগীরা যেমন করে চিকিৎসকের সমস্ত উপদেশ অক্ষুণ্ন রেখে পালন করে, পঞ্চাশ বিঘে জমিতে আলুচাষের পরীক্ষায় সরকারি কৃষিতত্ত্ব প্রবীণদের নির্দেশ সেইরকম একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করেছি। তাঁরাও আমার ভরসা জাগিয়ে রাখবার জন্য পরিদর্শন কার্যে সর্বদাই যাতায়াত করেছেন। তারই বহুব্যয়সাধ্য ব্যর্থতার প্রহসন নিয়ে বন্ধুবর জগদীশচন্দ্র আজও প্রায় মাঝে মাঝে হেসে থাকেন। কিন্তু তাঁরও চেয়ে প্রবল অট্টহাস্য নীরবে ধ্বনিত

> হয়েছিল চামরু নামধারী এক হাত কাটা সেই রাজবংশী চাষির ঘরে, যে ব্যক্তি পাঁচ কাঠা জমির উপযুক্ত বীজ নিয়ে কৃষিতত্ত্ববিদের সকল উপদেশই অগ্রাহ্য করে আমার চেয়ে প্রচুরতর ফল লাভ করেছিল। চাষবাস সম্বন্ধীয় যেসব পরীক্ষা ব্যাপারের মধ্যে বালক রথীন্দ্রনাথ বেড়ে উঠেছিল তারই একটা নমুনা দেবার জন্যে এই গল্পটা বলা গেল; পাঠকেরা হাসতে চান হাসুন, কিন্তু একথা যেন মানেন যে শিক্ষার অঙ্গরূপে এই ব্যর্থতাও ব্যর্থ নয়।"[২৪] (আশ্রমের রূপ ও বিকাশ ১৩৫৮)

এই বক্তব্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পল্লীউন্নয়ন প্রচেষ্টায় যে ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করেছেন তা যে জীবন-বিচ্ছিন্ন শিক্ষার কারণে তা তিনি উপলব্ধি করেছেন। তিনি ৫০ বিঘা জমিতে আলু চাষ করে শিক্ষিত কৃষিবিদদের সকল সহযোগিতা ও প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যে ব্যর্থ হলেন অপরদিকে একজন অশিক্ষিত আদিবাসী তাঁর লোকজ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার আলোকে ৫ কাঠা জমিতে ভালো ফসল ফলাতে পেরেছিল- তার একটি রসিকতাপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেছেন। তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথকেও কৃষিশিক্ষায় পারদর্শী করে গড়ে তুলতে গিয়ে এ বিষয়ে অবহিত করেছেন। আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা যে যথাযথ নয় এমনকি কৃষি এবং কারিগরি শিক্ষা-ব্যবস্থাও যে জীবন-অন্বিষ্ট নয়–সে কথা স্পষ্টভাবেই এখানে তিনি উল্লেখ করেছেন। এসব ব্যর্থতা ও তা থেকে রবীন্দ্রনাথ যে শিক্ষা বা জ্ঞানলাভ করেছিলেন সে আলোকেই পরবর্তীতে তাঁর পল্লীউন্নয়ন প্রচেষ্টা নির্দেশিত হয়েছিল এবং শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি এই ব্যর্থতাকে অনেকাংশে দূর করে তা জীবনমুখী করে গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে জমিদারি দায়িত্ব নেবার পর তিনি একজন প্রজাহিতৈষী জমিদার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। প্রশ্ন উঠতে পারে, রবীন্দ্রনাথ এত বড় জমিদার এবং তদুপরি কবি ও সাহিত্যিক হিসেবে বিশ্বনন্দিত, কেন তিনি পল্লীউন্নয়নের মতো কাজে নিজেকে এমনিভাবে জড়িয়ে নিলেন? এর উত্তরে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ কবি ছিলেন বলেই তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে মানুষের মনের গভীরে প্রবেশ করতে পারতেন। কবি ছিলেন বলেই রবীন্দ্রনাথ জমিদারের সম্পদ বৃদ্ধির কৌশল অবগত ছিলেন ফলে অনেক সময় তাঁর বিবেক তাঁকে দংশন করেছে। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধে তিনি যাদের দুঃখ-শোকের কথা উচ্চারণ করেছেন–তাদের জীবনের এই অসহায়ত্বের মূলে যে বিত্তবান ও ধনিক-সমাজ তা তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি রাশিয়ার বিপ্লব, ফরাসি বিপ্লব সম্বন্ধে অবগত ছিলেন; তাই তাঁর 'কর্মে ও কথায়' আত্মীয়তা করার জন্যে তিনি সাধারণ মানুষের কল্যাণে জীবনকে উৎসর্গিত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের নানা চিঠিপত্রে তাঁর এই চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ বলেন :

> "কাজের উপলক্ষে এক গ্রাম থেকে আরেক দূর গ্রামে যেতে হয়েছে, শিলাইদহ থেকে পতিসর। ... পল্লীবাসীদের দিনকৃত্য, তাদের জীবনযাত্রার বিচিত্র-চিত্র দেখে ... পল্লীর দুঃখদৈন্য আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল, তার জন্যে কিছু করব এই আকাঙ্ক্ষায় মন ছটফট

> করে উঠেছিল। তখন আমি যে জমিদারি-ব্যবসা করি, এটা নিতান্তই লজ্জার বিষয় মনে হয়েছিল। তারপর থেকে চেষ্টা করতুম কী করলে এদের মনের উদ্‌বোধন হয়, ... তখন থেকে মনে হয়েছে যে, পল্লীর কাজ করতে হবে। ..."[২৫]

রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্যেই পল্লীউন্নয়নে রবীন্দ্রনাথের সম্পৃক্ত হবার বিষয়টি আর অস্পষ্ট থাকে না। রবীন্দ্রনাথ শুধু যে পারিবারিক দায়-ভাগ পরিশোধের জন্যেই এই কাজে ব্রতী হয়েছিলেন তা নয়, দেশের প্রতি, জাতির প্রতি তাঁর কর্তব্যবোধও তাঁকে পল্লীউন্নয়নের কাজে উদ্বুদ্ধ করেছিল। রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে আর একটি যে বিশেষ চেতনা তাঁর মধ্যে কাজ করেছিল- তা তাঁর দেশপ্রেম বা স্বাদেশিকতা। তাঁর এই ভাবনার সঙ্গে সরাসরি রাজনীতির কোনো প্রত্যক্ষ যোগ না থাকলেও তিনি রাজনীতিকে যে অস্বীকার করেছিলেন- এমন বোধ হয় না। তাঁর দেশবিদেশীদের হাত থেকে মুক্ত হোক–এটা তাঁর আন্তরিক কামনা ছিল। কিন্তু অবিলম্বেই বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ লড়াইয়ে নামতে তিনি চাননি। এখানে তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারা কাজ করছে। ১৯০৫ সালে পাবনায় অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক সম্মেলনে বাংলা ভাষায় বক্তব্য প্রদান নিঃসন্দেহে একটি বিরাট বিদ্রোহ ছিল। আমার যতদূর ধারণা রবীন্দ্রনাথ লাঠিকে না ভেঙে সাপকে মারতে চেয়েছিলেন। এ কারণে বিদেশী প্রবর্তিত জমিদারি ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়েই তিনি পল্লীউন্নয়নের কাজ করতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন পল্লীউন্নয়নের জন্য সদিচ্ছা যেমন প্রয়োজনীয়, তদপেক্ষা বেশি প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক সহযোগিতা। দেশের মানুষ গরিব, বিত্তহীন–তাদের কাছ থেকে খাজনা নিতে হলে তাকে সামর্থ্যবান করে তুলতে হবে। এতে দুদিকেই লাভ হবে। রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন ভাবনায় এই চেতনাই সক্রিয় ছিল এবং এর উপর নির্ভর করেই তিনি বাংলাদেশে পল্লীউন্নয়নের কাজে নেমেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ পল্লীউন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি গ্রামকে মডেল বা আদর্শ হিসেবে নিতে চেয়েছিলেন। শিলাইদহে তাঁর জমিদারির অভ্যন্তরে এমন একটি গ্রামকে তিনি আদর্শ-পল্লী হিসেবে নির্বাচিত করেছিলেন এবং সেখানে তাঁর চিন্তা-ভাবনার প্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন।

কুষ্টিয়া গড়াইব্রিজের পশ্চিমে লাহিনী গ্রামে ৪০/৫০ বিঘা জমির উপর রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরিকল্পিত আদর্শ গ্রাম তৈরির কাজে সচেষ্ট হলেন। এই গ্রামের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হতো গড়াইনদী থেকে বেরিয়ে আসা কালীগঙ্গা নদী। কলকাতা-গোয়ালন্দ পর্যন্ত ট্রেন-যোগাযোগের জন্য কালীগঙ্গা নদীর উপর ব্রিটিশ সরকার রাস্তা নির্মাণ করেছিলেন। এ কাজে রবীন্দ্রনাথ বাধা দিয়েছিলেন এবং কালীগঙ্গার উপর একটি ব্রিজ নির্মাণের প্রস্তাব দিয়েছিলেন কিন্তু রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ তা গ্রহণ করে নি। যাহোক রবীন্দ্রনাথ তাঁর জমিদারি লাহিনী গ্রামে জরিপ করে উন্নয়নের একটি নক্সা তৈরি করেন। অতঃপর এই গ্রামে ইস্কুল, সমবায়, ডাক্তারখানা, রাস্তাঘাট ইত্যাদি নির্মাণকাজ শুরু হয়। বসতি স্থাপনের জন্যেও গৃহস্থ, চাকুরে, চাষি, তাঁতি, কামার-কুমোর, জেলে প্রভৃতির জন্য প্লট

তৈরি হল। বেশ কিছু বাড়িঘরও ইতোমধ্যে তৈরি হল। এই আদর্শ গ্রামের অধিবাসীদের জন্য রবীন্দ্রনাথ একটি বাজার তৈরির কাজেও হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু লাহিনী গ্রামের অনতিদূরে মোহিনী মিলের পাশ ঘেঁসে যশোরের নলডাঙ্গা রাজার (জমিদার) একটি হাট ছিল যা 'রাজার হাট' নামে অদ্যাবধি পরিচিত– তারসমূহ ক্ষতি হবে এ আশঙ্কা করে নলডাঙ্গার রাজা রবীন্দ্রনাথের নিকট প্রতিবাদ করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তা মানতে রাজি হলেন না। এর ফলে নলডাঙ্গার রাজা ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বেশ কয়েকটি মামলা হয়। কিন্তু বিষয়টি সেখানে নিষ্পত্তি হয় না। অতঃপর নলডাঙ্গার রাজার প্ররোচনায় রবীন্দ্রনাথের বাজার অগ্নিদগ্ধে ভস্মীভূত হয়। অবশেষে রবীন্দ্রনাথ নলডাঙ্গার রাজার বিরুদ্ধে মামলা করেন এবং মামলায় জয়ী হন। এই সময় লাহিনী গ্রামে দীনু ঘোষের ক্ষুদ্রাকৃতি প্রায় ৪০ বিঘা জমি রবীন্দ্রনাথের দখলে এসেছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ এই আদর্শ গ্রাম বাস্তবায়িত করতে পারেন নি। শ্রী শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর গ্রন্থ 'শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ'-এ এই আদর্শ গ্রামের বিস্তারিত বিবরণ আছে।

রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে থাকাকালীন শিলাইদহের কুঠিবাড়ি থেকে গড়াই নদীর কয়া বাজার সংলগ্ন একটি রাস্তা নির্মাণ করেন। এই রাস্তাটি 'রবীন্দ্র সড়ক' নামে সে সময় থেকে পরিচিতি লাভ করে আসছে। এ সময় শিলাইদহের আশেপাশে যাতায়াতের সুবিধার জন্য কোনো রাস্তাঘাট ছিল না। এ সব রাস্তাঘাটের জন্য জমির প্রয়োজন ছিল কিন্তু জমির মালিক বর্ধিষ্ণু হিন্দু গ্রাম-প্রধানগণ রাজি না হলে রবীন্দ্রনাথ জমিদার হিসেবে সেসব জমি দখল করে রাস্তা, গোপীনাথ মন্দিরের পাশে গোপীনাথ দিঘির পশ্চিমে বাজার ইস্কুল ও পূজামণ্ডপ তৈরি করে দেন। এই বাজার ও রাস্তা তৈরির জন্য রবীন্দ্রনাথকে নানা দুর্নামের ভাগী হতে হয়েছিল।[২৬]

সমবায় ও মণ্ডলী প্রথা পল্লীউন্নয়নের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে বড় যে কাজ করেছিলেন তা সমবায়-প্রথার প্রবর্তন। শিলাইদহেই তিনি এই সমবায়-প্রথার প্রবর্তন করেছিলেন। তিনি লক্ষ করেছিলেন গ্রামের মানুষ জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে অর্থনৈতিক চাপের সম্মুখীন হয়ে পড়ছে। পরিবার ভেঙে যাচ্ছে, সম্পদ ক্ষুদ্র হয়ে আসছে। সমাজে ক্ষুদ্র একটি শ্রেণী ধনী হয়ে পড়ছে এবং অধিকাংশই নির্ধন। এদের মধ্যে এক শ্রেণী তারা মধ্যস্বত্বভোগী। তিনি ধনী-নির্ধন, বিত্তবান-কৃষক ও বিত্তহীন-কৃষককে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমবায়ী করে তোলেন এবং এই সমবায়-প্রথাকে বাস্তবায়ন ও সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য তিনি সমগ্র এলাকাকে কয়েকটি মণ্ডলে বিভক্ত করেন। এই মণ্ডলীপ্রথা তাঁর একটি অবস্মরণীয় কর্মকাণ্ড। তিনি বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, মানুষ সুগঠিতভাবে সংগঠিত হলে তার উন্নয়ন সহজ এবং সম্ভবপর। কিন্তু শিলাইদহে এই মণ্ডলীপ্রথা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে ধনী-কৃষক বা জোতদার এবং কর্মচারীদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল এবং তারা এই প্রথার বিরোধিতা করতে শুরু করল। কারণ, তারা এযাবৎকাল যে সুবিধা বা অর্থনৈতিক সুযোগ লাভ করেছে এই প্রথা

প্রবর্তনের ফলে গ্রামের বিত্তহীন মানুষও তা ভোগ করবে এবং সমাজে তাদের অবস্থানের ভিত নড়ে উঠবে। নতুন নেতৃত্বের সূচনা হবে।

শচীন্দ্রনাথ অধিকারী 'শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে[২৭] এ সম্পর্কে উল্লেখ করেন,

"জমিদারির মধ্যে মণ্ডলীপ্রথা প্রবর্তনের ব্যাপারেও তাঁর সুদৃঢ় কর্তব্যনিষ্ঠা ও অবিচল অধ্যবসায়ের পরিচয় পাওয়া যায়। এই নতুন ব্যবস্থা যখন তিনি জমিদারিতে প্রবর্তন করলেন, তখন কর্মচারীদের মধ্যে অপ্রকাশ্য বিদ্রোহ দেখা দিল; প্রধান কর্মচারী ম্যানেজার জানালেন এই নতুন প্রথা কার্যকরী হবে না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্কল্পে অটল; পরিকল্পনায় তাঁর অসীম বিশ্বাস। অনেকবার ম্যানেজার তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অনুধাবন করবার যথেষ্ট সময় দিলেও ম্যানেজার তাঁর মত পুরোপুরি গ্রহণ না করায় রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বরখাস্ত করেন। এ ব্যাপারেও তিনি কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিলেন।

জমিদারি-প্রথা ও ব্যবস্থার বহুদিনের দুর্নাম ও কলঙ্ক মোচনের জন্য তিনি অবিচলিতভাবে কঠোর হস্তে যে সংস্কার ও সংগঠনের আয়োজন করেন, সে বিষয়ে কোনো জমিদার বিন্দুমাত্র চিন্তা করতেন না। আমাদের দেশের মত অনগ্রসর দেশে এই সমস্ত অভাবনীয় ব্যবস্থার জন্য রবীন্দ্রনাথকে বহু লোকের নিন্দা ও কঠোর সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছিল। আজ আমরা বুঝতে পারি, এইসব নিন্দা ও সমালোচনা কোনও মতেই রবীন্দ্রনাথের প্রাপ্য ছিল না। ম্যানেজারের প্রতিকূল আচরণের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ জমিদারিতে মণ্ডলী-গঠন ও তার কার্যপদ্ধতির সংস্কার ও প্রচলন বিষয়ে নিম্নস্থ কর্মচারীদের কীভাবে উপদেশ দিচ্ছেন তা নিম্নোদ্ধৃত চিঠি ক'খানা থেকে জানা যাবে-

আশিস : সন্তু

ডাকনজর অনুসারে জলির নজরখাজনা আদায়ের বৎসর এ নহে। প্রজাদের অবস্থা ও উৎপন্ন ফসলের পরিমাণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই আদায়-তহশিল করা শ্রেয়। এ সম্বন্ধে, ম্যানেজারকে পত্র লিখিয়াছি। তুমি তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া কিরূপ ব্যবস্থা করা কর্তব্য আমাকে জানাইবে। সর্বতোভাবে প্রজাদের সহিত ধর্মসম্বন্ধ রক্ষা করিয়া তাহাদের পূর্ণ বিশ্বাস আকর্ষণ করিতে হইবে। আমরা যে সর্বপ্রকারে প্রজাদের হিত ইচ্ছা করি, তোমাদের ব্যবহারে তাহা প্রতিপন্ন করিতে হইবে্ তোমার অধীনস্থ মণ্ডলের অন্তর্গত পল্লীগুলির যাহাতে সর্বপ্রকারে উন্নতিসাধন হয় প্রজাদিগকে সেজন্য সর্বদাই সচেষ্ট করিয়া দিবে। ইতঃপূর্বে তোমাদের প্রতি যে মুদ্রিত উপদেশ বিতরণ করা হইয়াছে তদনুসারে কাজ করিতে থাকিবে।

প্রজাদের প্রতি যেমন ন্যায়ধর্ম ও দয়া রক্ষা করিবে, তেমনি অধীনস্থ কর্মচারীদিগকে বিশেষভাবে কর্মের শাসনে সংযত করিয়া রাখিবে। কর্মচারীদের কোন প্রকার শৈথিল্য বা নিয়মভঙ্গ আমি কখনই মার্জনা করিব না। যাহাতে তোমার অধীনস্থ তোমার আমলাগণ প্রশ্রয় পাইতে

না পায় এ সম্বন্ধে তোমাকে অত্যন্ত কঠিন হইতে হইবে। তুমি স্বয়ং যেরূপ অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত কাজ করিবে, তাহাদের নিকট হইতেও তেমনি করিয়া বিনা ওজরে কাজ পুরোপুরি আদায় করিয়া লইবে। কর্মচারীগণ সম্পূর্ণ মনে প্রাণপণ পরিশ্রমে কাজ করিতেছে জানিতে পারিলে তাহারা পুরস্কৃত হইবে। ইতি – ২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৫ – শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ম্যানেজারের ব্যবস্থা সম্বন্ধে এই কর্মচারী আরও গুরুতর কিছু অভিযোগ করায় দশদিন পরেই কর্মচারীকে উৎসাহিত করবার জন্য রবীন্দ্রনাথ পুনরায় তাকে লিখছেন–

আশিস: সন্তু,

তুমি তোমার কর্তব্য পালন করিতে কিছুমাত্র সংকোচ করিবে না। যাহাতে প্রজাদের হিতকার্য করা হয় এইদিকে একমাত্র লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিবে। আদায় তহসিলের কার্যে যদি অতিরিক্ত লোকের আবশ্যক হয় তবে রিপোর্টের দ্বারা আমাকে জানাইলেই তাহার প্রতিকার হইবে।

তোমার বেতনের যে অংশ কাটা গিয়াছে এবারকার মতো তাহা মাপ করিয়া দেওয়া হইবে।

শরৎ সরকারকে মণ্ডলীর সেরেস্তা গঠনের জন্য পাঠানো হইয়াছে। যেভাবে কাজ করিতে হইবে শরৎ তাহার উপদেশ দিবে এবং কার্যনির্বাহের জন্য যেরূপ ব্যবস্থা করা আবশ্যক সে সম্বন্ধে সে রিপোর্ট করিবে। যাহাতে জমা, সুমার ব্যবস্থা প্রভৃতি সকল কর্মই মফঃস্বল সেরেস্তায় সম্পন্ন হইতে পারে সেইরকম বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ইতি– ২ রা আষাঢ়, ১৩১৫–শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অতঃপর একাজে ত্রুটি দেখা দিলে পুনরায় বাধাপ্রাপ্ত কর্মচারীকে কঠোরভাবে উপদেশ দিচ্ছেন–

আশিস : সন্তু,

তোমার সাধ্যমত এবং উচিতমত কাজ করিবে। শৈথিল্যও করিবে না, অন্যায়ও হইতে দিবে না। ইহাতে অসন্তোষের কোনো আশঙ্কা করিও না। উজির ও ছাবের বরকন্দাজদিগকে যেরূপ শাস্তি দিয়াছ, এবার তাহাদের শিক্ষার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। ভবিষ্যতে এরূপ ঘটিলে তাহাদিগকে বরখাস্ত করা কর্তব্য হইবে।

যদি খয়রাতুল্লাকে কালীগ্রামে আনিয়া কালোয়া মণ্ডলীকে অন্যান্য মণ্ডলীর মধ্যে বিভক্ত করিয়া দেওয়া হয়, তবে তোমার অংশে কালোয়া ও রঘুনাথপুর লইতে পারিবে কি না লিখিবে। এ প্রস্তাব সম্বন্ধে কেহ যেন কিছু না জানিতে পারে। ইতি- ১৯শে শ্রাবণ ১৩১৫ –শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নিজ জমিদারিতে মামুলি পুরানো প্রথার আমূল সংস্কার সাধন করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ কঠোর হস্তে 'মণ্ডলী' প্রথার প্রবর্তন করেন। এই প্রথার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন জমিদারি-প্রথাকে সংশোধন করে সময়োপযোগী এবং কল্যাণধর্মী জমিদারি প্রথা প্রচলনে সচেষ্ট হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ পঞ্চায়েতী প্রথার মাধ্যমে প্রকৃতভাবে পল্লীউন্নয়নের কাজ করতে চেয়েছিলেন। এতে বর্ধিষ্ণু মহল তাকে বাধা দিয়েছে। কিন্তু তিনি তাতে আদৌ হতাশ হন নি; বরং তার দৃঢ়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। শিলাইদহে মণ্ডলীপ্রথা চালু হয় ১৩১৫ সালে। পুরাতন আটটি ডিহি-কাছারি ভেঙে শিলাইদহ সদরসহ পাঁচটি মণ্ডলী গঠিত হয়। এ সময়ে শিলাইদহের প্রবীণ ম্যানেজার বামাচরণ বসু বিদায় নেন এবং তাঁর স্থলে বিপিন বিহারী বিশ্বাস বি. এল. নতুন ম্যানেজার নিযুক্ত হন। রবীন্দ্রনাথ বিপিন বিশ্বাসকে তাঁর চিন্তা-চেতনার আদর্শে গড়ে তোলেন। তিনি এবং শিলাইদহ ঠাকুর এস্টেটের অপর একজন কর্মচারী শরৎচন্দ্র সরকার উভয়ে রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়নের বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের মণ্ডলীপ্রথার কার্যপ্রণালীর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল কৃষকদের অবস্থা প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে একাধারে তাদের দারিদ্র্য বিমোচন এবং আর্থিক উন্নতি সাধনসহ জমিদারির উন্নয়ন ঘটানো। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন, কৃষকের উন্নতি না হলে যেমন দেশের উন্নতি সম্ভব নয়, তেমনি এমতাবস্থায় জমিদারি পরিচালনাও সম্ভব নয়।

শিলাইদহ সদর-কাছারি বাদে চারটি কাছারির বিবরণ নিম্নরূপ :

০১. জানিপুর- বনগ্রাম--নায়েব : নলিনী চক্রবর্তী
০২. কুমারখালি- পান্টি--নায়েব : ভুপেনচন্দ্র রায়
০৩. কয়া- কালোয়া--নায়েব : রতিকান্ত দাস
০৪. সদিরাজপুর- রাধাকান্তপুর— নায়েব : সতীশচন্দ্র ঘোষ

শচীন্দ্রনাথ অধিকারী উল্লেখ করেন :

'প্রতি মণ্ডলীতে মণ্ডলীর নায়েব বাদে চারজন— দুজন হিন্দু, দুজন মুসলমান সভ্য বা কর্মী নিযুক্ত হতেন। কোন মণ্ডলীতে মুসলমান সভ্য থাকতেন একজন। প্রথমে সপ্তাহে দু-বার, পরে একবার করে এরা মিলিত হয়ে কাজের ব্যবস্থা করতেন। এর ফলে সদর শিলাইদহ কাছারির গুরুত্ব কমে গেল, বিভাগীয় কাছারিগুলোতে অনেক সেরেস্তা গড়ে উঠল; তার ফলে মুসলমান কর্মচারীর সংখ্যা বাড়ল। গতানুগতিক পল্লী-জমিদারির একটা সাংগঠনিক অভিনবত্ব আত্মপ্রকাশ করল। চাষি-প্রজারা উৎসাহিত হল। ঠাকুর এস্টেটের খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। ... প্রাচীন মামুলি সর্বস্ব জমিদারি ব্যবস্থার বৈপ্লবিক সংস্কারে ছোট বড় প্রজাসাধারণ বেশ উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল। এ সময়ে চাষিদের ঋণদানের জন্য কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হল কালীগ্রাম ও শিলাইদহ সদর কাছারিতে। তখন রবীন্দ্রনাথ সুদূর উড়িষ্যার

কটকের ও পাবনা জেলার সাজাদপুর জমিদারির কাজ থেকে রেহাই পেয়েছেন, ফলে তাঁর সমস্ত চিন্তাভাবনা, উৎসাহ, উদ্যম, কর্ম-পরিচালনা শিলাইদহে ও কালীগ্রামে নিবদ্ধ। তিনি স্বয়ং দুই জমিদারিতে যাতায়াত করে সমস্ত সমস্যা তন্ন-তন্ন করে বিচার করেছেন, ব্যবস্থা করেছেন, আদেশ দিয়েছেন। কর্মচারীদের গুণানুসারে রদবদল করেছেন, প্রয়োজনবোধে নতুনকর্মী নিয়োগ করেছেন।

দুই জমিদারিতে অনেক সংগঠনমূলক কাজ হল। শালিসি-বিচার প্রবর্তনের ফলে প্রজাসাধারণের অভ্যাসগত অনেক মামলা-মোকদ্দমার আপস-নিষ্পত্তি হওয়ায় ঐ অঞ্চলের সবাই উপকৃত হল। শিলাইদহ গ্রামের মধ্যে দুটি প্রধান রাস্তা, গোপীনাথ মন্দিরের সংস্কার, দাতব্য-চিকিৎসালয়, কুষ্টিয়া-শিলাইদহ রাস্তা ইত্যাদি শিলাইদহের চেহারা বদলে দিল। জানিপুরে গোরাই নদীতীরে বিরাট গঞ্জ গড়ে উঠল, পান্টির সুতাহাটা, গোহাটা ইত্যাদি জেঁকে উঠল ব্যাপকভাবে তাঁতবস্ত্র তৈরি হতে লাগল, শিলাইদহে দুবার বিরাট মেলা বসল, কয়েকটি ইস্কুল-মক্তব-মাদ্রাসা স্থাপিত হল গ্রাম ও চর অঞ্চলে।"[২৮]

একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'মণ্ডলীপ্রথা' সম্বন্ধে বলেন :

"... এখন আমার কাজ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে। আমাদের জমিদারির মধ্যে একটা কাজ পত্তন করে এসেছি। বিরাহিমপুর পরগনাকে পাঁচটা মণ্ডলে ভাগ করে প্রত্যেক মণ্ডলে একজন অধ্যক্ষ বসিয়ে এসেছি' এই অধ্যক্ষেরা সেখানে পল্লী-সমাজ স্থাপনে নিযুক্ত যাতে গ্রামের লোকে নিজেদের হিতসাধনে সচেষ্ট হয়ে ওঠে — পথঘাট সংস্কার করে, জলকষ্ট দূর করে, শালিসের বিচারে বিবাদ নিষ্পত্তি করে, বিদ্যালয় স্থাপন করে, জঙ্গল পরিষ্কার করে, দুর্ভিক্ষের জন্য ধর্মগোলা বসিয়ে ইত্যাদি সর্বপ্রকারে গ্রাম্যসমাজের হিতে নিজের চেষ্টা নিয়োগ করতে উৎসাহিত হয়, তারই ব্যবস্থা করা গিয়েছে। আমার প্রজাদের মধ্যে যারা মুসলমান, তাদের মধ্যে বেশ কাজ অগ্রসর হচ্ছে- হিন্দু-পল্লীতে বাধার অন্ত নেই।"[২৯]

রবীন্দ্রনাথ পল্লীতে 'মণ্ডলী প্রথা' প্রবর্তন করায় নিজের আমলা-কর্মচারীদের মধ্য থেকে বাদ-প্রতিবাদ এসেছিল। তাঁর বিশ্বস্ত ম্যানেজার বিপিন বিশ্বাস চাকরি ছেড়ে চলে যান। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর জমিদারিতে 'মণ্ডলী প্রথা' বাস্তবায়িত করেছিলেন এবং তাঁর প্রবর্তিত পল্লীসমাজের উদ্দেশ্য এবং নীতি অনুসারে মণ্ডলী-প্রথাকে বাস্তবায়ন করেন।

রবীন্দ্রনাথ 'মণ্ডলী প্রথা' প্রবর্তনের পূর্বে 'পল্লী-সমাজ' গঠনের পরিকল্পনা করেছিলেন। ১৯০৮ সালের ফেব্রুয়ারি (বাংলা ১৩১৪) এই পল্লীসমাজের একটি প্রস্তাবসূচি তিনি গ্রামোন্নয়নের জন্য তৈরি করেছিলেন।

পল্লীসমাজ

"প্রতি জেলার প্রধান প্রধান গ্রাম, পল্লী বা পল্লীসমষ্টি লইয়া এক বা ততোধিক পল্লীসমাজ সংস্থাপন করিতে হইবে। শহর, গ্রাম কি পল্লীনিবাসী সকলেই স্ব স্ব পল্লীসমাজভুক্ত হইবেন। গ্রাম বা পল্লীবাসীর অভিপ্রায়মত অন্য পাঁচজনের উপর পল্লীসমাজের কার্যনির্বাহের ভার থাকিবে। তাঁহারা পল্লীবাসীদের মতামত ও সহায়তা লইয়া পল্লীসমাজের কার্য করিবেন।

পল্লীসমাজের প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যগুলি নিম্নে বিবৃত হইল :

প্রতি পল্লীসমাজ সাধ্যমতে এই উদ্দেশ্যগুলি কার্যে পরিণত করতে যত্নবান হবেন।

উদ্দেশ্য:

১ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্য ও সদ্ভাব-সংবর্ধন এবং দেশের ও সমাজের অহিতকর বিষয়গুলি নির্ধারণ করিয়া তাহার প্রতিকারের চেষ্টা।

২ সর্বপ্রকার গ্রাম্য বিবাদ-বিসংবাদ সালিশের দ্বারা মীমাংসা।

৩ স্বদেশ-শিল্পজাত দ্রব্য প্রচলন এবং তাহা সুলভ ও সহজপ্রাপ্য করিবার জন্য ব্যবস্থা এবং সাধারণ ও স্থানীয় শিল্প উন্নতির চেষ্টা।

৪ উপযুক্ত শিক্ষক নির্বাচন করিয়া পল্লীসমাজের অধীনে বিদ্যালয় ও আবশ্যকমত নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বালক-বালিকা সাধারণের সুশিক্ষার ব্যবস্থা।

৫ বিজ্ঞান, ইতিহাস বা মহাপুরুষদিগের জীবনী ব্যাখ্যা করিয়া সাধারণকে শিক্ষা প্রদান ও সর্বধর্মের সারনীতি সংগ্রহ করিয়া সাধারণের মধ্যে প্রচার ও সর্বতোভাবে সাধারণের মধ্যে সুনীতি ধর্মভাব একতা স্বদেশানুরাগ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা।

৬ প্রতি পল্লীতে একটি চিকিৎসক ও ঔষধালয় স্থাপন করা এবং অপারগ অনাথ ব্যক্তিবর্গের নিমিত্তে ঔষধ, পথ্য, সেবা ও সৎকারের ব্যবস্থা করা।

৭ পানীয়জল, নদী-নালা, পথ-ঘাট, সৎকারস্থান, ব্যায়ামশালা ও ক্রীড়াক্ষেত্র প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া স্বাস্থ্যের উন্নতির চেষ্টা।

৮ আদর্শ কৃষিক্ষেত্র বা খামার স্থাপন ও তথায় যুবক বা অন্য পল্লীবাসীদিগকে কৃষিকার্য বা গো-মহিষাদি পালন দ্বারা জীবিকা উপার্জনোপযোগী শিক্ষা প্রদান ও কৃষিকার্যের উন্নতি সাধনের চেষ্টা।

৯ দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থে ধর্মগোলা স্থাপন।

১০ গৃহস্থ স্ত্রীলোকেরা যাহাতে আপন আপন সংসারের আয় বৃদ্ধি করিতে পারেন এবং অসহায় হইলে সংসারের ভার গ্রহণ করিতে পারেন তদনুরূপ শিল্পাদি শিক্ষা দেওয়া ও তদুপযোগী উপকরণ সংগ্রহ করা।

১১ সুরাপান বা অন্যরূপ মাদকদ্রব্য ব্যবহার হইতে লোককে নিবৃত্ত করা।

১২ মিলনমন্দির, ক্লাব স্থাপন ও তথায় সমবেত হইয়া পল্লীর এবং স্বদেশের হিতার্থে সমস্ত বিষয়ের আলোচনা।

১৩ পল্লীর তত্ত্ব- অর্থাৎ জনসংখ্যা, স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকার সংখ্যা, বিভিন্ন জাতির সংখ্যা, গৃহসংখ্যা, জন্ম-মৃত্যুর সংখ্যা, অধিবাসীগণের স্থানত্যাগ ও নতুন বসতি, বিভিন্ন ফসলের অবস্থা, কৃষির ও বিভিন্ন ব্যবসায় উন্নতি, অবনতি, বিদ্যালয়, পাঠশালা ও ছাত্র ও ছাত্রী সংখ্যা, ম্যালেরিয়া (জ্বর), ওলাওঠা, বসন্ত ও অন্যান্য মহামারীতে আক্রান্ত রোগীর ও ঐসব রোগে মৃত্যুর সংখ্যা ও পল্লীর পুরাবৃত্ত ও বর্তমান উন্নতি ও অবনতির বিবরণ ও কারণ ধারাবাহিকরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা।

১৪ জেলায়-জেলায়, পল্লীতে-পল্লীতে, গ্রামে-গ্রামে, পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপন ও ঐক্যসংবর্ধন।

১৫ জেলা-সমিতি, প্রাদেশিক সমিতি ও জাতীয় মহাসমিতির উদ্দেশ্যের ও কার্যের সহায়তা করা।

অর্থের ব্যবস্থা

পল্লীসমাজের কার্য স্বেচ্ছাদান ও ঈশ্বরবৃত্তি দ্বারা চলিবে। যাহাদের বিবাদ-বিসম্বাদ সালিসিতে মেটান হইবে, তাঁহারা নিশ্চয়ই স্বেচ্ছাপূর্বক সমাজের মঙ্গলার্থে কিছু অর্থ সাহায্য করিবেন। বিবাহাদি শুভকার্যেও সকলেই স্বেচ্ছাপূর্বক এইরূপ বৃত্তি দিবেন। পল্লীবাসী মাত্রেই সপ্তাহে সপ্তাহে কি মাসে মাসে কি কি করিয়া সমাজের কার্যনির্বাহের জন্য যথাসাধ্য দান করিবেন। পল্লীসমাজের অন্তর্গত সমস্ত হাট-বাজার হইতেও ঈশ্বরবৃত্তি সংগৃহীত হইতে পারিবে। প্রতিবৎসর গ্রামে গ্রামে বারোয়ারি পূজার নাচ-তামাশায় যে অর্থ বৃথা নষ্ট হয়, ঐ সমস্ত অপব্যয় সংকোচন করিলে সেই অর্থ দ্বারা পল্লীসমাজের কার্যের বিশেষ সহায়তা হইতে পারে। পল্লীসমাজকার্যে প্রবৃত্ত হইলে অর্থের অভাব হইবে না।"[৩০]

পল্লীর উন্নয়নের জন্য রবীন্দ্রনাথের এই পরিকল্পনা নিঃসন্দেহে অসাধারণ

এবং বৈপ্লবিক। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে আমাদের দেশে শুধু নয়, অন্য কোনো দেশে কোনো কবি-জমিদার এমন করে দেশের জন্য ভেবেছেন কি না আমার জানা নেই। মানুষের কল্যাণে নিজেকে এমনভাবে নিবেদন করার বিষয়টি অভূতপূর্ব শুধু নয়- অকল্পনীয়; বিশেষ করে যিনি একজন জমিদার। মানবপ্রেম রবীন্দ্রনাথের অন্তরের কত গভীরে প্রবেশ করেছিল পল্লীসমাজের এই উন্নয়নচিন্তা তার নিদর্শন। কবির অন্তর্দৃষ্টি থাকার ফলেই এই মহৎ চিন্তার প্রতিফলন সম্ভবপর হয়েছে। এখানে কোনো স্বার্থবুদ্ধি কাজ করে নি। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই দেশের মঙ্গল কামনা করেছিলেন এবং সে কারণে প্রত্যক্ষভাবে নিজেকে উৎসর্গিত করেছিলেন।

পল্লীসমাজের এই চিন্তাচেতনা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশে কুষ্টিয়ার বিরাহিমপুর পরগনার শিলাইদহ এবং বিশেষ করে কালীগ্রাম পরগনার পতিসরে কাজ শুরু করেছিলেন।

এখানে তিনি অনেকাংশেই সফল হয়েছিলেন। এই সফলতার মূলে তাঁর সমবায়-ভাবনা বিশেষ কাজ করেছে। রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে লক্ষ করেছিলেন দেশের মানুষ আর্থিক দৈন্যের কারণে একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। যৌথ ও একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবারে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। জমি-জমা ইত্যাদিও বংশ বৃদ্ধি ও ধনিকসমাজ অশিক্ষা-কুশিক্ষার কারণে স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। অপরদিকে যারা গরিব ও দারিদ্র্য-পীড়িত মূর্খতা ও হীনবুদ্ধির কারণে ধনীসমাজকে ঈর্ষা ও হিংসায় নিমজ্জিত হয়ে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে। এসবের মধ্যে একশ্রেণীর স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন রাজনীতিবিদ শ্রেণীসংগ্রামের নামে ধনী ও বিত্তবান, জোতদার ইত্যাদি সম্প্রদায়ের ধ্বংস কামনা করে সাধারণ মানুষকে তাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে তাদেরকে সমাজ থেকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবার পরিকল্পনা করেছে। ফলে গ্রাম থেকে ধনীসমাজ সরে এসে শহর এবং নগরে বসতি স্থাপন করেছে। অতীতে ধনীদের সহযোগিতায় গ্রামের উন্নয়ন ঘটেছিল। স্কুল, পাঠশালা, পুকুরখনন, রাস্তাঘাট নির্মাণ– ধনীসমাজের সহায়তায় সম্ভব হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ তাই ধনী-নির্ধন, জোতদার-বিত্তহীন, হিন্দু-মুসলমান সকলকেই একত্রিত করতে চেয়েছিলেন। বাংলাদেশে (পূর্ববাংলায়) তাঁর এই পরিকল্পনা সফল হতে পারে নি কারণ– তিনি এখানে পর্যাপ্ত সময় পান নি এবং জমিদারিও হাতছাড়া হয়ে গেছে। কিন্তু শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা করে সেখানে রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিন্তা-চেতনার বাস্তব প্রকাশ ঘটাতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর ৬০ বৎসর পরে শ্রীনিকেতনে তাঁর কার্যক্রম অদ্যাবধি চালু রয়েছে দেখেছি। সেখানে একটি সাঁওতাল ও সাধারণ গ্রাম দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। সেখানে একজন নকশালপন্থি বিপ্লবীর সাথে পরিচয় হয়েছিল। তিনি রবীন্দ্রনাথের আদর্শে নিজেকে উৎসর্গিত করেছেন। তিনি বৃদ্ধ হলেও তাঁর মধ্যে একজন যুবকের কর্মোদ্দীপনা দেখেছি। শ্রীনিকেতনের পাশে আরও কয়েকটি গ্রামে আমি গিয়েছি।

আদিবাসীদের একটি গ্রামে ৩০০ জন সাঁওতাল পুরুষ-রমণী গোটা গ্রামটির চেহারা বদলে দিয়েছে। এই গ্রামটি হস্ত-শিল্পের জন্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ পল্লীসমাজে যে পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন তার মূলে তাঁর সমবায় চিন্তা সর্বাধিক কাজ করেছে। রবীন্দ্রনাথের এই চিন্তা তাঁর নিজস্ব ছিল না ঠিকই, কিন্তু তাঁকে তিনি তাঁর আপন চেতনায় কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। ইতোপূর্বে আমি বলেছি, সমবায় পদ্ধতি আমাদের হাজার বছরের ঐতিহ্য। অতীতে সমবায়ের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন গ্রামের একটি পরিচয় তুলে ধরেছেন :

> "ভারতবর্ষে সর্বজন চিত্ত ধর্মে-কর্মে ভোগে গ্রামে গ্রামে সর্বত্র প্রবাহিত হয়েছিল। সেইজন্যেই নানাকালে বিদেশী নানা রাজশক্তির আঘাত-অভিঘাত তার পক্ষে মর্মান্তিক হয়ে ওঠে নি। এমন গ্রাম ছিল না যেখানে সর্বজনসুলভ প্রাথমিক-শিক্ষার পাঠশালা ছিল না। গ্রামের সম্পন্ন-ব্যক্তিদের চণ্ডীমণ্ডপগুলি ছিল এই সকল পাঠশালার অধিষ্ঠানস্থল। চার পাঁচটি গ্রামের মধ্যে অন্তত একজন শাস্ত্রজ্ঞ-পণ্ডিত ছিলেন যাঁর ব্রত ছিল বিদ্যার্থীদের বিদ্যাদান করা। সমাজধর্মের আবহমান আদর্শের বিশুদ্ধতা রক্ষার ভার তাঁদের উপরই ছিল। তখনকার কালে ঐশ্বর্যের ভোগ একান্ত সংকীর্ণভাবে ব্যক্তিগত ছিল না। এক একটি মূল ঐশ্বর্যের ধারা থেকে সর্বসাধারণের নানা ব্যবহারের বহু শাখা বিভক্ত ইরিগেশন-ক্যানালগুলি নানাদিকে প্রসারিত হতো। তেমনি জ্ঞানীর জ্ঞানভাণ্ডার সকলের কাছে অবারিত ছিল। গুরু শুধু বিদ্যাদানই করতেন না, ছাত্রদের কাছ হতে খাওয়া-পরার মূল্য পর্যন্ত নিতেন না। এমনিভাবে সর্বাঙ্গীণ-প্রাণশক্তি গ্রামে গ্রামে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। তাই তখন জলের অভাব হয় নি, মানুষের চিত্তকে উপবাসী থাকতে হয়নি।"[৩১]

রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের গ্রামের দৈন্য, অসহায়তা ও দরিদ্রতার জন্য দায়ী করলেন পাশ্চাত্যের নগর-সভ্যতাকে। ইংরেজদের আগমনে এবং তাদের নগরায়ণে এ দেশের গ্রামগুলো ভাঙতে শুরু করল। রবীন্দ্রনাথ বললেন :

> "গ্রামে গ্রামে একটি সর্বস্বীকৃত সহজ-ব্যবস্থায় ধনী-দরিদ্র-পণ্ডিত-মূর্খ সকলের মধ্যেই যে একটা সামাজিক বাধা ছিল বাইরের আঘাতে এই সামাজিক স্নায়ুজাল খণ্ডখণ্ড হওয়াতে গ্রামে গ্রামে আমাদের প্রাণদৈন্য ঘটল। একদিন যখন বাংলাদেশের গ্রামের সঙ্গে আমার নিত্যসংশ্রব ছিল তখন এই চিন্তাটাই আমার মনকে আন্দোলিত করেছে। সেদিন স্পষ্ট চোখের সামনে দেখেছি, যে ব্যাপক ব্যবস্থায় আমাদের দেশের জনসাধারণের সকল রকমে মানুষ করে রেখেছিল আজ তাতে ব্যাঘাত হচ্ছে, দেশের সর্বত্র প্রাণের রস সহজে সঞ্চারিত হবার পথগুলি আজ অবরুদ্ধ। আমার মনে হয়েছিল যতদিন পর্যন্ত এই সমস্যার সমাধান না হয় ততদিন আমাদের রাষ্ট্রীয় উন্নতির চেষ্টা ভিত্তিহীন, আমাদের মঙ্গল সুদূরপরাহত। এই কথাই আমি তখন (১৩১১ সালে) 'স্বদেশী-সমাজ' নামক বক্তৃতায় বলেছি। কিন্তু কেবলমাত্র কথার দ্বারা শ্রোতার

> চিত্তকে জাগরিত করে আমাদের দেশে ফল অল্পই পাওয়া যায়, তাই কেজো-বুদ্ধি আমার না থাকা সত্ত্বেও কোনো কোনো গ্রাম নিয়ে সেগুলিকে ভিতরের দিক দিয়ে সচেতন করার কাজে আমি নিজে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম। তখন আমার সঙ্গে কয়েক জন তরুণ যুবক সহযোগীরূপে ছিলেন। এই চেষ্টার ফলে একটি জিনিস আমার শিক্ষা হয়েছে, সেটি এই– দারিদ্র্য হোক, অজ্ঞান হোক, মানুষ যে গভীর দুঃখ ভোগ করে তার মূলে সত্যের ত্রুটি। মানুষের ভিতরে যে সত্য তার মূল হচ্ছে তার ধর্মবুদ্ধিতে ; এই বুদ্ধির জোরে পরস্পরের সঙ্গে মানুষের মিলন গভীর হয়, সার্থক হয়। ... সামাজিক দিয়ে মানুষ ধর্মকে স্বীকার করেছে, কিন্তু আর্থিক দিয়ে করে নি। অর্থের উৎপাদন অধিকার ও ভোগ সম্বন্ধে মানুষ নিজেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলেই জানে। এইখানেই সে আপন অহমিকা, আপন আত্মম্ভরিতাকে ক্ষুণ্ন করতে অনিচ্ছুক। এইখানে তার মনের ভাবটা একলা মানুষের ভাব, এইখানেই তার নৈতিক দায়িত্ববোধ ক্ষীণ। ...
>
> আমাদের দেশে একদিন ছিল ধনীর ধনের উপর সমাজের দাবি। ধনী তার ধনের দায়িত্ব লোকমতের প্রভাব স্বীকার করতে বাধ্য হতো। তাতে তখনকার দিনে কাজ চলেছে, সমাজবেঁচেছে।"[৩২]

রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন সময় ও জীবনের পরিবর্তন হয়েছে। গ্রামের ধনীরা আজ শহরে এসে ধনভোগ করছে। তাদের ধন এখন ব্যক্তিগত সম্পদ। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের পথ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ 'সমবায়' পদ্ধতির প্রতি আস্থা রেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেন :

> "... আজ যখন আমাদের সমাজনীতির পরিবর্তন হয়েছে, ধনের ভোগ যখন একান্ত ব্যক্তিগত হল, ধনের দায়িত্ব যখন লোকহিতে সহজভাবে নিযুক্ত নয়, তখন লোক আপন হিতসাধন করতে সম্পূর্ণ অক্ষম হয়েছে। আজ ধনীরা শহরে এসে ধনভোগ করছে বলেই গ্রামের সাধারণ লোকেরা আপন ভাগ্যের কার্পণ্য নিয়ে হাহাকার করছে। তাদের বাঁচবার উপায় যে তাদেরই নিজের হাতে একথা বিশ্বাস করবার শক্তি তাদের নেই। গোড়ায় অন্নের ক্ষেত্রে এই বিশ্বাস যদি জাগিয়ে তুলতে পারা যায়, এই বিশ্বাসকে সার্থকভাবে প্রমাণ করা যায়, তা হলেই দেশ ক্রমেই সকল দিকেই বাঁচবে। অতএব, সমবায়নীতির দ্বারা এই সত্যকে সাধারণের মধ্যে প্রচার করা আমাদের আজকের দিনের কর্তব্য।"[৩৩]

এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ একটি দৃঢ়-সত্যকে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন। তিনি নিজে ধনী জমিদার। তিনি ভালভাবেই জেনেছেন অতীতের সমাজ দ্রুত পালটাচ্ছে। মানুষ এখন সমাজ অপেক্ষা নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। এমন অবস্থার প্রতিকার কিভাবে করা যাবে রবীন্দ্রনাথ তা বলেছেন। তিনি বলেন : "একেই বলে সমবায়নীতি। এই নীতিতেই মানুষ জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ হয়েছে, লোক ব্যবহারে এই নীতিকেই মানুষের ধর্মবুদ্ধি প্রচার করছে।"[৩৪]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর পল্লীউন্নয়নে এই সমবায়নীতিকেই মুখ্য মনে করে তা বাস্তবায়নে সচেষ্ট হয়েছেন। কুষ্টিয়ার শিলাইদহের গ্রামে তিনি সমবায়নীতির প্রবর্তন করেছিলেন। এপ্রসঙ্গে তিনি বলেন:

> "আমাকে এক পাড়াগাঁয়ে মাঝেমাঝে যাইতে হয়। সেখানে বারান্দায় দাঁড়াইয়া দক্ষিণের দিকে চাহিয়া দেখিলে দেখা যায় পাঁচ-ছয় মাইল ধরিয়া খেতের পর খেত চলিয়া গেছে। ঢের লোকে এইসব জমি চাষ করে। কারও-বা দুই বিঘা জমি, কারও-বা চার, কারও-বা দশ। জমির ভাগগুলি সমান নয়, সীমানা আঁকাবাঁকা। এই জমির যখন চাষ চলিতে থাকে তখন প্রথমেই এই কথা মনে হয় হালের গরু কোথাও-বা জমির পক্ষে যথেষ্ট, কোথাও-বা যথেষ্টর চেয়ে বেশি, কোথাও-বা তার চেয়ে কম। চাষার অবস্থার গতিকে কোথাও-বা চাষ যথাসময়ে আরম্ভ হয় কোথাও সময় বহিয়া যায়। তারপরে আঁকাবাঁকা সীমানায় হাল বারবার ঘুরাইয়া লইতে গরুর অনেক পরিশ্রম মিছা নষ্ট হয়। যদি প্রত্যেক চাষা কেবল নিজের ছোটো জমিটুকুকে অন্য জমি হইতে সম্পূর্ণ আলাদা করিয়া না দেখিত, যদি সকলের জমি এক করিয়া সকলে একযোগে মিলিয়া চাষ করিত তবে অনেক হাল কম লাগিত, অনেক কাজে মেহনত বাঁচিয়া যাইত। ফসল কাটা হইলে সেই ফসল প্রত্যেক চাষার ঘরে-ঘরে গোলায় তুলিবার জন্য স্বতন্ত্র গাড়ির ব্যবস্থা ও স্বতন্ত্র মজুরি আছে। প্রত্যেক গৃহস্থের স্বতন্ত্র গোলাঘর রাখিতে হয় এবং স্বতন্ত্রভাবে বেচিবার বন্দোবস্ত করিতে হয়। যদি অনেক চাষি মিলিয়া এক গোলায় ধান তুলিতে পারিত ও এক জায়গা হইতে বেচিবার ব্যবস্থা করিত তাহা হইলে অনেক বাজে খরচ ও বাজে পরিশ্রম বাঁচিয়া যাইত। ... একথা আজ আমাদের চাষিদেরও ভাবিবার দিন আসিয়াছে। নহিলে তাহারা বাঁচিবে না।"[৩৫]

সুতরাং এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, রবীন্দ্রনাথ নিছক খেয়ালের বশে পল্লীউন্নয়নের কথা ভাবেন নি, তিনি এ দেশের সাধারণ গরিব মানুষের ভাগ্যের উন্নতি কামনা করেছিলেন। তাঁর প্রণীত পল্লীসমাজের কাঠামো নিঃসন্দেহে একটি বৈপ্লবিক সমাজজীবনের পরিচয় বহন করে। তিনি শিলাইদহে তাঁর এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পল্লীসমাজ চিন্তা পরবর্তীকালে স্বদেশী সমাজভাবনায় রূপান্তরিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেন :

> "এইবার সময় আসিয়াছে যখন আমাদের সমাজ একটি সুবৃহৎ স্বদেশীসমাজ হইয়া উঠিবে। সময় আসিয়াছে যখন প্রত্যেকে জানিবে আমি একক নহি, আমি ক্ষুদ্র হইলেও আমাকে কেহ ত্যাগ করিতে পারিবে না এবং ক্ষুদ্রতা সত্ত্বেও আমি ত্যাগ করিতে পরিব না।"[৩৬]

রবীন্দ্রনাথ সকলের আগে শিলাইদহে তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে চেয়েছিলেন। কারণ, এখানকার মানুষ এবং প্রকৃতির সঙ্গে তিনি যতটা পরিচিত ছিলেন এমনটি অন্য কোন স্থানে তেমনটি সম্ভব হয় নি। কালীগ্রামে

পল্লীউন্নয়নের জন্য কাজ করেছেন কিন্তু শিলাইদহে ছিল তার ভিত্তি। রবীন্দ্রনাথ 'স্বদেশী-সমাজ' এবং 'সমবায়নীতি' সম্বন্ধে যা বলেছেন তা হঠাৎ করে কোন চমক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে রচিত হয় নি। তাঁর জমিদারিতে তিনি যা প্রত্যক্ষ করেছিলেন এই চেতনা তারই ফসল। রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধে বলেছেন :

> "বিদেশী রাজা চলিয়া গেলেই দেশ যে আমাদের স্বদেশ হইয়া উঠিবে তাহা নহে। দেশকে আপন চেষ্টায় আপনি দেশ করিয়া গড়িয়া তুলিতে হয়। অন্নবস্ত্র-সুখস্বাস্থ্য-শিক্ষাদীক্ষা দানে দেশের লোকই দেশের লোকের সর্বপ্রধান সহায়, দুঃখে-বিপদে দেশের লোকই দেশের জন্য প্রাণপণ করিয়া থাকে, ইহা যেখানকার জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে জানে সেখানে স্বদেশ যে কী তাহা বুঝাইবার জন্য এত বকাবকি করিতে হয় না। আজ আমাদের ইংরেজি-পড়া শহরের লোক যখন নিরক্ষর গ্রামের লোকের কাছে গিয়া বলে আমরা উভয়ে 'ভাই'– তখন এই ভাই কথাটার মানে সে বেচারা কিছুই বুঝিতে পারে না। যাহাদিগকে আমরা 'চাষাবেটা' বলিয়া জানি, যাহাদের সুখ-দুঃখের মূল্য আমাদের কাছে অতি সামান্য, যাহাদের অবস্থা জানিতে হইলে আমাদিগকে গভর্নমেন্টের প্রকাশিত তথ্যতালিকা পড়িতে হয়, সুদিনে দুর্দিনে আমরা যাহাদের ছায়া মাড়াই না, আজ হঠাৎ ইংরেজের প্রতি স্পর্ধা প্রকাশ করিবার বেলায় তাহাদের নিকট ভাই সম্পর্কের পরিচয় দিয়া তাহাদিগকে চড়া দামে জিনিস কিনিতে ও গুর্খার গুঁতা খাইতে আহ্বান করিলে আমাদের উদ্দেশ্যের প্রতি সন্দেহ জন্মিবার কথা। ... উদ্দেশ্য সাধনের উপলক্ষে প্রেমের সম্বন্ধ পাতাইতে গেলে ক্ষুদ্র ব্যক্তির কাছেও তাহা বিস্বাদ বোধ হয়– সে উদ্দেশ্য খুব বড়ো হইতে পারে, হউক তাহার নাম 'বয়কট' বা 'স্বরাজ', দেশের উন্নতি বা আর কিছু। মানুষ বলিয়া শ্রদ্ধাবশত ও স্বদেশী বলিয়া স্নেহবশত আমরা যদি সহজেই দেশের জনগণকে ভালোবাসিতাম, ইংরেজি শিক্ষায় আমাদের পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ না ঘটাইয়া মিলনকে যদি দৃঢ় করিতে পারিত– তাহাদের মাঝখানে থাকিয়া তাহাদের সর্বপ্রকার হিতসাধনে যদি আমাদের উপেক্ষা বা আলস্য না থাকিত– তবে আজ বিপদ বা ক্ষতির মুখে তাহাদিগকে ডাক পাড়িলে সেটা অসংগত শুনিতে হইত না। ... তবে করিতে হইবে কী? আর কিছু নয়, স্বদেশ সম্বন্ধে স্বদেশীয় যে দায়িত্ব আছে তাহা সর্বসাধারণের কাছে স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিতে হইবে। পুরাতন দলই হউন আর নতুন দলই হউন, যিনি পারেন একটা কাজের আয়োজন করুন। প্রমাণ করুন যে, দেশের ভার তাহারা লইতে পারেন। ... যদি সকলে মিলিয়া একটি কাজের আয়োজন গড়িয়া তুলিবার শক্তি আজও আমাদের না হইয়া থাকে তবে অগত্যা আমাদিগকে নিভৃতে নিঃশব্দে ব্যক্তিগত চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে।"[৩৭]

এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ দেশের সমস্যার পাশাপাশি কিছুসংখ্যক রাজনীতিবিদদের কর্মকাণ্ডকেও সমালোচনা করেছেন। হঠাৎ কোন চমক সৃষ্টির

চেয়ে দেশের কাজে প্রাণমন দিয়ে ব্রতী হবার জন্যে তিনি সকলকে আহ্বান জানিয়েছেন। এ কাজে নিঃস্বার্থ হওয়াটাকেই তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। গান্ধীর স্বরাজ প্রচেষ্টার সঙ্গে এখানেই তাঁর তফাত ছিল। দেশের মানুষের জন্য কাজ করে তাদের উন্নয়ন সাধন করতে পারলে স্বরাজ আপনি প্রতিষ্ঠিত হবে। রবীন্দ্রনাথের উপরিউক্ত বক্তব্য যে শুধু কথাতেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়- তিনি নিজেই গ্রামে কাজ করে তা সপ্রমাণ করেছেন। 'পল্লীসমাজ' সম্বন্ধে তাঁর পরিকল্পনা আমরা লক্ষ করেছি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রস্তাবে একটি বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণের কথা উল্লেখ করেছেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি শিলাইদহ এবং অন্যত্র কাজ করেছিলেন। সমবায়ের মধ্যে যে দেশের যথার্থ উন্নতি রয়েছে তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। কৃষিকাজে সমবায়নীতি যে একান্ত প্রয়োজন তা তিনি তাঁর 'সমবায়নীতি' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। একটি চিঠিতে তিনি তাঁর পরিকল্পনা সম্বন্ধে বলেন।

> "... গ্রাম-পল্লীকে Organise করে তোলবার যে প্রস্তাব আমার বক্তৃতায় করেছি সেটা আমি কাজে খাটাবার জন্যে পূর্ব হতেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েছি। আমার জমিদারির মধ্যে এই কাজের জন্যেই আমি ভূপেশকে লাগিয়ে দিয়েছি। আপাতত সে একটা পাড়াকে গড়ে তোলবার বিশেষ ভার নিয়েছে ... আরও দুটি ছেলেকে এই কাজে ভূপেশের সহযাত্রীরূপে লাগাব বলে স্থির করেছি- তারা আর সপ্তাহখানেক পরে এসেই কাজে যোগ দেবে। যাকে কটেজইন্ডাস্ট্রিজ বলে, অর্থাৎ ছোটোখাটো অনতিব্যয়সাধ্য কল নিয়ে গ্রামের লোক যে-সমস্ত কাজ করতে পারে, এখানকার পল্লীগ্রামে সেই সমস্ত চালানো উচিত বলে আমি স্থির করেছি।...
>
> ... আমি তো ইচ্ছা করছি শিলাইদহে চৈত্র মাসটা কাটিয়ে নতুন বৎসরে এখান থেকে যাব। তা যদি ঘটে ওঠে তার মধ্যে এখানকার পল্লীর কাজটাকেও কতকটা পরিমাণে অগ্রসর করে দিয়ে যেতে পারব ...।"[৩৮] ইতি- ৫ ই ফালগুন ১৩১৪

রবীন্দ্রনাথ অপর একটি চিঠিতে জনৈক উন্নয়নকর্মীকে লেখেন :

> "... রথীর কাজেরও আয়োজন চলছে। যে ক্ষেত্রটি পেয়েছে সেখানে ইচ্ছা করলে অনেক উপকার করতে পারবে। দেশের নিম্নশ্রেণীর লোকদের উন্নতি বিধান করাই এখন যথার্থ আমাদের দেশের কাজ। এই কাজে তুমিও যদি ওর সঙ্গে যোগ দিতে পার তা হলেই রথী কৃতকার্য হতে পারবে- এজন্যে ও তোমাকে চাচ্ছে। রথীর কাজে তুমি যদি সহযোগী হতে চাও তাহলে ক্ষেত্র প্রস্তুত আছে। চাষাবাদের সঙ্গে কোঅপারেশনে চাষ করা, ব্যাঙ্ক করা, ওদের স্বাস্থ্যকর বাসস্থান স্থাপন করা, ঋণমোচন করা, ছেলেদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা, বৃদ্ধবয়সের সংস্থান করে দেওয়া, রাস্তা করা, বাঁধ বেঁধে দেওয়া, জলকষ্ট দূর করা, পরস্পরকে পরস্পরের সহায়তাসূত্রে আবদ্ধ করা, এমন কত কাজ আছে তার সীমা নেই। একজায়গায় যদি আমরা এইরকম

> আদর্শ পল্লী-স্থাপনে কৃতকার্য হতে পারি- তবে সমস্ত দেশের পক্ষে তার চেয়ে লাভের আর কিছুই হতে পারে না।...
>
> মঙ্গলের ভিতর দিয়ে দেশকে সৃষ্টি করে তোলার কাজে যদি তোমরা লাগ তা হলে বড়ো খুশি হব- এই হচ্ছে ধর্মের কাজ, এই হচ্ছে পুণ্যকর্ম, এই হচ্ছে ঈশ্বরের সেবা... ।"[৩৯]

এই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ কৃষকদের মধ্যে সমবায়ের মাধ্যমে চাষ করার প্রতি যেমন গুরুত্ব আরোপ করেছেন, তেমনি সকল কাজের মধ্যেই সমবায়কে যুক্ত করতেও অনুরোধ জানিয়েছেন। কারণ, সমবায়ের মধ্যে দশের কাজ পূর্ণ হয়, তাতে দেশের মঙ্গল আসে। গ্রামের কাজকে রবীন্দ্রনাথ দেশসেবার কাজ বলে অভিহিত করেছেন। এই দেশসেবাকেই তিনি ধর্ম বলে বিবেচনা করেছেন। সমবায়ের গুরুত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ আরও বলেন :

> "... দেশের অবস্থা যতই দেখতে পাচ্ছি ততই বুঝতে পারছি সর্বসাধারণকে নিয়ে কোঅপারেটিভ প্রণালি অবলম্বন না করলে আমরা কোনোমতেই দাঁড়াতে পারব না। কিন্তু আমাদের দেশে পরস্পরের মধ্যে এত বিদ্বেষ এবং চাষারা ভদ্রলোকদের এতই অবিশ্বাস করে যে, সমবায়-মণ্ডলী গড়ে তোলা আমাদের দেশে অত্যন্ত দুঃসাধ্য। শুনতে পাই আয়ারল্যান্ডের এই সমবায়-মণ্ডলীর খুব প্রচলন হয়েছে। সেখান থেকে কোঅপারেটিভ ডায়েরি প্রভৃতি কাজের প্রণালি যদি তুমি কিছুদিন দেখেশুনে আসতে পার তাহলে এদেশে সেটা কাজে খাটাতে পার। আয়ারল্যান্ডের অবস্থা নানা কারণে অনেকটা আমাদের দেশের মতো, তারা রক্ষা পাবার জন্যে কি রকম চেষ্টা করছে তা দেখে এসে বোধ হয় সে অভিজ্ঞতা এখানে কাজে লাগাবে। আমার বিশ্বাস কুষ্টিয়ায় আমাদের প্রজাদের নিয়ে কোঅপারেটিভ ডায়েরি খোলার ভালো ক্ষেত্র আছে... ।"[৪০]

অতঃপর আয়ারল্যান্ডে কোঅপারেটিভ পদ্ধতিকে ব্যবহারের জন্য তিনি উপদেশ দিচ্ছেন এবং নিজেও এ কাজে অগ্রসর হচ্ছেন। দেশকে কতদূর ভালোবাসলে এমনিভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের উন্নয়নে জীবন ও মনকে উৎসর্গ করা যায়, রবীন্দ্রনাথই বুঝি তার প্রথম উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। একে যদি কেউ 'স্বার্থপরতা' বা জমিদারের 'খেয়ালিভাবনা' নামে অভিহিত করে তবে তাকে ঈর্ষাপরায়ণ এবং বিদ্বেষভাবাপন্ন এবং কুটিল মনের অধিকারী ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে। শিলাইদহে তাঁর নিজের জমিদারির ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যারা যুক্ত ছিলেন তাদের অনেকেই রবীন্দ্রনাথের এই উদার-মানবিক কর্মকাণ্ডকে নস্যাৎ করতে চেয়েছিলেন। তথাপি রবীন্দ্রনাথ দমে থাকেন নি। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহেই তাঁর বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সচেষ্ট হয়েছেন শত বাধার মধ্যেও। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়চেতা মানুষ ছিলেন। গ্রামোন্নয়নের ক্ষেত্রে মণ্ডলীপ্রথার পাশাপাশি সমবায়নীতি বাস্তবায়নে কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা তাঁর গ্রামোন্নয়নে এক অসাধারণ পদক্ষেপ। শিলাইদহেই তিনি সর্বপ্রথম কৃষি ব্যাংক স্থাপন করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে সুধীর সেন বলেন :

"Silaidaha in the district of Nadia was selected as the centre for his experiment. A part of nucleus for rural work was already avialable there. An Agricultural bank had been founded (In 1300 BS. 1893-94 A.D.) to advance loans particularly seasonal to the cultivators on reasonable rates- of interest."[৪১]

কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ঋণ প্রদানের মাধ্যমে কৃষকদের অবস্থার উন্নয়ন সাধন। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে থাকতে কৃষকদের প্রতি জমিদার-মহাজনদের অত্যাচার সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। এই প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরী বলেন :

"রবীন্দ্রনাথ জমিদার হিসাবে মহাজনের কবল থেকে প্রজাকে রক্ষা করবার জন্য আজীবন কী করে এসেছেন তা আমি সম্পূর্ণ জানি, - কেননা তাঁর জমিদারি-সেরেস্তায় আমিও কিছুদিন আমলাগিরি করেছি। আর আমাদের একটা বড় কর্তব্য ছিল, সাহাদের হাত থেকে শেখদের বাঁচানো।"[৪২]

এক্ষেত্রে তাই বিপন্ন-চাষীকে মহাজনদের হাত থেকে রক্ষার জন্য কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা তাঁর জন্য অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছিল। তিনি অনুভব করেছিলেন যে ঋণমুক্ত না হলে কৃষক কোনোভাবেই উন্নতি করতে সক্ষম হবে না। আবার শুধু চাষের উপর নির্ভরশীল হলেও যথাযথ উন্নয়ন সম্ভব হবে না। এক্ষেত্রে তিনি কৃষকদেরকে কুটিরশিল্পের প্রতি আগ্রহী করে তুলতে চেয়েছিলেন এবং সে কারণেও কৃষি ব্যাংক গড়ে তোলা প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দিয়েছিল।

শিলাইদহে কৃষি ব্যাংক স্থাপনের প্রায় ১১ বৎসর পরে পতিসরেও তিনি ১৯০৫ সালে অনুরূপ কৃষি ব্যাংক স্থাপন করেন। অবশ্য এই ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় তিনি প্রাথমিক পর্যায়ে ধনী বন্ধু-বান্ধবদের সহযোগিতা পেলেও ১৯১৩ সালের নোবেল পুরস্কার পেলে তার সমুদয় অর্থ তিনি পতিসর কৃষি ব্যাংকে জমা দেন। এই পুরস্কারের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। এত টাকা কৃষি ব্যাংকে জমা হওয়ায় ব্যাংকের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পায় এবং কৃষকদের মধ্যে ঋণপ্রদান অনেকটা নিশ্চিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ কৃষকদের ঋণের পরিমাণ ও সুদ নির্ধারণে তাঁর কর্মচারীদের উপর নির্ভর না করে পল্লীউন্নয়ন-কর্মীদের মতামতের উপর বেশি গুরুত্ব দিতেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, ফসল উৎপাদনের জন্যই কৃষি ব্যাংক কৃষককে ঋণ দিয়ে থাকত আবার ফসল উৎপন্ন হলেই ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা করা হতো। অবশ্য এক্ষেত্রে উৎপন্ন ফসল সরাসরি জমিদারের কার্যালয়ে আনা হতো এবং সুদসহ ঋণ পরিশোধ করে চাষি ফসল ঘরে নিয়ে যেতে পারত। অবশ্য উৎপন্ন ফসল জমিদারের কার্যালয়ে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের নামে দুর্নাম বা অপবাদ সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু চাষিরা নিজেরাই অনাদায়ী হবার ভয়ে এই পদ্ধতিকেই মেনে নিয়েছিল। এর ফলে কৃষকের কৃষিঋণের ভার ক্রমান্বয়ে লঘু

হয়ে যেত। কিন্তু কৃষকের সুবিধা হলেও বেশকিছু কৃষক অনাদায়ী হওয়ায় কৃষি ব্যাংক এক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তথাপি কৃষি ব্যাংক-পরিকল্পনা কৃষকদের আয়-উন্নয়নের পথকে এদেশে সুগম করে দেয়। শিলাইদহ এবং পতিসরে কৃষি ব্যাংক স্থাপিত হলে রবীন্দ্রনাথ সমবায়-পদ্ধতি বাস্তবায়নে সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন সমবায়ের মাধ্যমেই দেশের উন্নতি সম্ভব এবং তার এই অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে তাঁর নিজের বক্তব্যে :

"কয়েক বছর পূর্বে যে দিন সমবায়মূলক জীবিকার কথা প্রথম শুনি, আমার মনের জটিল সমস্যার একটা গাঁট যেন অনেকটা খুলে গেল। মনে হল যে জীবিকার ক্ষেত্রের স্বাতন্ত্র্য মানুষের সত্যকে এতদিন অবজ্ঞা করে এসেছিল, সেখানে স্বার্থের সম্মিলন সত্যকে আজ প্রমাণ করবার ভার দিয়েছে। এই কথাই বোঝাতে বলেছে যে, দারিদ্র্য মানুষের অসম্মিলনে। ধর্ম তার সম্মিলনে।... কেউ-কেউ বলবে যে, তুমি যে সমবায় জীবিকার কথা বলছ সকলে মিলে চরকা কাটাই তাই। আমি তা মানিনে। ... একমাত্র সূতো তৈরির বেলাতেই তেত্রিশ কোটি লোক মিলেমিশে আচার রক্ষা। তাতে সূতো অনেক জমবে। কিন্তু যুগে যুগে যে অন্ধতা জমে ওঠে আমাদের দারিদ্র্যকে গড়বন্দি করে রেখেছে তার গায়ে হাত পড়বে না।"[৪৩]

রবীন্দ্রনাথ কৃষিক্ষেত্রে সমবায় বাস্তবায়নে লাঙলের পরিবর্তে কলের লাঙল প্রবর্তনে আগ্রহী ছিলেন; কারণ তিনি জানতেন, সমগ্র জমি একত্র করে কলের লাঙলে চাষ করতে পারলে অল্প সময়ে সব জমি যেমন চাষ করা যায় তেমনি এই পদ্ধতিতে চাষি অর্থনৈতিক দিক থেকেও লাভবান হতে পারে। শিলাইদহে ও পতিসরে কৃষি ব্যাংক স্থাপনের পর রবীন্দ্রনাথ কৃষকদেরকে সমবায়ী হবার জন্যে উদ্বুদ্ধ করেন। শিলাইদহে তাঁর নিজের জমিদারিতে কলের লাঙল ব্যবহার করেন। এ কাজে রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথ মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সমবায়ের মাধ্যমে কুটিরশিল্পেরও প্রসার ঘটাতে পেরেছিলেন। পতিসরে কৃষি ব্যাংক কৃষকদের কৃষিকাজে ঋণপ্রদান ছাড়াও চিকিৎসা, পথ-ঘাট নির্মাণ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও ঋণ প্রদান করেছিল। পঞ্চান্ন বৎসর পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ ও পতিসরে তাঁর জমিদারিতে সমবায় পদ্ধতির প্রবর্তন করেছিলেন। কিন্তু নানা বিরোধিতার কারণে বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের এই পদক্ষেপ সফলতা লাভ করে নি। কিন্তু পরবর্তীকালে বিশ্বভারতীতে শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা করে তিনি সমবায়ে বিশেষ সফলতা লাভ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সমবায়ের সংজ্ঞা নির্দিষ্ট করে বলেন:

"অনেক গৃহস্থ অনেক মানুষ একজোট হইয়া জীবিকানির্বাহ করিবার যে উপায় তাহাকেই য়্যুরোপে কো-অপারেটিভ প্রণালি এবং বাংলায় 'সমবায়' নাম দেওয়া হইয়াছে ... এই কো-অপারেটিভ প্রণালিই আমাদের দেশকে দারিদ্র্য হইতে বাঁচাইবার একমাত্র উপায়। আমাদের দেশ কেন, পৃথিবীর সকল দেশেই এই প্রণালি একদিন বড়ো হইয়া উঠিবে। এখনকার দিনে ব্যবসা-বাণিজ্যে মানুষ

পরস্পর পরস্পরকে জিতিতে চায়, ঠকাইতে চায়; ধনী আপন টাকায় নির্ধনের শক্তিকে সস্তা দামে কিনিয়া লইতে চায়; ইহাতে করিয়া টাকা এবং ক্ষমতা কেবল এক জায়গাতেই বড়ো হইয়া ওঠে এবং বাকি জায়গায় সেই বড়ো টাকার আওতায় ছোটো শক্তিগুলি মাথা তুলিতে পারে না। কিন্তু সমবায় প্রণালিতে চাতুরি কিংবা বিশেষ একটা সুযোগে পরস্পর পরস্পরকে জিতিয়া বড় হইতে চাহিবে না, মিলিয়া বড়ো হইবে।"[৪৪]

১৯০৬-০৭ সাল থেকে কুষ্টিয়ার শিলাইদহ এবং রাজশাহীর পতিসরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জমিদারিতে সমবায়-পদ্ধতিতে কৃষিকাজের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন। শিলাইদহে থাকাকালীন কবি উল্লেখ করেন।

"কুঠিবাড়িতে বসে দেখতুম, চাষিরা হালবলদ নিয়ে চাষ করতে আসত, তাদের ছোটো ছোটো টুকরো জমি, তারা নিজের নিজের জমি চাষ করে চলে যেত, আমি দেখে ভাবতেম ... অনেকটা শক্তি তাদের অপব্যয় হচ্ছে। আমি তাদের ডেকে বললুম, 'তোমরা সমস্ত জমি একসঙ্গে চাষ করো ; সকলের যা সম্বল আছে, সামর্থ্য আছে তা একত্র করো; তা হলে অনায়াসে ট্রাক্টর দিয়ে তোমাদের জমি চাষ করা চলবে। সকলে একত্রে কাজ করলে জমির সামান্য তারতম্যে কিছু যায় আসে না, যা লাভ হবে তা তোমরা ভাগ করে নিতে পারবে। তোমাদের সমস্ত ফসল গ্রামে এক জায়গায় রাখবে, সেখান থেকে মহাজনেরা উপযুক্ত মূল্য দিয়ে কিনে নিয়ে যাবে।"[৪৫]

রবীন্দ্রনাথ এই সমবায়ের ভিত্তিতে ১৯১৫ সালে শিলাইদহে কালীগঙ্গার সন্নিকটে লাহিনী গ্রামে একটি আদর্শ-পল্লী গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু জমিদারে জমিদারে রেষারেষির কারণে- রবীন্দ্রনাথ এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারেন নি—এ সম্বন্ধে ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি। কিন্তু দৃঢ়চেতা রবীন্দ্রনাথ 'সমবায়' সম্পর্কে তাঁর বিশ্বাসকে ধরে রেখেছিলেন। ১৯১৫ সাল থেকে আমৃত্যু তিনি সমবায়ের প্রতি অনুরাগী হয়ে ওঠেন এবং শ্রীনিকেতনে তা অনেকটাই বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হন। বারান্তরে তা উল্লেখ করব।

শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ রেশম-শিল্পের জন্য রেশমের গুটিপোকার চাষ ইত্যাদি করেছিলেন এবং সে জন্য প্রচুর অর্থ-ব্যয়ও হয়েছিল। কিন্তু এ কাজে তিনি সফল হতে পারেন নি। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন-ভাবনা কোনো না কোনোভাবে জমিদারি স্বার্থরক্ষার জন্য হলেও তা যে স্বদেশ-প্রেম উদ্‌গত, এ কথা না মানলে রবীন্দ্রনাথের প্রতি নিঃসন্দেহে অবিচার করা হবে। রবীন্দ্রনাথ ঐতিহ্যানুগ ছিলেন। ইংরেজ-আমলে যে পঞ্চায়েতপ্রথা দেশে চালু ছিল যা পরবর্তীতে ইউনিয়ন-পরিষদে রূপান্তরিত হয়েছিল– রবীন্দ্রনাথ তা মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ ইতিহাস পাঠে আমাদের দেশের গ্রাম-পঞ্চায়েত সম্বন্ধে জেনেছিলেন– একথা আমরা বলেছি। রবীন্দ্রনাথ ব্রিটিশ প্রবর্তিত গ্রাম-পঞ্চায়েত প্রথা সম্বন্ধে বলেন :

"দৃষ্টান্ত স্বরূপ একবার পঞ্চায়েতবিধির কথা ভাবিয়া দেখুন। একসময় পঞ্চায়েত আমাদের দেশের জিনিস ছিল, এখন পঞ্চায়েত গভর্নমেন্ট আপিসে-গড়া জিনিস হইতে চলিল। যদি ফল বিচার করা যায় তবে এই দুই পঞ্চায়েতের প্রকৃতি একেবারে পরস্পরের বিপরীত বলিয়াই প্রতীত হইবে। যে পঞ্চায়েতের ক্ষমতা গ্রামের লোকের স্বতঃপ্রদত্ত নহে, যাহা গভর্নমেন্টের দত্ত, তাহা বাহিরের জিনিস হওয়াতেই গ্রামের বক্ষে একটা অশান্তির মতো চাপিয়া বসিবে– তাহা ঈর্ষার সৃষ্টি করিবে– এই পঞ্চায়েতের পদ লাভ করিবার জন্য অযোগ্য লোকে এমন সকল চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবে যাহাতে বিরোধ জমিতে থাকিবে- পঞ্চায়েত ম্যাজিস্ট্রেটবর্গকেই স্বপক্ষ এবং গ্রামকে অপরপক্ষ বলিয়া জানিবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বাহবা পাইবার জন্য গোপনে অথবা প্রকাশ্যে গ্রামের বিশ্বাস ভঙ্গ করিবে–ইহারা গ্রামের লোক হইয়া গ্রামের চরের কাজ করিতে বাধ্য হইবে এবং যে পঞ্চায়েত এদেশের গ্রামের বলস্বরূপ ছিল সেই পঞ্চায়েতই গ্রামের দুর্বলতার কারণ হইবে। ভারতবর্ষের যে সকল গ্রামে এখনো গ্রাম্য পঞ্চায়েতের প্রভাব বর্তমান আছে, যে পঞ্চায়েত কালক্রমে শিক্ষার বিস্তার ও অবস্থার পরিবর্তন অনুসারে স্বভাবতই স্বাদেশিক পঞ্চায়েতে পরিণত হইতে পারিত, যে গ্রাম্য পঞ্চায়েতগণ একদিন স্বদেশের সাধারণ কার্যে পরস্পরের মধ্যে জোট বাঁধিয়া দাঁড়াইবে এমন আশা করা যাইত– সেই সকল গ্রামের পঞ্চায়েতগণের মধ্যে একবার যদি গভর্নমেন্টের বেনোজল প্রবেশ করে, তবে পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েতত্ব চিরদিনের মতো ঘুচিল। দেশের জিনিস তাহারা যে কাজ করিত গভর্নমেন্টের জিনিস হইয়া তাহারা সম্পূর্ণ উলটারকম কাজ করিবে।"[৪৬]

এই আশঙ্কার কারণেই রবীন্দ্রনাথ পঞ্চায়েতের মধ্যে মণ্ডলীপ্রথা সৃষ্টি করেছিলেন এবং সমবায়-প্রথার মাধ্যমে গ্রামের উন্নয়ন সম্ভবপর করে তুলতে চেয়েছিলেন। এই চেতনার ফলেই তাঁর অন্তরে 'গ্রাম-স্বরাজ' এর স্বপ্ন জেগে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ বলেন :

"অতএব আর দ্বিধা না করিয়া আমাদের গ্রামের স্বকীয় শাসনকার্য আমাদিগকে নিজের হাতে লইতেই হইবে। সরকারি পঞ্চায়েতের মুষ্টি আমাদের পল্লীর কণ্ঠে দৃঢ় হইবার পূর্বেই আমাদের নিজের পল্লী-পঞ্চায়েতকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। চাষিকে আমরাই রক্ষা করিব, তাহার সন্তানদিগকে আমরাই শিক্ষা দিব; কৃষির উন্নতি আমরাই সাধন করিব, গ্রামের স্বাস্থ্য আমরাই বিধান করিব, এবং সর্বনেশে মামলার হাত হইতে আমাদের জমিদার ও প্রজাদিগকে আমরাই বাঁচাইব। এ সম্বন্ধে রাজার সাহায্য লইবার কল্পনাও যেন আমাদের না আসে, কারণ এ স্থলে সাহায্য লইবার অর্থই দুর্বলের স্বাধীন অধিকারের মধ্যে প্রবলকে ডাকিয়া আনিয়া বসানো।"[৪৭]

রবীন্দ্রনাথের এ বক্তব্যের মধ্যে গ্রাম-স্বরাজ প্রতিষ্ঠায় ঐকান্তিক ইচ্ছা প্রতিফলিত হয়েছে। ইতোপূর্বে পল্লীসমাজের যে দর্শন আমরা উল্লেখ করেছি,

রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত বক্তব্যে তারই প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পাই। তবে এই কাজে যা প্রয়োজন তা আত্মশক্তি। আত্মশক্তিতে বলীয়ান হতে পারলেই স্বরাজ আপনি প্রতিষ্ঠিত হয়। ভিক্ষাবৃত্তিতে নয়, আত্মবিশ্বাসেই সমাজের যথার্থ ভিত্তি। বাংলাদেশের শিলাইদহে কিংবা পতিসরে রবীন্দ্রনাথ এই গ্রাম-স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি—এটা সত্য। কিন্তু এ কাজে ব্যর্থতা আসা সত্ত্বেও তিনি হতোদ্যম বা নিরাশ হন নি। পল্লীউন্নয়নের জন্য শিলাইদহ এবং পতিসরে রবীন্দ্রনাথ যে কৃষিব্যাংক প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তাঁর উদ্দেশ্যও স্বাদেশিকতার সঙ্গে যুক্ত। রবীন্দ্রনাথ পল্লীউন্নয়নে সরকারি বা বিদেশী মহাজনদের প্রতিষ্ঠিত কোনো কৃষিব্যাংকের কার্যক্রম সমর্থন করেননি। কারণ, তাতে কৃষকদের বিদেশীদের হাতে বিকিয়ে দিতে হয়। রবীন্দ্রনাথ যথার্থভাবে গ্রামের মুক্তি চেয়েছিলেন। গ্রামের মানুষ আপন পায়ে দাঁড়াতে পারলেই স্বরাজ আপনি প্রতিষ্ঠিত হবে। কৃষিব্যাংক করে রবীন্দ্রনাথ লাভবান হননি—তিনি তা কখনও চাননি। তবে মূলধন বিনষ্ট হোক এমনটিও তিনি চাননি। কিন্তু কৃষিব্যাংক প্রতিষ্ঠার কুড়ি বছরের মধ্যে ব্যাংকের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। কৃষকদের নিকট কৃষিব্যাংকের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ যে ঋণ দিয়েছিলেন শেষপর্যন্ত তা অনেকাংশেই আদায় হয়নি। এমতাবস্থায় রবীন্দ্রনাথ পল্লীউন্নয়নের প্রচেষ্টা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেননি। কৃষিব্যাংক প্রতিষ্ঠার বেশ আগে থেকে রবীন্দ্রনাথ পল্লীউন্নয়নে যে সব অর্থ ব্যয় করতেন তা তাঁর নিজস্ব জমিদারি থেকে মাঝে-মধ্যে দিলেও কৃষকদের মধ্য থেকে একটি তহবিল গঠন করে পল্লীসংগঠনের ব্যয়নির্বাহের ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। গ্রামকে স্বনির্ভর করে তোলার এটিও ছিল একটি বিশেষ পদ্ধতি। এ বিষয়ে শ্রী শচীন্দ্রনাথ অধিকারী বলেন :

> "পল্লীসংগঠনাদির ব্যয়ের টাকা কোথা হতে পাওয়া যেত? মনে রাখা দরকার, বাংলার রাজা-মহারাজাদের মতো ঠাকুরবাবুরা ধনী ছিলেন না কিন্তু এ অঞ্চলে ঠাকুর-জমিদারদের সম্মান ও প্রতিপত্তি কারও অপেক্ষা কম ছিল না। প্রজাদের কাছ থেকে হাল-বকেয়া খাজনার টাকা প্রতি তিন পয়সা হিসেবে একটা বৃত্তি আদায় হতো। এ টাকা প্রজারা স্বতঃস্ফূর্ত হয়েই দিত। কালীগ্রামে এর নাম ছিল 'হিতৈষীবৃত্তি'। এই খরচের ব্যবস্থা করতো সেখানকার হিতৈষী-সভা। শিলাইদহে কল্যাণবৃত্তি ছিল টাকায় তিন পয়সা। এজন্য পৃথক রশিদ দেওয়া হতো। বৎসরে এইভাবে পাঁচ-ছয় হাজার টাকা উঠত। জমিদার এই আদায়ী টাকার অনুরূপ টাকা দিতেন। এ ছাড়া সায়রাত মহাল বন্দোবস্ত হলে মোট নজরের শতকরা ২.৫ (আড়াই) টাকা ও নাম খারিজের নজরানা সরকারি আইনে শতকরা ৫ টাকা আদায় হতো। এর হিসাব প্রতি বৎসর পরীক্ষার পর পাশ করার রীতি ছিল।"[৪৮]

রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে আসবার পর তার জমিদারি অঞ্চলে কৃষকদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে জানতে গিয়ে লক্ষ করেছিলেন যারা গরিব কৃষক তারা

মহাজনদের নিকট চড়াসুদে ঋণজালে আবদ্ধ। অনেক ক্ষেত্রেই এই ঋণের দায়ে তাদের জমি-জমা হাতছাড়া হয়ে যায়। এই ঘটনা রবীন্দ্রনাথকে পীড়া দিতে থাকে এবং এই অবস্থা থেকে কৃষকদের মুক্তিদানের জন্য তিনি শিলাইদহে এবং পতিসরে কৃষিব্যাংক ও সমবায় ব্যাংক গড়ে তোলেন। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন এককভাবে কারো পক্ষে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় এবং সে কারণেই তিনি সমবায়-পদ্ধতি প্রচলনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কৃষকদের লক্ষ করে তিনি বলেন :

> "ইহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে, যাহা একজন না পারে– তাহা পঞ্চাশজন জোট বাধিলেই হইতে পারে। তোমরা যে পঞ্চাশজনে চিরকাল পাশাপাশি পৃথক পৃথক চাষ করিয়া আসিতেছ, তোমরা তোমাদের সমস্ত জমি, হাল, লাঙল, গোয়ালঘর পরিশ্রম একত্র করিতে পারিলেই গরিব হইয়াও বড় মূলধনের সুযোগ আপনি পাইবে। তখন কল আনাইয়া লওয়া, কাজ করা কিছুই কঠিন হইবে না।[৪৯]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জমিদারিতে একটি 'কর্মীসংঘ' গঠন করেছিলেন। এই কাজে নিয়োজিত জমিদারির একজেন কর্মকর্তা অতুল সেন প্রজাদের নানাভাবে সহযোগিতা করায় কৃষকসমাজ প্রচুর ফসল লাভ করে। 'কর্মীসংঘের' উদ্দেশ্য ছিল বড় বড় মহাজনদের হাত থেকে গরিব চাষিদেরকে রক্ষা করা। কৃষকদের উন্নতির কাজে যুক্ত হয়েছিল ব্রতীদল। তারা প্রয়োজনমত কৃষকদের চাষের কাজে সাহায্য-সহযোগিতা করেছে। প্রকৃতপক্ষে জমিদারি দায়িত্ব নেবার পর রবীন্দ্রনাথ কৃষিনির্ভর পল্লীগ্রামে দারিদ্র্যবিমোচনে কৃষি তথা পল্লীউন্নয়নের ক্ষেত্রে যে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন তা অনন্য এবং বৈপ্লবিক। কেবল দুঃখ, পারিবারিক সমস্যা এবং জমিদারি হস্তান্তরিত হওয়ার ফলে রবীন্দ্রনাথ তার পরিকল্পনা বাংলাদেশে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হননি।

উপরোক্ত বক্তব্য পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে রবীন্দ্রনাথ জমিদারি প্রশাসনে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। তিনি তাঁর প্রজাদের মধ্যে আত্মশক্তির বিকাশ ঘটাতে চেয়েছিলেন। প্রজাদেরকে অপরের দয়া বা করুণার উপর নির্ভর না করে নিজেদের সমস্যাকে নিজেদের দ্বারাই সমাধানের উপায় করে দিয়েছিলেন। প্রজাদের উন্নয়নে জমিদার ও প্রজাদের অংশীদারত্ব- সাধারণ প্রজাদের আত্মমর্যাদাবোধ বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছিল। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথ তাঁর জমিদারিতে মানবিক মূল্যবোধকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। প্রজাদেরকে তিনি নিজের সন্তানের মতো দেখেছিলেন। তাদের দুঃখ-দুর্দশা তাঁকে গভীরভাবে পীড়িত করত। রবীন্দ্রনাথ আমৃত্যু প্রজাহিতৈষী ছিলেন। প্রজাদের কারণে তিনি তাঁর দুর্নীতিবাজ কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছেন। কিন্তু এক্ষেত্রেও তাঁকে একজন জনদরদী জমিদার হিসেবে দেখা গেছে। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ অঞ্চলকেই পল্লীউন্নয়নের কেন্দ্রস্থল বলে ভেবেছিলেন। এ কারণে তিনি শিলাইদহেই কৃষি ও অন্যান্য বিষয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ করেছিলেন।

ইতোপূর্বে আমরা রবীন্দ্রনাথের আলু চাষ এবং তার ব্যর্থতার কথাও উল্লেখ করেছি। এ সম্পর্কে ১৮৯৯ সালে ল্যান্ডরেকর্ডস অব এগ্রিকালচার অফিসের একটি রিপোর্টে রবীন্দ্রনাথের আলুচাষ সর্ম্পকে নিম্নলিখিত বিবরণটি মুদ্রিত হয়েছিল:

> "Experiment with Nainital potatoes were made by Mr Rabindranath Tagore in the Tagore Estate at Shelaidah in the Kushtia Sub-division. The crop was not satisfactory owing to the defective cultivation. One of Tagore's continents, however, working under more favourable circumstances obtained a bumper crop from a portion of the same seed and success of the experiments is said to have induced several nieghbouring Rayots to take the potato cultivation. Their experiments together with others introduced by Mr Rabindranath Tagore on his farm will be continued."[৫০]

আলু চাষের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ ভুট্টা, কপি, পাটনাই মটর, আখ ইত্যাদি চাষের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং তাতে কৃষকেরা সুফল পেয়েছিল। শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ আখ চাষের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা করেন এবং কৃষকদের আখ মাড়াই-এর জন্য মাড়াই-কলের প্রবর্তন করেন। এ সময় শিলাইদহ অঞ্চলে 'ধলি' 'কাজলা' এবং 'নাটা' নামের আখ চাষের প্রচলন ছিল। রবীন্দ্রনাথ সে সময়ে ঢাকা অঞ্চলের 'গেণ্ডারি আখ' চাষেরও ব্যবস্থা করেছিলেন। আশেপাশে চিনির কল না থাকায় আখ মাড়াই এর কলের সাহায্যে গুড় তৈরি হতো। রবীন্দ্রনাথ কুঠিবাড়িতে আখ মাড়াইকল তৈরি করতে শুরু করেন। প্রথম দিকে ব্যবসাটি লাভজনক হলেও পরে এ ব্যবসা তেমন সফল হয়নি। ইতোমধ্যে কুষ্টিয়াতে রেনউইক কোম্পানি নামে একটি বিদেশী কোম্পানি আখ মাড়াই এর কল তৈরি করতে শুরু করে এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁর ব্যবসা বন্ধ করে দেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে কুষ্টিয়াতে ভুষিমাল এবং পাট বাঁধাই এর জন্য ঠাকুর এস্টেট ট্যাগোর এ্যাণ্ড কোম্পানি নামে একটি প্রতিষ্ঠান খোলেন। যজ্ঞেশ্বর নামে এক কর্মচারীর সহযোগিতায় এই কাজ মোটামুটি ভালভাবে চলেছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজেই এ ব্যবসা দেখাশুনা করতেন এবং পরবর্তীকালে যজ্ঞেশ্বর বাবুকে এই কাজের সম্পুর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ রেশম চাষ শুরু করেছিলেন। কুমারখালিতে ঠাকুর-এস্টেটের ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলের রেশম ব্যবসার একটি কেন্দ্র ছিল। বিদেশী বাজারে সে সময় রেশমের বেশ ভাল মূল্য ছিল কিন্তু ঠাকুর-এস্টেটের দেনার দায়ে তা বিক্রি করে দিতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে পুত্র রথীন্দ্রনাথ এবং লরেন্স সাহেবের সহায়তায় রেশম চাষ করলেও তাতে সফল হতে পারেননি এবং এই চাষ পরে বন্ধ হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ অঞ্চলে কুঠিবাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিমে ৮০ বিঘা জমি খাস করে নিয়ে সেখানে কৃষি-গবেষণাগার নির্মাণ করেন। এখানে তখন পদ্মায় প্রচুর ইলিশ পাওয়া যেত। রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথ সস্তায় ৪ গাড়ি ইলিশ মাছ কিনে তা মাটিতে পুতে সার তৈরির ব্যবস্থা করেন। কিন্তু এ কাজে অধিক অর্থ ব্যয় হওয়ায় সার চাষের বিষয়টিও পরে বন্ধ করে দিতে হয়। এখানে পাম্পের সাহায্যে কৃষিক্ষেত্রে সেচ-সুবিধা প্রদানও শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথ এখানেই কৃষিখামার তৈরি করে উন্নত চাষের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং সে সম্বন্ধে শিলাইদহের কৃষকদের নানা প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করেছিলেন তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথের মাধ্যমে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিকে সমবায়ের আওতায় এনে সম্মিলিতভাবে ট্র্যাক্টর দিয়ে চাষের উপদেশ দিয়েছেন। বস্তুত, তিনিই সর্বপ্রথম যান্ত্রিক চাষের ব্যবস্থা করেছিলেন তাঁর জমিদারিতে। এ ছাড়াও উন্নতমানের চাষের গরুও আনয়নের ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি। এ উন্নতমানের চাষ ও কৃষিকাজে ট্র্যাক্টর ইত্যাদির ব্যবহার সম্বন্ধে তিনি বলেন :

> "আমাদের দেশের চাষের ক্ষেত্রের উপরে সমস্ত পৃথিবীর জ্ঞানের আলো ফেলিবার দিন আসিয়াছে। আজ শুধু একলা চাষির চাষ করিবার দিন নাই, আজ তাহার সঙ্গে বিদ্বানকে বৈজ্ঞানিককে যোগ দিতে হইবে। আজ শুধু চাষির লাঙলের ফলার সঙ্গে আমাদের মাটির সংযোগ যথেষ্ট নয়- সমস্ত দেশের বুদ্ধির সঙ্গে বিদ্যার সঙ্গে তাহার সংযোগ হওয়া চাই।"[৫১]

রবীন্দ্রনাথ পল্লীগ্রামে খাদ্যসমস্যা স্বচক্ষে দেখেছিলেন। এ কারণেই তিনি শিলাইদহে বৈজ্ঞানিক-রীতিতে চাষবাস ও গো-পালনের মাধ্যমে উন্নয়ন-প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের জমিদারিতে কর্মচারীদের দুর্নীতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন এবং এ বিষয়ে তিনি যথাযথ ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কর্মচারীদের বেতন তাঁর সময়কালে দুবার বৃদ্ধি করেছিলেন। কিন্তু ঠাকুর-এস্টেটের জমিদারি আয় ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাওয়ায় রবীন্দ্রনাথ কর্মচারীদের বেতন তেমন বৃদ্ধি করতে পারেননি। সে কারণে তিনি কর্মচারীদের মধ্যে চরাঞ্চলে জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। এর ফলে দুর্নীতি অনেকাংশে কমে এসেছিল। প্রশাসক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। প্রজাদের স্বার্থকে তিনি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতেন। কর্মচারীরা প্রজাদের নিকট থেকে অন্যায়ভাবে সুবিধা ভোগ করলে তিনি তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। কোনো কর্মচারীকে দুর্নীতিমুক্ত করতে না পারলে তাঁকে চাকুরিচ্যুত করতেন। এর ফলে কিছু কিছু কর্মচারী তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয় এবং কেউ-কেউ চাকুরি ছেড়ে চলে যায়। রবীন্দ্রনাথের কর্মচারীদের মধ্যে বেশ কয়েক জন মুসলমান ছিল। এরা

বরকন্দাজের চাকুরি করত। মুসলমানদের মধ্যে যারা সামান্য শিক্ষিত ছিল তাদেরকে তিনি আমিন এবং মুহুরীর কাজে নিযুক্ত করেন। রবীন্দ্রনাথের জমিদারিতে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানেরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। কিন্তু তারা কখনও রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতা করেনি। রবীন্দ্রনাথ কর্মচারীদের দুর্নীতি দমনে যেমন কঠোরতা অবলম্বন করেছিলেন তেমনি ভালো কাজে কর্মচারীদের তিনি স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। এ প্রসঙ্গে ঠাকুর এস্টেটের ম্যানেজার জানকী রায়ের কথা বলা যায়। জানকী রায় অবসর গ্রহণের পর রবীন্দ্রনাথ তাঁকে যে পত্র দিয়েছিলেন শচীন্দ্রনাথ অধিকারী তাঁর গ্রন্থ 'শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ'–এ তার বিবরণ দিয়েছেন।

শুভাশিসাং রাশয় সন্তু, বোলপুর

"এক্ষণে যাঁহারা কর্মের ভার লইয়াছেন তাঁহারা বর্তমান ব্যবস্থায় তোমার পদ অনাবশ্যক বিধায় তোমাকে অবসর দিয়াছেন ইহা আমার পক্ষে বেদনাজনক। তুমি চিরদিন কিরূপ সততার সহিত কাজ করিয়াছ এবং ধর্মের দিকে তাকাইয়া অসংকোচে ও নির্ভয়ে আপনার কর্তব্য সম্পন্ন করিয়াছ তাহা আমার অগোচর নাই। তোমার এই নির্ভীক সততায় অনেক সময় তোমার উপরিতন ও নিম্নতন কর্মচারীরা অসহিষ্ণু হইয়া তোমার বিরুদ্ধে নানাপ্রকার চেষ্টা করিয়াও এ পর্যন্ত কৃতকার্য হয় নাই। তুমি যেরূপ নিস্পলকভাবে ও সম্মানের সহিত পেনশন লইয়া কর্ম হইতে নিষ্কৃতিলাভের সুযোগ পাইয়াছ, জমিদারি সেরেস্তায় অল্প লোকের ভাগ্যে এরূপ ঘটে। ইহা তোমার অবিচলিত ধর্ম-নিষ্ঠার ফল। যে ভগবানের প্রতি তুমি সুখে-দুঃখে চিরদিনই নির্ভর করেছ তিনি নিশ্চয় তোমার কর্মজাল হইতে মুক্তি-লাভকে তোমার পক্ষে কল্যাণকর করিয়া তুলিবেন। অতএব, তুমি তোমার বর্তমান ক্ষতি ও অসুবিধাকে তাহারই স্বহস্তের দান বলিয়া নিরুদ্বিগ্নচিত্তে শিরোধার্য করিয়া লইবে। তুমি যে অবস্থায় যেখানে থাক, আমি তোমার মঙ্গল কামনা করি। সহসা তোমার কর্মস্থান হইতে চলিয়া আসিবার জন্য তোমার যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা জানাইয়া আবেদন করিলে নিঃসন্দেহে তাহা পূরণের ব্যবস্থা হইবে। এ সম্বন্ধে এস্টেট হইতে তোমাকে সাহায্য করা কর্তব্য বলিয়া মনে করি। অতএব, সংকোচ না করিয়া এইসংক্রান্ত তোমার ন্যায্যদাবী উত্থাপন করিতে পার। সরকারি যে জিনিষগুলি তুমি সর্বদা ব্যবহার করিয়া আসিতেছ তাহা তুমি সঙ্গে লইয়া যাইবে। তাহার কোন মূল্য দিতে হইবে না। আমাদের সহিত পূর্বাপর যে রূপ, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সম্বন্ধ ছিল তাহার লেশমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই, ইহা স্থির জানিবে এবং তোমার মঙ্গল সংবাদ পাইলে সুখী হইব, ইহাও মনে রাখিবে। ইতি- ১৬ ই বৈশাখ, ১৩১৮।

উপরোক্ত চিঠি রবীন্দ্রনাথের দরদি মনের একটি বিশেষ দিকের পরিচয় বহন করে। এ সময় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা ও ইন্দিরা দেবীর স্বামী প্রমথ

চৌধুরী ঠাকুর-এস্টেটের ম্যানেজিং এজেন্ট নিযুক্ত হন। রবীন্দ্রনাথ একজন বিশ্বস্ত কর্মচারীকে অবসর দেওয়ায় যে বেদনা বোধ করেছিলেন এই চিঠি তার পরিচয় বহন করে। এ সময়ে ঠাকুর-এস্টেটের পরিচালনা থেকে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে সরিয়ে নেন। সময়কাল : ১৩২২ সাল।

লোকসংস্কৃতি ও লোকসমাজ : পল্লীউন্নয়নের ইতিকথা

শিলাইদহে পল্লীউন্নয়নের কাজে নেমে রবীন্দ্রনাথ বাংলার লোকসংস্কৃতি উদ্ধারে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি নিজেও এ কাজে ব্রতী ছিলেন। শিলাইদহে এই কাজ তিনি শুরু করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন উন্নয়নের সঙ্গে আনন্দ না থাকলে যথার্থ উন্নয়ন সম্ভব নয়। এজন্য তিনি শিলাইদহে নানা ধরনের মেলা ও উৎসবের ব্যবস্থা করেছিলেন। যাত্রা, নাটক ইত্যাদি অনুষ্ঠান তাঁর সময়ে নিয়মিত হয়েছে। শ্রী শচীন্দ্রনাথ অধিকারী তাঁর গ্রন্থে এ সবের নানা বর্ণনা দিয়েছেন। গ্রামের প্রতি কোন ভালোবাসা না থাকলে রবীন্দ্রনাথ লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী হতেন না। তিনি লক্ষ করেছিলেন অভাব-অনটনের কারণে লোকসংস্কৃতি বিলীয়মান। লোকসংস্কৃতি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয়ে তিনি নানা প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁর 'গ্রাম্যসাহিত্য' প্রবন্ধটি এ সর্ম্পকে একটি অতীব মূল্যবান এবং উল্লেখযোগ্য অবদান। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন :

"একদিন শ্রাবণের শেষে নৌকা করিয়া পাবনা রাজশাহির মধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলাম। মাঠঘাট সমস্ত জলে ডুবিয়াছে। ছোটো ছোটো গ্রামগুলি জলচর জীবের ভাসমান কুলায়পুঞ্জের মতো মাঝে মাঝে জাগিয়া আছে। কূলের রেখা দেখা যায় না, শুধু জল ছলছল করিতেছে। ইহার মধ্যে যখন সূর্য অস্ত যাইবে এমন সময় দেখা গেল প্রায় দশ-বারোজন লোক একখানি ডিঙি বাহিয়া আসিতেছে! তাহারা সকলে মিলিয়া উচ্চকণ্ঠে এক গান ধরিয়াছে এবং দাঁড়ের পরিবর্তে এক-একখানি বাঁখারি দুই হাতে ধরিয়া গানের তালে তালে ঝোঁকে ঝোঁকে ঝপঝপ শব্দে জল ঠেলিয়া দ্রুতবেগে চলিয়াছে। গানের কথাগুলি শুনিবার জন্য কান পাতিলাম, অবশেষে বারম্বার আবৃত্তি শুনিয়া যে ধুয়াটি উদ্ধার করিলাম তাহা এই—

যুবতী, ক্যান বা কর মন ভারী
পাবনা থ্যাহে আন্যে দিব ট্যাহাদামের মোটরি॥

ভরাবর্ষার জলপ্লাবনের উপর যখন নিঃশব্দে সূর্য অস্ত যাইতেছে এ গানটি ঠিক তখনকার উপযুক্ত কি না সে সম্বন্ধে পাঠক মাত্রেরই সন্দেহ হইতে পারে, কিন্তু গানের এই দুইটি চরণে সেই শৈবালবিকীর্ণ জলমরুর মাঝখান হইতে সমস্ত গ্রামগুলি যেন কথা কহিয়া উঠিল।

দেখিলাম, এই গোয়ালঘরের পাশে, এই কুলগাছের ছায়ায়, এখানেও যুবতী মন ভারী করিয়া থাকেন এবং তাঁহার রোষারুণ কুটিল কটাক্ষপাতে গ্রাম্যকবির কবিতা ছন্দে-বন্ধে সুরে-তালে মাঠে-ঘাটে জলে-স্থলে জাগিয়া উঠিতে থাকে।

জগতে যত প্রকার দুর্বিপাক আছে যুবতীচিত্তের বিমুখতা তাহার মধ্যে অগ্রগণ্য। সেই দুরগ্রহ-শান্তির জন্য কবিরা ছন্দ রচনা ও প্রিয় প্রসাদবঞ্চিত হতভাগ্যগণ প্রাণপাত করিতে প্রস্তুত। কিন্তু যখন গানের মধ্যে শুনিলাম 'পাবনা থেকে আনি দেব টাকা দামের 'মোটরি' তখন ক্ষণকালের জন্য মনের মধ্যে বড়ো একটা আশ্বাস অনুভব করা গেল। মোটরি পদার্থটি কী তাহা ঠিক জানি না, কিন্তু তাহার মূল্য যে এক টাকার বেশি নহে কবি তাহাতে সন্দেহ রাখেন নাই। জগতের একপ্রান্তে পাবনা জেলায় যে এমন একটা স্থান আছে যেখানে প্রতিকূল প্রণয়ীনীর জন্য অসাধ্য সাধন করিতে হয় না, পাবনা অপেক্ষা দুর্গম স্থানে যাইতে এবং 'মোটরি' অপেক্ষা দুর্লভ পদার্থ সংগ্রহ করিতে হয় না, ইহা মনে করিলে ভাবযন্ত্রণা অপেক্ষাকৃত সুসহ বলিয়া বোধ হয়। কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর কবিরা এমনস্থলে নিশ্চয়ই মানস-সরোবরের স্বর্ণপদ্ম, আকাশের তারা এবং নন্দনকাননের পারিজাত অম্লান মুখে হাঁকিয়া বসিতেন এবং উজ্জয়িনীর প্রথম শ্রেণীর যুবতীরা শিখারিনী এবং মন্দাক্রান্তা ছন্দে এমন দুঃসাধ্য অনুষ্ঠানের প্রস্তাবমাত্র শুনিলে প্রসন্ন না হইয়া থাকিতে পারিতেন না।"[৫২]

রবীন্দ্রনাথ এই গানের মধ্য দিয়েই দুই শ্রেণীর মানুষের হৃদয়বৃত্তির কথা উল্লেখ করেছেন। পল্লীগ্রামের যুবতী এবং উজ্জয়িনীর ধনী নারী উভয়ের মধ্যে একটি হৃদয়ের মিল আছে। এ কথা বুঝতে সক্ষম বলে মোটরির দাম নিঃসন্দেহে টাকার চেয়ে অনেক বেশি বলে বোধ হয়। এই গানের মধ্যে জীবনের দুঃখ-কষ্ট এবং দৈন্যকে অতিক্রম করবার এক তীব্র বাসনাও সৃষ্টি হয়। ছন্দে ও সুরের তালে তা এক নিমিষে উজ্জয়িনীর সৌন্দর্যালোকের সঙ্গে মিশে যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ এই ভাবনাকে সাহিত্য নামে অভিহিত করেছেন। কালিদাসের সঙ্গে তখন এই গ্রাম্যকবির একটি মেলবন্ধনও সূচিত হয়।

এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন :

> "গ্রাম্য সাহিত্যের মধ্যেও কল্পনার তান অধিক থাক বা না থাক, সেই আনন্দের সুর আছে। গ্রামবাসীরা যে জীবন প্রতিদিন ভোগ করিয়া আসিতেছে, যে কবি সেই জীবনকে ছন্দে তালে বাজাইয়া তোলে সে কবি সমস্ত গ্রামের হৃদয়কে ভাষা দান করে। ... মেঘদূতের কবি অলকা পর্যন্ত গিয়াছেন। তিনি উজ্জয়িনী রাজসভার কবি; আমাদের অখ্যাতগণের কবি দায়ে পড়িয়াও পাবনা শহরের বেশি অগ্রসর হইতে পারেন নাই ... কল্পনার সংকীর্ণতা দ্বারাই সে আপন প্রতিবেশীবর্গকে ঘনিষ্ঠসূত্রে বাঁধিতে পারিয়াছে, এবং সেই কারণেই তাহার গানের

> মধ্যে কল্পনাপ্রিয় একক কবির নহে, পরন্তু সমস্ত জনপদের হৃদয় কলরবে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।
>
> সেইজন্য বাংলা জনপদের মধ্যে ছড়াগান কথা আকারে যে সাহিত্য গ্রামবাসীর মনকে সকল সময়েই দোল দিতেছে তাহাকে কাব্য হিসেবে গ্রহণ করিতে গেলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে সমস্ত গ্রাম সমস্ত লোকালয়কে জড়াইয়া লইয়া পাঠ করিতে হয়; তাহারাই ইহার ভাঙা ছন্দ এবং অপূর্ব মিলকে অর্থে ও প্রাণে ভরাট করিয়া তোলে। গ্রাম্যসাহিত্য বাংলার গ্রামের ছবির, গ্রামের স্মৃতির অপেক্ষা রাখে; সেইজন্য বাঙালির কাছে ইহার একটি বিশেষ রস আছে। ... গাছের শিকড়টা যেমন মাটির সঙ্গে জড়িত এবং তাহার অগ্রভাগ আকাশের দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তেমনি সবর্ত্রই সাহিত্যের নিম্নঅংশে স্বদেশে মাটির মধ্যেই অনেক পরিমাণে জড়িত হইয়া ঢাকা থাকে, তাহা বিশেষরূপে সংকীর্ণরূপে দেশীয়, স্থানীয়। ... সাহিত্যের যে অংশ সার্বভৌমিক তাহা এই প্রাদেশিক নিম্নস্তরের থাক্‌টার উপরে দাঁড়াইয়া আছে। এইরূপ নিম্নসাহিত্য এবং উচ্চসাহিত্যের মধ্যে বরাবর ভিতরকার একটি যোগ আছে।"[৫৩]

রবীন্দ্রনাথ লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী হয়েছিলেন গ্রামের প্রতি তাঁর প্রবল প্রীতিময়তার কারণে। কারণ, তিনি জানতেন প্রতি দেশের লোক-সাহিত্য, সংগীত এবং সংস্কৃতির মধ্যে সে দেশের মানুষের ঐতিহ্যকে চেনা যায়। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, এ সবের মধ্যেই পল্লীর প্রাণ নিহিত। পল্লীর মানুষেরাও রক্ত-মাংশে গড়া, তাদের প্রেম-ভালোবাসা, আনন্দ-বেদনা আছে। পল্লীর উন্নয়ন বলতে রবীন্দ্রনাথ তাই কেবল অর্থনৈতিক উন্নয়ন বুঝেননি–তার সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নয়নও বুঝেছেন। শিলাইদহ এবং পতিসরে থাকবার সময় গ্রামের মানুষের এই অন্তরের উপলব্ধির সঙ্গে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন। এই লোকসংস্কৃতির মাধ্যমেই তিনি গ্রামের মানুষকে আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে চেয়েছিলেন।

শিলাইদহ অঞ্চলের বাউলগান বিশেষ করে লালন ফকিরের গানের প্রতি তিনি অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কারণ, এর মধ্যে তিনি বাংলাদেশের মানুষের অসাম্প্রদায়িক চেতনা, হিন্দু-মুসলমানের একত্রে বসবাসজনিত প্রীতিময়তা, সর্বোপরি তাদের গানে মানবতাবোধ, শেণী-বৈষম্যকে অস্বীকার করে সব ধর্মমতের একটি মিলনের সেতুবন্ধনকে দেখতে পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ পল্লীসংস্কারে নেমে পল্লীর সাধারণ মানুষের অন্তরের খুব কাছাকাছি পৌঁছেছিলেন। তিনি পল্লীগ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে একশ্রেণীর মানুষকে অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণ ও কুটিল স্বভাবসম্পন্ন দেখেছিলেন। এরা রবীন্দ্রনাথের সকল উন্নয়ন কর্মকে বাধা দিয়েছে এবং নানা ষড়যন্ত্র করেছে। এতৎসত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ পল্লীর মানুষের নানা সমস্যা সমাধানে তৎপর হয়েছিলেন। গ্রামের মানুষের জলকষ্ট নিবারণের জন্য তিনি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। তিনি বলেন :

"জ্যৈষ্ঠের জ্যৈষ্ঠমাস ফিরিয়া আসে। দেশের তালু শুকাইয়া যায়, মধ্যাহ্নে অতিথি আসিয়া জল চাহিলে এক গণ্ডুষ জল দিতে গৃহীর হাত সরে না, প্রখর রৌদ্র ভিজা বালি খুঁড়িয়া তুলিয়া সেই বালি মাথায় দিয়া স্নানের কাজ সারিতে হয় এবং এক ঘড়া জল আনিতে মেয়েরা দেড়ক্রোশ তপ্ত পথ হাঁটিয়া যায় এবং ফিরিতে আর দেড়টি ক্রোশ লাগে।"[৫৪]

এ কারণে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ, সাজাদপুর এবং পতিসরে কয়েকটি পুকুর নির্মাণ করে দেন। গ্রামের মানুষের নিজেদের কোন উদ্যোগ ছিল না। এলাকায় অগ্নিকাণ্ড হলে পানির অভাবে বাড়িঘর পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ গ্রামের লোকদের পাতকুয়া নির্মাণ করতে বললে তারা আগ্রহ দেখায় না বরং রবীন্দ্রনাথকেই এই কাজটি করবার জন্য অনুরোধ করে। নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে তারা আগ্রহী নয়। সর্বক্ষেত্রেই তারা নিয়তির উপর নির্ভরশীল। এ ছাড়াও এদের মাধ্যমে কুপ্ররোচনা কাজ করে, তা হল যারা অবস্থাপন্ন তাদের সব কাজে তাদের ঈর্ষাপরায়ণতা। কোনো কাজে তাদের সুবিধার সঙ্গে অন্য কারো সুবিধা হোক– তারা তাতেও রাজি নয়। ফলে একটি বিভেদের বেড়াজাল তাদের মধ্যে বিরাজ করে।

রবীন্দ্রনাথ 'কালান্তর' গ্রন্থে 'খুটিশ্বরী' প্রসঙ্গে বলেন :

"যে বুদ্ধির রাস্তায় কর্মের রাস্তায় মানুষ পরস্পর মিলে সমৃদ্ধির পথে চলতে পারে সেইখানে খুঁটি গেড়ে থাকার সমস্যা ; যাদের মধ্যে সর্বদা আনাগোনার পথ সকল রকম খোলসা রাখতে হবে তাদের মধ্যে অসংখ্য খুঁটির বেড়াতুলে পরস্পরের ভেদকে বহুধা ও স্থায়ী করে তোলার সমস্যা; বুদ্ধির যোগে যেখানে সকলের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে অবুদ্ধির অচল বাধায় সেখানে সকলের সঙ্গে চিরবিচ্ছিন্ন হবার সমস্যা; খুঁটিরূপিনী ভেদ বুদ্ধির কাছে ভক্তি করে বিচার বিবেককে বলিদান করবার সমস্যা।"[৫৫]

গ্রামাঞ্চলের মানুষের বিশেষ করে তাঁর নিজের প্রজাদের মধ্যকার হীন স্বার্থবুদ্ধি এবং অক্ষম স্বভাবের মনোভাব রবীন্দ্রনাথকে নিদারুণ মনোকষ্টের কারণ হয়ে পড়েছিল। তাঁর দুঃখের কথা তিনি তাঁর উপন্যাস 'গোরা'-র মধ্যে প্রকাশ করেছেন। 'গোরা' উপন্যাসে নায়ক গোরার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের বিশ্বাস-অবিশ্বাসকে মূর্ত করে তুলেছেন। 'গোরা' শহরের মানুষ হয়ে গ্রামে দীর্ঘদিন বসবাস করেছে এবং তারমধ্যে সে গ্রামের মানুষের সুখ-দুঃখের ইতিহাস যেমন জেনেছেন তেমনি তাদের সহজ-সারল্যের সঙ্গে কিছু মানুষের কুটিলতা ও স্বার্থপরতা তাঁকে পীড়া দিয়েছে। 'গোরা' উপন্যাসের নায়ক গোরার গ্রামবাংলা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতার কথা এখানে তুলে ধরছি যা একার্থে রবীন্দ্রনাথেরই অভিজ্ঞতা এ কথা বললে মোটেই অসংগত হবে না।

"... ভদ্রসমাজ শিক্ষিত-সমাজ ও কলিকাতা-সমাজের বাহিরে আমাদের দেশটা যে কিরূপ গোরা তাহা এই প্রথম দেখিল। এই

নিভৃত প্রকাণ্ড গ্রাম্য ভারতবর্ষ যে কত বিচ্ছিন্ন, কত সংকীর্ণ, কত দুর্বল– সে নিজের শক্তি সম্বন্ধে যে কিরূপ নিতান্ত অচেতন এবং মঙ্গল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও উদাসীন– প্রত্যেক পাঁচ-সাত ক্রোশের ব্যবধানে তাহার সামাজিক পার্থক্য যে কিরূপ একান্ত– পৃথিবীর বৃহৎ কর্মক্ষেত্রে বলিবার পক্ষে সে যে কতই স্বরচিত ও কাল্পনিক বাধায় প্রতিহত– তুচ্ছতাকে যে সে কতোই বড় করিয়া জানে এবং সংস্কার মাত্রেই যে তাহার কাছে কিরূপ নিশ্চলভাবে কঠিন– তাহার মন যে কতই সুপ্ত, প্রাণ যে কতই স্বল্প, চেষ্টা যে কতই ক্ষীণ– তাহা গোরা গ্রামবাসীদেও মধ্যে এমন করিয়া বাস না করিলে কোনোমতেই কল্পনা করিতে পারিত না। গোরা গ্রামে বাস করিবার সময় একটা পাড়ায় আগুন লাগিয়াছিল। এত বড়ো একটা সংকটেও সকলে দলবদ্ধ হইয়া প্রাণপণ চেষ্টায় বিপদের বিরুদ্ধে কাজ করিবার শক্তি যে তাহাদের কত অল্প তাহা দেখিয়া গোরা আশ্চর্য হইয়া গেল। সকলেই গোলমাল দৌড়াদৌড়ি কান্নাকাটি করিত লাগিল, কিন্তু বিধিবদ্ধভাবে কিছুই করিতে পারিল না। সে পাড়ার নিকট জলাশয় ছিল না ; মেয়েরা দূর হইতে জল বহিয়া আনিয়া ঘরের কাজ চালায়, অথচ প্রতিদিনেরই সেই অসুবিধা লাঘব করিবার জন্য ঘরে একটা স্বল্পব্যয়ে কূপ খনন করিয়া রাখে সংগতিসম্পন্ন লোকেরও সে চিন্তাই ছিল না। পূর্বেও এ পাড়ায় মাঝে মাঝে আগুন লাগিয়াছে, তাহাকে দৈবের উৎপাত বলিয়াই সকলে নিরুদ্যম হইয়া আছে, নিকটে কোনোপ্রকার জলের ব্যবস্থা করিয়া রাখিবার জন্য তাহাদের কোনোরূপ চেষ্টাই জন্মে নাই। পাড়ার নিতান্ত প্রয়োজন সম্বন্ধেও যাহাদের বোধশক্তি এমন আশ্চর্য অসাড় তাহাদের কাছে সমস্ত দেশের আলোচনা করা গোরার কাছে বিদ্রূপ বলিয়া বোধ হইল। ... এই অজ্ঞতা জড়তা ও দুঃখের বোঝা যে কী ভয়ঙ্কর প্রকাণ্ড এবং এই ভার যে আমাদের শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র সকলেরই কাঁধের উপর চাপিয়া রহিয়াছে, প্রত্যেকেই অগ্রসর হইতে দিতেছে না, এই কথা আজ স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়া গোরার চিত্ত রাত্রিদিন ক্লিষ্ট হইতে লাগিল।"[৫৬]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাস্তবজীবনে এমন ঘটনা শিলাইদহ এবং পতিসরে প্রত্যক্ষ করেছেন। গ্রামোন্নয়নে রবীন্দ্রনাথ নারীদের অবস্থানের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। নারী ব্যতিরেকে কোন সমাজ অগ্রসর হতে পারে না। অথচ গ্রামে নারীদের অবস্থানের বিষয়টি পুরুষের নিকট গুরুত্ব পায়নি। 'গোরা' চরিত্রের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ নর-নারীর বিষয়টি গুরুত্ববহ করে তুলেছেন। আজ পৃথিবীতে যে নারীবাদী আন্দোলন শুরু হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর সময়কালে এই বিষয়টির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সমাজে নর-নারীর অবস্থানের বিষয়টি সম্পর্কে গোরার উপলব্ধি ছিল নিম্নরূপ :

"... নর-নারী সমাজশক্তির দুই দিক, পুরুষই ব্যক্ত, কিন্তু ব্যক্ত বলেই যে মস্ত তা নয়– নারী অব্যক্ত, এই অব্যক্ত শক্তিকে যদি কেবলই ব্যক্ত করবার চেষ্টা করা হয় তা হলে সমস্ত মূলধন খরচ করে ফেলে

সমাজকে দ্রুত বেগে দেউলে করবার দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। সেইজন্য বলছি– আমরা পুরুষেরা যদি থাকি যজ্ঞের ক্ষেত্রে, মেয়েরা যদি থাকেন ভাড়ার আগলে, তা হলেই মেয়েরা অদৃশ্য থাকলেও যজ্ঞ সুসম্পন্ন হবে। সব শক্তিকেই একই দিকে একই জায়গায় একই রকমে খরচ করতে চায় যারা তারা উন্মত্ত।"[৫৭]

রবীন্দ্রনাথ গোরার এই বক্তব্যে শাশ্বত নারীর মহিমাকে কীর্তন করেছেন। সংসারে নারীর যে ভূমিকা যা সমাজকে সংহত রূপ দিয়ে থাকে, রবীন্দ্রনাথ তাকেই গ্রহণের কথা উল্লেখ করেছেন। আজ সারা বিশ্বে নারীদেরকে সংসার থেকে বের করে নিয়ে এসে পুরুষেরা কাজের পাশাপাশি রেখে তার শক্তিকে খরচ করে ফেলবার প্রাকটিস চলছে- রবীন্দ্রনাথ তাকে বর্জন করতে চেয়েছেন। এতে সমাজ এগুবে না বরং সমাজ ধ্বংস হবে। তার মানে এই নয় যে সমাজে নারী-পুরুষের হাতের ক্রীড়নক হবে কিংবা নিগৃহীত হবে। রবীন্দ্রনাথ তার যথাযথ মর্যাদা প্রদানে বিশ্বাসী ছিলেন। গোরার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ তাই বলেন : "আমি যখন আমার মাকে দেখেছি, মাকে জেনেছি, তখন আমার দেশের সমস্ত স্ত্রীলোককে সেই এক জায়গায় দেখেছি, জেনেছি।"[৫৮] গোরা তার এই বক্তব্যে গোটা স্ত্রীজাতিকে সমাজে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখতে চেয়েছে। সে তাঁর বক্তব্যে আরও বলেছে :

"দিন আর রাত্রি সময়ের এই যেমন দুটো ভাগ– পুরুষ এবং মেয়েও তেমনি সমাজের দুই অংশ। সমাজের স্বাভাবিক অবস্থায় স্ত্রীলোক রাত্রির মতোই প্রচ্ছন্ন– তার সমস্ত কাজ নিগূঢ় এবং নিভৃত। আমাদের কর্মের হিসাব থেকে আমরা রাতকে বাদ দিই। কিন্তু বাদ দিই বলে তার যে গভীর কর্ম তার কিছুই বাদ পড়ে না। ... যেখানে সমাজের অস্বাভাবিক অবস্থা সেখানে রাতকে জোর করে দিন করে তোলে– সেখানে গ্যাস জ্বালিয়ে কল চালানো হয়, বাতি জ্বালিয়ে সমস্ত রাত নাচগান হয়– তাতে ফল কী হয়। ফল হয় এই যে, রাত্রির যে স্বাভাবিক নিভৃত কাজ তা নষ্ট হয়ে যায়, ক্লান্তি বাড়তে থাকে, ক্ষতিপূরণ হয় না, মানুষ উন্মত্ত হয়ে ওঠে। মেয়েদেরও যদি তেমনি আমরা প্রকাশ্য কর্মক্ষেত্রে টেনে আনি তা হলে তাদের নিগূঢ় কর্মের ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে যায়– তাতে সমাজের স্বাস্থ্য ও শান্তি ভঙ্গ হয়, সমাজে একটা মত্ততা প্রবেশ করে।"[৫৯]

বাস্তবিক আজ নারীবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে নারীকে গৃহাঙ্গন থেকে বাইরে নিয়ে এসে তাদেরকে সেভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে অথবা যেভাবে তারা ব্যবহৃত হচ্ছে তা মত্ততারই সামিল। আপাতভাবে মনে হতে পারে সমাজ বুঝি এগুচ্ছে– আসলে তা একটি সামাজিক বিপর্যয়ের নামান্তর। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পল্লীউন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীসমাজকে উন্নয়নের সহায়ক-শক্তি হিসেবে দেখেছেন।

রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে এবং অন্যত্র হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানদের সহযোগিতা লাভ করেছিলেন। কিন্তু তিনি গভীর দুঃখের সাথে লক্ষ করেছিলেন যে গ্রামের হিন্দুসমাজ মুসলমানদেরকে অস্পৃশ্যতুল্য বলে বিবেচনা করে এবং সে কারণে

তাদের উভয়ের মধ্যে একটি বিরোধ প্রায়শই পরিলক্ষিত হয়। শিলাইদহে পুণ্যাহ উৎসবের কথা আগেই বলেছি। রবীন্দ্রনাথ 'গোরা' উপন্যাসে এবং 'সমস্যাপূরণ' গল্পে হিন্দু-মুসলমানের কথা উল্লেখ করেছেন। অপর একটি গল্পে তিনি হিন্দু-রমণী কমলা চরিত্রের মাধ্যমে হিন্দু ও মুসলমানকে একসূত্রে গাঁথবার প্রচেষ্টা নিয়েছেন। বাউল লালন ফকিরের দর্শনে যে 'মানবধর্মের' উল্লেখ রয়েছে, রবীন্দ্রনাথ তাকেই অসাম্প্রদায়িক চেতনা হিসেবে গণ্য করে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঐক্যমিল খুঁজে পেয়েছেন। 'মুসলমানি'র গল্পে কমলা বলেছে:

"বাবা আমার ধর্ম নেই, আমি যাকে ভালোবাসী সেই ভাগ্যবানই আমার ধর্ম। যে ধর্ম চিরদিন আমাকে জীবনের সব ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত করেছে, অবজ্ঞার আস্তাকুঁড়ের পাশে আমাকে ফেলে রেখে দিয়েছে, সে ধর্মের মধ্যে আমি ত দেবতার প্রসন্নতা কোনদিন দেখতে পেলুম না। ... আমি প্রথম ভালোবাসা পেলুম বাপজান তোমার ঘরে। জানতে পারলুম হতভাগিনী মেয়েরও জীবনের মূল্য আছে। ... তুমি মুসলমান করে নাও আমাকে, তাতে আমার আপত্তি হবে না, আমার না হয় দুই ধর্মই থাকল।"[৬০]

রবীন্দ্রনাথ হিন্দু-মুসলিমকে দুই বিরোধী হিসেবে দেখতে চাননি। তাই হিন্দু মুসলিম ভিত্তিতে সমগ্র বঙ্গদেশ বিভক্ত হলে তিনি তাঁর প্রতিবাদ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন :

"If Bengal is dividided into two jones the Moslem zone and the Hindu zone, then all the ties that bind Hindus and Moslems will unloosened by and by— there is disunity amongst Hindus and Moslems— but if the king proposes to widen the gulf that exists and make both the parties independent of each other, then in course of time Hindu Moslem excessiveness and the intensity of mutual Jealousy will be undoubtedly on the increase."[৬১]

'বঙ্গভঙ্গ' আন্দোলনের রাজনৈতিক পরিণাম দুঃখজনক হয়েছিল। এই আন্দোলন এক পর্যায়ে এসে দাঙ্গার সৃষ্টি করেছিল। এই দাঙ্গায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই দায়ী ছিল। ১৯০৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বঙ্গীয় প্রাদেশিক-সম্মিলনীর পাবনা অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু-মুসলমানের মিলন কামনায় বলেন :

"এদিকে একটা প্রকাণ্ড বিচ্ছেদের খড়্গ দেশের মাথার উপর ঝুলিতেছে। কত শত বৎসর হইয়া গেল, আমরা হিন্দু ও মুসলমান একই দেশমাতার দুই জানুর উপর বসিয়া একই স্নেহ উপভোগ করিয়াছি, তথাপি আজও আমাদের মিলনে বিঘ্ন ঘটিতেছে। ... যাই হউক, হিন্দু ও মুসলমান ভারতবর্ষের এই দুই প্রধান ভাগকে এক

রাষ্ট্রসম্মিলনের মধ্যে বাঁধিবার জন্য যে ত্যাগ, যে সহিষ্ণুতা, যে সতর্কতা ও আত্মদান আবশ্যক তাহা আমাদিগকে অবলম্বন করিতে হইবে।"[৬২]

রবীন্দ্রনাথের এই মানসিকতা বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্রজীবনী রচিতকার সাইকস বলেন :

"Another thing in Bengal politics hurt him deeply. This was that Hindus and Muslims were being divided and were forming a 'Hindu party' and a` Muslim Party'. In 1908 Rabindranath was the President of the Bengal provincial conference and he spoke to the conference about this danger. He suggested that all youngmen who really wanted to serve their country should go and work in groups in the villages. Each group should contain both Hindu and Moslem youngmen, and they should make it their special responsibility to increase the friendship and understanding between Hindues and Moslems in the villages. They should help the villagers to see that, to whichever religion they belonged, their real interests as human beings were the same. This ought to be done, he said, not because it might help in a political movement but simply because it was right thing to do."[৬৩]

রবীন্দ্রনাথ পল্লীউন্নয়নের ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমানকেই সম্পৃক্ত করেছিলেন। শিলাইদহে এবং পতিসরে রবীন্দ্রনাথ যে সফলতা লাভ করেছিলেন তা হিন্দু-পল্লীতে নয়, মুসলমান-পল্লীতে। একটি চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন : "আমার প্রজাদের মধ্যে যারা মুসলমান তাদের মধ্যে বেশ কাজ অগ্রসর হচ্ছে–হিন্দুপল্লীতে বাধার অন্ত নেই।"[৬৪]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পল্লীউন্নয়নের ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমানের মিলনকেই উন্নয়নের সোপান বলে জেনেছিলেন। শিলাইদহে হিন্দু-মুসলমানের 'রাখীবন্ধন' উৎসব এই চেতনার বহিঃপ্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ এই রাখী-উৎসব দেশ ও হিন্দু-মুসলমানের মেল-বন্ধনের জন্য করেছিলেন। শিলাইদহে এই উৎসব পালিত হয়। 'রাখী-বন্ধন' সর্ম্পকে রবীন্দ্রনাথ বলেন :

"ঈশ্বর যে বাঙালিকে বিচ্ছিন্ন করেন নাই তাহাই বিশেষরূপে স্মরণ ও প্রচার করিবার জন্য সেই দিনকে আমরা বাঙালির রাখীবন্ধনের দিন করিয়া পরস্পরের হাতে হরিদ্রাবর্ণের সূত্র বাঁধিয়া দিব।

রাখীবন্ধনের মন্ত্রটি এই 'ভাই ভাই এক ঠাঁই'[৬৫]

শিলাইদহের রাখীবন্ধনের উৎসব সর্ম্পকে শচীন্দ্রনাথ অধিকারী প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে বলেন :

"আমি তখন স্কুলের ছাত্র, বয়স বোধ হয় দশ-এগারো, সালটা ঠিক বলতে পারব না। রবীন্দ্রনাথ একবার শিলাইদহে রাখীবন্ধন উৎসব করেন। ... সে-বারে মহাসমারোহে রাখীবন্ধন উৎসবের আয়োজন। বিরাট গানের দল– খোল, করতাল বাদেও হারমোনিয়াম ও ফ্লুট ইত্যাদিসহ 'বাংলার মাটি বাংলার জল' গানে সারা গ্রাম প্রকম্পিত ... সব বাড়িতে রান্না নিষেধ, লালনিশান আর ফুলের মালার ছড়াছড়ি। সবার কাঁধে গামছা, বিরাট গানের দল বাজার ও হাট পরিক্রমা করে পদ্মাতীরে হানিফের ঘাটে বোটে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মিলিত হয়; তাঁর গান ও বক্তৃতা শুনব আর বাঁধব রাঙারাখি তাঁর হাতে সবাই মিলে। ... রবীন্দ্রনাথ বললেন, "আমাদের সোনার বাংলাকে কার সাধ্য ভেঙে দুভাগ করবে। হিন্দুমুসলমান ভাইভাই এক ঠাঁই বলে বক্তৃতা দিলেন; আমরা তাঁর দুহাতে এক গাদা রাঙারাখী বেঁধে দিলাম।... "[৬৬]

শিলাইদহের রাখীবন্ধন উৎসবে রবীন্দ্রনাথ হিন্দুমুসলমান নির্বিশেষে সকলের হাতে রাখী বেঁধে দিয়েছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর উল্লেখ করেছেন যে, "এ সময়ে মসজিদে প্রবেশ করে মুসলমানদের হাতেও রাখীর সুতো পরিয়ে দেওয়া হয়েছে।"[৬৭]

রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গভঙ্গ' রোধ করতে হিন্দু-মুসলমানের মিলনকে কামনা করেছিলেন। একটি সভায় তিনি আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলেছিলেন,

"চাষি চাষ করিয়া এতক্ষণে ঘরে ফিরিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো, যে রাখাল ধেনুদলকে গোষ্ঠীগৃহে এতক্ষণে ফিরাইয়া আনিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো, শংখমুখরিত দেবালয়ে যে পূজার্থী আগত হইয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো, অস্তসূর্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া যে মুসলমান নামাজ পড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো। আজ সায়াহ্নে ... একবার বাংলাদেশের পূর্বে পশ্চিমে আপন অন্তরের আলিঙ্গন বিস্তার করিয়া দাও। ... "[৬৮]

এখানেই রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হননি। অতঃপর রবীন্দ্রনাথ আরো বলেন :

"... দেশে কর্মশক্তিকে একটি বিশেষ কর্তৃসভার (Council of action) মধ্যে বদ্ধ করিতে হইবে। অন্তত একজন হিন্দু ও একজন মুসলমানকে আমরা এই সভার অধিনায়ক করিব। তাহাদের নিকট নিজেকে সম্পূর্ণ অধীন, সম্পূর্ণ নত করিয়া রাখিব; তাহাদিগকে কর দান করিব; তাহাদের আদেশ পালন করিব; নির্বিচারে তাহাদের শাসন মানিয়া চলিব; তাহাদিগকে সম্মান করিয়া দেশকে সম্মানিত করিব।"[৬৯]

রবীন্দ্রনাথের এই প্রচেষ্টা অপবাদমুক্ত ছিল না। অনেকে বলেছেন, কবির মুসলমান প্রীতির আড়ালে ব্রাহ্মধর্মের সমর্থন রয়েছে।[৭০] রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস

করেছিলেন, ধর্মের ভিত্তির উপরেই মিলনের ইমারত স্থায়িভাবে গড়ে ওঠে। তিনি তাঁর 'সমস্যা' প্রবন্ধে উল্লেখ করেন :

> "সেই নির্ভীক নির্বাধ বিপুল মনুষ্যত্বের অধিকারী হইবার জন্যই আমাদিগকে পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরকে ধর্মের বন্ধনে বাঁধিতে হইবে। ইহা ছাড়া মানুষ কোনমতেই বড় হইতে পারে না, কোনমতেই সত্য হইতে পারে না।"[৭১]

রবীন্দ্রনাথ মৈত্রেয়ী দেবীকে একবার গল্পচ্ছলে তাঁর সম্বন্ধে নানা মিথ্যা-অপবাদের কথা উল্লেখ করে বলেন :

> "একটা কথা শুনেছ বোধ হয় যে আমি একজন অত্যাচারী জমিদার ? অথচ এতবড় মিথ্যে খুব কম আছে। আমার সঙ্গে আমার প্রজাদের সম্বন্ধ কোনদিন স্নেহশূন্য ছিল না। সত্যি সত্যি আমায় ভালোবাসতো তারা। ... আমার ওখানে তো মুসলমান প্রজা কম ছিল না, কিন্তু একথা বলতেই হবে তাদের কাছ থেকে যে ব্যবহার পেয়েছি হিন্দু প্রজাদের কাছ থেকেও তা পাইনি। আজকাল এই ঘোর কমিওনাল বিদ্বেষের দিনে সে সব কথা মনে পড়ে।"[৭২]

রবীন্দ্রনাথ হিন্দু-মুসলমান মিলনের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের চর্চার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আরবি-ফার্সি ভাষার সংমিশ্রণে যে বাংলাভাষা উন্নত হয়েছে একথা রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে বিশ্বাস করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেন :

> "সাহিত্যে বাংলাদেশে যে একটি বিপুল মিলনযজ্ঞের আয়োজন হইয়াছে, যাহার বেদী আমাদের চিত্তের মধ্যে, সত্যের উপরে ভাবের উপরে যাহার প্রতিষ্ঠা, সেখানেও হিন্দুমুসলমানকে যাহারা কৃত্রিম বেড়া তুলিয়া পৃথক করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন তাহারা মুসলমানের বন্ধু নহেন। দুই প্রতিবেশীর মধ্যে একটা স্বাভাবিক আত্মীয়তার যোগসূত্রকেও যাঁহারা ছেদন করিতে চাহেন, তাঁহাদের অন্তর্যামীই জানেন, তাঁহারা ধর্মের নামে দেশের মধ্যে অধর্মকে আহ্বান করিবার পথ খনন করিতেছেন। ... বাংলাদেশের সাধনা একটি সত্যবস্তু পাইয়াছে সেটি তাহার সাহিত্য। এই সাহিত্যের প্রতি আন্তরিক মমত্ববোধ না হওয়াই হিন্দু বা মুসলমানের পক্ষে অসংগত।"[৭৩]

রবীন্দ্রনাথের আগে ও পরে অনেক হিন্দু-সাহিত্যিক যে আরবি-ফার্সি ভাষা বাংলাসাহিত্যের চর্চায় ব্যবহার করেছেন এবং এর ফলে দেশে একটি সম্প্রীতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্র গড়ে উঠেছে সে সম্পর্কে যদুনাথ সরকার তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন :

> "... Rise of our vernacular literature, as the fruits of peace and economic prosperity under the empire of Delhi."[৭৪]

রবীন্দ্রনাথের মুসলমান-প্রীতি যে শুধু কিছু লেখাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বাস্তবেও যে তিনি তাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা নিতেন সে সম্বন্ধে তাঁর 'হিন্দু মুসলমান' প্রবন্ধে উল্লেখ রয়েছে—

> "কোরবানি নিয়ে দেশে যখন একটা উত্তেজনা প্রবল তখন হিন্দুপ্রজারা আমাদের এলাকায় সেটা সম্পূর্ণ রহিত করবার জন্য আমার কাছে নালিশ করেছিল। সে নালিশ আমি সংগত মনে করিনি, কিন্তু মুসলমান প্রজাদের ডেকে যখন বলে দিলুম কাজটা যেন এমনভাবে সম্পন্ন করা হয় যাতে হিন্দুদের মনে অকারণে আঘাত না লাগে, তারা তখনই তা মেনে নিলে। আমাদের সেখানে এ পর্যন্ত কোনো উপদ্রব ঘটেনি। আমার বিশ্বাস তার প্রধান কারণ, আমার সঙ্গে মুসলমান-প্রজার সম্বন্ধ সহজ ও বাধাহীন।"[৭৫]

শুধু বাংলাদেশই নয়, পশ্চিমবাংলায় রবীন্দ্রনাথের নিজের প্রতিষ্ঠান 'শান্তিনিকেতন' এর পার্শ্ববর্তী দুটি গ্রামে কোরবানি হতো। এ সম্পর্কে প্রেমচাঁদ লাল তাঁর গ্রন্থে বলেন যে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ চামড়া ব্যবসা শুরু করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল গরিব মুচিদের জুতা তৈরির কাজে সাহায্য করা। সে সময় বীরভূম জেলায় ৩৬০০ জন মুচি বাস করতো। তাদের সকলেই বিত্তহীন হয়ে পড়েছিল। অনেকেই তাদের পৈতৃক ব্যবসা ভুলতে বসেছিল। এদের মধ্যে কেউ চাষবাস করে খেত, কেউ শ্রমিকের কাজ করতো। এই প্রেক্ষিতেই রবীন্দ্রনাথ চামড়া ব্যবসা শুরু করেন। প্রেমচাঁদ বলেন :

> "It is estimated that there are about 3600 Muchis (Leather workers) in the district. A great majority of them are landless and in most cases have forgotten their own trade. some of them are farming on small pieces of land on rentals, others earn their living as day labourers, their condition is very miserable. The tannery was started as an experiments in the face of many difficulties. First of all with regard to the getting of raw materials. All the villages round about, with the exception of two, are Hindu villages, therefore, no cows are slaughtered in them for the consumptin of flesh. Even in the two Mohammadan villages, it is only on the occasion of their annual festivals that they kill cows and then only a few."[৭৬]

রবীন্দ্রনাথ পল্লীউন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। মানুষ সুশিক্ষিত হলে তাঁর বিচার-বিবেচনা সুপথে পরিচালিত হয়। এই সুশিক্ষার অভাবের কারণেই মানুষের মধ্যে যত বিরোধ। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে বিরোধিতা তা অনেকটাই এ কারণে। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকে মুক্তির সোপান বলেছেন। এই শিক্ষা প্রচলিত পুঁথিগত শিক্ষা নয়। যে শিক্ষা মানুষকে ধর্মে-কর্মে

প্রীতিময়তার শিক্ষা দেয়, দুর্বুদ্ধি থেকে মুক্তি দেয়– সেই শিক্ষাকেই তিনি যথার্থ শিক্ষা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষাচিন্তাকে জীবনমুখী করতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকে কর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে মানুষের বেকারসমস্যা দুর করতে চেয়েছিলেন। শিলাইদহে কৃষির উন্নতির জন্য পরীক্ষাগার ও তাঁত-কারখানা চালু করেছিলেন সাধারণ মানুষকে হাতে-কলমে শিক্ষা দেবার জন্য। শান্তিনিকেতনে শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল এই ভাবনা। বাংলাদেশে শিলাইদহেই তিনি এমন প্রতিষ্ঠান তৈরি করবেন বলে ভেবেছিলেন। পুত্রবধূ প্রতিমা শিলাইদহে এই উদ্দেশ্যেই একটা স্কুল গড়ে তুলেছিলেন। জমিদারির পতন হওয়ায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষা-পরিকল্পনাকে এ দেশে বাস্তবায়ন করতে পারেননি। শিলাইদহ এবং পতিসরে রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন সর্ম্পকে একটি নাতিদীর্ঘ বিবরণ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পুত্রকে নিয়ে শিলাইদহ এবং অন্যত্র কি করতে চেয়েছিলেন এই পত্রে সেই বিবরণও পাওয়া যাবে তাঁর বক্তব্য 'পিতৃস্মৃতিতে':

> "যৌবনের প্রারম্ভেই আমার পিতা মহর্ষিদেবের কাছ থেকে কঠিন দায়িত্বপূর্ণ একটি কার্যভার পেলেন। মহর্ষি আদেশ করলেন তাঁকে জমিদারি চালনা করতে হবে। সে সময় জমিদারি সম্পত্তি যথেষ্ট ছিল; সেগুলি অনেক জায়গায় ছড়ানো— বাংলায় ছিল তিনটি পরগনা তিন বিভিন্ন জেলায়; পাবনায় শাহাজাদপুর, রাজশাহীতে কালিগ্রাম ও নদীয়াতে বিরাহিমপুর। এ ছাড়া উড়িষ্যায় ছিল আরও তিনটি ছোট ছোট জমিদারি।

এই কাজের ভার পেয়ে বাবাকে কলকাতা ছাড়তে হল। তিনি চলে গেলেন শিলাইদহে। শিলাইদহে ছিল বিরাহিমপুর পরগনার সদর কাছারি। কাজের সুবিধার জন্য বাবা শিলাইদহে তাঁর প্রধান কার্যক্ষেত্র করলেন। সেখান থেকে শাহাজাদপুর ও কালিগ্রামে নদীপথে সহজেই যাওয়া যায়। শিলাইদহ পদ্মানদীর ধারে, সেখানে থাকত 'পদ্মা' বোট। বাবা এই বোটে করে কুষ্টিয়া, কুমারখালি, শাহাজাদপুর পতিসর ও অন্যান্য যে সব জায়গায় আমাদের কাছারি ছিল যাতায়াত করতেন। বাংলাদেশে নদীর অভাব নেই, জলপথে প্রায় সব স্থানেই যাওয়া যায়। বোটে করে খাল-বিল নদী বেয়ে ঘুরতে বাবা ভালোবাসতেন। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাতায়াতের তাঁর প্রধান আকর্ষণ ছিল দেশকে ভালো করে জানা, দেশের লোকের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখের সাক্ষাৎ পরিচয় পাওয়া। জমিদারি দেখার কাজ তাঁর কাছে নিশ্চয়ই পীড়াজনক হয়ে উঠত যদি-না এই সূত্রে গ্রামজীবনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাবার সুযোগ তাঁর হতো। গ্রামের ও গ্রামবাসীদের অবস্থা বাবাকে কতখানি বিচলিত করেছিল, সেইসময়কার তাঁর লেখার মধ্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রামের সমস্যা যে সমগ্র দেশের সমস্যা, দেশের উন্নতি নির্ভর করে গ্রামের উন্নতির উপর, দেশসেবা মানেই যে লোকসেবা, এইসব কথা বারবার নানা প্রবন্ধে ও বক্তৃতায় তিনি দেশবাসীকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন, গ্রামের দুরবস্থা জানিয়ে তার প্রতিকারের

ব্যবস্থা সম্বন্ধে সচেষ্ট হবার জন্য বারবার তাদের মনকে নাড়া দেবার প্রভূত প্রয়াস করেছেন।

... গ্রামের অবস্থা সম্বন্ধে তিনি নিজে জেনে এবং সকলকে কেবল জানিয়েই ক্ষান্ত ছিলেন না। জমিদারি পরিচালনার ভার নিয়ে অবধি তাঁর ক্ষমতার মধ্যে তিনি নিজে কি করতে পারেন সে বিষয় অহরহ চিন্তা করেছেন, এক-একটি সমস্যা নিয়ে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করেছেন। আমার পিতা গ্রামের উন্নতির জন্য কতখানি ভাবছেন, কৃষকদের আর্থিক দুর্গতি ও মানসিক জড়তা দূরীকরণের জন্য কি কি উপায় স্থির করেছেন আমি প্রথম জানলুম ১৯১০ সালে। আমি তখন আমেরিকা থেকে ইউরোপে ঘুরে সবে দেশে ফিরেছি। বাড়ি পৌঁছাবার কয়েকদিন পরেই তিনি আমাকে শিলাইদহে নিয়ে গেলেন। আমাকে আমেরিকায় পাঠিয়েছিলেন কৃষিবিজ্ঞান শেখবার জন্য ১৯০৬ সালে স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে। সেই আন্দোলনে তিনি কি উৎসাহে নিজেকে ঢেলে দিয়েছিলেন তা সর্বজনবিদিত। তিনি আশা করেছিলেন বাঙালির মনে যে স্বদেশপ্রেম জেগেছে সেটা দেশসেবার কার্যক্ষেত্রে প্রসারিত হবে। 'স্বদেশীসমাজ' 'সভাপতির অভিভাষণ–পাবনা সম্মিলনী' প্রভৃতি নানা বক্তৃতায় তিনি সর্বসাধারণকে, বিশেষত কংগ্রেসের নেতাদের, দেশসেবার কাজে প্রবৃত্ত করার জন্য অনুনয় করেন। তিনি বলেন— "দেশে আমাদের যে বৃহৎ কর্মস্থানকে প্রস্তুত করিয়া তুলিতে হইবে, কেমন করিয়া তাহা আরম্ভ করিব? উচ্চ চূড়াকে আকাশে তুলিতে গেলে তাহার ভিত্তিকে প্রশস্ত করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। আমাদের কর্মশক্তির চূড়াকে ভারতবর্ষের কেন্দ্রস্থলে যদি অভ্রভেদী করিতে চাই তবে প্রত্যেক জেলা হইতে তাহার ভিত গাঁথার কাজ আরম্ভ করিতে হইবে।" অন্যত্র লিখেছেন— 'মাতৃভূমির যথার্থ স্বরূপ গ্রামের মধ্যেই; এইখানেই প্রাণের নিকেতন ; লক্ষ্মী এইখানেই তাঁহার আসন সন্ধান করেন।'

ভিত গাঁথার কাজ তাঁর সাধ্যমত তিনি সূত্রপাত করেছিলেন নিজেদের জমিদারির অন্তর্গত গ্রামগুলির মধ্যে। যখন দেখলেন দেশবাসী তাঁর কথা গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়, বরং তিনি দেশসেবার যে কর্মপদ্ধতি তাদের সামনে ধরেছিলেন তার বিরুদ্ধে সমালোচনাই হতে থাকল, নেতারা কেবল রাজনৈতিক উত্তেজনাতেই মেতে রইলেন, তখন তিনি সংকল্প করলেন গ্রামোন্নতির কাজ যতটা পারেন তাঁর আদর্শমতো তিনি নিজেই জমিদারির মধ্যে প্রচলন করবেন।

কৃষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করতে গেলে কৃষির উন্নতি করা বিশেষ দরকার। পাশ্চাত্য দেশে বিজ্ঞানের সাহায্যে কৃষির উন্নতি হয়েছে। কৃষিবিজ্ঞান আমাদের দেশেও প্রবর্তন করতে হবে। এই উদ্দেশ্যেই সন্তোষচন্দ্র মজুমদার ও আমাকে ১৯০৬ সালে আমেরিকায় কৃষিবিজ্ঞান শেখবার জন্যে পাঠালেন। তার এক বছর পরে আমার ভগিনীপতি নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কেও সেখানে পাঠালেন। শিক্ষা

সমাপ্ত করে আমরা তিনজনে গ্রামোন্নয়নের কাজে তাঁকে সাহায্য করতে পারব তাঁর আশা ছিল। আমি সব আগে ফিরে এলুম। আসবামাত্রই তিনি আমাকে শিলাইদহে নিয়ে গেলেন কাজে নিযুক্ত করার জন্য। শিলাইদহে কিছুদিন থেকে সেখানকার কাজকর্ম বোঝানো হয়ে গেলে বোটে করে তাঁর সঙ্গে নিয়ে গেলেন পতিসরে। যাবার পথে রোজ সন্ধ্যেবেলায় বোটের ডেকের উপর বসে নানা বিষয়ে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা হতো ... বাংলার গ্রামে-গ্রামে লোকদের সামাজিক, নৈতিক ও আর্থিক কি শোচনীয় অবস্থা তিনি দেখেছেন, তাদের জীবন-যাপন কত রকমের সমস্যা লক্ষ করেছেন, এইসব সমস্যার প্রতিকারের তিনি কি চেষ্টা করেছেন ও ভবিষ্যতে আরও কি করতে ইচ্ছা করেন। ...

বাবা বললেন, তিনি যখন জমিদারির কাজ দেখতে আরম্ভ করেন প্রথমেই প্রজাদের মধ্যে সালিশী বিচারের প্রবর্তন করেন। বিরাহিমপুর ও কালিগ্রাম এই দুই পরগনায় কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি করে বিচারসভা স্থাপন করেন। প্রজাদের পরস্পরের মধ্যে কোনো বিবাদ ঘটলেই উভয়পক্ষকে এই বিচারসভায় উপস্থিত হতে হবে এই নিয়ম হল। প্রজারা ফৌজদারি ছাড়া অন্য কোনোরকম মামলা নিয়ে আদালতে যাবে না। কেউ এই নিয়ম অমান্য করলে গ্রামবাসীরা তাকে একঘরে করবে, তার সঙ্গে কোনো সামাজিকতা রাখবে না। এই বিচারসভার বিচারে অসন্তুষ্ট হলে আপীলের সুযোগ দেবারও ব্যবস্থা করা হল। প্রজাদের সম্মতিক্রমে সমস্ত পরগনার জন্য পাঁচজন সভ্য নিয়ে একটি আপীল-সভা নির্বাচিত হল। এই পাঁচজনকে পঞ্চপ্রধান বলা হতো। পঞ্চপ্রধানের বিচারে সন্তুষ্ট না হলে শেষ আপীল ছিল স্বয়ং জমিদারের কাছে। বিচারের জন্য বাদী বা বিবাদীর কোনো ব্যয় বহন করতে হতো না, কেবল দরখাস্ত করার কাগজ কেনার জন্য সামান্য মূল্য দিতে হতো। এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্যই ছিল প্রজারা নিজেদের মধ্যে বিবাদ মিটিয়ে ফেলবে– আদালতে যাবে না। বিচারের নথিপত্র রীতিমত রাখা হত, সেগুলি সযত্নে ফাইল করে রাখার সাহায্য করত জমিদারির সেরেস্তা। আদালতে সাহায্য, বিনা ব্যয়ে বিনা বিলম্বে মামলার বিচারের এই ব্যবস্থা আরম্ভ হবার শুরু থেকেই প্রজারা এর উপকারিতা অনুভব করেছিল। তাদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা ছিল বলেই দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে এই ব্যবস্থা এত অনায়াসে চলেছিল। ছোট-বড় কোনোরকম বিবাদ নিয়ে আদালতে নালিশ করতে যাওয়া তারা সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছিল। দেওয়ানি বিচারের ভার প্রজারা নিজেরাই নিয়েছে বলে গভর্নমেন্ট কখনো আপত্তি তোলে নি বরং উৎসাহ দিয়েছে। ... বোটে যেতে-যেতে বাবা আমাকে বোঝাতে লাগলেন– তিনি এতদিন পর্যন্ত নিজের চেষ্টায় যেটুকু সম্ভব তাই করেছেন, কিন্তু গ্রাম-সংস্কারের কাজ জমিদারির কর্মচারীদের দ্বারা হয় না। সেই জন্য তিনি ঠিক করেছেন শান্তিনিকেতন থেকে কয়েক জন শিক্ষককে শিলাইদহ ও পতিসরে

পাঠিয়ে দেবেন। তাদের উপরেই বিশেষভাবে এই কাজের ভার থাকবে।

শিলাইদহের চারপাশে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সদ্ভাব নেই। কুষ্টিয়া, কুমারখালি প্রভৃতি শহরের সান্নিধ্যে প্রজাদের প্রকৃতি বিকৃত হয়ে গেছে, তারা স্বাভাবিক সরল মনোভাব হারিয়েছে, নতুন কিছু প্রবর্তন করতে গেলেই সন্দেহ করে। কয়েক বছর চেষ্টা করেও সেখানে বিশেষ কিছু করতে পারা যায়নি। একমাত্র কুষ্টিয়াতে তাঁতের বয়নশিল্প-প্রতিষ্ঠানটি ভালো চলছিল।

এই কারণে কালিগ্রাম পরগনাতেই তিনি বেশি মনোযোগ দিয়েছেন। সেখানকার প্রজাদের মধ্যে একনিষ্ঠতা আছে। কাজের সুবিধার জন্য এই পরগনাকে তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। পরগনার সমস্ত প্রজারা মিলে একটি সমিতি নির্বাচন করেছে– তার নাম হয়েছে 'কালিগ্রাম হিতৈষী সভা'। তা ছাড়া প্রত্যেক বিভাগের প্রজারা একটি করে 'বিভাগীয় হিতৈষী সভা'ও নির্বাচন করেছে। শান্তিনিকেতন থেকে যে কর্মীরা আসবেন তাঁদের প্রত্যেকের কাজের কেন্দ্র হবে এক-একটি বিভাগে।

প্রজারা হিতৈষী সভার কাজ চালাবার জন্য স্বেচ্ছায় নিজেরা চাঁদা দিচ্ছে। চাঁদা আদায়ের জন্য তাদের কোনো পৃথক ব্যবস্থা করতে হয়নি, তার জন্য ব্যয়ও কিছু হয় না। খাজনা আদায়ের সময় তারা খাজনার প্রতি টাকার সঙ্গে তিন পয়সা অতিরিক্ত দেয়। অতিরিক্ত এই আয় হিতৈষী সভার নামে পৃথক তহবিলে রাখা হয়। হিতৈষী সভার সমস্ত কিছু কাজ বিভাগ থেকে করা হয় বলে আদায়ী টাকা তিন অংশে ভাগ করে তিনটি বিভাগীয় হিতৈষী সভার হাতে দেওয়া হয়। সভার পক্ষ থেকে সেখানে বেতনভোগী একজন করে কর্মচারী রাখা হয়েছে। কালিগ্রামে গ্রামসংস্কার-প্রতিষ্ঠানের গঠন এইভাবে করা হয়– প্রত্যেক গ্রামের বাসিন্দারা সেই গ্রামেরই একজন প্রবীণকে প্রধান বলে নির্বাচিত করে। প্রতি বিভাগে যতগুলি প্রধান নির্বাচিত হয় তাদের সকলকে নিয়েই বিভাগীয় হিতৈষী সভা গঠিত। তিন বিভাগের প্রধানরা মিলে পাঁচজনকে কেন্দ্রীয় হিতৈষী সভার সভ্য নির্বাচন করে। তাদের বলা হয় পরগনার পঞ্চপ্রধান। এই পাঁচজন ছাড়াও কেন্দ্রীয় সভায় জমিদারের একজন প্রতিনিধি থাকে। হিতৈষী সভার সভ্যের সংখ্যা পরে বাড়ানো হয়।

সাধারণত বছরে একবার কেন্দ্রীয় হিতৈষী সভার মিটিং হয়। এত কাজ থাকে যে সমস্ত দিন সভা করেও অনেক কাজ শেষ হয় না। প্রথমত গত বছরের হিসাব পরীক্ষা করা হয়, যে টাকা ব্যয় হয়েছে তাতে কি কাজ কতখানি হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা হয়। তারপর আগামী বছরের জন্য কাজের প্রোগ্রাম স্থির করা ও সেই অনুযায়ী খরচের বাজেট প্রস্তুত করা। বার্ষিক সভার এই দুটি হল প্রধান কাজ– আর একটি কাজ ছিল জমিদারি-পরিচালনায় কর্মচারীদের কোনো

ত্রুটি বা প্রজাদের প্রতি অত্যাচার ঘটলে জমিদার মহাশয়কে সে বিষয় জানানো।

টাকায় তিন পয়সা চাঁদা থেকে হিতৈষী সভার পাঁচ-ছ হাজার টাকা বার্ষিক আয় ছিল। প্রজাদের উৎসাহ দেবার জন্য বাবা বললেন, এস্টেট থেকে তিনি আরো দু হাজার টাকা দেবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। হিতৈষী সভার জন্য যে টাকা উঠত প্রজারা তাকে 'সাধারণ ফান্ড' বলত। আমার যতটা মনে পড়ে চাঁদার হার পরে বাড়ানো হয়েছিল ইস্কুল ডিস্‌পেনসারি প্রভৃতির সংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে। গ্রামের উন্নতির জন্য অনেক কিছু করা দরকার, হিতৈষী সভা আপাতত কেবল কয়েকটি বিষয়ে মনোযোগ দিতে পেরেছে, তারমধ্যে শিক্ষার ব্যবস্থা হল প্রধান। সারা পরগনার মধ্যে শিক্ষার কোনো ব্যবস্থায়ই পূর্বে ছিল না। অবস্থাপন্ন লোক তাদের ছেলেদের নাটোর, আত্রাই, বগুড়া প্রভৃতি শহরে পাঠাত ইস্কুলে পড়াবার জন্য। হিতৈষী সভা দু-এক বছরের মধ্যে কয়েকটি বিভিন্ন গ্রামে পাঠশালা, তিন বিভাগে তিনটি মধ্য-ইংরেজি ও পতিসরে একটি হাই-স্কুল স্থাপন করেছে। ইস্কুলবাড়ি ও ছাত্রাবাসের ঘর নির্মাণ করার মত টাকা সাধারণত ফান্ড থেকে দেওয়া সম্ভব নয় বলে বাবা এস্টেটের খরচে সেগুলি তৈরি করে দিয়েছেন।

শিক্ষার সঙ্গে চিকিৎসার ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন ছিল। ঐ অঞ্চলে কোথাও একটি পাস-করা ডাক্তার ছিল না। প্রথমে পতিসরে একটি ডাক্তারখানা খোলা হয়– তারপর ক্রমশ অন্য দুটি বিভাগেও ডাক্তারসহ ডিসপেনসারি স্থাপিত হল। কর্মচারীদের চিকিৎসার জন্য এস্টেট থেকেও যথেষ্ট সাহায্য দেওয়া হয়। পতিসরে চিকিৎসালয় বেশ ভালো হয়েছে এবং এখানে বহুসংখ্যক রোগী দৈনিক চিকিৎসার জন্য আসে। কালিগ্রাম পরগনা চলনবিলের সংলগ্ন। বর্ষাকালে শস্যক্ষেত সমস্তই জলমগ্ন হয়ে যায়, গ্রামগুলি উঁচু জমির উপর, দেখতে এক-একটি দ্বীপের মত। বাবা বললেন, তুই তো দেখেছিস রাস্তা কোথাও নেই– গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যেতে গেলে ধানক্ষেতের আল ধরে হেঁটে যাতায়াত করতে হয়, বর্ষার দিনে নৌকা বেয়ে ধানের উপর দিয়ে সর্বত্র যাওয়া-আসা চলে। সাধারণ ফান্ড থেকে বিশেষ প্রয়োজনীয় কয়েকটি রাস্তা তৈরি করা আরম্ভ হয়ে গেছে। পতিসর থেকে আত্রাই স্টেশন পর্যন্ত সাত মাইল সদর রাস্তা এস্টেট থেকে প্রস্তুত করার চেষ্টা হচ্ছে। এই রাস্তা প্রস্তুত করতে বহু টাকা খরচ– সাধারণফান্ড থেকে এই ব্যয় বহন করা সম্ভব নয়।

এই কয়েকটি প্রধান কাজ ছাড়াও, বুজে-যাওয়া মজা ডোবা ও পুকুর পুনরুদ্ধার করা, জঙ্গল পরিষ্কার করা, যেখানে পানীয় জলের অভাব সেখানে কূপ খনন করে দেওয়া প্রভৃতি সাধারণের উপকারার্থে নানান কাজে হিতৈষীসভা ক্রমশ হাত দিচ্ছে। পতিসরে একটি ধর্মগোলারও ব্যবস্থা হয়েছে। আমেরিকায় যে তিন-চার বছর কলেজে পড়েছিলাম

সেই সময়ে বাবা জমিদারিতে প্রজাদের মধ্যে যে এত রকমের কাজে হাত দিয়েছেন তা কিছুই জানতুম না। ... বাবার নির্দেশ অনুসারে আমি কৃষির উন্নতির নানাবিধ চেষ্টায় উঠেপড়ে লাগলুম। শিলাইদহ কুঠিবাড়ির সংলগ্ন কতক জমি খাস করে নিয়ে বৈজ্ঞানিক প্রথায় একটি আদর্শ কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করলুম। আমেরিকা থেকে চাষ-আবাদের কয়েকটি যন্ত্রপাতি আনিয়ে সেখানে তার পরীক্ষা চলতে লাগল। চাষিরা ধান ছাড়া অন্য ফসলের চাষ তেমন করে না দেখে ঐ অঞ্চলে rotation করে দু-একটা সড়হবু পৎড়ঢ়ং করা যায় কি না তার পরীক্ষা হতে থাকল। আমেরিকা থেকে ভালো ভুট্টার বীজ আনালুম। চাষিদের আলু ও টমেটোর চাষ শেখান হল। শিলাইদহের দোআঁশলা মাটিতে উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় কি কি খাদ্যসামগ্রীর অভাব তা জানবার জন্য ছোটোখাটো একটা রাসায়নিক ল্যাবরেটরি গড়ে তুললুম। চাষিদের মধ্যে ক্রমশ উৎসাহ দেখা গেল, আলু, আখ, টমেটো প্রভৃতির চাষ ক্রমশ বাড়তে লাগল। সারের অভাব কি করে ঘোচানো যায় ভাবছি এমন সময় আকস্মিকভাবে একটি উপায় আবিষ্কার করলুম। শিলাইদহের ধারে পদ্মানদী থেকে বিস্তর ইলিশ মাছ কলকাতায় রপ্তানি হয়। বেড়াজালে এক-সময় এত মাছ ওঠে যে অত মাছ শিকারীরা নিতে চায়না। একদিন দেখলুম ডিম বের করে নিয়ে নুন দিয়ে রাখছে আর মাছগুলি নদীর জলে ফেলে দিচ্ছে। নামমাত্র মূল্যে কয়েক নৌকা বোঝাই মাছ কিনে নিয়ে এসে চুন দিয়ে মাটির মধ্যে পুঁতে রাখলুম। একবছর পরে মাটি খুঁড়ে দেখি চমৎকার সার হয়েছে। তখন মাছের সার প্রচলনের চেষ্টা করলুম।

শিলাইদহ অঞ্চলে কৃষির উন্নতি করার যথেষ্ট সুযোগ পেলুম। কিন্তু পতিসরে সে সুযোগ নেই, দেশটা নিতান্তই একফসলে; বর্ষার কয়েক মাস জলমগ্ন থাকে আর জল নেমে গেলে মাটি শুকিয়ে এত কঠিন হয়ে যায় যে লাঙল চলে না। সেইজন্য রবিশস্য কিছুই হয় না ; এমন কি গাছপালাও জন্মায় না। বাবা কিন্তু এই অসুবিধা সত্ত্বেও কালিগ্রামে আবাদের কি উন্নতি হতে পারে তাই নিয়ে চিন্তা করতে ছাড়েনি।' ১৩১৫ সালে [১৭ শ্রাবণ তারিখে] তিনি কোনো কর্মীকে [শ্রীভূপেশচন্দ্র রায়কে] লিখছেন–

'প্রজাদের বাস্তবাড়ি, ক্ষেতের আইল প্রভৃতি স্থানে আনারস, কলা, খেজুর প্রভৃতি ফলের গাছ লাগাইবার জন্য তাহাদিগকে উৎসাহিত করিও। আনারসের পাতা হইতে খুব মজবুত সূতা বাহির হয়। ফলও বিক্রয়যোগ্য। শিমুল, আঙুর গাছ, বেড়া প্রভৃতির কাজে লাগাইয়া তাহার মূল হইতে কিরূপে খাদ্য বাহির করা যাইতে পারে তাহাও প্রজাদিগকে শিখানো আবশ্যক। আলুর চাষ প্রচলিত করিতে পারিলে বিশেষ লাভের হইবে। অবশ্য তাহাতে জলসেচন আবশ্যক করে। এইজন্য প্রত্যেকে যদি নিজের ভিটায় দুই এক কাঠাও বপন করে তবে তাহার জলসেচনে নিতান্ত অসাধ্য হয় না। কাছারিতে যে আমেরিকান ভুট্টার বীজ আছে তাহা পুনর্বার লাগাইবার চেষ্টা করিতে হইবে।'

অনেক চেষ্টার ফলেও কালিগ্রামে চাষবাসের বিশেষ উন্নতি করা সম্ভব হয়নি। ... কৌতূহল মেটাবার জন্য ট্র্যাক্টর নিয়ে আমি নেমে গেলুম ধানক্ষেতে। কয়েক জন চাষিকে জিজ্ঞাসা করলুম, আলের উপর দিয়ে লাঙল না চালিয়ে তো উপায় নেই– আল বাঁচিয়ে ছোট ছোট ক্ষেত মেশিন দিয়ে চাষ দেওয়া সম্ভবর নয়। তারা আমাকে আশ্বাস দিল, 'ভাবনা নেই ; আপনি আলের উপর দিয়ে চাষ দিয়ে যান, আমরা কোদাল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব, সঙ্গে-সঙ্গে আল আবার বানিয়ে নেব।' প্রথম দিনের পরীক্ষাতেই কৃষকেরা খুব খুশি। ট্র্যাক্টর পতিসরেই থাকবে স্থির হল। আমি জানলুম, চাষ করে দেবার জন্যে বিঘাপ্রতি এক টাকা মাত্র খরচা হিসেবে নিয়ে ভাড়া দেওয়া হবে। তারপর থেকে ট্র্যাক্টররের চাষ সর্বত্র চলতে লাগল, এবং সেটা ভাড়া নেবার জন্য চাষিদের মধ্যে রেষারেষি পড়ে গেল। পতিসর থেকে চলে আসার আগে প্রজাদের প্রতিশ্রুতি দিতে হল– আগামী বছরে আরও ট্র্যাক্টর আনিয়ে দেব। বছরের বেশ কয়েক মাস চাষিদের কোনো কাজ থাকে না। এই সময় হাতের কাজ করে তারা অনায়াসে কিছু রোজগার করতে পারে। বাবা আমাকে প্রায়ই স্মরণ করিয়ে দিতেন কয়েকটি কুটিরশিল্প শেখাবার ব্যবস্থা করতে। কালিগ্রামে ভালো তাঁতি ছিল না, মুসলমানদের মধ্যে কয়েকঘর জোলা ছিল তারা মোটা রকমের গামছা কেবল বুনত। তাদের একজনকে শান্তিনিকেতনে পাঠানো হল তাঁতে কাপড় বোনা শেখবার জন্য। নানান রকমের নকশা তুলে বিবিধ প্রকারের কাপড় বোনা শিখে এসে সে যখন পতিসরে ফিরে এল সাধারণ ফান্ডের খরচে তাকে শিক্ষক করে একটি বয়নশিক্ষার ইস্কুল খোলা হল। এই সময়ে (১৯১১-১২) বাবা আমাকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—

> 'বোলপুরে একটা ধানভানা কল চলচে— সেইরকম একটা কল এখানে [পতিসরে] আনাতে পারলে বিশেষ কাজে লাগবে। এ দেশ ধানেরই দেশ– বোলপুরের চেয়ে অনেক বেশি ধান এখানে জন্মায়। আমার ইচ্ছা ৫/১০ টাকা শেয়ার করে এখানকার অনেক চাষায় মিলে এই কলটা যদি চালায় তাহলেই ওদের মধ্যে মিলে কাজ করবার যথার্থ সূত্রপাত হতে পারে। আমাদের ব্যাঙ্ক থেকে ধার নিয়ে এই ধান ভানার ব্যবসাটা এখানে সহজেই চালানো যেতে পারে– নগেন্দ্র এবং জানকী দুজনেরই বিশ্বাস এই কাজটা এখানকার যোগ্য এবং এতে প্রজাদের উপকার হবে। এই কলের সন্ধান দেখিস।'

'তার পরে এখানকার চাষাদের কোন industry শেখানো যেতে পারে সেই কথা ভাবছিলুম। এখানে ধান ছাড়া আর কিছুই জন্মায় না– এদের থাকবার মধ্যে কেবল শক্ত এঁটেল মাটি আছে। আমি জানতে চাই Pottery জিনিষটাকে Cottage Industry রূপে গণ্য করা চলে কি না। একবার খবর নিয়ে দেখিস– অর্থাৎ ছোটোখাটো Furnace আনিয়ে এক গ্রামের লোক মিলে এ কাজ চালানো

সম্ভবপর কি না। মুসলমানরা যে রকম সান্‌কির জিনিষ ব্যবহার করে এরা যদি সেইরকম মোটা গোছের প্লেট, বাটি প্রভৃতি তৈরী করতে পারে তা হলে উপকার হয়। আর একটা জিনিষ আছে ছাতা তৈরী করতে শেখানো। সে রকম শেখাবার লোক যদি পাওয়া যায় তাহলে শিলাইদহ অঞ্চলে এই কাজটা চালানো যেতে পারে। নগেন্দ্র বলছিল খোলা তৈরি করতে পারে এমন কুমোর এখানে আনতে পারলে বিস্তর উপকার হয়। লোকে টিনের ছাদ দিতে চায়, পেরে ওঠে না– খোলা পেলে সুবিধা হয়। যাই হোক ধানভানা কল, Pottery-র চাক ও ছাতা তৈরির শিক্ষকের খবর নিস– ভুলিস নে।' বাবার আমলেই কালিগ্রাম পরগনায় কয়েকটি ইস্কুল স্থাপিত হয়েছিল। শিক্ষাবিস্তারের জন্য বাবাকে বিশেষ চেষ্টা করতে হয়নি। প্রজাদের মধ্যে লেখাপড়া শেখার আগ্রহ অত্যন্ত বেশি। তারা যে- শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়েছে তাদের ছেলেরা যাতে সেই শিক্ষা পাবার যথেষ্ট সুযোগ পায় তাদের একান্ত আকাঙ্ক্ষা। পাঠশালা ইস্কুল তাড়াতাড়ি খোলবার জন্য রেষারেষি পড়ে যেত। প্রজাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকলে সাধারণ ফান্ডের সমস্ত টাকাই বোধ হয় তারা শিক্ষাবিস্তারের জন্য খরচ করে ফেলত। বাবাকে এই বিষয়ে প্রজাদের উৎসাহ অনেক সময় সংযত করতে হতো। পাঠশালা ক্রমশ বাড়তে লাগল, কয়েক বছরের মধ্যে পরগনার প্রত্যেক গ্রামেই একটি করে পাঠশালা স্থাপিত হল। এইসঙ্গে প্রত্যেক বিভাগে একটি করে উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয় ও পতিসরে একটি হাইস্কুল খোলা হল। বর্ষাকালে চারদিক জলে ডুবে যায়, পতিসরে গেলে দেখতুম নৌকো বোঝাই করে ছাত্ররা আশেপাশের গ্রাম থেকে ইস্কুলে পড়তে আসছে। কলকাতার ইস্কুল-কলেজের যেমন নিজেদের বাস রাখতে হয়, কালিগ্রামের ইস্কুলগুলির তেমনি কয়েকখানা করে নৌকা থাকত।

গ্রামের অভাব দূর করার জন্য হিতৈষী সভা নানান দিকে চেষ্টা করেছে– শিক্ষাবিস্তার, তাঁতে কাপড় বোনা প্রভৃতি গ্রাম্য-শিল্প প্রচলন, চাষের উন্নতি, মাছের ব্যবসা, রাস্তাঘাট প্রস্তুত, সালিশের বিচার, জলকষ্ট নিবারণ, দুর্ভিক্ষের জন্য ধর্মগোলা স্থাপন ইত্যাদি– কিন্তু একটি অভাব দূর করতে পারে নি, দুর করার ক্ষমতা ছিল না বলে। জমিদারির সঙ্গে পরিচয় হবার পরই বাবা লক্ষ করেছিলেন প্রজাদের মধ্যে সকলেরই ঋণ আছে। গ্রামে অবস্থাপন্ন লোক খুব কম, অধিকাংশ গ্রামবাসী ঋণে ডুবে রয়েছে, দেনা থেকে সারা জীবনেও তারা মুক্তি পায় না। তখনকার দিনে এইটাই ছিল পল্লীসমাজের সবচেয়ে বড় সমস্যা। এই সমস্যা বাবাকে সর্বদাই পীড়া দিত, তাঁকে চিন্তিত করত, এর প্রতিবিধানের কোনো উপায় অনেকদিন পর্যন্ত তিনি খুঁজে পাননি। প্রজারা মহাজনকে টাকা শোধ দেবার চেষ্টা করত না তা নয়– কিন্তু সুদের হার এত বেশি আর সুদেও সুদ আদায় হতো বলে আসল কোনোদিন শোধ হতো না। এই অবস্থায় তাদের দুঃখনিবারণের একমাত্র উপায় যুক্তিসংগত কম সুদে প্রয়োজনমত কর্জ

দেবার ব্যবস্থা। কিন্তু সে ব্যবস্থা করতে অনেক টাকা লাগে, বাবার পক্ষে সেটা সম্ভব ছিল না।

সে সময়ে শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের জন্য তাঁকে যথেষ্ট দেনা করতে হয়েছে, তবু প্রজাদের দুঃখ নিবারণের জন্য কিছু চেষ্টা না করে তিনি থাকতে পারলেন না। বন্ধু-বান্ধব ও দুএকজন ধনী মহাজনের কাছ থেকে কয়েক হাজার টাকা ধার নিয়ে পতিসরে একটি ব্যাঙ্ক খুলে বসলেন। এই ব্যাঙ্ক যে মূলধন নিয়ে কাজ আরম্ভ করল সবই ধার-করা টাকা– ধার করতে বাবাকে শতকরা ৮/= সুদ দিতে হচ্ছিল। বাবা নিয়ম করলেন প্রজাদের কাছ থেকে ১২/= টাকা সুদ নেওয়া হবে। ব্যাঙ্ক চালাবার খরচা দিয়ে ও অনাদায়ী টাকার হিসাব করলে ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্কেও কোন লাভই থাকে না। তবু ব্যাঙ্কে কাজ এইভাবে চলতে থাকল। মূলধন সামান্য, তাতে প্রজাদের চাহিদা সংকুলান করা সম্ভব হল না। এর জন্য বাবা যখন খুবই চিন্তিত তখন আকস্মিকভাবে একটি সুযোগ উপস্থিত হল। নোবেল প্রাইজের ১, ০৮, ০০০ টাকা তাঁর হাতে এসে পড়ল। টাকাটা শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়কে দেবার তাঁর নিতান্ত ইচ্ছা, অথচ প্রজাদের হিতার্থে লাগাতে পারলেও তিনি খুশি হন। এই দোটানার মধ্যে তিনি স্থির করতে পারছিলেন না কি করবেন। সুরেনদাদা [সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর] ও আমি তাঁর কাছে তখন প্রস্তাব করি যে প্রাইজের টাকাটা পতিসরে কৃষি-ব্যাঙ্কে ডিপজিট রাখা হোক শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের নামে। এতে দুদিকেরই উপকার হবে। তাই করা হল। যতদিন কৃষিব্যাঙ্ক ছিল বহু বছর ধরে বিদ্যালয়ের ও পরে বিশ্বভারতীর বছরে আট হাজার টাকা করে একটি স্থায়ী আয় ছিল। ব্যাঙ্কেরও সুবিধা হল এই মূলধন পেয়ে। কৃষি-ব্যাঙ্ক থেকে কর্জ নেবার চাহিদা খুব বৃদ্ধি পেয়েছে। কালিগ্রাম পরগনার মধ্যে বাইরের মহাজনরা তাদের কারবার গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে। এমন কি কয়েক জন কৃষি-ব্যাঙ্কে ডিপজিট রাখতে আরম্ভ করেছিল। ব্যাঙ্ক খোলার পর বহু গরিব প্রজা প্রথম সুযোগ পেল ঋণমুক্ত হবার। কৃষি-ব্যাঙ্কের কাজ কিন্তু বন্ধ হয়ে গেল যখন Rural Indebtendness-এর আইন প্রবর্তন হল। প্রজাদের ধার দেওয়া টাকা আদায় হবার উপায় রইল না– নোবেল প্রাইজের আসল টাকা সেইজন্য কৃষি-ব্যাঙ্ক বিশ্বভারতীকে শেষ পর্যন্ত ফেরত দিতে পারেনি। ... সেবার পতিসরে পৌঁছে গ্রামবাসীদের অবস্থার উন্নতি দেখে মন পুলকিত হয়ে উঠল। পতিসরের হাইস্কুলে ছাত্র আর ধরছে না দেখলুম– নৌকার পর নৌকা নাবিয়ে দিয়ে যাচ্ছে ছেলের দল ইস্কুলের ঘাটে। এমন-কি আট-দশ মাইল দূরের গ্রাম থেকেও ছাত্র আসছে। পড়াশুনার ব্যবস্থা প্রথম শ্রেণীর কোনো ইস্কুলের চেয়ে নিকৃষ্ট নয়। পাঠশালা, মাইনর স্কুল সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে। তিনটি হাসপাতাল ও ডিসপেনসারির কাজ ভালো চলছে। মামলা-মোকদ্দমা খুবই কম, যে অল্পস্বল্প বিবাদ উপস্থিত হয় তখনই প্রধানরা মিটিয়ে দেন। যে সব জোলারা আগে কেবল গামছা বুনত তারা এখন ধুতি, শাড়ি, বিছানার

চাদর বুনে আমাকে দেখাতে আনল। ঐ অঞ্চলে যত রকম মাছ ধরার জাল বা খাঁচা ব্যবহার করা হয় একটি জেলে তার এক সেট মডেল আমাকে উপহার দিল। কুমোরেরাও নানারকমের মাটির বাসন এনে দেখাল। গভর্নমেন্টের নতুন আইনের সাহায্যে ঋণমুক্ত হয়ে গ্রামের লোকদের চিরন্তন আর্থিক দুরবস্থা আর নেই। আমাকে চাষিরা কেবল অনুযোগ জানাল, 'বাবুমশায়, আমাদের আরও ট্র্যাক্টর এনে দিলেন না?' ১৩১৫ সালে বাবা যে লিখেছিলেন তাঁর এক চিঠিতে—

> 'যাতে গ্রামের লোকে নিজেদের হিতসাধনে সচেষ্ট হয়ে ওঠে– পথ-ঘাট সংস্কার করে, জলকষ্ট দুর করে, সালিশের বিচারে বিবাদ নিষ্পত্তি করে, বিদ্যালয় স্থাপন করে, জঙ্গল পরিষ্কার করে, দুর্ভিক্ষের জন্য ধর্মগোলা বসায় ইত্যাদি সর্বপ্রকারে গ্রাম্য-সমাজের হিতে নিজের চেষ্টা নিয়োগ করতে উৎসাহিত হয়– তারই ব্যবস্থা করা গিয়েছে।' তাঁর দীর্ঘকালের সেই চেষ্টা যে এমন সুফল দিয়েছে তা দেখে আনন্দে আমার মন ভরে গেল।"

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ যে পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচি তা একান্ত করে অভিনব ছিল। কারণ, তাঁর পূর্বে তৎকালীন বঙ্গীয় রাষ্ট্র নেতাদের চিন্তায় গ্রাম-সংগঠন বা গ্রাম-উন্নয়নের জন্য কোনো ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম বাংলাদেশের মানুষকে পল্লীমুখী করতে চেয়েছিলেন। শিলাইদহে তার প্রথম-পর্ব শুরু হয়েছিল ১৮৯১ সালে এবং পতিসর থেকে হয়েছিল ২য় পর্ব ১৯১৪ সালে। রবীন্দ্রনাথ কবিতা ও গানে যে দেশের মানুষের কথা বললেন, তাদের জন্যে পল্লীউন্নয়নের কাজ শুরু করলেন শিলাইদহে কয়েক জন কর্মীকে নিয়ে। এখানেই তিনি পুরাতন জমিদারি-প্রথার সংস্কার সাধন করে পঞ্চায়েতী-প্রথার বাহন হিসেবে মণ্ডলী-প্রথার প্রবর্তন করেন। গ্রাম পর্যায়ে সুশাসন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের মণ্ডলী-প্রথাকে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ শুধু নয়, একে উন্নয়নের ভিত্তি বলে অভিহিত করাই বোধ করি সমীচীন। পল্লীউন্নয়নে সমবায়-প্রথার বাস্তবায়ন সম্ভবপর হয়েছিল মণ্ডলী-প্রথার জন্য। ১৯০৮ সালে (বাংলা-১৩১৫) একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ সে সময়কার মণ্ডলী-প্রথার মাধ্যমে গ্রামগুলোতে উন্নয়ন-ধারা বাস্তবায়নের নির্দেশ দেন। এ কাজে গ্রামের জঙ্গল, পুকুর ও নর্দমা সংস্কার, রাস্তাঘাট মেরামত ইত্যাদির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ এই মণ্ডলী-প্রথার মাধ্যমে প্রজা এবং জমিদারের মধ্যে এক মেলবন্ধন রচনা করতে পেরেছিলেন। এই মণ্ডলী-প্রথার সাহায্যে গড়াই নদীর তীরে জানিপুরে গো-হাটা, পান্টিতে সুতা-হাটা এবং বিভিন্ন গ্রামে তাঁত-শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই পল্লী-সংগঠনের মাধ্যমে স্বাস্থ্য-পরিচর্যা বিষয়েও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ গ্রামের মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষায় মহর্ষি দাতব্য-চিকিৎসালয় নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন এ কথা ইতোপূর্বে বলেছি। তাঁর সমবায়-নীতি অনুসরণ করে জনৈক ডাক্তার

গোপাল দেব পল্লীঅঞ্চলে ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। শিলাইদহে অবশ্য এই কাজটি তেমন সফল হয়নি। কিন্তু পতিসরে রবীন্দ্রনাথ এ কাজে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছিলেন। শিলাইদহ ও পতিসরের অভিজ্ঞতা নিয়েই শ্রীনিকেতনকে তিনি গড়ে তুলেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ থাকাকালীন সময়ে সাজাদপুর ও পতিসরে গ্রামোন্নয়নের কাজ করেছিলেন। সাজাদপুর হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় সেখানে রবীন্দ্রনাথ পল্লীউন্নয়ন সর্ম্পকে তেমন কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেননি।

তথ্যসূত্র

১. অমিতাভ চৌধুরী, জমিদার রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা ১৯৭৬, পৃ.৭।
২. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মজীবনী, সম্পাদনা– শতিশচন্দ্র চক্রবর্তী, পরিবর্ধিত সংস্করণ, কলিকাতা ১৯৬২, পৃ.৮৫-৮৬।
৩. শচীন্দ্রনাথ অধিকারী, শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ, কলিকাতা ১৯৭৪, পৃ.৪৯।
৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনস্মৃতি, ছেলেবেলা, পৃ.৬১-৬৭। দ্র. শচীন্দ্রনাথ অধিকারী প্রাগুক্ত, পৃ.৬১।
৫. অমিআভ চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.২৮।
৬. শ্রী প্রভাতকুমার মুখোপাদ্ধায়, রবীন্দ্রজীবনী ১ম খণ্ড, পৃ.২৩২।
৭. প্রমথনাথ বিশী, শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ, কলিকাতা ১৯৭২, পৃ.৩৪।
৮. প্রমথনাথ বিশী, প্রাগুক্ত ৩২-৩৩।
৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ছিন্নপত্রাবলী, শিলাইদহ ১০ মে ১৮৯৩ পত্র ৯৫, কলিকাতা, পৃ.১৬৩-৬৪।
১০. ঐ, ছিন্নপত্রাবলী, শিলাইদহ ৪ জুলাই, ১৮৯৩, পত্র-১০৩।
১১. শচীন্দ্রনাথ অধিকারী, শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ, প্রাগুক্ত, পৃ.৬, ৭, ৩৭৯।
১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাশিয়ার চিঠি, পত্র-৪। দ্র. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পল্লী প্রকৃতি, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ১৩৯৩, পৃ. ২০১।
১৩. রবীন্দ্ররচনাবলী তৃতীয়খণ্ড, ১৩৪৭, পৃ.৬-৭।
১৪. ছিন্নপত্রাবলী, শিলাইদহ, পত্র-৩৯, বৃহস্পতিবার ১৪ জানুয়ারি ১৮৯২।
১৫. ছিন্নপত্রাবলী, শিলাইদহ, বৃহস্পতিবার, ৭ এপ্রিল ১৮৯২ পত্র-৪১।
১৬. ছিন্নপত্রাবলী, পত্র-৭৪, শিলাইদহ, ৯ ডিসেম্বর ১৮৯২।
১৭. ছিন্নপত্রাবলী, পত্র-১৭৪, কুষ্টিয়ার পথে, ২৪ আগস্ট ১৮৯৪।
১৮. ছিন্নপত্রাবলী, পত্র-১৭৯, শিলাইদহ ২৮ নভেম্বর ১৮৯৪।
১৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বরাজসাধনা, 'কালান্তর' আশ্বিন ১৩২২।
২০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সমাজভেদ, স্বদেশ, রচনাবলী ১১শ, পৃ.৪৮৫।
২১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'গোরা' রবীন্দ্ররচনাবলী ষষ্ঠখণ্ড, বিশ্বভারতী, কলিকাতা ১৯৬৪।
২২. অবলা বসুকে লেখা চিঠি, এপ্রিল, ১৯০৮, পল্লী প্রকৃতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯।
২৩. শচীন্দ্রনাথ অধিকারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮-৭৪।
২৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আশ্রমের রুপ ও বিকাশ, পৃ. ৪২।

২৫. রবীন্দ্ররচনাবলী ২৭ খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৯৭১, পৃ. ৫৫৫-৫৫৮।
২৬. শচীন্দ্রনাথ অধিকারী, শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮-৭৯।
২৭. শচীন্দ্রনাথ অধিকারী, শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯-৮১।
২৮. শচীন্দ্রনাথ অধিকারী, শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২০-৪২৩।
২৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পল্লী প্রকৃতি, পৃ. ২২৬।
৩০. পল্লীপ্রকৃতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১-২২৪।
৩১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সমবায়নীতি, ভারতবর্ষে সমবায়ের বিশিষ্টিতা, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, চৈত্র ১৩৯৫, পৃ. ২২।
৩২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সমবায়নীতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬।
৩৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সমবায়নীতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।
৩৪. ঐ, প্রাগুক্ত পৃ. ৩১।
৩৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২-১৪।
৩৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বদেশী সমাজ, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, পুনরমূদ্রণ ১৩৯৩ পৃ. ২২।
৩৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্যাধি ও প্রতিকার, প্রবাসী শ্রাবণ ১৩১৪।
৩৮. ঐ, চিঠিপত্র, শিলাইদহ, ৫ ফাল্গুন, ১৩১৪ দ্র. পল্লীপ্রকৃতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০-২৩১।
৩৯. ঐ, চিঠিপত্র, ২০ মাঘ ১৩১৩ (১৩১৬)। দ্র. পল্লী প্রকৃতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২-২৩৩।
৪০. ঐ, চিঠিপত্র, ৩০ শে ফাল্গুন, ১৩১৩(১৩১৬), দ্র. পল্লী প্রকৃতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪।
৪১. Sudhir Sen, Rabindranath Tagore on Rural Reconstruction, calcutta. P. 93
৪২. প্রমথ চৌধুরী, রায়তের কথা, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ১৩৫৪, পৃ. ২১।
৪৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চরকা, কালান্তর, প্রবাসী ১৩৩৫(১৯২৮)।
৪৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সমবায়নীতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫-১৬।
৪৫. পল্লী প্রকৃতি, শ্রীনিকেতনের ইতিহাস ও আদর্শ, প্রাগুক্ত, ১০২-১০৩।
৪৬. সুধীর করণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪।
৪৭. সুধীর করণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫।
৪৮. শচীন্দ্রনাথ অধিকারী, শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২-৩৩।
৪৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সমবায়নীতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪-১৫।
৫০. অমিতাভ চৌধুরী, জমিদার রবীন্দ্রনাথ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১।
৫১. পল্লী প্রকৃতি, ভূমিলক্ষী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯-৪০।
৫২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্রম্যসাহিত্য, রবীন্দ্ররচনাবলী ষষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৯-৬৪০।
৫৩. ঐ, প্রাগুক্ত পৃ. ৬৪১-৬৪২।
৫৪. রবীন্দ্র রচনাবলী ১২ খণ্ড, পৃ. ৭৮০।
৫৫. রবীন্দ্র রচনাবলী ১৩(পবস), সমস্যা, (কালান্তর), পৃ. ৩৯৫।
৫৬. গোরা, রবীন্দ্র রচনাবলী, ষষ্ঠ খনড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬-২৭৭।
৫৭. গোরা, রবীন্দ্র রচনাবলী, ষষ্ঠ খনড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪-২১৫।
৫৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৩।
৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪।
৬০. মুসলমানি'র গল্প, রবীন্দ্র রচনাবলী ৭ম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, পৃ. ৭৭৬-৭৭৭।

৬১. রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা ১০ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৯, পৃ. ১৭৩।
৬২. সভাপতির অভিভাষণ, পাবনা প্রাদেশিক সম্মেলনে পঠিত, ১৩১৪। দ্র. রবীন্দ্র রচনাবলী ১২খণ্ড, পৃ. ৮০৯-৮১০।
৬৩. Sykes, Rabindranath Tagore, P. 63. দ্র. শচীন্দ্রনাথ অধিকারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৩।
৬৪. স্মৃতি, ৩০শে আষাঢ়, পৃ.৭০-৭১।
৬৫. সুধীর চন্দ্র কর, জনগণের রবীন্দ্রনাথ (বঙ্গদর্শণ), ১৩৭০, পৃ.২২৪।
৬৬. সচীন্দ্রনাথ অধিকরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫২-৩৫৩।
৬৭. রাণীচন্দ্র, অবণীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঘরোয়া, পুনরমূদ্রণ ১৩৬৯, পৃ. ২৪-২৬।
৬৮. রবীন্দ্ররচনাবলী ১২ খণ্ড, পৃ. ১০৮-১০৯।
৬৯. প্রভাত কুমার মুখোপাদ্ধায়, রবীন্দ্রজীবনী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৫।
৭০. অমিতাভ চৌধুরী, 'দেশ' শারদীয় সংখ্যা ১৩৮২, পৃ. ৫০।
৭১. রবীন্দ্র রচনাবলী, সমস্যা, শতবার্ষিক সংস্করণ, ১২ খণ্ড, পৃ. ১০০১-১০০৩।
৭২. মৈত্রেয়ীদেবী, মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, পৃ. ২০৯।
৭৩. রবীন্দ্র রচনাবলী, শতবার্ষিক সংস্করণ (পবস) ১৪ খণ্ড পৃ. ৩৯০ সাহিত্য সম্মিলন, ১৩৩৩ বৈশাখ।
৭৪. Jadunath Sarkar, India Through the Ages, Fifth edition, 1960. P. 42
৭৫. রবীন্দ্র রচনাবলী, (পবস) ১৩ খনড, পৃ. ৩৬৭।
৭৬. Premchand Lal, Reconstruction and Education in Rural India. (With an in Iroduction by Rabindronath Tagor), London, 1932, P. 69-70
৭৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পিতৃস্মৃতি, পল্লী প্রকৃতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫-২৫০।

তৃতীয় অধ্যায়
সাজাদপুর পর্ব

ভূমিকা

বাংলাদেশে ঠাকুর-এস্টেটের জমিদারি তিনটি বিশেষ অঞ্চল নিয়ে গড়ে উঠেছিল। এদের নাম যথাক্রমে কুষ্টিয়া জেলার শিলাইদহ, পাবনা জেলার সাজাদপুর এবং রাজশাহীর পতিসর। ইউসুফশাহী পরগনার অন্তর্গত ডিহি সাজাদপুরের জমিদারি প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবদ্দশাতেই কেনা হয়েছিল। সাজাদপুর রাণী ভবাণীর জমিদারির অংশ ছিল এবং যখন তাঁর জমিদারির বিরাট অংশ নিলামে ওঠে, তখন মাত্র তেরো টাকা দশ আনায় দ্বারকানাথ ঠাকুর ডিহি সাজাদপুর নিলামে খরিদ করেন।[১]

উত্তরাধিকারদের জন্য সম্পদ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ট্রাস্টডিড তৈরি করেন এবং সে অনুসারে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেঝো ভাই গিরীন্দ্রনাথ (১৮২০-৫৪) ঠাকুর সাজাদপুরে জমিদারির মালিকানা লাভ করেন। পরে তাঁর পুত্র গুণেন্দ্রনাথ (১৮৪৭-১৮৬১) জমিদারির মালিক হন। তিনি তিন নাবালক পুত্র গগণেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ এবং অবনীন্দ্রনাথকে রেখে মৃত্যুবরণ করেন। সাজাদপুরের জমিদারি এই নাবালকদের অভিভাবক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ দেখা শুনা করেছেন।[২]

ফলে এখানে তিনি তাঁর পল্লীউন্নয়ন কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেন নি। রবীন্দ্রনাথ এখানে কেবল তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে জমিদারি দেখাশুনা করেছেন। বলা যেতে পারে, এখানে তিনি অধিকাংশ সময় কাব্যচর্চা এবং লেখা-লিখির মধ্যেই সময় অতিবাহিত করেছেন। প্রায় ৫ (পাঁচ) বৎসর রবীন্দ্রনাথ এই জমিদারি দেখাশুনা করেছিলেন। পরে গগণেন্দ্রনাথ ও অবননীন্দ্রনাথ সাবালকত্ব পেলে রবীন্দ্রনাথ তাদের হাতে জমিদারি হস্তান্তর করেন।

ভৌগোলিক বিবরণ

সাজাদপুর তদানীন্তন পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহাকুমা (পরে জেলা) অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র থানা সদর। সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া রেল স্টেশেনের কাছে পূর্ব

দক্ষিণের দিকে সাজাদপুর উপজেলা। উল্লাপাড়া রেলষ্টেশন থেকে দূরত্ব হবে প্রায় আট মাইল। ঢাকা থেকে সাজাদপুরে আসবার চমৎকার ব্যবস্থা রয়েছে সড়ক পথে। রবীন্দ্রনাথের সময় যোগাযোগ ব্যবস্থা এখনকার মতো ভাল ছিল না। তখন একমাত্র নদীপথেই সাজাদপুরের সংগে যোগাযোগ রক্ষা করা যেত।

রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ থেকে নদীপথে সাজাদপুরে আসা -যাওয়া করতেন। পদ্মানদী থেকে ইছামতি এবং আত্রাই নদী, এই পথেই রবীন্দ্রনাথ সাজাদপুর এবং পতিসরে ভ্রমণ করেছেন। সাজাদপুর যেতে চলনবিলের বড় জলাশয় পার হতে হতো।

রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ, সাজাদপুর এবং পতিসর ভ্রমণের জন্য যে নৌকা ব্যবহার করতেন তার নাম রাখা হয়েছিল 'পদ্মা' (বোট)। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের আমলে পদ্মাবোট বড় বজরা হিসেবে তৈরি হয়। এই পদ্মাবোটে রবীন্দ্রনাথ চলা-ফেরা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লালন ফকিরের একটি স্কেচ এঁকেছিলেন এই পদ্মাবোটে। সময় ছিল ১৮৮৯ সালের ৫ই মে।[৩]

পদ্মাবোটের সংগে থাকতো আরো দুটো তিনটে বোট। একটিতে রান্ন-বান্না, অপরটিতে চলতো আতিথিয়তা। যাঁরা রবীন্দ্রনাথের সাথে বেড়াতে যেতেন তাঁরা সেখানে থাকতেন। অন্যবোটে কর্মচারী- কর্মকর্তারা থাকতেন। সাজাদপুরের কিছু দূরে রাজশাহী জেলার পতিসর সদর কাছারি। আত্রাই নদীপথে সেখানে যাওয়া যেত। রবীন্দ্রনাথ কখনও কখনও শুকনো মওশুমে সাজাদপুর থেকে৪ মাইল দূরে রাওতারা নামক গ্রাম থেকে পাল্কীতে চড়ে সাজাদপুরে যেতেন।

সাজাদপুরে কুঠিবাড়ি

সাজাদপুরে কিরণবালা ইসকুল ঘেঁসে দ্বারিয়াপুর হাট এবং তার সামনে একটি বড় মাঠের পাশেই সাজাদপুরের কুঠিবাড়ি। শিলাইদহের মতো এটিও ছিল নীলকর সাহেবর কুঠি। তাঁরাই তৈরি করেছিলেন এই বাড়ি। লোকে এটিকে নীলকুঠি বলেই জানতো। কুঠিবাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে পশ্চিমে ছিল কাছারি, মালখানা এবং কর্মচারীদের বাসস্থান-প্রায় এগারো বিঘা সম্পত্তি। উত্তর দিকে কুঠিবাড়ি ঢোকার প্রধান প্রবেশ পথ। এখানে কুঠিবাড়ি সংলগ্ন বাগান। আমলকী ও ঝাউগাছ এখনও পূরণো স্মৃতি বহন করে আসছে। কুঠিবাড়ির পশ্চিমে দিকে বকুল গাছ ও আমগাছ। দক্ষিণ দিকেও একটা বাগান ছিল। রবীন্দ্রনাথের আগে থেকেই এ সব বাগানের অস্তিত্ব ছিল। রবীন্দ্রনাথের সময় এর অবয়ব আরও সুন্দর করা হয়েছিল। দক্ষিণের বাগানে নানা জাতের গাছের মধ্যে ছিল দারুচিনি গাছ এবং অন্যান্য ফুলের গাছের মধ্যে একটি ছিল কামিনী ফুল। 'ছিন্নপত্রাবলী'তে কামিনী ফুলের উল্লেখ আছে। এই দক্ষিণ পাশে ছিল একটি কৃত্রিম হ্রদ, তাতে বারোমাসই পদ্ম ফুটে থাকতো।

উত্তরে প্রধান গেট দিয়ে ঢুকলে ভিতরে বাগান ছাড়িয়ে নিচতলায় উত্তর দিকের বারান্দা, পশ্চিমে দিকে উপরে উঠবার সিড়ি। দোতালায় ৪টি বড় ঘর। সবচেয়ে বড় ঘরটি রবীন্দ্রনাথ বসবার ঘর হিসেবে ব্যবহার করতেন। বসবার পরের ঘরই ছিল রবীন্দ্রনাথের শোবার ঘর। রবীন্দ্রনাথ সাজাদপুরে একাই আসতেন। মৃণালিনী দেবী কখনও আসেন নি এখানে থাকার জন্য। শোবার ঘরের ডানদিকে ছিল কবির স্নানের ঘর। নিচতলার মতো উপরে দোতালায়ও বারান্দা আছে। শোনা যায় আগে রেলিং ছিল - এখন নেই।

কুঠিবাড়ির একতলায় ছিল পোস্ট-অফিস। নিচতলায় ছিল একটি লাইব্রেরী। সংগে লাগানো পূর্বদিকে বাবুর্চীদের রান্নাঘর। কুঠিবাড়িতে এখনও রবীন্দ্রনাথের 'পালকি' সংরক্ষিত আছে। বসবার ঘরে কয়েকটি সোফা এবং শ্বেত পাথরের টেবিল। এখানে এখনও একটি হারমোনিয়াম আছে।[৪] এই হারমোনিয়াম কবি ব্যবহার করেছেন। এখনও দেয়ালে বেশ কিছু ছবি রয়েছে রবীন্দ্রনাথ এবং ঠাকুর পরিবারের। শোবার ঘরে আছে দুখানা পালঙ্ক। এক কোণে দুটো টেবিল, আয়না, কাপড় রাখবার দুটো আলনা, গুটিকতক চেয়ার এবং ইজি-চেয়ার। এসব কবি ব্যবহার করেছেন বলে শোনা যায়।[৫]

সাজাদপুরের নাম

সাজাদপুর নাম নিয়ে বিতর্ক আছে। তবে অধিকাংশের মতে ইয়ামেনের একজন শাহজাদা তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে এখানে এসেছিলেন ধর্মপ্রচারের জন্য। কারো কারো মতে তাঁর নাম ছিল শাহজাদা মখদুমশাহ দৌলা। এখানে তাঁর ও তাঁর সঙ্গীদের মাজার আছে। শাহজাদা মখদুম শাহের সংগে এতদঞ্চলের হিন্দু রাজাদের যুদ্ধ বাঁধে এবং হিন্দু রাজারা পরাজিত হন। শাহজাদা মখদুম শাহের নাম থেকে সাহাজাদপুর। রবীন্দ্রসাহিত্যে এবং জমিদারি এস্টেটে সাজাদপুর নাম বিখ্যাত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনাবলীতে শাহজাদপুরের পরিবর্তে সাজাদপুর লেখায় এই গ্রন্থে সেটিই অনুসরণ করা হয়েছে। অবশ্য কোন কোন লেখায় বিশেষ করে চিঠিপত্রে রবীন্দ্রনাথ 'শাহজাদপুর' লিখেছেন।"[৬]

সাজাদপুর নিবাসী শ্রী হরিদাস বসাককে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

> তোমার লেখা চিঠিটা বড় ভাল লাগলো। মানুষের এক জীবনে জন্মজন্মান্তর ঘটে। শাহজাদপুরের সীমানার মধ্যে যে দিনগুলি গাথা পড়েছিল তার রূপ, তার রস, তার হাওয়া, তার আলো আর এক জন্মের। এখনকার থেকে কেবল আমিই যে স্বতন্ত্র ছিলুম তা নয়— তখনকার মানুষ ছিল - অন্য জগতের। সেই আমার দূরবর্তী জন্মের শাহজাদপুর অনেকবার আমার মনকে টানে কিন্তু সে কি এখনও কোথায় আছে ? সে যে ছিল আমার মনকে জড়িয়ে নিয়ে, সে মন কোথায় হারিয়ে গেছে। না হারালে চলতো না। এখন জন্মান্তরের পালা।"[৭]

সাজাদপুর জমিদারি

সাজাদপুরে ঠাকুর এস্টেটের যে জমিদারি ছিল তা প্রথমাবস্থায় ছিল এজমালি। দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-এস্টেটের দায়িত্ব নেবার পর তাঁর আমলে জমিদারি স্থিতি লাভ করে। এ সময়ে তিনি তার মধ্যমভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথকে সাজাদপুরের জমিদারি ভাগে প্রদান করেন। গিরীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁর দুই পুত্র গণেন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথও অকালে মারা যান। গণেন্দ্রনাথ নিঃসন্তান ছিলেন। ফলে গুণেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁর তিনপুত্র গগণেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ এবং অবনীন্দ্রনাথ সাজাদপুর জমিদারির এজমালি মালিকানা লাভ করেন। গুণেন্দ্রনাথ বেঁচে থাকাকালীন সময়ে রবীন্দ্রনাথ সাজাদপুর জমিদারি পরিচালনা করে তার হিসাবপত্র ইত্যাদি প্রকৃত মালিকদের বুঝিয়ে দিতেন। গগণেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ এবং অবনীন্দ্রনাথ সাবালক ও বুদ্ধিপ্রাপ্ত হলে রবীন্দ্রনাথ জমিদারি দায়িত্ব তাদের হাতে ছেড়ে দেন।

জমিদারি এজমালি থাকাকালীন সময়ে রবীন্দ্রনাথ সাজাদপুরে এসেছেন এবং জমিদারি পরিচালনা করেছেন। তবে এখানে তিনি কোন পল্লীউন্নয়নের কর্মসূচী গ্রহণ করেন নি, কারণ এখানে তাঁর অবস্থান দীর্ঘস্থায়ী ছিল না। তথাপি তিনি তাঁর দায়িত্ব পালনের সময় এখানে এসে থেকেছেন এবং সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। তাঁর সময়ে তিনি একজন জনদরদী জমিদার হিসেবে এতদঞ্চলে পরিচিত ছিলেন। সাজাদপুর জমিদারিতে রবীন্দ্রনাথের অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাঁর সাহিত্যকর্মের জন্য। শিলাইদহ এবং পতিসর এই দুই অঞ্চলের জমিদারির সংগে সাজাদপুর প্রেরণাদায়িনী শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। এখান থেকেই তিনি গ্রামবাংলার মানুষকে খুব কাছাকাছি পেয়েছিলেন। তাদের জীবনালেখ্য নিয়ে তিনি যে ছোটগল্প, কবিতা, গান লিখেছিলেন তা শিলাইদহে এবং পতিসরে পল্লীউন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পেরেছিলেন। শিলাইদহ এবং সাজাদপুরের দায়িত্ব হস্তান্তর করবার পর তিনি পতিসরে এবং পরবর্তীতে শ্রীনিকেতনে অত্যন্ত নিবিষ্ট চিত্তে কাজ করতে পেরেছিলেন।

সাজাদপুরে রবীন্দ্রনাথ প্রজাদের যে কাছের মানুষ ছিলেন এখানে তার একটি নমুনা তুলে ধরা যেতে পারে। সাজাদপুর জমিদারিতে লালচাঁদ নামে রবীন্দ্রনাথের এক প্রজা ছিল। সে আচার- আচরণে দুর্দান্ত প্রকৃতির হলেও রবীন্দ্রনাথের খুব অনুগত ছিল। সে জমিদার হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া সরকার বা অন্য কোন জমিদারকে আমলেই আনতো না। একবার একটি সরকারি নদীর চর দখল করে নেওয়ায় তার বিরুদ্ধে সরকারি তদন্ত হয়। তদন্তে ম্যাজিস্ট্রেট ও রবীন্দ্রনাথ কিভাবে যাবেন সে ব্যবস্থা করার জন্য লালচাঁদকে বলা হলে লালচাঁদ দুটো পালকির পরিবর্তে একটি পালকি আনলো জমিদার রবীন্দ্রনাথের জন্য এবং একটি বেতো ঘোড়া নিয়ে এল ম্যাজিস্ট্রেটের জন্য। লালচাঁদের চোখে জমিদার রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অনন্য।

সাজাদপুরেও রবীন্দ্রনাথ প্রজাদের নিকট অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'পুণ্যাহ' উৎসবের একটি বর্ণনা দিতে গিয়ে একজন প্রজা সম্বন্ধে বলেন:

> "তাঁর নাম রূপচাঁদ মেধা — সে একটি ডাকাত বিশেষ— লম্বা, জোয়ান, সত্যবাদী, অত্যাচারী, রাজভক্ত প্রজা। আমাকে যেন সে, পরমাত্মীয়ের মতো ভালবাসে — সে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে বললে, তোমার চাঁদমুখ দেখতে এসেছি। চাঁদমুখ এ কথায় বোধকরি কিঞ্চিত রক্তিমবর্ণ হবার উপক্রম করলে। রূপচাঁদ বললে, 'কতদিন পরে দেখা — এক বৎসর তোমায় দেখিনি।' মেয়েদের ভালবাসা অবশ্য খুব মধুর লাগতে পারে, কিন্তু এই রকম সরল সবল পুরুষমানুষের অকৃত্রিম অটল নিষ্ঠা এরও একটি অপূর্ব সৌন্দর্য্য আছে।"[৮]

শিলাইদহের মতো রবীন্দ্রনাথ এখানেও প্রজাদের নালিশকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। অনেক কর্মকর্তা এবং কর্মচারীর বিরুদ্ধে তিনি প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিয়েছেন। কাউকে ছাঁটায় করে দিয়েছেন। তাঁর কাছে প্রজাসাধারণই ছিল বড়। সাজাদপুরে সে সময় অনেক গরিব জেলে- নিকেরী বাস করতো। তাদের অভাবের কারণে তিনি একটি বিল বিনা খাজনায় বন্দোবস্ত করে দেন।

আর একটি ঘটনা হয়েছিল একজন গরিব বেহালা বাদককে নিয়ে। বেচারা বেহালা বাজিয়ে সংসার নির্বাহ করত। যেটুকু জমি ছিল তাও নিলামে উঠেছিল খাজনার দায়ে। বেনীর অবস্থা সঙ্গিন। অনাহারে-উপবাসে দিন কাটছে। তখন সাজাদপুরের বেণীর প্রতিবেশী নফর নামে এক ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের পরিচিত ছিল। সে কলকাতা গিয়ে বেণীর দুঃখের কথা বলতেই রবীন্দ্রনাথ বেণীর খাজনা মাফ করে দিলেন। পরবর্তীতে বেণী তার সহায় সম্পত্তি ফিরে পেল। সাজাদপুরে রবীন্দ্রনাথ এই বেহালা বাদক বেণীকে পুরস্কৃত করেছিলেন।[৯]

সাজাদাপুরে রবীন্দ্রনাথ পল্লীউন্নয়নের ক্ষেত্রে কোন ভূমিকায় রাখেন নি—একথা বললে সত্যের অপলাপ হবে। সাজাদপুরে তিনি বেশ কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে তোলেন। এখানে ঠাকুর এস্টেটের অর্থানুকূল্যে রবীন্দ্রনাথের সাজাদপুর আসার পূর্বেই একটি মিড্‌ল ইংলিশ ইস্কুল গড়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ জমিদারির দায়িত্ব নেবার পর এই ইস্কুলের উন্নয়নের জন্য তিনি সর্বতোভাবে ব্যবস্থা করেন। রবীন্দ্রনাথ এখানে অনেক গরিব মেধাবী ছেলের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করে দেন।

রবীন্দ্রনাথ গ্রামোন্নয়নের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যচিকিৎসাকে একটি জরুরি বিষয় বলে ভেবেছিলেন। সাজাদপুর থাকাকালে তিনি কুঠিবাড়িতে এবং অনত্রে প্রজাদের স্বাস্থ্য-চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। রবীন্দ্রনাথ যে যথার্থ প্রজাহিতৈষী ছিলেন নিম্নের এই ঘটনা থেকে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

শ্রাবণ মাসে রবীন্দ্রনাথ সাজাদপুরে অবস্থান করছেন। হঠাৎ- এক রাত্রে

একটি মেয়ের বেদনার্ত কান্নায় তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। তিনি খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন সাজাদপুর খালের ধারে নিকেরীদের আস্তানায় একটি মেয়ে প্রসব যন্ত্রণায় কাঁদছে। কবি ছুটে গেলেন সেখানে। তারপর চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রুষার ব্যবস্থা করে দিলেন এবং প্রসবান্তে তিনি মেয়েটিকে মা হবার জন্য পুরস্কৃত করেন।[১০] এমনিভাবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রজাদের খুব কাছাকাছি এসেছিলেন। এখানে তাঁর সাময়িক অবস্থানের সময় তিনি স্থানীয় ছেলেদের খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং মেলার ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর অর্থানুকূল্যে সাজাদপুরে বাণী সম্মিলনী, বেনুবীণা সংসদ, সুনীতি সঞ্চারিণী নামে নানা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজেও অনেক সময় তাদের সে সব অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশ নিয়েছেন।

সাজাদপুর যে জন্য খ্যাত-তা রবীন্দ্রনাথের নানা ছোটগল্প এবং সাহিত্যকর্মের জন্য। এ সব গল্পের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ গ্রামকে আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। গ্রামের সাধারণ মানুষের নিত্যদিনের সুখ-দুঃখের ছবি তাঁর রচনায় অনেকেটাই যেন সত্য হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। নগরজীবন অপেক্ষা গ্রাম্যজীবনের সারল্য রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। এই পটভূমিকাতেই 'পোস্টমাস্টার', 'ছুটি' প্রভৃতি গল্প লেখা হয়েছিল। অভাব প্রায়ক্ষেত্রেই প্রেমকে কেড়ে নেয়। গ্রামের অশিক্ষিত, দরিদ্র মানুষের জীবনেও যে প্রেম আসতে পারে, 'পোস্টমাস্টার' গল্পের 'রতন' তার বাস্তব নিদর্শন। 'ছুটি' গল্পের 'ফটিক' ও শহরে এসে দারুণ মনোকষ্টে নিপাতিত হয়েছিল। এই শহরের সব ঐশ্বর্যই যে তার কাছে মিথ্যে প্রমাণিত হয়েছিল, এটা বুঝতে আমাদের আদৌ কষ্ট হয় না। 'রতন' এবং 'ফটিক' এদের দুঃখ দুধরনের— কিন্ত তা, একান্ত করেই পল্লীআশ্রিত এবং নিটোল। রবীন্দ্রনাথের এই পল্লীপ্রীতি যথার্থই অসাধারণ।

পোস্টমাস্টার শহরের মানুষ। দুর্ভাগ্যক্রমে সে গ্রামে চাকরি নিয়ে এসেছে। দুজন নারী-পুরুষ একে অপরের সান্নিধ্যে এসেছে। তাদের মধ্যে দুর্বলতা থাকা স্বাভাবিক। পোস্টমাস্টারের নাগরিক মন তার সেই দুর্বলতাকে ঝেড়ে ফেলতে চাইল। অপরপক্ষে 'রতন' পোস্টমাস্টারের মধ্যে তার ভালবাসার মানুষই শুধু পায় নি, বলা যেতে পারে তাকে কেন্দ্র করেই তার নির্ভরতা ক্রমেক্রমে দানা বেঁধেছিল—যা অকস্মাৎ পোস্টমাস্টারের নগরে প্রত্যাবর্তনের ঘোষণায় এক নিমিষে সব ধূলিসাৎ করে দিল। শিলাইদহ এবং পতিসর উভয়স্থানে রবীন্দ্রনাথ কর্মব্যস্তদিন কাটিয়েছেন। সে সব স্থানে পল্লীউন্নয়ন কর্মকাণ্ড থাকায় ও নানা অতিথিবর্গ তাঁর চারপাশে প্রায়শ ভিড় করায় তিনি লেখা-লিখি কাজটা সেখানে নীরবচ্ছিন্নভাবে করতে পারেন নি। কিন্তু সাজাদপুর জমিদারি ছিল ব্যতিক্রম। একটু দুর্গম হওয়ায় অতিথিদের তেমন আগমন হতো না। জমিদারির কাজকর্মও তেমন ছিল না। তদারকি কাজটা নিয়মমাফিক চলতো। ফলে এখানে তাঁর অবসর ছিল। 'পোস্টমাস্টার' 'ছুটি' ইত্যাদি গল্প লেখার জন্য যে উপকরণ প্রয়োজন ছিল সাজাদপুরে তিনি তা পেয়েছিলেন। সর্বোপরি এখানে

জীবনকে দেখবার এক স্বাচ্ছন্দ্য সময় তিনি পেয়েছিলেন। সাজাদপুর থেকে লেখা নানা চিঠিতে তিনি তা ব্যক্ত করেছেন। সাজাদপুরে থেকে লেখা এমনি একটি চিঠি :

সাজাদপুর, ফেব্রুয়ারী ১৮৯১

"আমার সামনে নানা রকম গ্রাম্য দৃশ্য দেখতে পাই, সেগুলো আমার দেখতে বেশ লাগে। ঠিক আমার জানালার সুমুখে খালের ও পারে, একদল বেদে বাখারির উপর খানকতক দর্মা এবং কাপড় টাঙিয়ে দিয়ে তারই মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। গুটি তিনেক খুব ছোট্ট, ছোট্ট ছাউনি মাত্র—তাঁর মধ্যে মানুষের দাঁড়াবার জো নেই। ঘরের বাইরেই তাদের সমস্ত গৃহকর্ম চলে—কেবল রাত্রিরে সকলে মিলে কোনোপ্রকারে জড়পুটুলি হয়ে সেই ঘরের মধ্যে ঘুমুতে যায়। বেদে জাতটাই এই রকম। কোথাও বাড়ি ঘর নেই, কোনো জমিদারকে খাজনা দেয় না। একদল শুয়োর, গোটা দুয়েক কুকুর এবং কতকগুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ায়। পুলিশ সর্বদা এদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে। আমাদের এখানে যারা আছে, আমি জানালায় দাঁড়িয়ে প্রায় তাদের কাজকর্ম দেখি। এদের দেখতে মন্দ নয়, হিন্দুস্থানি ধরনের। কালো বটে, কিন্তু বেশ শ্রী আছে, বেশ জোরালো সুডোল শরীর। মেয়েদেরও বেশ দেখতে ছিপছিপে লম্বা—আট সাঁট, অনেকটা ইংরেজ মেয়েদের মতো শরীরের স্বাধীন ভঙ্গী। অর্থ্যাৎ, বেশ অসংকোচ চালচলন, নড়াচড়ার মধ্যে সহজ সরল দ্রুতভাব আছে— আমারতো ঠিক মনে হয় কালো ইংরেজের মেয়ে।

পুরুষটা রান্নাচড়িয়ে দিয়ে বসে বসে বাঁশ চিরে চিরে ধামা চাঙারি কুলো প্রভৃতি তৈরি করছে— মেয়েটা কোলের ওপর একটি ছোট্ট আয়না নিয়ে অত্যন্ত সাবধানে একটা গামছা ভিজিয়ে মুখটি বিশেষ যত্নের সংগে দু-তিনবার করে মুছলে, তার পরে আঁচল-টাচলগুলো একটু ইতস্তত টেনেটুনে সেরেসুরে নিয়ে বেশ ফিটফাট হয়ে পুরুষটার কাছে গিয়ে উবু হয়ে বসল; তারপরে একটু - আধটু কাজে হাত দিতে লাগল।... .আমার এই খোলা-জানালার মধ্যে দিয়ে নানা দৃশ্য দেখতে পাই। সবশুদ্ধ বেশ লাগে।"[১১]

রবীন্দ্রনাথের এ এক অসাধারণ দেখবার ক্ষমতা। এমন দেখবার ক্ষমতা ছিল বলেই তিনি রতনের মনের গভীরে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন। রতন তার অবিনশ্বর চরিত্র। 'পোস্টমাস্টার' চরিত্রও ব্যতিক্রমী। রবীন্দ্রনাথ এই চেনা চরিত্রকে কল্পনার রঙ মিশিয়ে অবাস্তব করে তোলেন নি, বরং তাকে অসংখ্য সংশয়চিত্ত পুরুষের একজন করে তুলেছেন। এই পোস্টমাস্টার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি চিঠিতে উল্লেখ করেন :

সাজাদপুর ২৯ জুন ১৮৯২

"... ..কালকের চিঠিতে লিখেছিলুম, আজ অপরাহ্ণে সাতটার সময় কবি কালিদাসের সঙ্গে একটা এনগেজমেন্ট করা যাবে। বাতিটি

জ্বালিয়ে টেবিলের কাছে কেদারাটি টেনে, বইখানি হাতে, যখন বেশ প্রস্তুত হয়ে বসেছি, হেনকালে কবি কালিদাসের পরিবর্তে এখানকার পোস্টমাস্টার উপস্থিত। মৃত কবির চেয়ে একজন জীবিত পোস্টমাস্টারের দাবি ঢের বেশি। আমি তাঁকে বলতে পারলুম না, 'আপনি এখন যান, কালিদাসের সঙ্গে আমার একটু বিশেষ প্রয়োজন আছে', বললেও সে লোকটি ভালো বুঝতে পারতেন না। অতএব, পোস্টমাস্টারকে চৌকিটি ছেড়ে দিয়ে কালিদাসকে আস্তে-আস্তে বিদায় নিতে হল। এই লোকটির সংগে আমার একটি বিশেষ যোগ আছে। যখন আমাদের এই কুঠিবাড়ির একতলাতেই পোস্ট-অফিস ছিল এবং আমি তাঁকে প্রতিদিন দেখতে পেতুম, তখনই আমি একদিন লিখেছিলুম। এবং সে গল্পটি যখন হিতবাদীতে বেরোল তখন আমার পোস্টমাস্টারবাবু তার উল্লেখ করে বিস্তর লজ্জামিশ্রিত হাস্যবিস্তার করেছিলেন। যাইহোক, এই লোকটিকে আমার বেশ লাগে। বেশ নানারকম গল্প করে যান, আমি চুপ করে শুনি। ওঁর মধ্যে আবার বেশ একটু হাস্যরসও আছে।..."[১২]

রবীন্দ্রনাথ পোস্টমাস্টারকে চিত্রিত করেছেন নগর এবং গ্রামের পটভূমিকায়। একদিন যে গ্রাম সকলকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছে, আজ সে গ্রাম ধ্বংসশীল। রতনেরা এমনিভাবে নিজেদের দুঃখ- শোকের ইতিহাস নিয়ে বেঁচে থাকে। পোস্টমাস্টার শত গরিব হলেও রতনকে নিয়ে গ্রামে থাকবার কোন বাসনাই তার নেই। তাই সে গ্রামে থেকে শহরে চলে যাবার জন্য দরখাস্ত করে—একদিন তা মঞ্জুর হয়। কিন্তু রতন সে কথা জানে না। আচমকা পোস্টমাস্টারের চলে যাবার ঘোষণা শুনে সে হত-বিহবল হয়ে পড়ে। একদিন সে পোস্টমাস্টারকে নিয়ে যে সপ্পিল নীড় বাঁধবার সংকল্প করেছিল, কঠিন বাস্তবের আঘাতে তা ভেঙে চুরমার হয়ে পড়ে।

ফটিকের জীবন বিপরীতধর্মী। গ্রামের শত কষ্টেও গ্রাম তার আপনার ধাম। গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে তাই সে যেন ডাঙায় জোর করে তোলা নদীর মাছ। মৃত্যুতেই তার সমাপ্তি। রবীন্দ্রনাথ ফটিকের গ্রামের একটি চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন একটি চিঠিতে। সাজাদপুরে এই গ্রামের বর্ণনা দেখে আমাদের ভাবতে আদৌ বেগ পেতে হয় না এই ভেবে যে গ্রামটাই ফটিকের।

সাজাদপুর ১ জুন ১৮৯১

"... .বিকেল বেলায় আমি এখানকার গ্রামের ঘাটের উপরে বোট লাগাই। অনেকগুলো ছেলেয় মিলে খেলা করে, বসে বসে দেখি।... ডাঙার উপর মস্ত নৌকার মাস্তুল পড়েছিল— গোটাকতক বিবস্ত্র ক্ষুদে ছেলে মিলে অনেক বিবেচনার পর ঠাউরালে যে, যদি যথোচিত কলরব- সহকারে সেইটেকে ঠেলে ঠেলে গড়ানো যেতে পারে তা হলে খুব এক নূতন এবং আমোদজনক খেলার সৃষ্টি হয়। যেমন মনে আসা অমনি কার্যারম্ভ। 'সাবাস জোয়ান হেঁইও! মারো ঠেলা হেঁইও।' মাস্তুল

যেমনি এক পাক ঘুরছে অমনি সকলের আনন্দে উচ্চহাস্য। কিন্তু এই ছেলেদের মধ্যে যে দুটি একটি মেয়ে আছে, তাদের ভাব আর একরকম। সঙ্গী অভাবে ছেলেদের সঙ্গে মিশতে বাধ্য হয়েছে, কিন্তু এই সকল শ্রমসাধ্য উৎকট খেলায় তাদের মনোযোগ নেই। একটি ছোটো মেয়ে বিনা বাক্যব্যয়ে গম্ভীর প্রশান্তভাবে সেই মাস্তুলটার উপর গিয়ে চেপে বসল। ছেলেদের এমন সাধের খেলা মাটি। দু-একজন ভাবলে এমনস্থলে হার মানাই ভালো। তফাতে গিয়ে তারা ম্লানমুখে সেই মেয়েটির অটল গাম্ভীর্য নিরীক্ষণ করতে লাগল। ওদের মধ্যে একজন এসে পরীক্ষাচ্ছলে মেয়েটাকে একটু একটু ঠেলতে চেষ্টা করলে। কিন্তু সে নীরবে নিশ্চিন্তমনে বিশ্রাম করতে লাগল। সর্বজ্যেষ্ঠ ছেলেটি এসে তাকে বিশ্রামের জন্য অন্যস্থান নির্দেশ করে দিলে, সে তাকে সতেজ মাথা নেড়ে কোলের উপর দুহাত জড়ো করে নড়ে চড়ে আবার বেশ গুটিয়ে বসল। তখন সেই ছেলেটা শারিরীক যুক্তি প্রয়োগ করতে আরম্ভ করলে এবং অবিলম্বে কৃতকার্য হল। আবার অভ্রভেদী আনন্দধ্বনি উঠল, পুনর্বার মাস্তুল গড়াতে লাগল— এমনকি খানিক্ষণবাদে মেয়েটাও নারীগৌরব এবং সুমহৎ নিশ্চেষ্ট স্বাতন্ত্র ত্যাগ করে কৃত্রিম উৎসাহে ছেলেদের এই অর্থহীন চপলতায় যোগ দিলে।..."[১৩]

এই রকম নানারকম ছবি রবীন্দ্রনাথ প্রায় দিনই লক্ষ্য করছেন এবং তা থেকেই গল্প বেরিয়ে এসেছে। এমনি আর একটি ছবি:

"... আর একবার ওই রকম নৌকা ভিড়িয়েছি। নদীর তীরে গ্রামের অনেক ছেলে খেলা করতে এসেছে— প্রায় চৌদ্দ পনেরোজন। তার মধ্যে একটি ছেলেই সর্দার; আর সকলে নিরীহ বেচারীর মতো তার অনুসরণ করছে। বামুনের ছেলে, বছর তেরো বয়স, স্ফুর্তি ও সজীবতার অবতার। কোমরে পৈতে বেঁধে সকলের আগে আগে হৈ হৈ করতে করতে যাচ্ছে, আর মাঝে মাঝে, 'তারে নারে না' বলে গান ধরছে। তার প্রধান আমোদ হচ্ছে এ নৌকা ও নৌকা করে বেড়ানো, মাঝিদের কাজ দেখা, মাস্তুলের পাল গুটানো দেখা ইত্যাদি। তীরে অনেকগুলি গুড়িকাঠ গাদা করা ছিল। মাঝে ছেলেটি তড়াক করে নৌকা থেকে নেমে এই কাঠগুলি গড়িয়ে গড়িয়ে নদীতে ফেলতে আরম্ভ করলে। কিন্তু তার আমোদের পথে একটা বিঘ্ন এসে উপস্থিত হল। একটা ছোটো মেয়ে একটি গুঁড়ি চেপে বসল। ছেলেটি তাকে উঠাবার কত চেষ্টা করলে, কিন্তু মেয়েটি তা গ্রাহ্যও করলে না। সে বেশ ফিলজফার এর মতো গম্ভীরভাবে গুঁড়ি দখল করে আছে। তখন ছেলেটি তাকে সুদ্ধই গুঁড়িটি উলটে দিলে। মেয়েটি পড়ে গিয়ে বিকট কান্না জুড়ে দিলে, এবং কাঁদতে কাঁদতে উঠেই ছেলেটাকে কষে এক চড় লাগালে। এই ঘটনা থেকেই 'ছুটি'র শুরু।"[১৪]

সুতরাং স্পষ্ট বোঝা যায়, পল্লীর নিত্যকর্মের মধ্য দিয়ে জীবনকে দেখবার এই অসামান্য চোখ রবীন্দ্রনাথকে মানুষের জীবনে নিত্যসঙ্গী করে নিয়েছিল। শিলাইদহ সাজাদপুর পতিসর ছিল রবীন্দ্রনাথের বিচরণ ভূমি। সাজাদপুরে এসে রবীন্দ্রনাথ, বলা যেতে পারে, 'দম' ফেলেছেন। এখানে তিনি শুধু জীবনকে দেখেন নি তাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তিনি এই পল্লীকে তার আপন ঐশ্বর্য এবং বৈভব নিয়ে বাঁচিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। এইজন্য গল্প নিয়ে গল্পের মধ্য থেকেই তিনি শক্তি সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন। তাঁর কবিতা ও গান সম্বন্ধেও একথা বলা অত্যুক্তি হবে না। তাঁর কবিতা ও গানে রবীন্দ্রনাথ এক বিরুদ্দেশ সৌন্দর্যালোকের ছবি এঁকেছেন। গল্পে একদিন প্রতিদিনের সুখ-দুঃখভরা মানুষের ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাওয়া জীবনের চিত্র রয়েছে— যা অসাধারণ।

'ছুটি' গল্পে যে জীবন আমরা দেখি, 'সুভা' গল্পে তার অনেকটাই একইভাবনাজাত। ফটিক গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে অসহায় হয়ে পড়েছিল, অতঃপর তার মৃত্যু ঘটেছে। সুভার জীবনেও তাই। পল্লীর অসাধারণ স্নেহ যে বোবা মেয়েটিকে লালন করেছে, শহরে এসে 'সুভা' বিবাহিত জীবনের সেই অনাবিল জীবন ধারার কোন চিহ্নই আর খুঁজে পায় নি। 'সমাপ্তি' গল্পের নায়িকা মৃণ্ময়ী ও ফটিক, সুভার সমগোত্রীয়। এরা সকলেই পল্লীশিশু, দুরন্ত জীবনের নিত্যদিনের ছবি। কিন্তু শহরে এসেই তারা মুখ থুবড়ে পড়েছে। এমনি দরদি মন নিয়ে রবীন্দ্রনাথ পল্লীকে বুঝতে চেয়েছেন এবং সে কারণেই পল্লীউন্নয়ন কর্মকাণ্ড ছিল তাঁর একান্ত আন্তরিক প্রচেষ্টা। কোন নাম-যশ বা খ্যাতির জন্য নয়; অনেকটাই বিবেকের টানে তিনি এই কাজে নেমেছিলেন। সাজাদপুর থেকে লেখা এমনি কিছু চিঠিপত্রে পল্লীপ্রকৃতির প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণের কথা জানা যায়:

> "আজকাল আমার এখানে এমন চমৎকার জ্যোৎস্নারাত্রি হয় সে আর কী বলব। অবশ্য, যে ঠিকানায় এ চিঠি গিয়ে পৌছবে সেখানেও যে জ্যোৎস্নারাত্রি হয় না তা বলা আমার অভিপ্রায় নয়— স্বীকার করতেই হবে সেখানে সেই ময়দানের ওপর, সেই গির্জের চূড়ার উপর, সম্মুখের নিস্তব্ধ গাছপালার উপর, ধীরে ধীরে জ্যোৎস্না আপনার নীরব অধিকার বিস্তার করে। কিন্তু সেখানে জ্যোৎস্না ছাড়াও অন্য পাঁচটা বস্তু আছে— কিন্তু আমার এই নিস্তব্ধ রাত্রি ছাড়া আর কিছুই নেই। একলা বসে বসে আমি যে এর ভিতর কী অনন্ত শান্তি এবং সৌন্দর্য দেখতে পাই সে আর ব্যক্ত করতে পারিনে। ... মাথাটা জানালার উপর রেখে দিই— বাতাস প্রকৃতির স্নেহহস্তের মতো আস্তে-আস্তে আমার চুলের মধ্যে আঙুল বুলিয়ে দেয়, জল ছল ছল শব্দ করে বয়ে যায়, জ্যোৎস্না ঝিক ঝিক করতে থাকে এবং অনেক সময় 'জলে নয়ন আপনি ভেসে যায়'।"[১৫]

সাজাদপুর থেকে লেখা অপর একটি চিঠিতে পল্লীজীবনের আর একটি ছবি ফুটে ওঠে:

> 'আমাদের ঘাটে একটি নৌকো লেগে আছে, এবং এখানকার অনেকগুলি 'জনপদবধূ' তার সম্মুখে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। বোধ হয় একজন কে-কোথায় যাচ্ছে এবং তাকে বিদায় দিতে সবাই এসেছে। অনেকগুলি কচি ছেলে, অনেকগুলি ঘোমটা এবং অনেকগুলি পাকাচুল একত্র হয়েছে। কিন্তু ওদের মধ্যে একটি মেয়ে আছে, তার প্রতিই আমার মনোযোগটা সর্বাপেক্ষা আকৃষ্ট হচ্ছে। বোধ হয় বয়সে বারো তেরো হবে, কিন্তু একটু হৃষ্টপুষ্ট হওয়াতে চৌদ্দ-পনের দেখাচ্ছে। মুখখানি বেড়ে। কালো অথচ বেশ দেখতে।... একজন মেয়ে ডাঙায় দাঁড়িয়ে রৌদ্রে চুল এলিয়ে দশাঙ্গুলি-দ্বারা জটা ছড়াচ্ছে এবং নৌকোর আর-একটি রমণীর সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে ঘরকর্ণার আলাপ হচ্ছে। শোনা গেল তার একটিমাত্র 'ম্যায়্যা', অন্য 'ছেওয়াল' নাই— কিন্তু সে মেয়েটির বুদ্ধিসুদ্ধি নেই-'কারে কী কয়, কারে কী হয়—আপন জ্ঞান নেই'। আরও অবগত হওয়া গেল গোপাল মা'র জামাইটি তেমন ভালো হয় নি, মেয়ে তার কাছে যেতে চায় না..."[১৬]

রবীন্দ্রনাথ এ সব জীবনের নিত্যদিনের ভাষা এবং দিনযাপনের চালচিত্র সযতনে চয়ন করে নিয়েছেন। সাজাদপুরের জীবন যে তাঁর কাছে বেশ কাম্য ছিল, একটি চিঠিতে তিনি তা প্রকাশ করেছেন।

> "ছোটোখাটো গ্রাম, ভাঙাচোরাঘাট, টিনের ছাত-ওয়ালা বাজার, বাখারির বেড়া-দেওয়া গোলাঘর, বাঁশঝাড়, আমকাঁঠাল, খেজুর, শিমুল, কলা, আকন্দ, ভেরেণ্ডা, ওল, কচু, লতা গুল্ম তৃণের সমষ্টিবদ্ধ ঝোপঝাড় জঙ্গল। ঘাটে বাঁধা মাস্তুল-তোলা বৃহদাকার নৌকার দল, নিমগ্নপ্রায় ধান এবং অর্ধমগ্ন পাটের খেতের মধ্যদিয়ে ক্রমাগত এঁকে বেঁকে কাল সন্ধ্যের সময় সাজাদপুরে এসে পৌঁচেছি।
>
> এখন কিছুদিনের মতো এইখানেই স্থায়ী হওয়া গেল। অনেকদিন বোটেই থাকার পর সাজাদপুরের বাড়িটা বেশ লাগে ভালো— একটা যেন নতুন স্বাধীনতা পাওয়া যায়— যতটা খুশি নড়বার চড়বার এবং শরীর প্রসারণ করবার জায়গা পাওয়া মানুষের মানসিক সুখের যে একটা প্রধান অঙ্গ সেটা আবিষ্কার করা যায়।"[১৭]

রবীন্দ্রনাথের কাছে সাজাদপুর অনেকটা তাঁর কর্মমুখর জীবনে একটু স্বতন্ত্র হয়ে বসে দেখবার সময়।

> "পাড়াগাঁয়ের কর্মস্রোত খুব বেশি তীব্র নয় অথচ নিতান্ত নিশ্চেষ্ট নির্জীবও নয়। কাজ এবং বিশ্রাম দুই যেন পাশাপাশি মিলিত হয়ে হাতধরাধরি করে চলেছে"।[১৮]

সাজাদপুর রবীন্দ্র ভূগোলে স্থির হয়ে সবকিছু পর্যবেক্ষণের স্থান। এখানে বসেই রবীন্দ্রনাথ সুখ-দুঃখভরা জীবনের নানা চিত্র-বিচিত্র ছবি এঁকেছেন তাঁর গল্পে। এ সব গল্পের মধ্য দিয়েই তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মজীবনও স্থির করেছেন। এখানেই তাই পল্লীউন্নয়ন কর্মের প্রেরণা রবীন্দ্রনাথ পেয়েছেন— সাজাদপুরের জমিদারির সার্থকতা সেখানে। সাজাদপুরে থাকাকলিন সময়ে রবীন্দ্রনাথ অনেক

গল্প লিখেছিলেন। সে সম্বন্ধে ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। এসব গল্পের উৎসও সাজাদপুরের জনজীবন। 'সমাপ্তি' গল্পের পটভূমিকা সাজাদপুর অঞ্চলের। এ গল্পের পটভূমি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন :

> "আমি একবার জমিদারি দেখা উপলক্ষ্যে একটা নদীর তীরে নৌকা লাগিয়েছি। নৌকায় বসে কোনো রকম কাজ করছি। এমন সময় দেখলুম একটি মেয়ে— বড় মেয়ে; হিন্দুর ঘরে অতবড় মেয়ে অবিবাহিতা প্রায় দেখা যায় না— নদীর তীরে থেকে আমার নৌকার দিকে দেখছে। সে তখনই চলে গিয়ে আবার ফস করে একটি ছেলে কোলে নিয়ে ফিরে এল, এসে নৌকার এদিক-ওদিক দেখতে লাগল। তার সরল সতেজ দৃষ্টি, চলাফেরার মধ্যে একটা সহজ স্ফূর্তির ভাব দেখে আমার বড় ভাল বোধ হল। বাঙালি মেয়েদের মধ্যে সে রকম ভাব আমি প্রায় দেখি না। আমার মেয়েটিকে ডেকে দু-একটি কথা জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হল। কিন্তু আবার কী ভেবে পারছিলুম না। সে দিন তো গেল। তার পরের দিন দেখি আমার পাশের একটি নৌকার চাল-ডাল, বাসন-কোসন প্রভৃতি ঘরকন্নার জিনিসপত্র বোঝাই হচ্ছে, যেন কোনো মেয়ে শ্বশুরবাড়ি যাবে। খানিক পরে দেখি ঠিক কালকের সেই মেয়েটিকে কণে সাজিয়ে অনেকে মিলে নৌকার দিকে নিয়ে আসছে। সে কিছুতেই নৌকায় উঠবে না। আর তারাও জোর করে তাকে তুলে দেবে। সচরাচর মেয়ে -টেয়ে পাঠাবার সময় যে কান্না-কাটির ভাব দেখি এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অভাব দেখলুম। কান্না-কাটির কথা দূরে থাকুক, অনেকেই বেশ স্ফূর্তি ও আমোদ করছে। কেবল একটি মেয়ে, বড় মেয়ে সে তার মায়ের কোলে চড়ে আছে, তার লম্বা লম্বা পা দুখানা ঝুলে পড়েছে- সে-ই মায়ের ঘাড়ে মুখ লুকিয়ে নীরবে ফুলে ফুলে কাঁদছে। তারপরে পাশের নৌকা ছেড়ে দিলে, তীরের স্ত্রীলোকেরাও চলে গেলেন। আমি কেবল দূর থেকে শুনলাম একটি মেয়েমানুষ আর একজনকে বলছে— ওকে তো জান বোন, ও ওই রকমই। কতকরে বললাম, পরের ঘর করতে যাচ্ছিস, বেশ সাবধানে থাকিস, ঘাড় হেঁট করে থাকিস, উঁচু করে কথা বলিস নে, কিন্তু সে কি তা পারবে, ইত্যাদি— এই ঘটনাই আমার 'সমাপ্তি' রচনার ভিত্তি"।[১৯]

'সমাপ্তি' গল্পের এই মেয়েটিকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথের আর একটি অপরূপ বর্ণনা:

> "দেখতুম কিনা বোট থেকে, মেয়েরা ঘাটে আসত, কেউ বা ছেলে কোলে, কেউ বা এক পাঁজা বাসন নিয়ে, কেউবা কলসি কাঁকে। ওই দশ এগারো বছরের মেয়েটা, ছোট ছোট করে চুল ছাঁটা কাঁকে একটা ছেলে নিয়ে রোজ আসত। রোগা রোগা দেখতে, শ্যামলা রং। বোটের উপর আমাকে সবাই দেখত, কিন্তু ওর দেখাটা ছিল অন্যরকম। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকত, মাঝে মাঝে কোলের ছেলেটাকে আমাকে দেখাত আঙুল দিয়ে -'ওই দেখ।' আমার ভারি মজা লাগত।

> এমন একটা স্বাভাবিক স্ফূর্তি চঞ্চলতা ছিল তার, যা ও - বয়সের জড়সড় বাঙালি মেয়েদের বেশি দেখা যায় না। তারপর একটি দিন দেখলুম বধূবেশে শ্বশুরবাড়ি চলল সেই মেয়ে। সেই ঘাটে নৌকা বাঁধা। কি তার কান্না। অন্য মেয়েদের বলাবলি কানে এল— যা দুরন্ত মেয়ে! কি হবে ওর শ্বশুর বাড়িতে ?
>
> ভারী দুঃখ হল তার শ্বশুর বাড়ি যাওয়া দেখে। চঞ্চলা হরিণীকে বন্দিনী করবে। ওর কথা মনে করেই এই গল্পটা লিখেছিলুম। ওই বোটে বাংলাদেশের গ্রামের এমন একটা সজীব ছবি দেখেছি যা অনেকে দেখেনি।"[২০]

গ্রামকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ এত অধিক ভেবেছেন যে তাঁর প্রায় সব লেখাতেই গ্রাম নানাভাবে নিজের আসন দখল করে নিয়েছে। সাজাদপুরে বসে-বসে রবীন্দ্রনাথ 'অতিথি' 'ক্ষুধিতপাষাণ' ইত্যাদি গল্পও লিখেছেন। শুধু গল্প নয়, কবিতা ও গান আপনা আপনি এসেছে তাঁর মনে। এ সবের বিবরণ এখানে দেওয়া সংগত নয়। সাজাদপুর রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়নে ক্ষেত্রে হয়তো তেমন কোন দৃষ্টান্ত হতে পারে নি— কিন্তু গল্প, কবিতা ও গানে পল্লী যে তার স্বরূপ নিয়ে এসেছিল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

তথ্যসূত্র

১. Tofayel, Z.A.- Lalon Shah And the Lyrics of the Padma, Dhaka. 1968 p.110 Tofayel writes, "Rabindranath's grandfather Dharakanath bought number 3 Touji (as Shahjadpur is called) at Rs.13 and annas 10 in an auction"

২. শচীন্দ্রনাথ অধিকারী, শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ, জিজ্ঞাসা, কলিকাতা, ২৫শে জানুয়ারী ১৯৭৪, পৃ. ৯

৩. আনোয়ারুল করিম, বাংলা বাউল, বর্ণায়ন, ঢাকা ২০০২, পৃ. ৪৩৯.

৪. মোহাম্মাদ আনসারুজ্জামান, সাজাদপুর রবীন্দ্রনাথ, বর্ণমিছিল, ঢাকা, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃ. ১২.

৫. ঐ, পৃ. ১২।

৬. মোহাম্মাদ আনসারুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

৭. ঐ, পৃ. ৮৭।

৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ছিন্নপত্রাবলী, পত্র নং২১৯। সাজাদপুর ৬ জুলাই ১৮৮৫।

৯. মোহাম্মাদ আনসারুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

১০. ঐ, পৃ. ২২।

১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ছিন্নপত্রাবলী, পত্র নং ১৬, সাজাদপুর, ফেব্রুয়ারি ১৮৯১। প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬-৫৮

১২. ঐ ছিন্নপত্রাবলী, পত্র নং, ৬২, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০-১৩১।

১৩. ঐ পত্র নং ২৪, প্রাগুক্ত, পৃ.৭১-৭২।

১৪. রবীন্দ্রনাথের উক্তির অনুলিপি, জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধায়, শান্তিনিকতনে রবীন্দ্রনাথ, সুপ্রভাত, ভাদ্র ১৩১৬ ২ মে, ১৯০১।

১৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ছিন্নপত্রাবলী, পত্র নং ২২, সাজাদপুর ২২ জুন, ১৮৯১। প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮।

১৬. ছিন্নপত্রাবলী পত্র নং ২৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭-৭৯
১৭. ছিন্নপত্রাবলী পত্র নং ১০৫। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০. সাজাদপুর ৭ জুলাই ১৮৯৩।
১৮. ঐ, পৃ. ১৮০
১৯. প্রমথনাথ বিশী, রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প, ২য় সংস্করণ, জৈষ্ঠ ১৩৬৪, কলিকাতা পুলিনবিহারী সেন সংকলিত তথ্যপঞ্জী, পৃ. ৫২
২০. রবীন্দ্রনাথের উক্তির অনুলিপি, শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী, মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, প্রথম সংস্করণ পৃ. ১৮৩-১৮৪।

চতুর্থ অধ্যায়

পতিসর পর্ব

রবীন্দ্রনাথ জমিদারি দায়িত্ব গ্রহণের পর তাঁর এলাকাতে প্রজাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য নানাবিধ পল্লীউন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। প্রথমদিকে তাঁর দায়িত্ব ছিল প্রধানত এজমালি সম্পত্তি দেখাশুনা করা এবং এই তদারকির দায়িত্ব তিনি শুধু পালনই করেন নি বরং এসব সম্পদের মাধ্যমে তিনি জমিদারি আয় বৃদ্ধির জন্য যেমন পরিকল্পনা করেছেন তেমনি এসবে বসবাসকারী প্রজা সাধারণের উন্নয়নের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। লক্ষ্য করা গেছে প্রজাদের হিত সাধনের জন্য তিনি অনেক সময় যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন তাতে তিনি নিজেই জমিদার হিসেবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে পড়েন। কিন্তু প্রজাদের হিতসাধনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল পল্লীউন্নয়ন এবং এই ভাবনা তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল গভীর দেশপ্রেম থেকে। তিনি প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন নি, তিনি লক্ষ্য করেছিলেন দেশের মানুষকে নিজেদের সমস্যা সমাধানের জন্য সচেতন করে না তুলতে পারলে এই প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। কবি ও সাহিত্যিকের দৃষ্টি নিয়ে তিনি সাধারণ মানুষের জীবনচর্যা ও তাদের সমস্যার সঙ্গে পরিচিত হন। অতএব, একজন দক্ষ উন্নয়নকর্মী, দরদি জমিদার এবং যথার্থ দেশপ্রেমিকের ভূমিকায় তিনি নিজেকে তাঁর জমিদারিতে নিয়োজিত রেখেছিলেন। কুষ্টিয়া জেলার বিরাহিমপুর পরগনার সদর শিলাইদহকে কেন্দ্র করে তিনি তাঁর উন্নয়ন কর্মকাণ্ড রাজশাহী জেলার কালীগ্রাম পরগনার সদর পতিসর পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন। কিন্তু জমিদারি এজমালি এবং পরবর্তীতে তা যথার্থ মালিকদের নিকট নির্দেশ মোতাবেক হস্তান্তর ইত্যাদির কারণে তিনি ঠাকুর-এস্টেটের পুরো জমিদারিতে তাঁর উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত করতে পারেন নি। অবশেষে পতিসরেই তাঁর জমিদারি নির্দিষ্ট হয়েছিল এবং এখানেই তিনি দেশবিভাগ এবং জমিদারি হস্তান্তর ও উচ্ছেদ না হওয়া পর্যন্ত কাজ করেছিলেন। অবশ্য পশ্চিমবাংলার বোলপুর অন্তর্গত শান্তিনিকেতনে ভূমিসম্পদ ক্রয় এবং তদস্থলে শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা করে তিনি পূর্ববাংলা (বাংলাদেশ) বিশেষ করে বিরাহিমপুর পরগনার শিলাইদহ (কুষ্টিয়া) এবং কালীগ্রাম পরগনার পতিসর (রাজশাহী) অঞ্চলের পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচীকে

সম্প্রসারিত ও বাস্তবায়িত করেছিলেন। এটিও ছিল রবীন্দ্রনাথের দূরদর্শিতার পরিচায়ক।

এইপর্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব জমিদারি পতিসরে যে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড গ্রহণ করেছিলেন তার একটি বিবরণ দেব। পতিসরে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক পূর্ববাংলায়, যা প্রমথনাথ বিশীর[১] ভাষায়, মধ্যবাংলা এবং উত্তর বাংলা হিসেবে চিহ্নিত, দায়িত্ব নেবার সাথে সাথেই শুরু হয়েছিল এবং তার বিবরণও ইতোমধ্যেই দেওয়া হয়েছে। এখানে পতিসরের জমিদার হিসেবে রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন কর্মকাণ্ডের পরিচয় তুলে ধরা হল।

বাংলাদেশে জমিদারি দায়িত্ব নেবার পর রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহকে কেন্দ্র করে ঠাকুর এস্টেটের জমিদারি যে সব অঞ্চলে ছিল অর্থ্যাৎ সাজাদপুর এবং পতিসরে, তিনি সে সব অঞ্চল পরিদর্শন করেন। অতঃপর, এ সব অঞ্চলকে নিয়ে তিনি প্রশাসনিক এবং উন্নয়নমুখীন কর্মকাণ্ড প্রণয়ন করেন। পতিসরে তিনি সর্বপ্রথম কবে এসেছিলেন এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রজীবনীকারেরা সঠিক তারিখ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেন নি। তবে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় উল্লেখ করেন:

> "এবার (১৮৯১ সাল) শীতকালেই তাহাকে কালিগ্রাম যাইতে হয়। পতিসর কাছারি চলনবিলের অনতিদূরে নাগরনদীর উপর। এই জায়গার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম পরিচয়। নতুন পারিপার্শ্বিকতার সহিত মনের খাপখাওয়াইতে কষ্ট হইতেছে।"[১]

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্রবর্ষপঞ্জী'তে লেখেন :

> "জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি (১৮৯১)মাসে জমিদারিতে— কালিগ্রাম, আত্রাই, পতিসর, সাজাদপুরে বাস। মাঘোৎসবে উপস্থিত নহেন।"[২]

প্রশান্তকুমার পাল তাঁর সাম্প্রতিক রচনা 'রবীন্দ্রজীবনী'তে এ-সম্পর্কে বলেন:

> "এই বৎসর সম্ভবত ১ মাঘ (মঙ্গল, ১৩ জানুয়ারি) তিনি... ..কালিগ্রাম পরগনার সদর কাছারি পতিসর অভিমুখে রওয়ানা হন। রবীন্দ্রনাথ বোটে করে পতিসর গিয়েছিলেন, সেখানে গিয়ে পথের বর্ণনা দিয়ে স্ত্রীকে লেখেন, 'আজ আমি কালিগ্রাম এসে পৌঁছলুম। তিন দিন লাগল।"[৩]

অতঃপর 'ছিন্নপত্রাবলী'তে ইন্দিরাদেবী চৌধুরানীকে লেখা বেশ কয়েকটি চিঠি। প্রথমটি কালিগ্রাম থেকে লেখা। চিঠির তারিখ ৫ মাঘ ১৮৯১; চিঠির সংখ্যা ৯। পতিসর থেকে লেখা চিঠির তারিখ ৬ মাঘ ১৮৯১; চিঠির সংখ্যা ১০।

'ছিন্নপত্রাবলী'তে উল্লিখিত চিঠি পর্যালোচনা করলে বেশ বোঝা যায় যে কালিগ্রাম বা পতিসরে তিনি বেশ আগেই এসেছেন। কালিগ্রাম থেকে লেখা একটা চিঠির অংশ বিশেষ, তারিখ ৫ মাঘ ১৮৯১।

> "বেশ কুঁড়েমি করবার মতো বেলাটা। কেউ তাড়া দেবার লোক নেই, তা ছাড়া প্রজা এবং কাজের ভিড় এখনো চর্তুদিকে ছেঁকে ধরে নি।
>
> সব-সুদ্ধ খুব ঢিলে ঢিলে একলা-একলা কী একরকম মনে হচেছ। যেন পৃথিবীতে অত্যাবশ্যক কাজ বলে একটা কিছুই নেই, এমন-কি, নাইলেও চলে, না— নাইলেও চলে, এবং ঠিক সময়মত খাওয়াটা কলকাতার লোকের মধ্যে প্রচলিত একটা বহুদিনের কুসংস্কার বলে মনে হয়। এখানকার চতুর্দিকের ভাবগতিক ও সেই রকম। একটা ছোট্ট নদী আছে বটে, কিন্তু তাতে কানাকড়ির স্রোত নেই। সে যেন আপন শৈবাল দামের মধ্যে জড়ীভূত হয়ে সঙ্গ বিস্তার করে দিয়ে পড়ে পড়ে ভাবছে যে, যদি না চললেও চলে তবে আর চলবার দরকার কী ? জলের মাঝে মাঝে যে লম্বা ঘাস এবং জলজ উদ্ভিদ জন্মেছে, জেলেরা জাল ফেলতে না এলে সেগুলো সমস্ত দিনের মধ্যে একটু নাড়া পায় না। পাঁচটা ছটা বড়ো বড়ো নৌকো সারি সারি বাঁধা আছে, তার মধ্যে একটার ছাতের ওপর একজন মাঝি আপাদমস্তক কাপড় মুড়ে রোদদুরে নিদ্রা দিচেছ— আর একটার ওপর একজন বসে দড়ি পাকাচেছ। ডাঙার ওপর নানান রকমের নানান লোক অত্যন্ত মৃদ্মমন্দ অলস চালে কেন যে আসছে, কেন যে যাচেছ, কেন বুকের মধ্যে নিজের দুটো হাঁটুকে আলিঙ্গন করে ধরে উবু হয়ে বসে আছে, কেন যে অবাক হয়ে বিশেষ কোনো কিছুর দিকে না তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার কোনো অর্থ পাওয়া যায় না।... "[৪]

বেশ বোঝা যায় যে, কালিগ্রাম ছিল উন্নয়ন থেকে অনেক দূরে। মানুষের মধ্যেও নিরুত্তাপ; প্রতিদিন কেবল ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাওয়া। এর পরে পতিসর থেকে ৬ মাঘ ১৮৯১ ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে লেখা আর একটি চিঠি :

> "আমার বোট কাছারির কাছ থেকে অনেক দূরে এনে একটি নিরিবিলি জায়গায় বেঁধেছে। এ দেশে গোলমাল কোথাও নেই, ইচেছ করলেও পাওয়া যায় না; কেবল হয়তো অন্যান্য বিবিধ জিনিসের সঙ্গে হাটে পাওয়া যেতে পারে। আমি এখন যেখানে এসেছি এ জায়গায় অধিকন্তু মানুষের মুখ দেখা যায় না। চারদিকে কেবল মাঠ ধু-ধু করছে— মাঠের শস্য কেটে নিয়ে গেছে, কেবল কাটা ধানের গোড়াগুলিতে সমস্ত মাঠ আচছন্ন।"[৫]

এর পরের দিন, অর্থাৎ ৭ মাঘ ১৮৯১, পতিসর থেকে আর একটি চিঠি। এটিও ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণীকে লেখা।

> "... এইমাত্র খাওয়া শেষ করে বসেছি— এখন বেলা দেড়টা। বোট খুলে দিয়েছে, আস্তে আস্তে কাছারির দিকে চলেছে।... ..মাঝে মাঝে ঘন শৈবালের মধ্যে দিয়ে যেতে খস্ খস্ শব্দ হচেছ। সেই শৈবালের ওপরে অনেকগুলো ছোটো ছোটো কচ্ছপ আকাশের দিকে সমস্ত গলা বাড়িযে দিয়ে রোদ পোহাচ্ছে। অনেক দূরে একটা একটা ছোটো

ছোটো গ্রাম আসছে। গুটিকতক খড়ে ঘর, কতকগুলি চালশূন্য মাটির দেয়াল, দুটো একটা খড়ের স্তূপ, কুলগাছ আমগাছ বটগাছ এবং বাঁশের ঝাড়, গোটা তিনেক ছাগল চরছে, গোটাকতক উলঙ্গ ছেলে মেয়ে; নদী পর্যন্ত একটা গড়ানে কাঁচা ঘাট; সেখানে কেউ কাপড় কাচছে, কেউ নাইছে, কেউ বাসন মাজছে ;... .তীরে কতকগুলো নৌকো বাঁধা এবং একটা পরিত্যক্ত প্রাচীন জেলে ডিঙি অর্ধনিমগ্ন অবস্থায় পুনরুদ্ধারের প্রতীক্ষা করছে।... ."[৬]

অতঃপর স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর নিকট রবীন্দ্রনাথের পত্র। এই পত্রে কালিগ্রাম পতিসরের ভৌগোলিক অবস্থান এবং পরিবেশের বর্ণনা।

"... ..একটা মস্ত বিল আছে তার নাম চলনবিল।... টেনেটুনে অনেক কষ্টে এবং অনেক বিপদ এড়িয়ে বিলের মধ্যে এসে পড়লুম।....এই বিলটা আমার ভালো লাগে নি। তারপর মাঝে মাঝে ছোটো ছোটো নদী, মাঝে মাঝে বিল। এমনি করে এসে পৌঁছেছি।... এখানকার নদীতে একেবারে স্রোত নেই, শেওলা ভাসছে, মাঝে মাঝে জঙ্গল রয়েছে... পাঁড়াগেঁয়ে পুকুরের যে একরকম গন্ধ পাওয়া যায়, সেই রকম গন্ধ— তা ছাড়া রাত্তিরে বোধ হয় মশা পাওয়া যাবে। নিতান্ত অসহ্য হলে এইখানে থেকেই কলকাতা পালাব।"[৭]

উপরোক্ত চিঠিপত্র থেকে বেশ বোঝা যায় যে, জমিদারি দায়িত্ব নেবার পরপরই রবীন্দ্রনাথ সর্বত্র বিচরণ করেছেন। এমন কি দুর্গম স্থানেও তাঁর যেতে বাঁধেনি। পতিসর ছিল এমনি দূগর্ম যে সেখানে জীবনের দেখা মেলাভার ছিল যখন রবীন্দ্রনাথ সেখানে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন চিন্তা যে কোন কল্পনা- বিলাস ছিল না এবং তিনি যথার্থই সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছিলেন— এসব চিঠি তার প্রমাণ।একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ তা উল্লেখ করেছেন:

"ছোটো নদীটি ঈষৎ বেঁকে একটুখানি কোণের মতো, একটু কোলের মতো তৈরি করেছে— দুই ধারের উঁচু পাড়ের মধ্যে সেই কোলের কোণটুকুতে প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকি। একটু দূর থেকেই আমাদের আর দেখা যায় না— নৌকাওয়ালার উত্তর দিক থেকে গুণ টেনে টেনে আসে, হঠাৎ একটা বাঁক ফিরেই এই জনহীন মাঠের ধারে অকারণে একটা মস্ত বোট বাঁধা দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়।— হাঁ গা, কাদের বজরা গা ? 'জমিদার বাবুর।'

'এখানে কেন ? কাছারির সামনে কেন বাঁধ নি ?'

'হাওয়া খেতে এসেছেন'— এসেছি হাওয়ার চেয়ে আরও ঢের বেশি কঠিন জিনিসের জন্যে।"[৮]

এই কঠিন দায়িত্ব ছিল জমিদারি তদারকি। পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এক-এক করে তাঁর সন্তানদের এবং পরিবারের অনেককেই এই দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু কেউ তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে পারেন নি। অবশেষে যাঁর দ্বারা

আপাতভাবে আদৌ সম্ভব নয় এমন ধারণা থাকা সত্ত্বেও তাঁকে দিয়েই তিনিই সফল হয়েছিলেন— তিনি রবীন্দ্রনাথ। কল্পনা ও বাস্তবে মেশানো এক অনন্য চরিত্র— অসাধারণ কর্মঠ এবং দক্ষ, যিনি মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে মুহূর্তে তাদের জয় করে নেবার ক্ষমতা রাখতেন। পাবনার সিরাজগঞ্জে পার্শ্ববর্তী জমিদারিতে প্রজাবিদ্রোহ হলেও রবীন্দ্রনাথের জমিদারিতে তা হয় নি। কাঙাল হরিনাথ মজুমদার তাঁর 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'য় তাঁর জমিদার হয়ে আসবার পূর্বে ঠাকুর-এস্টেটের জমিদারিতে প্রজাদের অসন্তোষের কিছু দেখে থাকলেও রবীন্দ্রনাথের আসবার পর তা আর ছিল না। পিতা দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং তা দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন— গর্বিত হয়েছিলেন পুত্রের দক্ষতায়।

শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ কঠিন জীবনের ছোঁয়া পান নি। পদ্মা যেখানে প্রগলভা, যৌবনাদীপ্ত, কবি তাঁর সান্নিধ্যে মুখর হয়ে ওঠেন। প্রকৃতি নদী নারী সব মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রেমের ভুবন গড়ে উঠেছিল শিলাইদহে; বাউলের সংস্পর্শে তা অসাধারণ রূপময়তা পেল অধ্যাত্মচিন্তায়। এরই পাশাপাশি জীবনঘনিষ্ঠ কবি। পদ্মাতীরের মানুষের স্বজন: এ কথা আগেই বলেছি। কিন্তু পতিসরে প্রথম দেখায় কবি প্রেমে পড়তে পারেন নি। ম্যালেরিয়ার আক্রমণের ভয়ে সরাসরি পালাতে চেয়েছেন কলকাতায়। কিন্তু পালানোতো হয়ইনি বরং পতিসর তার রুক্ষ কাঠিন্যে রবীন্দ্রনাথকে অনাস্বাদিত নুতন জীবনের সংগে পরিচয় করে দিয়েছে। পতিসরে যাবার পরপরই কবির নূতন অভিজ্ঞতা।

"... সমস্ত দিনের পর সূর্যাস্তের সময় এই মাঠে কাল একবার বেড়াতে বেড়িয়েছিলুম। সূর্য ক্রমেই রক্তবর্ণ হয়ে একেবারে পৃথিবীর শেষ রেখার অন্তরালে অন্তর্হিত হয়ে গেল। চারদিক কী যে সুন্দর হয়ে উঠল সে আর কী বলার! বহুদূরে একেবারে দিগন্তের শেষ প্রান্তে একটু গাছপালার ঘের দেওয়া ছিল, সেখানটা এমন মায়াময় হয়ে উঠল— নীলেতে লালেতে মিশে এমন আবছায়া হয়ে এল— মনে হল ঐখানে যেন সন্ধ্যার বাড়ি। ঐখানে গিয়ে সে আপনার রাঙা আঁচলটি শিথিলভাবে এলিয়ে দেয়, আপনার সন্ধ্যাতারাটি যত্ন করে জ্বালিয়ে তোলে, আপন নিভৃত নির্জনতার মধ্যে সিদুঁর পরে বধূর মতো কারো প্রতীক্ষায় বসে থাকে, এবং বসে বসে পা দুটি মেলে তারার মালা গাঁথে এবং গুন গুন স্বরে স্বপ্ন রচনা করে। সমস্ত অপার মাঠের উপর একটি ছায়া পড়েছে— একটি কোমল বিষাদ— ঠিক অশ্রুজল নয়— একটি নির্নিমেষ চোখের বড়ো বড়ো পল্লবের নিচে গভীর ছলছলে ভাবের মতো। এমন মনে করা যেতে পারে মা পৃথিবীর লোকালয়ের মধ্যে আপন ছেলেপুলে এবং কোলাহল এবং ঘরকর্ণার কাজ নিয়ে থাকে— যেখানে একটু ফাঁকা, একটু নিস্তব্ধতা একটু খোলা আকাশ, সেইখানেই তার বিশাল হৃদয়ের অন্তর্নিহিত বৈরাগ্য এবেং বিষাদ ফুটে ওঠে; সেইখানেই তার গভীর দীর্ঘনিশ্বাস শোনা যায়।... "[৯]

শিলাইদহ এবং পতিসর দুই স্থানের দুই অভিব্যক্তি। শিলাইদহের মতোই পতিসর রবীন্দ্রনাথের মন কেড়েছিল, অবয়বে একে অপর থেকে স্বতন্ত্র হলেও তাদের বৈপরীত্যে কোথাও বুঝি একটা মিলও কমে ক্রমে নির্মিত হয়েছিল; ফলে শেষের দিকে শিলাইদহের জমিদারি ছেড়ে আসতে তেমন কোন কষ্ট হয় নি। বলা যেতে পারে, পতিসরে রবীন্দ্রনাথ জীবনের এক নূতন সুর খুঁজে পেয়েছিলেন। এখানকার কর্মকাণ্ডে পল্লীউন্নয়ন মুখ্য হলেও সাহিত্য সৃষ্টিতেও পতিসর রবীন্দ্রনাথকে সমৃদ্ধ করেছে। সেই জমিদারির শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ কালিগ্রাম, পতিসরকে ভালবেসেছিলেন- ভালবেসেছিলেন তাঁর ঐশ্বর্য্যের জন্য নয়, তার দুঃখ, কষ্ট, শোকের জন্য। কালিগ্রাম থেকে জানুয়ারি ১৮৯১ একটি চিঠিতে তিনি তা উল্লেখ করেছেন।

> "ঐ যে মস্ত পৃথিবীটা চুপ করে পড়ে রয়েছে ওটাকে এমন ভালবাসি— ওর এই গাছপালা নদী মাঠ কোলাহল নিস্তব্ধতা প্রভাত সন্ধ্যা সমস্তটা— সুদ্ধ দু-হাতে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করে। মনে হয় পৃথিবীর কাছ থেকে আমরা যে সব পৃথিবীর ধন পেয়েছি এমন কি কোনো স্বর্গ থেকে পেতুম ? স্বর্গ আর কি দিত জানি নে, এমন কোমলতা দুর্বলতা-ময়, এমন সকরুণ আশঙ্কা-ভরা, অপরিণত এই মানুষগুলির মতো এমন আপনার ধন কোথা থেকে দিত! আমাদের এই মাটির মা, আমাদের এই আপনাদের পৃথিবী এর সোনার শস্যক্ষেত্রে, এর স্নেহশালিনী নদীগুলির ধারে, এর সুখ দুঃখময় ভালোবাসার লোকালয়ের মধ্যে এই সমস্ত দরিদ্র মর্ত হৃদয়ের আশ্রুর ধনগুলিকে কোলে করে এনে দিয়েছে। আমরা হতভাগ্যরা তাদের রাখতে পারি নে, বাঁচাতে পারি নে, নানা অদৃশ্য প্রবল শক্তি এসে বুকের কাছ থেকে তাদের ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিয়ে যায়। কিন্তু বেচারা পৃথিবীর যতদূর সাধ্য তা করেছে। আমি এই পৃথিবীকে ভারী ভালোবাসি। এর মুখে ভারী একটি সুদূরব্যাপী বিষাদ লেগে আছে— যেন এর মনে মনে আছে, আমি দেবতার মেয়ে. কিন্তু দেবতার ক্ষমতা আমার নেই। আমি ভালবাসী কিন্তু রক্ষা করতে পারি নে। আরম্ভ করি, সম্পূর্ণ করতে পারি নে। জন্ম দিই, মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারি নে। এইজন্যে স্বর্গের উপর আড়ি করে আমি আমার দরিদ্র মায়ের ঘর আরো বেশি ভালবাসি। এত অসহায়, অসমর্থ অসম্পূর্ণ ভালবাসার সহস্র আশঙ্কায় সর্বদা চিন্তাকাতর বলে।"[১০]

এই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ মানব জীবনের অনেক দুঃখ-শোককে মূর্ত করে তুলেছেন। পতিসরের সাধারণ মানুষের দারিদ্র্যতা বিমোচনের জন্য তাই তাঁর প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। শিলাইদহে যা ছিল তার ব্যর্থতা পতিসরে তা অনেকটা সফলতায় সার্থক। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহকে ভুলে থাকতে পারেন নি। পতিসরে এসে তাঁর সেই ফেলে আশা দিনগুলো স্মৃতি হয়ে ভেসে আসে। পতিসব থেকে লেখা চিঠিতে এমনি হারানো স্মৃতি অসাধারণভাবে উজ্জ্বল:

> "... আজকাল ভোরের বেলায় চোখ মেলেই ঠিক আমার খোলা জানলার সামনেই শুকতারা দেখতে পাই— তাকে আমার ভারী মিষ্টি লাগে— সেও আমার দিকে চেয়ে থাকে, যেন বহুকালের আমার আপনার লোক। মনে আছে, যখন শিলাইদহে কাছারি করে সন্ধ্যে বেলায় নৌকো করে নদী পার হতুম, এবং রোজ আকাশে সন্ধ্যাতারা দেখতে পেতুম, আমার ভারী একটা সান্ত্বনা বোধ হতো। ঠিক মনে হত, আমার নদীটি যেন আমার ঘর সংসার এবং আমার সন্ধ্যাতারাটি আমার এই ঘরের গৃহলক্ষ্মী— আমি কখন কাছারি থেকে ফিরে আসব এইজন্যে সে উজ্জ্বল হয়ে সেজে বসে আছে। তার কাছে থেকে তখন একটি স্নেহস্পর্শ পেতুম। তখন নদীটি নিস্তব্ধ হয়ে থাকত, বাতাস কি ঠাণ্ডা, কোথাও কিছু শব্দ নেই, ভারী যেন একটা ঘনিষ্ঠতারভাবে আমার সেই প্রশান্ত সংসারটি পরিপূর্ণ হয়ে থাকত। আমার সেই শিলাইদহে প্রতি সন্ধ্যায় নিস্তব্ধ অন্ধকারে নদী পার হওয়াটা খুব স্পষ্ট রূপে প্রায়ই মনে পড়ে। ভোরের বেলায় প্রথম দৃষ্টিপাতেই শুকতারাটি দেখে তাকে আমার একটি বহু পরিচিত সহাস্য সহচরী না মনে করে থাকতে পারি নে; সে যেন একটি চিরজাগ্রত কল্যাণ কামনার মতো ঠিক আমার নিদ্রিত মুখের উপর প্রফুল্ল স্নেহ বিকিরণ করতে থাকে।..."[১১]

রবীন্দ্রনাথের এই চিঠিগুলি অসাধারণ। পতিসরে রবীন্দ্রনাথ পল্লীউন্নয়নে সফলতা অর্জন করেছিলেন সে কথা ইতোপূর্বেই বলেছি। কিন্তু তাঁর সাহিত্যচর্চা বিশেষ করে, কবিতা, গান এবং গল্পের পাশাপাশি তাঁর চিঠিপত্র এমন আবেগধর্মী এবং জীবনঅন্বিষ্ট হয়ে উঠল যার তুলনা মেলা ভার। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণের তাগিদ এসেছে তাঁর নিজের কাছ থেকেই। তাঁর অন্তরে যে সত্যের আবির্ভাব হয়েছিল— যাকে তিনি পেয়েছিলেন আপনার অনুভূতির পরতে পরতে, তিনিই তাঁকে মানুষের কাছে নিয়োজিত করেছিলেন। জমিদার হিসেবে তাঁর দায়িত্ব ছিল পরিবার এবং সংসার জীবনের, কিন্তু কবি - জমিদারের দায়িত্ব ছিল অপরিসীম। সাহিত্য তাঁকে বিবেকবান করেছে, দেশপ্রেমী করেছে। শিলাইদহ এবং পতিসরে তাঁর পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচী একটি জাতিকে সংগঠিত হতে সাহায্য করেছে। পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচীর মধ্যে তিনি কেবল একটি ভংগুর সমাজের অর্থনৈতিক মুক্তি দেখেন নি— এর মাধ্যমে তিনি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি সাধন করতে চেয়েছিলেন। সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের ধারণা জন্ম নেওয়ার অনেক আগেই রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের মধ্য ও উত্তরবঙ্গে তাঁর জমিদারিতেই যে বিপ্লব ঘটিয়ে গেছেন তা সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের ভিত্তিভূমি হতে পারে। একটি দেশের উন্নয়ন যে কেবল নগরকেন্দ্রিক হতে পারে না বরং বলা যেতে পারে, নগরের অস্তিত্বের জন্য গ্রামের উন্নতি অপরিহার্য, রবীন্দ্রনাথ তা বুঝেছিলেন। সে কারণেই তাঁর 'ফিরে চল মাটির টানে' গানটি শুধু একটি গানই ছিল না সেটি ছিল কবির অন্তরের প্রেরণার উৎস।

১৮৯০ সাল থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশে তাঁর

জমিদারির দায়িত্ব পালন করেছেন। এই দায়িত্ব যে কত কঠিন ছিল, তা তিনি তাঁর কর্মে প্রমাণ রেখে গেছেন। পতিসরে তাঁর এই কাজের পরিচয় আছে। অবশ্য পতিসরে তিনি যে কাজ আরম্ভ করেছিলেন তা পূর্বেই শিলাইদহে চালু ছিল। শিলাইদহে তিনি 'মণ্ডলী' প্রথা প্রবর্তন করেছিলেন। একাজ সুসম্পন্ন করার জন্য তিনিই কালীমোহন ঘোষকে নিয়োজিত করেন। কালীমোহন ঘোষ ছিলেন সেকালের একজন নামকরা স্বদেশী। তাঁর বাড়ি ছিল চাঁদপুরে। তিনি রবীন্দ্রনাথের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে শিলাইদহে আসেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে কর্মী হিসেবে নিয়োগ দেন। এখানে পরে শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠিত হলে সকল উন্নয়ন কর্মের সহযোগী ছিলেন তিনি। বলা যেতে পারে, শ্রীনিকেতনে পল্লীউন্নয়ন কর্মকাণ্ডের একনিষ্ঠ এবং নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন তিনি। ১৯৪০ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। কালীগ্রাম পরগনার পল্লীউন্নয়নের কাজে নিয়োজিত হয়েছিলেন অতুল সেন। তিনিও ছিলেন স্বদেশী। কালীমোহন ঘোষের মত তিনিও রবীন্দ্রনাথের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন। প্রকৃতঅর্থে কালীমোহন ঘোষ এবং অতুল সেন উভয়েই বাংলাদেশের শিলাইদহ এবং পতিসরে রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের প্রধান ভূমিকা পালন করেন। পতিসরে কাজ করতে করতে রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন বাংলাদেশে (পূর্ববাংলা) এ কাজ হয়তো পূর্ণাঙ্গভাবে তিনি সমাধা করতে পারবেন না। সে কারণেই শান্তিনিকেতনে তিনি পল্লীউন্নয়নের কাজ শুরু করেন। কিন্তু তখনও বাংলাদেশে পতিসরে তাঁর জমিদারি ছিল। এ কারণে তিনি তাঁর পরিকল্পনার সিংহভাগ এখানেই বাস্তবায়নে সচেষ্ট হন। অতুল সেনকে নিয়ে পতিসরে রবীন্দ্রনাথ পল্লীউন্নয়নের যে পরিকল্পনা করেন শান্তিনিকেতেনের প্রাক্তন ছাত্র মনোরঞ্জন চৌধুরীকে একটি পত্রে সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অবহিত করেন।

> "পতিসরে আমি কিছুকাল হইতে পল্লীসমাজ গড়িবার চেষ্টা করিতেছি, যাহাতে দরিদ্র চাষি প্রজারা নিজেরা একত্রে মিলিয়া নিজেদের দারিদ্র্য অস্বাস্থ্য ও অজ্ঞান দূর করিতে পারে। নিজের চেষ্টায় রাস্তাঘাট নির্মাণ করে, এই আমার অভিপ্রায়। প্রায় ৬০০ পল্লী লইয়া কাজ ফাঁদিয়াছি— আমরা যে টাকা দিই ও প্রজারা যে টাকা উঠায় তাহাতে বৎসরে ১১০০০ টাকার আয় দাঁড়ায়াছে। এই টাকা ইহারা নিজে কমিটি করিয়া ব্যয় করে। ইহারা ইতিমধ্যে অনেক কাজ করিয়াছে। কিন্তু অপব্যয় ও উচ্ছৃঙ্খলতা যথেষ্ট আছে। এইজন্য কিছুদিন হইল আমি নিজে গিয়া সকলকে ডাকিয়া নূতন নিয়ম বাঁধিয়া দিয়া আসিয়াছি। এখন যিনি অধ্যক্ষ তাঁহার সঙ্গে কর্মচারীদের খিটিমিটি হওয়াতে কর্মচারীরা প্রজাদের ভুল বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছে। এ সময়ে আমি যদি অতি শীঘ্র না যাই তবে অনুতাপ করিতে হইবে। ইহার পর গ্রামে ওলাওঠা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে—আমি স্বয়ং উপস্থিত থাকিলে তাহারা ভালরূপ প্রতিকার হইতে পারিবে। এমন অবস্থায় আমি কাহার খাতিরে একদিনও যদি বিলম্ব করি তবে অপরাধ হইবে। এ কথা মনে রাখিয়া আমি বিশ্রাম করিতে পারিলে

> বাঁচিতাম— যে কাজের মধ্যে যাইতেছি তাহা আরামের নহে- কিন্তু তাহা অত্যাবশ্যক... বাকুড়ায় যাওয়ার আবশ্যকতা সে জাতীয় নহে। অতএব, আমার প্রতি অসন্তোষ ও বিরক্তিকে আমি শিরোধার্য করিয়াই মঙ্গলবারের দিন পতিসরে চলিয়া যাইব। সে জায়গা মনোরম নয়, স্বাস্থ্যকর নয়, সেইজন্যই মন সহজেই সেখানে না যাইবার ছুতা খোঁজে— ইহার উপরেও তোমরা যদি সামান্য কারণে উপদ্রব করিতে চাও তবে তাহাতে আমার বোঝা বাড়াইয়া আমাকে ক্লিষ্ট করিয়া তুলিবে। তোমরা আমাকে চেন, অতএব আমার উপরে এই বিশ্বাস স্থির রাখিয়ো যে, আমি দেহ মনকে সামজিক দায়িত্ব হইতে যেটুকু বাঁচাইয়া চলি তার কারণ আলস্য নয়, তার কারণ— আমার উপর কাজের ভার আছে, সে কাজ আমাকে নির্বাহ করিতেই হইবে। ইতি ১৩ মাঘ ১৩২২।"[১২]

উপরোক্ত চিঠিতে গ্রামের সাধারণ মানুষের প্রতি রবীন্দ্রনাথের দায়িত্ববোধ এবং এ বিষয়ে তাঁর মনোভাব সুস্পষ্ট। তিনি যে কতখানি দেশপ্রেমী ও প্রজাহিতেষী ছিলেন তা সহজেই অনুমেয়। প্রজাদের অসুখবিসুখের সংবাদ তাঁকে যে পরিমাণ উতলা করেছে তা অপরিকল্পনীয়। গ্রামে ওলাওঠা দেখা দিয়েছে, তাঁর অবর্তমানে প্রজাদের ভালো চিকিৎসা হবে না, এটা মনে করেই তিনি অস্থির হয়ে পড়েন এবং নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েও তিনি পতিসরে ছুটে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ বাকুড়ায় যাবেন, এমন সম্ভাবনা ছিল। সে সময় বাকুড়া কলেজে একটি অনুষ্ঠান ছিল। বাকুড়া কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ ছিলেন মিঃ টমসন। তিনি রবীন্দ্রনাথের ভক্ত এবং রবীন্দ্রজীবনীকার ছিলেন। বাকুড়ায় তাঁর না যাওয়ার তিনি দুঃখ পাবেন এবং বিরক্ত হবেন এটা রবীন্দ্রনাথ জানতেন। কিন্তু পতিসরে তাঁর দায়িত্ব অন্যসবকিছুর উর্ধ্বে— এ কথা তিনি অন্যদের বোঝাতে চেয়েছিলেন। এই চিঠি প্রসংগেই তিনি উল্লেখ করেন :

> "টমসন সাহেব বিরক্ত হইতে পারেন, সেজন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু তোমরাতো আমাকে জান, তোমরা কি জন্য আমাকে অনাবশ্যক টানাটানি করিবার ইচ্ছা করিতেছ ? আমর যে বয়স ও যে অবস্থা, এখন আমার শক্তি সাবধানে ব্যয় করার দরকার। হাতে যে কাজ পড়িয়াছে তার অতিরিক্ত কিছু করিতে গেলে সেই কাজের ক্ষতি হয়; কেননা আমার শরীরের সামর্থ্য এখন পরিমিত।... "[১৩]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জমিদারিতে পল্লীউন্নয়নের কাজটিকে কীভাবে দেখতেন, বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর সম্পাদক ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রকে লেখা একটি চিঠিতে তা ব্যক্ত হয়েছে।

> "আপনার রিপোর্টে আমার নাম আর যে কোনো আশায় ও উপলক্ষে ব্যবহার করুন, পল্লীর কাজটাকে বাদ দিবেন। আমার কাজকে আমি কোনোমতেই প্রচার করিতে চাই না— কারণ, আমি পাব্লিকের কাছে সাহায্য চাই না, খ্যাতিও চাই না, সুতরাং নিন্দাও না। আমার কাজ আমার গোপন কাজ। যাঁহাকে উৎসর্গ করিয়াছি তিনিই তাহার রিপোর্ট

গ্রহণ করিবেন। এই পল্লীর কথা আপনি রিপোর্টে ব্যবহার করিতে পারিবেন না।...

আর কিছু বলিবার নাই। মোটকথাটা, যে কাজ আমার জীবনের সাধনা তাহাকে বাহিরের দৃষ্টিতে সম্মুখে স্থাপিত করিয়া ধরা আমার সাধনার প্রতিকূল— তাহাতে কাজেরও ক্ষতি হয়, নিজেরও। এইজন্যই আপনি বিরক্ত হইবেন জানিয়াও এই বিষয়ে আপনাকে সম্মতি দিতে পারিলাম না, কারণ বিষয়টি আমার পক্ষে বিশেষ গুরুতর। ইতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১১ই চৈত্র ১৩২২।"[১৪]

পতিসরে পল্লীউন্নয়ন মূলত কালিগ্রাম পরগনাভিত্তিক। কালিগ্রাম পরগনা রাজশাহী ও বগুড়া জিলার আত্রাই, রঘুরামপুর, রানীনগর সান্তাহাব, তিলকপুর, আদমদিঘী, নসরৎপুর ও তালোড়া রেলস্টেশন ঘিরে বিস্তৃত।

কালিগ্রাম পরগনার সদর কাছারি ছিল পতিসর। এখানে ঠাকুর-এস্টেটের একটি কুঠিবাড়ি আছে। রবীন্দ্রনাথ এই কুঠিবাড়ি এবং পতিসর সংলগ্ন নাগর নদীর উপর বড়ো বজরায় থেকেছেন এবং জমিদারি পরিচালনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সময় পতিসরে যাওয়া তেমন সহজ ছিল না। নদীপথই ছিল যাতয়াতের মাধ্যম। নওগাঁ মহাকুমা (বর্তমানে জিলা) সদর থেকে ২৯ কিলোমিটার দক্ষিণে আত্রাই রেলস্টেশন থেকে ১২ কিলোমিটার পূর্বে পতিসর। সড়ক পথে নওগাঁ সদর থেকে পতিসরের দূরত্ব ২৬ কিলোমিটার। নওগাঁ রানীনগর হয়ে পতিসর পর্যন্ত পাকা সড়ক সম্প্রতি নির্মিত হয়েছে। বগুড়া জেলার আদমদিঘী থেকেও পতিসর পর্যন্ত কাঁচা রাস্তা আছে। আদমদিঘী রাতোয়াল হয়েও পতিসরে যাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ অধিকাংশ সময় নদীপথে আত্রাই এবং নাগরনদী দিয়ে পতিসরে যেতেন। শুকনোর সময় আত্রাই থেকে পালকি কিংবা হাতিতে চড়েও পতিসরে যাওয়া-আসা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। অনেক সময় সাজাদপুর থেকে নদীপথে যাতয়াতের সময় চলনবিল পার হতে হয়েছে কবিকে। পতিসর অঞ্চলটি ছিল অত্যন্ত দুর্গম। শিলাইদহের মতো এমন উর্বর ছিল না। ফলে জমিদারির রাজস্ব আদায় তেমন হয় নি। জমিদারের কাছারি হিসেবেই গুরুত্ব ছিল পতিসরের। এই পতিসরকেই রবীন্দ্রনাথ পুরোপুরি নির্মাণ করেছিলেন আপন ধ্যানধারণায়। এখানে সোনা ফলিয়াছেন তিনি। স্বদেশী কর্মী অতুল সেন পতিসরের দায়িত্বে। তাঁর সহকর্মী ছিলেন উপেন্দ্র ভদ্র এবং বিশ্বের বসুসহ আরও কয়েক জন। এখানে উন্নয়ন কর্ম পাঁচটা প্রধানখাতে বিভক্ত ছিল।"[১৫]

এক. চিকিৎসা ব্যবস্থা, দুই. প্রাথমিক শিক্ষাবিধান, তিন. পাবলিক ওয়ার্কস— যেমন কূপ খনন, রাস্তা প্রস্তুত ও মেরামত, জঙ্গল সংস্কার প্রভৃতি, চার. ঋণ প্রদানে সহায়তা অথবা ঋণদায় থেকে দরিদ্র চাষিকে রক্ষা, পাঁচ. সালিশী বিচারের মাধ্যমে কলহ ইত্যাদির নিষ্পত্তি।

প্রথম উদ্দেশ্য: চিকিৎসাব্যবস্থা

প্রথমে কাজ শুরু হয় তিনটি কেন্দ্রে : পতিসর, কামতা ও রাতোয়ালে। এখানে হাসপাতাল ও ঔষাধালয় স্থাপন করে বিনামূল্যে ঔষুধ বিতরণ করা হতো। হাসপাতালে ডাক্তার ও নার্স থাকতেন। রোগীদের জন্য দু-একটি বেডেরও ব্যবস্থা ছিল। এ সবের ব্যয়ভার অংশত জমিদার হিসেবে রবীন্দ্রনাথ এবং অংশত প্রজারা বহন করতেন। পতিসরে রবীন্দ্রনাথ 'মণ্ডলী'প্রথা 'হিতৈষী'সভা গড়ে তোলেন। এ সবের মাধ্যমে তিনি প্রজাদের জন্য একটি কল্যাণ তহবিল গঠন করেছিলেন। খাজনার টাকা পিছু এক আনা দিতেন রবীন্দ্রনাথ এবং প্রজারা দিতেন এক আনা।

সালিশী বিচারের মাধ্যমেও তহবিল গঠন করা হতো। এইসব টাকা সাধারণ ফান্ডে জমা হতো এবং পরে তা সকলের কল্যাণের জন্য ব্যবহৃত হতো।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য : প্রাথমিক শিক্ষাবিধান

পতিসর এবং অন্য দুইটি কেন্দ্র কামতা এবং রাতোয়ালে নিরক্ষরতা দূরীকরণার্থে দুই শতাধিক নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছিল। শিশু এবং বয়োজ্যেষ্ঠদের জন্য দিবা ও নৈশবিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করা হয়। অক্ষরজ্ঞান শেষে পাটীগণিত ও পড়া-শেখার ব্যবস্থা থাকত। অতঃপর ইতিহাস, ভূগোল, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, প্রাথমিক চিকিৎসা (first aid), কৃষিশিক্ষা, অগ্নিনির্বাপণ এবং বন্যার সময় কর্তব্য ইত্যাদি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞানদান করা হতো। অবসর সময়ে পৃথিবীর ও দেশের খবরাখবর জানানো হতো।

তৃতীয় উদ্দেশ্য : পাবলিক ওয়ার্কস- জনকল্যাণমূলক কার্য

এই পর্যায়ে পুকুর খনন, কূপ খনন, রাস্তা মেরামত ও সংস্কার, জঙ্গল পরিষ্কার প্রভৃতি করা হতো। এই কাজ ছিল ব্যয়সাধ্য। অতুল সেন এই কাজে ব্যয় নির্বাহের জন্য চমৎকার ব্যবস্থা করেন। প্রজাদের নিকট থেকে কায়িক পরিশ্রম বাবদ চাঁদা নেওয়া হতো। যারা কায়িক পরিশ্রম দিতে পারতো না তারা কায়িক পরিশ্রমের পরিবর্তে চাঁদা হিসেবে অর্থ প্রদান করতো। এইভাবে ৭/৮ মাসের মধ্যে এই তিনটি কেন্দ্রসহ অন্যত্র কয়েক হাজার টাকা জনকল্যাণে ব্যয় করা সম্ভব হয়েছিল।

চতুর্থ উদ্দেশ্য : ঋণদায় থেকে বিপন্ন কৃষকদের রক্ষার ব্যবস্থা

এটি ছিল রবীন্দ্রনাথের এক অসাধারণ পরিকল্পনা। তিনি নিজেই এই পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিলেন। এই পরিকল্পনানুসারে ঠাকুর এস্টেট প্রজাদের ঋণের দায় নিস্পত্তির ব্যবস্হা নিয়েছিল। এস্টেট থেকে প্রজাদের মাসিক

শতকরা নয় টাকা সুদে ঋণ প্রদান করা হতো। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছিলেন প্রজারা অনেক সময় না বুঝে অতিরিক্তি ঋণ গ্রহণ করে তা ভোজন বিলাস বা অপ্রয়োজনীয় কাজে ব্যয় করে বিপন্ন হয়ে পড়ত। অতুল সেন ও তাঁর কর্মীসংঘ হিসাব করে প্রজাদের প্রয়োজন নির্ধারণ করতেন। অতঃপর ভোজন দক্ষিণার পরিবর্তে সাধারণ ফান্ডে কিছু চাঁদা নিয়ে তাদেরকে নিষ্কৃতি দিতে লাগলেন। রবীন্দ্রনাথ এই কাজটি নায়েবদের হাতে ছেড়ে দেন নি। কারণ, তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে বেতনভোগীদের হাতে এ কাজের দায়িত্ব প্রদান করা হলে অনাচার বৃদ্ধি পাবে। ঋণ গ্রহণের কারণে চাষি তার ফসল সরাসরি ঘরে নিতে পারত না। তাকে সে ফসল ঠাকুর-এস্টেটে জমা দিতে হতো। অতঃপর ফসলের দাম হিসাব করে ঋণ শোধ হবার পর যা উদ্বৃত্ত থাকত তা কৃষক ঘরে নিতে পারত। এই সময় কৃষকের শতকরা ৩ টাকা সুদ মাফ করে দেওয়া হতো। অর্থ্যাৎ সুদ শতকরা নয় টাকার পরিবর্তে ছয় টাকা গ্রহণ করা হতো। কোনক্ষেত্রে কৃষকের ঋণে টান পড়লে তা মাফ করে দেওয়া হতো। এর পরে ঋণমুক্ত প্রজা পুনরায় প্রয়োজন মত ঋণ গ্রহণ করার অধিকারী হতো। এর ফলে কৃষক বা প্রজাসাধারণকে চক্রবৃদ্ধি হারে সর্বনাশা সুদের কবলে পড়তে হতো না।

রবীন্দ্রনাথের এই কৃষি বা প্রজা ঋণ পরিকল্পনা কালিগ্রাম পরগনায় অত্যন্ত সফল হয়েছিল। ফলে কাবুলীপন্থি অন্যান্য মহাজনী ঋণদান প্রকল্প অচল হয়ে পড়েছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে এই কাজের জন্য অপবাদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কৃষকের ফসল সরাসরি কৃষকের ঘরে না যেয়ে জমিদারের ঘরে যেয়ে উঠত। এ কারণে অনেকে মনে করতো যে জমিদার হিসেবে রবীন্দ্রনাথ এই ফসল আত্মসাৎ করে নিতেন। কিন্তু বাস্তবে ঘটনাটি ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। একটি কেন্দ্রস্থলে ফসল জমা হবার পর ফসলের দাম নির্ধারণ শেষে ঋণের টাকা কেটে নিয়ে উদ্বৃত্ত ফসল কৃষককে ফেরৎ দেওয়া হতো।

পঞ্চম উদ্দেশ্য : সালিশী বিচারের মাধমে কলহের নিষ্পত্তি

এই ব্যবস্থা ঠাকুর এস্টেটে আগের থেকে অল্প কিছু ছিল। রবীন্দ্রনাথ এই দায়িত্বটি পুরোপুরিভাবে অতুল সেনকে প্রদান করেন। প্রজাদের মধ্যে কোন বিবাদ বিরোধিতা দেখা দিলে অতুল সেন তাঁর তত্ত্বাবধানে এবং বুদ্ধিমত এইসব বিবাদ ঠিকঠাক সুরাহা করে দিতেন। এর ফলে গ্রামের কোন বিরোধ মামলা হিসেবে আদালতে যায় নি। অতুল বাবুর মিমাংসায় কেউ সন্তুষ্ট না হলে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তা সুরাহা করে দিতেন। তবে সকলেই অতুল সেনের মামলা সুরাহা ব্যবস্থা মেনে নিত।

গ্রামের সঠিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের এই পরিকল্পনা ছিল অসাধারণ এবং বৈপ্লবিক। তাঁর পূর্বে এমনতর চিন্তা রাজনীতিবিদ বা সমাজকর্মীরা করতে সক্ষম হন নি। শিলাইদহে এবং পতিসরে রবীন্দ্রনাথের এই গ্রামোন্নয়ন পরিষদ বাংলাদেশে (পূর্ববাংলায়) একটি যুগান্তাকারী পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হয়েছিল।

প্রকৃতঅর্থে এই গ্রামোন্নয়ন পরিষদ যা গোটা এলাকাকে কয়েকটি 'মণ্ডলী'তে বিভক্ত করে 'হিতৈষী'সভার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ও শাখা গঠন করে সমগ্র এলাকায় গ্রামের মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা, বিচার, জনকল্যাণমূলক কাজ, যেমন রাস্তাঘাট নির্মাণ, কূপ পুস্কারিণী খনন, কৃষির উন্নতি, গো-রক্ষণ, চাষিদের মধ্যে নিজ শক্তিতে আর্থিক উন্নতি বিধান, সমবায় নীতিতে আস্থা, শস্যভান্ডার স্থাপন, কুটিরশিল্পে আত্মনিয়োগ এবং জমিদার ও মহাজনদের নিকট থেকে আত্মরক্ষা ইত্যাদি কর্মযজ্ঞে উদ্বুদ্ধ করেছিল। গ্রামে গ্রামে সমিতি গঠন করা ছিল এই কর্ম পরিষদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এইসব সমিতির মাধ্যমে শুধু যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন সংঘঠিত হয়েছিল তা নয়, গ্রামীণ সাহিত্য সংস্কৃতির-সংরক্ষণে এবং সম্প্রসারণও সম্ভব হয়েছিল। বিভিন্ন মেলা ও উৎসবের মাধ্যমে গ্রামকে উজ্জীবিত করে তোলা হয়েছিল। অতীতে একদিন 'পঞ্চায়েতী' প্রথার মাধ্যমে গ্রাম নিজেরাই নিজেদের শাসন ও উন্নয়ন ঘটিয়েছিল যা পরবর্তীকালে ব্রিটিশ আমলে ধ্বংশ হয়ে পড়ে, রবীন্দ্রনাথ তাকেই পুনরজ্জীবিত করে তোলেন নূতন আঙ্গিকে। রবীন্দ্রনাথ গ্রামাঞ্চলে 'মণ্ডলী' প্রথা ও 'হিতৈষী' সভার মাধ্যমে গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটিয়েছিলেন। এই সময় অতুল সেনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি চিঠি থেকে গ্রামোন্নয়নের অগ্রগতির কথা জানা যায়।

পদ্মাচর অগ্রহায়ণ ১৩২২

"কালিগ্রামের কাজ সম্বন্ধে আমার মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিল— এমন কি রাত্রে ঘুম থেকে জেগে আমি এই কথা আলোচনা করে ঘুমতে পারি নি। তোমার চিঠি পড়ে মনটা সুস্থ হল। আমি অত্যন্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন দেহ নিয়ে এখানে এসেছি তাই কয়েকদিন নদীর উপরে থেকে একটু সুস্থ হয়ে নেবার চেষ্টায় আছি। এখানেও প্রজাদের নানা দরবার উপস্থিত হয়েছে, তাই সমস্ত না সেরে নড়তে পারছিনে। কাজ কর্মের প্রণালি সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে বসে মোকাবিলায় ঠিক করা যাবে।"[১৬]

অপর একটি চিঠি:

"তোমার অধিকার সম্বন্ধে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছিলাম। তোমাদের হিসাবের খাতা পরিষ্কার করিয়া রাখিয়ো অর্থ্যাৎ যাহাতে কাজের অঙ্গ কোনোমতে অসম্পূর্ণ না হয় সেটার প্রতি বিশেষ লক্ষ রাখিবে। তোমাদের হিসাব যখন ধঁফরঃ হইবে তখন সকল প্রকার ব্যয়ের voucher যেন থাকে এবং মোটা মোটা খরচ সম্বন্ধে সুরেনের হুকুম আদায় করিয়া রাখিয়ে— হিসাব সম্বন্ধে কোনো ত্রুটি রাখিলে সেই ছিদ্র দিয়া নৌকাডুবি হইতে পারে। আসল কাজটা যে তোমরা করিয়া তুলিবে সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ মাত্র নাই। আজ অত্যন্ত ব্যস্ত আছি। ইতি ৬ মাঘ ১৩২২।"[১৭]

রবীন্দ্রনাথ পল্লীউন্নয়নের কাজটিকে তাঁর নিজস্ব দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন এবং এই কাজে তিনি কোন প্রচার চান নি। ইতোপূর্বে তা আমরা

লক্ষ্য করেছি। তিনি এই কাজটিকে পরিপূর্ণভাবে মানুষের মঙ্গলের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন এবং স্রষ্টার প্রতি আস্থা রেখেছিলেন।

এই সময়ে পতিসরে গ্রামের মানুষের মধ্যে ওলাওঠা রোগের প্রাদুর্ভাব হলে তিনি তা প্রতিকারের জন্য সচেষ্ট হন। কলকাতা থেকে ডাক্তার ও ঔষুধ পাঠিয়ে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। পতিসরে পল্লীউন্নয়নের দায়িত্বভার ছিল অতুল সেনের ওপর। তিনি প্রতিনিয়ত তাঁর কাজে সহায়তা প্রদান করতেন। এ সব কাজে যাতে খরচ বৃদ্ধি না হয় সে দিকেও তাঁর দৃষ্টি ছিল। পল্লীউন্নয়নের কাজটিকে তিনি কতদূর দায়িত্ব সহকারে করতে চাইতেন এবং সাধারণ মানুষের মঙ্গলচিন্তা যে কতদূর তাঁর অন্তর জুড়ে ছিল পতিসরে দায়িত্বে নিয়োজিত অতুল সেনকে লেখা নিম্নের পত্রগুলিতে তা পরিষ্কার হবে।

"সমস্ত হৃদয় মন উৎসর্গ করিয়া লোকের হৃদয় অধিকার করিয়া লও। তাহা হইলেই সমস্ত বাধা কাটিয়া যাইবে। টাকা সম্বন্ধে তখনই মনে খটকা বাঁধিবে যখন মন বিমুখ হইবে। অবশ্য কর্তব্য সাধন করিতে বসিলে সকলের মন পাওয়ার যায় না এবং মন যোগাইবার দিকেই দৃষ্টি রাখিলেও চলিবে না, কিন্ত ওখানকার লোকদের স্পষ্ট বুঝিতে পারা দরকার হইবে যে তুমি অক্ষুন্ন শ্রদ্ধার যোগ্য, তাহাদের সেবায় তোমার পরিপূর্ণ শক্তি পরিপূর্ণ আনন্দে কাজ করিতেছ। তাহা হইলেই ক্রমেক্রমে সমস্ত ছোট কথা সুদূরে চলিয়া যাইবে। অতএব, কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া যাও, একদিন তোমার পূর্ণআসন তুমি অধিকার করিয়া বসিতে পারিবে। কর্তব্য সম্বন্ধে মনকে একান্ত সহজ কর— ক্ষোভকে দমন কর, যথা সম্ভব শান্ত ও নীরব হও— নম্র হইয়া আপনার শক্তিকে প্রচ্ছন্নভাবে প্রয়োগ কর, কর্মকে ধর্মসাধনার ও মুক্তি সাধনার অঙ্গ জানিয়া তপস্যাকে বিশুদ্ধ কর এবং মনকে অনন্তের মধ্যে সমাহিত করিবার অভ্যাস কর। আঘাতকে আনন্দে গ্রহণ করিবার শক্তি লাভ কর, অন্তরের পূর্ণতায় প্রতিদিন অচলপ্রতিষ্ঠা হইতে থাক। ইতি ২১ ফাগুন ১৩২২"[১৮]

অপর আর একটি চিঠি :

"তোমাদের কাজ যে রূপ চলিতেছে তাহার বিবরণ পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিলাম। সাধারণ হিতের জন্য প্রত্যেককে নিজের সামর্থ্যে খাটাইবার অভ্যাসটি যদি কোনো মতে পাকা হইয়া যায় তাহা হইলেই তোমার সকল চেষ্টার সার্থকতা হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস একবার কোথাও ইহার শুরু হইলেই ইহা দেখিতে দেখিতে গ্রামে গ্রামান্তরে ছড়াইয়া পড়িবে।

আমার একটি কথা বলিবার আছে। কাজের সঙ্গে সঙ্গে একটি আনন্দের সুর বাজাইয়া তুলিতে হইবে। আমাদের গ্রামের জীবনযাত্রা বড়ই নিরানন্দময় হইয়া পড়িয়াছে। প্রাণের শুষ্কতা দূর করা চাই। হিতোনুষ্ঠানগুলিকে যথাসম্ভব উৎসবে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়ো।

বৎসরে একদিন বৃক্ষরোপণের উৎসব করিবে। বৈশাখের শেষে কোনো একদিন ইস্কুলের ছুটি দিয়া সব ছেলেদের লইয়া বনভোজন ও বৃক্ষরোপন করিবার আয়োজন করিলে ভাল হয়। রাস্তা প্রভৃতির কাজ আরম্ভ করিবার প্রথম দিনটায় একটু উৎসবের ভাব থাকিলে এগুলো ধর্মকর্মের চেহারা পাইবে। আর একটি কথা মনে রাখা চাই। চাষি গৃহস্থদের মনে ফুলগাছের সখ প্রবর্তন করিতে পারিলে উপকার হইবে। প্রত্যেক কুটিরের আঙিনায় দুই চারিটি বেলফুল গোলাপফুলের গাছ লাগাইতে পারিলে গ্রামগুলি সুন্দর হইয়া উঠিবে। দেশে এই সৌন্দর্যের চর্চা অত্যাবশ্যক একথা ভুলিলে চলিবে না।..."[১৯]

এই প্রসংগে আর একটি চিঠি:

শিলাইদহ

"তোমার চিঠিখানি পড়ে আনন্দিত হয়েছি। আমি পতিসরে এস পৌঁছবার পূর্বেই তুমি ওখানকার ক্ষেত্রটি বেশ দখল করে বসবে এইটে হলেই সুন্দর হয়। কেন না আমি মাঝখানে পড়ে যা কিছু করব সেটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হবে না। আমার মন যোগাবার জন্য কিম্বা আমার হুকুম যা হবে সেটা হয়তো একেবারে অন্তরের জিনিস হবে না— এবং তার থেকে ঈর্ষা-বিরোধের সৃষ্টি ও হতে পারে। আমরা যে পক্ষে থাকি সে পক্ষের প্রতি অন্য সকলে অনেক সময় বিরুদ্ধভাব ধারণ করে— তার প্রধান কারণ ক্ষমতানাশের আশঙ্কা। এটা আমি বারংবার দেখেছি, সেইজন্য কারো আনুকূল্য করতে দ্বিধা হয় পাছে সেটা প্রতিকূলতা হয়ে দাঁড়ায়।

তোমরা একবার ওখানকার হৃদয় অধিকার করে দাঁড়ালেই আর কোনো ভয় থাকবে না। সে তোমরা নিশ্চয় পারবে আমি জানি সেই পারাটা তোমাদের নিজেদের কৃতিত্বে হলেই তোমাদের যথার্থ জয় হবে। যে কাজে তোমরা প্রবৃত্ত হচ্ছ সেটা তোমাদেরই যথার্থ সৃষ্টিকর্ম হয় এই আমার ইচ্ছা। তোমরা তার মধ্যে নিজের স্বাধীনতা এবং নিজের দায়িত্ব সম্পূর্ণ পরিমাণে অনুভব করবে— যখন মূর্তিটি গড়া হয়ে যাবে তখন তোমরা তার ভিতর নিজের জীবনের সাধনার প্রতিমূর্তি দেখতে পাবে। আমি কেবল তোমাদের ক্ষেত্র দিয়েছি এই পর্যন্ত— এবং যদি কখনো তোমরা আমাকে কোনো বিষয়ে তোমাদের সহযোগী করতে চাও তাহলে আমাকে পাবে।... "[২০]

অতুল সেনকে লেখা আর একটি চিঠি :

শান্তিনিকেতন

"এইতো চাই। এমনি করিয়া এক জায়গায় কাজ আরম্ভ হইলে সব জায়গাতেই হইবে। এই বৎসর প্রজারা প্রচুর ফসল পাইয়াছে বলিয়া স্ফুর্তিতে আছে— এখনি তোমার কাজের আসর জমিবে ভাল।"[২১]

উল্লিখিত চিঠিগুলিতে পল্লীর উন্নতি বিধানে রবীন্দ্রনাথের সংকল্প এবং ইচছার যে প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়— তা অভাবনীয় শুধু নয়, অভূতপূর্ব। এখানে রবীন্দ্রনাথ যথার্থ পল্লীনায়কের ভূমিকায় নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। এইসব দরিদ্র, মূঢ়, অসহায় মানুষের প্রতি এমন কর্তব্যবোধ, এমন সহমর্মিতা আমরা কোথাও কখনও লক্ষ্য করি না। তিনি প্রতিমুহূর্তেই তাদের জন্র উদ্বিগ্ন থাকতেন। তাঁর স্ত্রীবিয়োগ, সন্তান-সন্তানদের মৃত্যু, আত্মীয়-স্বজনের বিয়োগ ব্যথা সবকিছুতেই তিনি পল্লীর মানুষের মধ্যে নিজেকে সমর্পন করে সে সব দুঃখ-শোককে তিনি ভুলতে পেরেছিলেন। পল্লীর কাজকে তিনি ধর্মের কাজের সংগে যুক্ত করেছিলেন। তাঁর কর্মে এবং কথায় কোন ফাঁক ছিল না। মানুষের কবি হয়ে তাঁর জমিদারিতে তিনি অসহায় মানুষের জীবনের সংগে নিজেকে মিশিয়ে তিনি তাদেরই লোক হয়ে রইলেন। এই চিঠিগুলোর মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের যথার্থ পরিচয় নিহিত। এর মধ্যেই তাঁকে পরিপূর্ণভাবে আবিষ্কার করা সম্ভব। তাঁর স্বদেশপ্রেম যে কত গভীর এবং বৈপ্লবিক ছিল তাঁর পল্লীউন্নয়ন কর্মকাণ্ডে তার প্রমাণ রয়েছে।

পতিসরে তাঁর এই সাফল্য জমিদারি-উচ্ছেদের কারণে থেমে গেলেও পশ্চিমবাংলায় বোলপুরে প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন গ্রামে তিনি তার এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেখানে সুরুল গ্রামে তিনি পল্লীউন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেবার উদ্দেশ্যে শ্রীনিকেতন স্থাপন করেছিলেন। অতঃপর শ্রীনিকেত এবং শান্তিনিকেতনের ঐতিহ্য নিয়ে গড়ে তুলেছিলন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। অদ্যাবধি ভারতে রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচী একটি 'মডেল' হিসেবে সমাদৃত। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ পল্লীপ্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য, পল্লীর মানুষের সুখ-দুঃখের মধ্যেও তাদের অধ্যাত্ম সাধনা এবং সংগীত রসপ্রিয়তা লক্ষ্য করে মুগ্ধ হয়েছিল। বৈষ্ণব এবং বাউলের সান্নিধ্য এবং গ্রামের মানুষের লোকসংস্কৃতি তাঁর মনকে প্রাণিত করেছিল।

কিন্তু পতিসরে এসে তিনি দারিদ্র্যপীড়িত বাংলাদেশকে দেখতে পেয়েছিলেন। শিলাইদহর মাটি ছিল উর্বর। কিন্তু পতিসরের জমি ছিল অনুর্বর। এখানে তখন কৃষক ও সাধারণ মানুষের জীবন ছিল নিয়ত দুঃখ ভারাক্রান্ত। এখানকার নদীগুলো ছিল শ্রোতহীন। গ্রামগুলো শ্রীহীন এবং ম্যালেরিয়া পীড়িত। বন্যার সময় এ সব গ্রামের দুরাবস্থার অন্ত ছিল না। ছিন্নপত্রাবলীতে রবীন্দ্রনাথ পতিসরের গ্রাম এবং মানুষের বর্ণনা দিয়েছেন এমনি ভাবে:

> "এত অবহেলা অস্বাস্থ্য, অসন্দৌর্য, দারিদ্র্য বর্বরতা মানুষের আবাসস্থলে কিছুতেই শোভা পায় না। সকল রকম ক্ষমতার কাছে আমরা পরাভূত হয়ে আছি— প্রকৃতি যখন উপদ্রব করে তাও সয়ে থাকি, রাজা যখন উপদ্রব করে তাও সয়ে থাকি, এবং শাস্ত্র চিরকাল ধরে যে সমস্ত দুঃসহ উপদ্রব করে আসছে তার বিরুদ্ধে কথাটি বলতে সাহস হয় না।"[২২]

এখানে থাকতেই 'শাস্তি' গল্প প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছিলেন পতিসরের জনগণের অধিকাংশই মুসলমান। তাঁরা জমিদারকে আপন করে নিয়েছিল। শিলাইদহেও তিনি মুসলমানদের নিকট থেকেই সহযোগিতা পেয়েছিলেন। এ কারণে তাঁর গল্প-উপন্যাসে মুসলমানদের প্রতি তাঁর মমত্ববোধকে আমরা লক্ষ্য করি। রবীন্দ্রনাথ এখানে শুষ্ক বাগানে ফুল ফুটিয়েছিলেন। দারিদ্র্য দূরীভূত হয়েছিল ক্রমে ক্রমে। এখানে তিনি সাধারণ মানুষকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে অনেকাংশ মুক্ত করতে পেরেছিলেন। গ্রামীণ স্তরে নূতন নেতৃত্ব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন এইসব দরিদ্র অসহায় মানুষ একবার জেগে উঠতে সক্ষম হলে দেশের দারিদ্র্য আপনি দূর হবে। সরকারি সাহায্যে এদের পঙ্গু না করে তাদেরকে আত্মনির্ভর হতে সহযোগিতা করতে হবে এবং তখনই স্বরাজ আপানা-আপনি প্রতিষ্ঠিত হবে। এজন্যই তিনি গান্ধীর আহবানকে গ্রহণ করতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ বলেন :

> "যাহাদিগকে আমরা বাপ-বেটা 'বলিয়া জানি, যাহাদের সুখ-দুঃখের মূল্য আমাদের কাছে অতি সামান্য, যাহাদের অবস্থা জানিতে হইলে গভর্নমেন্টের তথ্যতালিকা পড়িতে হয়, সুদিনে দুর্দিনে আমরা যাহাদের ছায়া মাড়াই না, আজ হঠাৎ... তাহদিগকে চড়া দামে জিনিস কিনিতে ও গুর্খার গুঁতা খাইতে আহবান করিলে আমাদের উদ্দেশ্যর প্রতি সন্দেহ জন্মিবার কথা। সন্দেহ জন্মিয়াও ছিল।"[২৩]

শিলাইদহ ও পতিসরে গ্রামোন্নয়নের কাজ শুরু করে রবীন্দ্রনাথের যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তা থেকে তিনি এই কাজে আরো গভীরভাবে নিবিষ্ট হবার প্রেরণা খুঁজে পেয়েছিলেন। এ সময়ে তিনি যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন তার বেশ কয়েকটি দিক নিয়ে তিনি পাবনায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণে তা ব্যক্ত করেছিলেন। এখানে তিনি পল্লীউন্নয়নকেই দেশ জাগরণের একমাত্র উপায় বলে গণ্য করেছিলেন। এখানে তিনি তিনটি বিষয়ের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব অর্পণ করেন।

১. গ্রাম পর্যায়ে সংগঠন গড়ে তুলতে হবে।
২. গ্রাম পর্যায়ে শিক্ষিত - অশিক্ষিত, ধনী-নির্ধনের মধ্যে বৈষম্য এবং বিচ্ছিন্নতা দূর করতে হবে।
৩. জনসাধারণের মধ্যে গ্রাম-উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে প্রসারিত করতে হবে।

এই বক্তব্যে রবীন্দ্রনাথ গ্রামে গ্রামে 'মণ্ডলী' প্রথা, সমবায় নীতির কথা এবং পল্লী থেকে জেলা এবং প্রদেশ পর্যন্ত সর্বস্তরে প্রতিনিধি সভা গঠনের প্রস্তাব প্রদান করেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই কাজে কোন প্রকার রাজনৈতিক সহযোগিতা লাভ করেন নি; বরং বলা যেতে পারে রাজনীতিবিদগণ, রবীন্দ্রনাথের এই কাজকে অবমূল্যায়ন করতে চেয়েছেন। সমাজবাদীদের কাছে তিনি ছিলেন একজন

বুর্জোয়া যিনি গরিবের ধনে লালিত। অনেকেই তাঁকে মিথ্যাভাবে 'অত্যাচারী' এবং 'সাম্প্রদায়িক' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে অনবহিত হবার কারণেই তাঁরা এসব মিথ্যা দোষারপ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর পল্লীউন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে স্বরাজ সাধন, আখ্যায় ভূষিত করেছেন। তিনি পল্লীর উন্নয়ন ঘটিয়ে সমাজতন্ত্রের পথকে সুগম করে দিয়েছিলেন। বলা চলে, সমাজতন্ত্রের একটি নূতন 'অভিধা'র বিকাশ ঘটিয়েছিলেন তিনি।

প্রকৃতপ্রস্তাবে রবীন্দ্রনাথ পতিসরে সামাজিক বিপ্লব ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। এখানে 'মণ্ডলী' প্রথা, 'হিতৈষীসভা' ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সাধারণ মানুসের অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বাসস্থানের অভাব দূর করতে চেয়েছিলেন। এখানে ধর্ম- গোলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড গড়ে উঠেছিল।

ইতোপূর্ব আমরা আলোচনা করেছি যে, রবীন্দ্রনাথ দারিদ্র্য বিমোচনে শিলাইদহ এবং পতিসরে কৃষিব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এখানে তিনি নানাধরনের কুঠিরশিল্পও স্থাপন করেছিলেন। কারণ, তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, কৃষির পাশাপাশি গ্রামকে কুঠিরশিল্পেও অগ্রসর হতে হবে। বলতে কি, ইংরেজ শাসন এদেশের গ্রামীণ অর্থনীতিতে যে ধ্বংশ আনয়ন করেছিল, রবীন্দ্রনাথ তা অনেকাংশে পুনরুদ্ধারে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। এই উদ্যোগের প্রধানতম সূচনা ছিল কৃষিব্যাংক, যা সমবায়ব্যাংক হিসেবে গড়ে উঠেছিল।

রবীন্দ্রনাথ পতিসরে 'মণ্ডলী' প্রথা ও 'হিতৈষীসভা' প্রতিষ্ঠিত করে 'পঞ্চায়েতী' প্রথার একটি নূতন এবং গণতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর এই প্রচেষ্টায় পল্লীসমাজে যে কর্মজাগরণ শুরু হয়েছিল তা একটি নূতন পল্লীসমাজ গঠন করে তোলে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, জমিদারি উচ্ছেদের কারণে এবং পরবর্তীতে দেশবিভাগ হওয়ায় রবীন্দ্রনাথের এই পরিকল্পনা নানাভাবে বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং এখানে তা আর কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয় না।

রবীন্দ্রনাথ শেষবারে যখন পতিসরে এসেছিলেন তখন ১৯৩৭ সাল। তখন তাঁর বয়স ছিল ৭৬। এ সময়ে 'পুণ্যাহ' অনুষ্ঠানে তাঁকে আসবার জন্য আন্তরিক আমন্ত্রণ জানান হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রজাদের এ আমন্ত্রণ ফিরিয়ে দেন নি। এ সম্পর্কে প্রভাতকুমার লেখেন :

> পতিসরে কাছারিপাড়াতে রবীন্দ্রনাথের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে একজন মুসলমান প্রজা কালিগ্রাম পরগনার অন্তর্গত রাতোয়াল গ্রামের কফিলউদ্দিন আকন্দ নিম্নোক্ত কবিতা পাঠ করেন:
>
> মহামান্য দেশবরেণ্য দেবতুল্য জমিদার শ্রীযুক্ত কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ
> ঠাকুর মহোদয়ের পরগনায় শুভাগমন উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি:
>
> প্রভু রূপে হেথা আস নাই তুমি
> দেবরূপে এসে দিলে দেখা

> দেবতারদান অক্ষয় হউক
> হৃদিপটে থাক স্মৃতি রেখা।'
> পতিসর সদর কাছারি
> ১২ শ্রাবণ ১৩৪৪
> মোঃ কফিলউদ্দিন আকন্দ, রাতোয়াল

পতিসরের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সে সময়ের রাজশাহীর জেলা প্রশাসক বিশিষ্ট সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায়। কবির সংগে ছিলেন কবির একান্ত সচিব সুধাকান্ত রায় চৌধুরী, অবসরপ্রাপ্ত ম্যানেজার ও শ্যালক, নগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী ও ভৃত্য বনমালী।[২৪] 'পুণ্যাহ' অনুষ্ঠানের পর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে কবি বললেন:

> "সংসার থেকে বিদায় নেবার সময় তোমাদের সঙ্গে দেখা হল— এইটিই আমার সান্ত্বনা। তোমাদের কাছে অনেক পেয়েছি— কিন্তু কিছু দিতে পেরেছি বলে মনে হয় না। সেসব কথা মনে হলে বড় দুঃখ পাই। কিন্তু আর সময় নেই, আমার যাবার সময় হয়েছে, শরীর আমার অসুস্থ— এ অবস্থায় তোমাদের মধ্যে তোমাদের সংগে থেকে তোমাদের উন্নতির জন্য কিছু করবার ইচছা থাকলেও আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে। তোমরা নিজের পায়ে দাঁড়াও। তোমাদের সবার মংগল হোক— তোমাদের সবাইকে এই আশীর্বাদই আমার শেষ আশীর্বাদ।"

অমিতাভ চৌধুরী লেখেন :

> কবির কথা শুনে প্রজাদের চোখ ছলছল। একজন বৃদ্ধ মুসলমান প্রজা রবীন্দ্রনাথকে সেলাম করে বললেন,
>
> "আমরাতো হুজুর বুড়ো হয়েছি, আমরাও চলতি পথে, বড়ই দুঃখ হয়, প্রজা-মনিবের এমন মধুর সম্বন্ধের ধারা বুঝি ভবিষ্যতে বন্ধ হয়ে যায়।"
>
> রবীন্দ্রনাথও বিচলিত, বললেন, "তোমরা আমার বড় আপনজন, তোমরা সুখে থাকো।"
>
> বিরাট জনতা নীরব। খানিক থেমে রবীন্দ্রনাথ আবার বললেন, 'তোমাদের জন্যে কিছুই করতে পারি নি। ইচ্ছা ছিল মান সম্মান সম্ভ্রম সব ছেড়ে দিয়ে তোমাদের সঙ্গে তোমাদের মতই সহজ হয়ে জীবনটা কাটিয়ে দেব। কী করে বাঁচতে হবে তোমাদের সঙ্গে মিলে সেই সাধনা করব। কিন্তু আমার এই বয়সে তা হবার নয়, আমার যাবার সময় হয়ে এসেছে। এই নিয়ে দুঃখ করে কী করব ? তোমাদের সবার উন্নতি হোক— এই কামনা নিয়ে আমি পরলোকে চলে যাব।"[২৫]

কবির সঙ্গী সচিব সুধাকান্ত রায় চৌধুরী এই প্রসংগে বলেছেন :

> "অতীতের পুরানো কথা বলতে বলতে কবি এবং প্রজাদের চোখ ছল ছল করে উঠেছে আনন্দের অশ্রুবানে। এই দৃশ্য দেখতে পাব কোনোদিন ভাবতে পারি নি।... সাম্প্রদায়িকতার এই দুর্দিনে পতিসরে মুসলমান বহুল প্রজামণ্ডলীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের আসন কোথায় সেটা চোখে যারা দেখেন নি, তাদের সে কথা লিখে বুঝিয়ে বলা শক্ত।"[২৬]

অমিতাভ চৌধুরী লেখেন :

> "ওদিকেও বিদায় নেবার সময় হয়েছে। বোট প্রস্তুত। কবিকে নিয়ে বোট ছাড়ল পতিসরের কাছারি ঘাট থেকে। নাগর ও আত্রাই নদী তিনি পোরোলেন। নদীর দুধারে প্রজাদের সারি। গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে যাচেছ তাঁর পরিচিত জনপদ, প্রত্যেকটিতে যেন তাঁরই লেখা সেই অসামান্য গল্পটির মতো সামান্য গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখ্যছবি।
>
> রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি স্থির, ভঙ্গি নিরাসক্ত। উন্নতদর্শন দীর্ঘ চেহারা ঈষৎ নুব্জ। শেষ নমস্কার তিনি জানালেন করজোড়ে।"[২৭]

তথ্যসূত্র

১. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী-১, বিশ্বভারতী, কলিকাতা ১৩৭৭, পৃ. ৩০৪।
২. ঐ, রবীন্দ্রবর্ষপঞ্জী, প্রথম সংস্করর্ণ, পৌষ ১৩৬৯, ডিসেম্বর ১৯৬২, কলিকাতা, পৃ.৩১।
৩. প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী-৩, বিশ্বভারতী, কলিকাতা ১৩৭৭, পৃ.১৬৫।
৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পত্র নং ৯ ছিন্নপত্রাবলী, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, পৃ. ৪৬।
৫. ঐ, পত্র নং ১০ ছিন্নপত্রাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৪-৪৫।
৬ ঐ, পত্র নং ১১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮।
৭. ঐ, চিঠিপত্র ১, পৃ- ৯-১০।
৮. ঐ, ছিন্নপত্রাবলী, পত্র নং, ১১, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮
৯. ঐ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪
১০. ঐ, প্রাগুক্ত, পত্র নং ১৩, পৃ.৫২।
১১. ঐ, প্রাগুক্ত, পত্র নং ১১৮, পতিসর ২৪ মার্চ ১৮৯৪, পৃ. ২০৪।
১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পল্লীপ্রকৃতি, পুলিনবিহারী সেন-কর্তৃক সংকলিত, বিশ্বভারতী, কলিকাতা ১৯৬২, পৃ. ২৬১।
১৩. ঐগ্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১।
১৪. রবীন্দ্রনাথঠাকুর, পল্লীপ্রকৃতি, প্রাগুক্ত, পৃ.২৬২
১৫. " ঐ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০-২৫৪
১৬. " ঐ, পৃ. ২৫৫
১৭. " ঐ, পৃ. ২৫৫
১৮. " ঐ, পৃ. ২৫৭-২৫৮
১৯. " ঐ, পৃ. ২৫৮-২৫৯

২০. " ঐ, পৃ. ২৫৯
২১. " ঐ, পৃ. ২৫৯-২৬০
২২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিন্নপত্রাবলী, প্রাগুক্ত, পত্র নং ১৫৩, দিঘাপতিয়া জলপথে ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪ পৃ. ২৪১-২৪২
২৩. রবীন্দ্ররচনাবলী, ১০ বিশ্বভারতী, ১৯৭১ পৃ. ৬৩০
২৪. প্রভাতকুমার মুখ্যেপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী, ৪, কলিকাতা ১৪০১, পৃ. ১০১-১০২ (প্রবাসী, অগ্রায়ন, ১৩৪৪ পৃঃ ২১০)
২৫. অমিতাভ চৌধুরী, জমিদার রবীন্দ্রনাথ, কলিকাতা ১৯৭৬, পৃ. ৮৬-৮৭
২৬. ঐ, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৭
২৭. ঐ, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৮

পঞ্চম অধ্যায়

শ্রীনিকেতন পর্ব

বাংলাদেশে (পূর্ববাংলা) ঠাকুর-এস্টেটের জমিদারি হস্তান্তরিত এবং পরবর্তীতে উচ্ছেদ হয়ে যাওয়ায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর সর্বশেষ পল্লীউন্নয়নের ক্ষেত্র পতিসর থেকে শ্রীনিকেতনে তাঁর কর্মকাণ্ড সরিয়ে নিয়ে আসেন। এখানে বলা প্রয়োজন যে শ্রীনিকেতনে হঠাৎই তিনি পল্লীউন্নয়নের কাজ শুরু করেন নি। পূর্ববাংলায় ঠাকুর-এস্টেটকে নিয়ে যখন নানা সমস্যা দেখা দিচ্ছিল, তখনই তিনি বিকল্প পদক্ষেপ হিসেবেই শ্রীনিকেতনের অবস্থান অনেকটা নিশ্চিত করে রেখেছিলেন। এ প্রসংগে শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার পেছনের ইতিহাস জানা প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথের বাবা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্ম মতাবলম্বী ছিলেন। কলকাতায় তাঁর ব্রাহ্মধর্ম ক্রমান্বয়ে বিস্তার লাভ করলেও তিনি তাঁর ধর্মাচরণের জন্য একটি নির্দিষ্ট এবং নিরিবিলি স্থান খোঁজ করেছিলেন। এই সময়ে তিনি তাঁর ব্রাহ্ম ধর্মানুসারী বীরভূম জেলার বোলপুর রেলষ্টেশন সংলগ্ন রাইপুর গ্রামের ভুবনমোহন সিংহের আমন্ত্রণ ক্রমে তাঁর বাড়িতে বেড়াতে আসেন। সময়কাল ছিল ১২৬৮ বঙ্গাব্দের সম্ভবত মাঘ মাস। রাইপুরে ভুবনমোহন সিংহের বিশাল জমিজমা ছিল। এই অঞ্চলে ইংরেজদের আধিপত্য ছিল। বোলপুর রেলষ্টেশনের কারণে এখানে ইংরেজ কমকর্তা ও কর্মচারীদের অফিস ও বাসভবন ছিল। রাইপুরের পার্শ্ববর্তী উত্তর পশ্চিম দিকের একটি গ্রামের নাম সুরুল। বোলপুরের কাছেই একটি গ্রাম ছিল সুপুর— অজয় নদীর ধারে। এই সুপুর গ্রামের পশ্চিমে রাইপুর। ভূবনমোহন সিংহের পূর্বপুরুষ ছিলেন মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনা গ্রামের অধিবাসী। ভুবনমোহন ছিলেন কর্মযোগী এবং উদ্যোগী পুরুষ। কার্যসূত্রেই তিনি রাইপুরে এসেছিলেন। সে সময় ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক প্রতিনিধি ছিলেন জন চীপ। তাঁর ব্যবসা ছিল গুড়, সুতো, নৌকার পালের কাপড় ইত্যাদির। এই চীপ সাহেবের সংগে ব্যবসা করে ভুবনমোহন প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন এবং পরবর্তীতে এই অঞ্চলের জমিদার হিসেবে গণ্য হন। চীপ সাহেবের বাড়ি ছিল বর্তমানে শ্রীনিকেতন ছাড়িয়ে সিউড়ি যাবার রাস্তায় সুরুল গ্রামের পশ্চিমে। তাঁর বাড়িকে সবাই চীপকুঠি বলে। বাড়ির গায়ে কিছুদিন আগেও খোদিত ছিল, 'Here lived Mr. Cheap in 1795.'। ভুবনমোহন এতদাঞ্চলে বেশ কয়েকঘর হিন্দু ও মুসলমান প্রজা বসিয়েছিলেন। সাধারণ মানুষের কাছে

এই অঞ্চলের নাম ছিল ভুবনডাঙা।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১২৬৮ সালে রাইপুরে এলে তিনি 'চীপকুঠি' পর্যন্ত এলাকা দেখতে যান। এই সালেই রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। দেবেন্দ্রনাথ এই জায়গাটি পছন্দ করেছিলেন। এখানে ১২৬৯ সালের ১৮ ফাল্গুন, ১৮৬৩ মার্চ মাসে তিনি দুটি ছাতিমগাছসহ কুড়ি বিঘা সম্পত্তি ভুবনমোহন সিংহের পুত্র প্রতাপ নারায়ণ সিংহের নিকট থেকে ইস্ট- ইণ্ডিয়া কোম্পানির নির্দিষ্ট বার্ষিক ৫ টাকা খাজনায় জমিদারির মৌরসী পাট্রা পেয়েছিলেন। এখানেই তিনি ছাতিমতলায় নিরাকার ব্রহ্মার উপসনার জন্য ব্রাহ্মমন্দির গড়ে তুলেন। এখানে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বসবাসের জন্য একটি বাড়ি নির্মাণ করেন। প্রথমে একতলা, পরে দোতলা। বাড়ির চারপাশের নানা গাছ রোপন করা হয়েছিল। অতঃপর বাড়ির নামকরণ হল শান্তিনিকেতন। উপাসনা মন্দির নিমার্ণের পূর্বে 'শান্তিনিকেতন' বাড়িতেই উপাসনা হতো। ১৮৮৯ সালে ঠাকুর-এস্টেটের জমিদারি দায়িত্ব নেবার পর ১৮৯৬ সালে রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে শান্তিনিকেতন বাসভবনে থেকেছেন। শান্তিনিকেতনের পাশে ছিল খোয়াই নদী এবং বিস্তীর্ণ মাঠ। এখন অবশ্য ঘর-বাড়ি এবং গাছপালায় ভরে গেছে চারদিকে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর শান্তিনিকেতনের পাশে বাংলা ১২৯৮ সনের ৭ ই পৌষ, ইংরেজি ১৮৯১ সালের ২১শে ডিসেম্বর ব্রাহ্ম্যমন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে ট্রাস্টডীড তৈরি করেন তাতে লেখা আছে:

> "... নিরাকার এক ব্রহ্মার উপাসনা ব্যতীত কোন সম্প্রদায় বিশেষের অভীষ্ট দেবতা বা পশু, পক্ষী, মনুষ্যের বা মূর্তির বা চিত্রের বা কোন চিহ্নের পূজা বা যজ্ঞাদি ঐ শান্তিনিকেতনে হইবে না। ধর্মানুষ্ঠান বা খাদ্যের জন্য জীবহিংসা বা মাংস আনয়ন বা আমিষ ভোজন বা মদ্যপান ঐ স্থানে হইতে পারিবে না। কোন ধর্ম বা মনুষ্যের উপাস্যদেবতার কোন প্রকার নিন্দা বা অবমাননা ঐ স্থানে হইবে না... ধর্মাভাব উদ্দীপনের জন্য ট্রাস্টিগণ বর্ষে বর্ষে একটি মেলা বসাইবার চেষ্টা ও উদ্যোগ করিবেন। এই মেলাতে সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের সাধু পুরুষেরা আসিয়া ধর্মবিচার ও ধর্মালাপ করিতে পারিবেন। এই মেলার উৎসবে কোন প্রকার পৌত্তলিক আরাধনা ও কুৎসিত আমোদ উল্লাস হইতে পারিবে না। মদ্যমাংস ব্যতীত এই মেলায় সর্বপ্রকার দ্রব্যাদি খরিদ বিক্রয় হইতে পারিবে। যদি কালে মেলার দ্বারা কোনরূপ আয় হয় তবে ট্রাস্টিগণ ঐ আয়ের টাকা মেলার কিম্বা আশ্রমের উন্নতির জন্য ব্যয় করিবেন। ... ইতি সন ১২৯৪ সাল তারিখ ২৬ ফাল্গুন। স্বাঃ শ্রী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।"[১]

এমন পিতার পুত্র হিসেবে রবীন্দ্রনাথের মনে তো সাম্প্রদায়িকতা থাকতে পারে না। এমন শিক্ষাতো তিনি পান নি। মহর্ষি তাঁর অসুখের সময় প্রায়শ উপনিষদ ও হাফেজের শ্লোক আবৃত্তি করতেন। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথ পিতৃসান্নিধ্যে থেকেই পৌত্তলিকতা বিরোধী এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনাসম্পন্ন মানুষ হিসেবে

গড়ে উঠেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ জমিদারি দায়িত্ব পাবার পর একদিকে শান্তিনিকেতনের শ্রীবৃদ্ধি এবং পাশাপাশি গ্রাম বাংলার উন্নয়নের জন্য নিবিষ্ট হন। ১৯০১ সালে ৫টি মাত্র ছাত্র নিয়ে তিনি শান্তিনিকেতনে শুরু করেন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়। অল্প দিনেই ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ প্রথাগত শিক্ষাকে পরিহার করে তা জীবনধর্মী করতে চেয়েছিলেন। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে একটি মুক্তবুদ্ধির উন্মেষ ঘটুক একেবারে জীবনের প্রারম্ভেই— এমনটিই তাঁর আশা ছিল। শিলাইদহে তিনি তাঁর নিজের সন্তানদের লেখা-পড়া শেখাবার জন্য তিনজন শিক্ষক নিয়োগ করেছিলেন। তাঁর মধ্যে একজন ছিলেন বিদেশী, মিঃ লরেন্স। কিন্তু সেখানে বিদ্যালয় স্থাপন করা নানা কারণে সম্ভবপর হয় নি। পরে তিনি শান্তিনিকেতনে পিতার অনুমতি নিয়ে ১৯০১ সালে যে বিদ্যালয় গড়ে তুললেন, তার নাম ছিল ব্রহ্মবিদ্যালয়। ট্রাস্ট্রডীডে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপনের নির্দেশ ছিল। রবীন্দ্রনাথ এই বিদ্যালয়কে অনেকটা আশ্রমভিত্তিক করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল,

> "এখানে সকল বিচিত্র সাধনার স্থান হইবে, সকল সাধনার ওপরে থাকিবে ব্রহ্মের সাধনা। এখানে জ্ঞানী আসিবেন, বৈজ্ঞানিক আসিবেন, শিল্পী আসিবেন— ক্রমে হয়তো বিশ্ববিদ্যালয় হইয়া উঠিবে... বিশ্ববিদ্যালয় এখানে একটা বিশ্বতীর্থের মতই হইয়া উঠিবে।"[২]

এই ব্রহ্ম্যবিদ্যালয় কালক্রমে বিশ্বভারতীতে রূপান্তরিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ জীবনের প্রথম থেকেই শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব অর্পণ করেছিলেন। তাঁর মতে,

> "ভারতবর্ষে যদি সত্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তবে গোড়া হইতেই সে বিদ্যালয় তাহার অর্থশাস্ত্র, তাহার কৃষিতত্ত্ব তাহার স্বাস্থ্যবিদ্যা, তাহার সমস্ত ব্যবহারিক বিদ্যাকে আপন প্রতিষ্ঠা স্থাপনের চতুর্দিকবর্তী পল্লীর মধ্যে প্রয়োগ করিয়া দেশের জীবনযাত্রার কেন্দ্রস্থান অধিকার করিবে। এই বিদ্যালয় উৎকৃষ্ট আদর্শে চাষ করিবে, গো-পালন করিবে, কাপড় বুনিবে এবং নিজের আর্থিক সম্বল লাভের জন্য সমবায় প্রণালি অবলম্বন করিয়া ছাত্র, শিক্ষক ও চারদিকের অধিবাসীদের সঙ্গে জীবিকার যোগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইবে। এইরূপ আদর্শ বিদ্যালয়কে আমি 'বিশ্বভারতী' নাম দিবার প্রস্তাব করিয়াছি।
>
> "Viswa Bharati represents India when she has wealth of mind which is for all. Viswa Bharati acknowledges India's obligation to offer to others the hospitality of her best cultures and India's right to accept from others their best."[৩]

১৯১৮ সাল থেকে 'বিশ্বভারতী' শব্দটি ব্যবহৃত হলেও এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় ১৯২১ সালের ডিসেম্বরে। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। ১৯২২ সালে বিশ্বভারতী সোসাইটি রেজিস্ট্রিভুক্ত সংস্থায় পরিণত হয়। ১৯২৩ সালে রবীন্দ্রনাথ ট্রাস্ট্র দলিল সম্পাদন করে

শান্তিনিকেতন ও সুরুলে অধিকৃত যাবতীয় গৃহ ও ভূমি বিশ্বভারতী সোসাইটিকে হস্তান্তরিত করেন।"[৪]

এই প্রসংগে উল্লেখ করা প্রয়োজন শিলাইদহ ও পতিসরে রবীন্দ্রনাথ গ্রামোন্নয়ন কাজে ব্যর্থ বা কখনো সফল হলেও বাংলাদেশে তাঁর গ্রামোন্নয়ন কাজ শেষ পর্যন্ত পরিপূর্ণ সফলতা এনে দিতে পারে নি। কিন্তু এ কাজে তাঁর যে অসাধারণ অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তা পরবর্তীকালে শ্রীনিকেতন গড়ে তুলতে সর্বাধিক সাহায্য করেছে।

প্রকৃতঅর্থে শিলাইদহ ও পতিসরে গ্রামোন্নয়নের মধ্যেই শ্রীনিকেতনের বীজ লুকিয়ে ছিল। পূর্ববাংলায় তাঁর জমিদারি কার্য বন্ধ হয়ে যেতে পারে, এমন ধারণা তিনি করেছিলেন। এবং সে কারণে ১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের পার্শ্ববর্তী সুরুল গ্রামে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেল-কোম্পানির একটি পুরোন কুঠিবাড়ি ক্রয় করেন। প্রায় বিশ হাজার টাকা খরচ করে এই কুঠিবাড়ি সংস্কার করা হয়। ১৩২১ সালে ১লা বৈশাখে এই কুঠিবাড়িতে গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠান হয়। এই বাড়িতে রথীন্দ্রনাথ সস্ত্রিক থাকলেও পরবর্তীতে ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত হয়ে কুঠিবাড়ি ত্যাগ করেন। ১৯১৫ সালে বসন্তকালে রবীন্দ্রনাথ কিছুকাল এই কুঠিবাড়িতে ছিলেন এবং এখানে 'ফাল্গুনী' নাটক রচনা করেন। ১৯২০ সালেও রবীন্দ্রনাথ এখানে বেশ কিছুকাল ছিলেন। ১৯২১ সালে আমেরিকায় থাকাকালীন সময়ে রবীন্দ্রনাথের সংগে লিওনার্ড এল্‌মহার্স্ট নামে একজন ইংরেজ এর দেখা হয়। তিনি আমেরিকায় কৃষিবিষয়ে শিক্ষালাভ করছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়নের বিষয়ে তাঁর আকর্ষণ বৃদ্ধি হওয়ায় তিনি শান্তিনিকেতনে চলে আসেন। এ সময় রবীন্দ্রনাথ দারুণ অর্থকষ্ট ভোগ করছিলেন। এমনি মুহূর্তে আমেরিকার একজন ধনী মহিলা ডারোথী স্ট্রেইট এর সংগে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ হয় এবং তিনি তাঁকে সব বিষয়ে অবহিত করলে ডরোথী স্বেচ্ছায় রবীন্দ্রনাথকে সাহায্য করতে আগ্রহী হন এবং শান্তিনিকেতনে চলে আসেন। এল্‌মহার্স্ট ও ডারোথীর চেষ্টায় অবশেষে সুরুলে পল্লীউন্নয়নের কাজ শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে কয়েক জন কর্মী ও ছাত্র নিয়ে এল্‌মহার্স্ট সুরুল কুঠিতে চলে আসেন। অতঃপর কৃষি ও গো-পালন নিয়ে সুরুল কৃষি খামারের গোড়াপত্তন হয়। প্রথম দিকে এর নাম ছিল সুরুল ফার্ম। কাগজপত্রে এর নাম ছিল— 'ডিপার্টমেন্ট অব এগ্রিকালচার— শান্তিনিকেতন।'

বিশ্বভারতী সোসাইটি রেজিস্ট্রিভুক্ত হওয়ার পর বিধি অনুয়ায়ী শান্তিনিকেতন কর্মসমিতি এবং সুরুল সমিতি (সুরুল এগ্রিকালচারাল বোর্ড) নামে দুটি পৃথক সমিতি গঠিত হয়। সোসাইটির প্রথম কর্মকর্তা হিসেবে এল্‌মহার্স্টকে ডিরেক্টর হিসেবে উল্লেখ করা হয়। তখন তাঁর পরিচয় ছিল ডিরেক্টর-ডিপার্টমেন্ট অব এগ্রিকালচার। এ সময় সুরুল কেন্দ্রের মোট জমির পরিমাণ ছিল ১০০ বিঘা এবং তার মূল্য দেখান হয় ১২৬০০ টাকা। এ ছাড়া এই কেন্দ্রের ইমারত ইত্যাদির মূল্য দেখান হয় ৫৪৯৬০ টাকা।[৫]

ঠিক কোন সময় সুরুল কেন্দ্রের নাম শ্রীনিকেতন রাখা হয় তার কোন সঠিক তথ্য বা বিবরণ পাওয়া যায় না। ১৯২৩ সালে ২৬ শে ডিসেম্বর তারিখে বিশ্বভারতী সোসাইটির বার্ষিক পরিষদের সভায় সোসাইটির সংবিধান সংশোধন কালে সুরুল সমিতির পরিবর্তে 'শ্রীনিকেতন সমিতি' এই কথাটির উল্লেখ পাওয়া যায়।[৬] শ্রীনিকেতনকে Institute of Rural Reconstruction হিসেবে ব্যবহারও সেই সময় থেকে হয়।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীকে দুটি নির্দিষ্ট খাতে বিভক্ত করেছিলেন। প্রথমটি, যা ছিল শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়— রবীন্দ্রনাথ এখানে সর্বজনীন শিক্ষাবিস্তারের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় খাতে তিনি কৃষিকার্য, কুটিরশিল্পের মাধ্যমে পল্লীউন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়কে রবীন্দ্রনাথ কিভাবে দেখতে চেয়েছিলেন সে সম্বন্ধে প্রেমচাঁদ লাল বলেন :

"Tagore wanted his school to be a place where —

01. Children would be happy to go because there they would have the utmost freedom and would not be forced into anything which they did not wish to do;

02. Where, under the enjoyment of the Ashram, they would find a natural outlet, for all this capacities and a greater chance of this development;

03. Where nature would be the chief teacher—others would act only as guides and not as taskmasters;

04. Where the gulf which exists in most schools between the teachers and the pupils would be bridged by a spirit of friendship and brotherliness;

05. Where the personality of the child would be respected and not suggested;

06. Where under the environment of the Ashram the pupils would find the best opportunity for their physical, moral intellectual and spiritual development:

07. Where, as members of this school community, they would learn their lesson of citizenship in a larger society and the activities of the school would be closely connected with those of the society;

08. Where the pupils would draw inspiration from their own folk-literature, and popular tradition, and receive instruction through the medium of their own vernacular.'[৭]

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকে উন্নয়নের প্রধানতম শর্ত বলে বুঝেছিলেন। এজন্য শিলাইদহ ও পতিসরে তাঁর গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনায় শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব

দিয়ে তা এই কাজে সম্পৃক্ত করা হয়েছিল। শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য ছিল, একটি শিশুকে স্বাভাবিকভাবে এবং প্রকৃতিদত্ত জ্ঞানের সংস্পর্শে রেখে তার মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটানো।

এইজন্য তিনি বিদ্যালয়কে একটি আশ্রমের সংগে তুলনা করেছিলেন। শিশুকাল থেকে একটি শিশু আশ্রম থেকে একটি বৃহত্তর পরিবেশে এসে অন্যের সাথে মিলিত হয়ে একে অপরকে দেখে জ্ঞান লাভ করবে। শিক্ষক তার অভিভাবক এবং পথনির্দেশক হবেন। ইংরাজিতে যাকে Task master বলা হয়, একজন শিক্ষক তেমনটি হবেন না। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকে মনুষ্যত্বের বিকাশ বলে জেনেছিলেন। প্রতিটি মানুষের মধ্যে মানবিক গুণাবলি রয়েছে। এই গুণাবলিকে স্বাভাবিকভাবেই বিকশিত করতে সক্ষম হলে তার যথার্থ শিক্ষালাভ ঘটবে। রবীন্দ্রনাথ ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে যেমন তাদের স্বভাবধর্মকে স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রেখে প্রকৃতি-প্রদত্ত জ্ঞানের পাশাপাশি আমাদের দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, লোকসংস্কৃতি ও সাহিত্য থেকে শিক্ষালাভের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন তেমনি এই শিক্ষার মাধ্যমেই তারা তাদের নিত্যদিনের অভাবকেও বুঝতে শিখবে এবং তা দূর করার জন্য সে ব্যবস্থা নিতে শিখবে। রবীন্দ্রনাথ এমনি শিক্ষা ব্যবস্থা শিলাইদহ ও পতিসরে প্রবর্তন করেছিলেন। কিন্তু শিলাইদহ অপেক্ষা পতিসরে তাঁর এই কাজটি বেশ এগিয়েছিল। শান্তিনিকেতনে তিনি এ কাজটি সফল করে তুলতে চেয়েছিলেন। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করে তিনি শিক্ষার সংগে কর্মকে যোগ করে শিক্ষার একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। শান্তিনিকেতন এবং শ্রীনিকেতন তাঁর এই চিন্তাভাবনার ফসল যা বিশ্বভারতীতে সফলভাবে রূপায়িত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই চিন্তা ও চেতনাকে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেছেন:

01. To concentrate in Santiniketan, in the midst of the Ashram, the different cultures of the East, especially those that have originated in India or found shelter within her shores.

02. To lay in Sriniketan, " The Institute of Rural Reconstruction, " the foundation of a happy, contented and humane life in the villages; and finally,

03. Through the Viswa-Bharati, as a whole, to seek to establish a living being relationship between East and West, to promote inter-cultural and inter-racial amity and understanding and fulfil the highest mission of the present age—the unification of mankind."[৮]

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনকে মেলাতে চেয়েছিলেন। এটিই ছিল তাঁর উন্নয়ন পরিকল্পনা। তিনি বুঝেছিলেন, একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি সফল হতে পারে না। পাশ্চাত্যের শিক্ষায় বস্তুবাদিতা প্রাধান্য পেয়েছে। তারা জেনেছে কিভাবে অভাব দূর করতে হয়। অভাবের পরে যে ঐশ্বর্য্যের সমারোহ

ঘটে তাকে তারা দুহাতে ভোগ করতে শেখে। সেখানে ধর্ম বড় হয়ে ওঠে না। তাদের ধর্ম ও নৈতিকতা বস্তুবাদকে ঘিরেই গড়ে ওঠে। কিন্তু প্রাচ্যের নৈতিকতা আবহমান কাল ধরে মানুষের জন্য যে ধর্মীয়ভিত্তিক নীতিবোধ গড়ে উঠেছে পাশ্চাত্যে তার অভাব। একারণেই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার মাধমে পূর্ব ও পশ্চিমকে একত্র করে তাদের সংস্কৃতিকে নতুনভাবে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন যাকে তিনি বলেছেন Unification of mankind' 'মানুষ এখানে এসে মিলবে, শক্তিতে নয়— সৌহার্দে। এই মিলনের অগ্রদূত ছিল তাঁর শিক্ষা সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা। রবীন্দ্রনাথ বলেন:

> "দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষা সম্বন্ধে আমার মনের মধ্যে যে মতটি সক্রিয় ছিল, মোটের ওপর সেটি হচ্ছে এই যে, শিক্ষা হবে প্রতিদিনের জীবনযাত্রার নিকট অঙ্গ, চলবে তার সঙ্গে এক তালে এক সুরে, সেটা ক্লাস নামধারী খাবার জিনিস হবে না। আর যে বিশ্বপ্রকৃতি প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে আমাদের দেহে মনে শিক্ষা-বিস্তার করে সেও এর সঙ্গে হবে মিলিত। প্রকৃতির এই শিক্ষালয়ের একটা অঙ্গ পর্যবেক্ষণ আর একটা পরীক্ষা, এবং সকলের চেয়ে বড়ো তার কাজ প্রাণের মধ্যে আনন্দ সঞ্চার, এই গেল বাহ্যপ্রকৃতি। আর আছে দেশের অন্ত:প্রকৃতি, তারও বিশেষ রস আছে, রঙ আছে, ধ্বনি আছে। ভারতবর্ষের চিরকালের যে চিত্র সেটার আশ্রয় সংস্কৃত ভাষায়। এই ভাষার তীর্থপথ দিয়ে আমরা দেশের চিন্ময় প্রকৃতির স্পর্শ পাব, তাকে অন্তরে গ্রহণ করব, শিক্ষার এই লক্ষ্য মনে আমার দৃঢ় ছিল। ইংরেজি ভাষার ভিতর দিয়ে নানা জ্ঞাতব্য বিষয় আমরা জানতে পারি, সেগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার একটা আনন্দ আছে, সে রঞ্জিত করে আমাদের মনের আকাশকে, তার মধ্যে সে আমাদের শান্তি দেয় এবং চিন্তাকে মর্যাদা দিয়ে থাকে।
>
> যে শিক্ষাতত্ত্বকে আমি শ্রদ্ধা করি তার ভূমিকা হল এইখানে। এতে যথেষ্ট সাহসের প্রয়োজন ছিল কেননা এর পথ অনভ্যস্ত এবং চরম ফল অপরিক্ষীত। এই শিক্ষাকে শেষ পর্যন্ত চালনা করবার শক্তি আমার ছিল না, কিন্তু এর পরে নিষ্ঠা আমার অবিচলিত।"[৯]

রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত ভাষার প্রতি তাঁর প্রীতিময়তার কথা বললেও বাংলা ভাষাকেই তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই শিক্ষা প্রকল্পের জন্য অনেক বাধা পেয়েছেন। এ সম্বন্ধে তিনি বলেন:

> "আধুনিক কালে শিক্ষার উপাদান অনেক বাড়াতে হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার রূপটি তার রসটি তৈরি হয়ে উঠবে প্রকৃতির সহযোগে, এবং যিনি শিক্ষাদান করবেন তাঁর অন্তরঙ্গ আধ্যাত্মিক সংসর্গে। শুনে সেদিন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহশয় বলেছিলেন, এ কথাটি কবিমনোচিত। কবি এর অত্যাবশকতা যতটা কল্পনা করেছেন আধুনিক কালে ততটা স্বীকার করা যায় না। আমি প্রত্যুত্তরে তাঁকে

> বলেছিলেম বিশ্বপ্রকৃতি ক্লাসে ডেস্কের সামনে বসে মাস্টারী করেন না, কিন্তু জলে স্থলে আকাশে তাঁর ক্লাস খুলে আমাদের মনকে তিনি যে প্রবল শক্তিতে গড়ে তোলেন কোনো মাস্টার কি তা পারে!
>
> একথা নিশ্চিত জানি, যদি আমি বাল্যকাল থেকে অধিকাংশ সময়ই শহরে আবদ্ধ থাকতেম তবে তার প্রভাবটা প্রচুর পমিাণেই প্রকাশ পেত আমার চিন্তায়, আমার রচনায়। বিদ্যায় বুদ্ধিতে সেটা বিশেষভাবে অনুভব করা যেত কি না জানি নে, কিন্তু ধাত হতো অন্য প্রকারের। বিশ্বের অযাচিত দান থেকে যে পরিমাণে নিয়ত বঞ্চিত হতেম সেই পরিমাণে বিশ্বকে প্রতিদানের সম্পদে আমার স্বভাবে দারিদ্র্য থেকে যেত। এইরকম আন্তরিক জিনিসটার বাজারদর নেই বলেই এর অভাব সম্বন্ধে যে মানুষ স্বাচ্ছন্দে নিশ্চেতন থাকে সেরকম বেদনাহীন হতভাগ্য যে কৃপাপাত্র তা অন্তর্যামী জানেন। সংসার যাত্রায় সে যেমনি কৃতকৃত্য হোক মানবজন্মের পূর্ণতায় সে চিরদিন থেকে যায় অকৃতার্থ।
>
> সেইদিনই আমি প্রথম মনে করলেম, শুধু মুখের কথায় ফল হবে না, কেননা এ সব কথা এখনকার কালের অভ্যাসবিরুদ্ধ। এই চিন্তাটা কেবলই মনের মধ্যে আন্দোলিত হতে লাগল যে এই আদর্শকে যতটা পারি কর্মক্ষেত্রে রচনা করে তুলতে হবে। তপোবনের বাহ্য-অনুকরণ যাকে বলা যেতে পারে তা অগ্রাহ্য, কেননা এখনকার দিনে তা অসংগত, তা মিথ্যে। তার ভিতরকার সত্যটিকে আধুনিক জীবনযাত্রার আধারে প্রতিষ্ঠিত করা চাই।"[১০]

আর এই প্রত্যয়ের কারণেই শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন এবং অবশেষে বিশ্বভারতী। শ্রীনিকেতন নিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রথমে বেশ কষ্টে পড়েছিলেন। কিন্তু ডরোথীর নিশ্চয়তায় তিনি উজ্জীবিত হয়ে উঠলেন। এ কাজটি আরও অগ্রসর হল যখন ডরোথী এবং এল্‌মহার্স্ট পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হলেন এবং রবীন্দ্রনাথের কাজটি এগিয়ে নেবার জন্য বদ্ধপরিকর হলেন। প্রকৃতপক্ষে এল্‌মহার্স্ট এবং ডরোথীর সাহায্য না পেলে রবীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতনকে এতদূরে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারতেন কি না সন্দেহ। লিওনার্ড এল্‌মহার্স্ট সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথ কর বলেন :

> "Mr. Elmhirst is the chief architect of Sriniketon which he built up with his own labor and later gave financial ability to the project with funds from his own resources. The work he had started was not simply an isolated undertaking; it was a sort of a movement full of possibilities and has now taken the shape of community development undertaken by the government of India."[১১]

এল্‌মহার্স্ট মাত্র দুই বৎসর শ্রীনিকেতনে ছিলেন। কিন্তু দুই বৎসরের মধ্যে তিনি শ্রীনিকেতনকে পল্লীউন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি 'মডেল' নির্মাণ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর চলে যাবার পর হতোদ্যম না হয়ে শিলাইদহ ও পতিসরের পল্লীউন্নয়ন কর্মী কালিমোহন ঘোষ এবং অতুল সেনসহ অন্যদের নিয়ে পুরোদমে কাজ শুরু করেন।

শ্রীনিকেতন নামকরণটি কীভাবে হয়েছিল তা কেউ বলতে পারেন না। এই নামটি রবীন্দ্রনাথের নিজেরই দেওয়া। শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার পেছনে রবীন্দ্রনাথের যে মন ও মননশীলতা কাজ করেছিল তা হলো গ্রামবাসীদের জীবন ও জীবিকার আর্থিক উন্নয়ন যা তিনি শিলাইদহ এবং পতিসরে করতে চেয়েছিলেন।

শ্রীনিকেতনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল একটি অনুর্বর পল্লীঅঞ্চলের জীবনকে সর্বাঙ্গীন শ্রীমণ্ডিত করে তোলা। শ্রীনিকেতন নামকরণের মধ্যে কবির মনে যে চিত্রটি উঁকি ঝুঁকি মারতো তা বেশ লক্ষ্য করা যায়, যখন তিনি জাভা দ্বীপ থেকে পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে চিঠি লেখেন :

> "আর্টিস্টের চোখে পড়বার মতো জিনিস এখানে চারদিকেই। অন্ন-সচ্ছলতা আছে বলেই স্বভাবত গ্রামের লোকের পক্ষে ঘর দুয়ার আচার— অনুষ্ঠান আসবাবপত্রকে শিল্পকলায় সজ্জিত করবার চেষ্টা সফল হতে পেরেছে। কোথাও হেলা-ফেলার দৃশ্য দেখা গেল না। গ্রামে সর্বত্র চলছে নাচ, গান অভিনয়, অভিনয়ের বিষয় প্রায়ই মহাভারত থেকে। এর থেকে বোঝা যাবে, গ্রামের লোকের পেটের খাদ্য ও মনের খাদ্যের বরাদ্ধ পর্যাপ্ত। পথে আশে-পাশে প্রায়ই নানা প্রকারের মূর্তি ও মন্দির। দারিদ্র্যের চিহ্ন নেই, ভিক্ষুকও এ পর্যন্ত চোখে পড়ল না। এখানকার গ্রামগুলি দেখে মনে হল, এইতো যথার্থ শ্রীনিকেতন। গ্রামের সমগ্র প্রাণটি সকল দিকে পরিপূর্ণ।"[১২]

শ্রীনিকেতনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পল্লীউন্নয়নের সফলতার দিকটিকেই দেখতে চেয়েছিলেন। 'ফিরে চল মাটির টানে' এই গানটিতে সেই মর্মের ধ্বনিই শুনতে পাওয়া যায়। প্রথমদিকে শ্রীনিকেতন ছিল পরিপূর্ণ জঙ্গলাকীর্ণ। মশা ও বানরের উৎপাত ছিল খুব বেশি। নানা অসুবিধার মধ্যে ছাত্র ও কর্মীদের দিন কাটত। এ সময় স্কুলের পুরাতন কুঠিবাড়িতে ছিল শ্রীনিকেতনের দপ্তর। সেখানে কর্মীরা থাকতেন। আশেপাশে ছিল গোশালা, পোল্ট্রি, ট্যানারি, তাঁতঘর ও খামারবাড়ি। ক্রমে ক্রমে এখানে ডিসপেনসারি, মেয়েদের ইস্কুল, শিক্ষাসত্র ইত্যাদি গড়ে ওঠে। ম্যালেরিয়া রোগ অতিমাত্রায় থাকায় তার ব্যবস্থা নেওয়া হয় এবং জঙ্গল ইত্যাদি পরিষ্কার করা হয়। এভাবে কয়েক বৎসরের মধ্যে এখানকার পরিবেশ পাল্টে যায়।

শ্রীনিকেতন থেকে শান্তিনিকেতনের দূরত্ব প্রায় দুইমাইল এবং বোলপুরের দূরত্ব আড়াই মাইল। কোন রাস্তাঘাট ছিল না। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে দুএকটা রাস্তা নির্মিত হয়েছিল। তখন ইউনিয়নবোর্ড ছিল। রাস্তাঘাট নির্মিত হতো জেলাবোর্ডের তত্ত্বাধানে। পরবর্তীকালে শ্রীনিকেতন থেকে শান্তিনিকেতন পর্যন্ত একটা পাকা রাস্তা নির্মিত হয়। বর্তমানে বিশ্বভারতীর তত্ত্বাবধানে শ্রীনিকেতন এবং শান্তিনিকেতনের মধ্যে বাস চলাচল রয়েছে।

শ্রীনিকেতনের কাজ কোন ধরা-বাঁধা ছকে হয় নি। শিলাইদহ ও পতিসরের আদর্শে এখানে কাজ শুরু হয়। বাংলাদেশের মতো এখানকার গ্রামের লোক প্রথম দিকে কর্মীদেরকে সন্দেহের চোখে দেখত। গ্রামের উন্নতির জন্য শিক্ষিত ভদ্রলোক কাজ করবেন এ কথা সে যুগে তাদের পক্ষে ভাবা একপ্রকার অসম্ভব ছিল। এ কারণে তাদের মধ্যে একটা সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ভাব প্রথম দিকে জন্ম নেয়। কিন্তু এল্‌মহার্স্টসহ অন্যান্য কর্মীদের নিঃস্বার্থ মেলা-মেশা ও গ্রামের উন্নতিতে নিত্যদিন কাজ করার ফলে এই অবিশ্বাস ও সন্দেহ দূর হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে পল্লীউন্নয়নের জন্য যে ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন এখানেও তা অনুসরণ করেন। গ্রামের তরুণদের নিয়ে গড়ে ওঠে ব্রতীবালক দল। এখানে প্রথমদিকে এদের নাম ছিল গ্রামসহায়ক। রবীন্দ্রনাথই তাদের নাম পাল্টিয়ে ব্রতীবালকদল রাখেন। শিলাইদহ ও পতিসরের মতই তাদের উদ্দেশ্য ছিল। কিছুদিনের মধ্যেই এখানকার গ্রামে পল্লীউন্নয়ন ও সমবায় সমিতি গড়ে ওঠে। সে সময়ে শ্রীনিকেতনের কাজ সম্পর্কে 'প্রবাসী' পত্রিকায় ১৩৩৩ সালের ফাল্গুন সংখ্যায় একটি সংবাদ নিবন্ধ ছাপা হয়। এখানে তা উল্লেখ করা হল :

> "বিশ্বভারতীর অন্তর্গত শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসব সম্প্রতি হইয়া গিয়াছে। ইহা বোলপুরের নিকটস্থ সুরুল গ্রামে স্থিত। ইহার দ্বারা সুরুল ও নিকটবর্তী অন্য অনেক গ্রামের অনেক উপকার হইতেছে। বাংলাদেশ গ্রামপ্রধান। গ্রামগুলি না বাঁচিলে বাংলা উৎসন্নে যাইবে। গ্রামগুলিতে নূতন ও আনন্দময় জীবন দিতে হইলে তাহাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে হইবে। আবার, তাহাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে হইলে গ্রামের লোকদিগকে পরস্পরের প্রতি সদ্ভাবপূর্ণ এবং পরস্পরের সহযোগী করিতে হইবে, জ্ঞান দিতে হইবে, চাষের উন্নতি করিতে হইবে এবং তন্তুবায় কর্মকার প্রভৃতি শ্রেণীর লোকদের শিল্পের উন্নতি সাধন করিতে হইবে। শ্রীনিকেতনের কর্মীরা, কেবল মৌখিক উপদেশ দ্বারা নহে, পরন্তু কাজ করিয়া এবং কাজ করিতে শিখাইয়া এই সমুদয় দিকে গ্রামবাসীদিগকে স্বয়ং নিজের হিত নিজে করিতে সমর্থ করিতেছেন। এইজন্য ইহার কাজের উন্নতি, বিস্তৃতি, স্থায়িত্ব ও সাফল্য সর্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়।"[১৩]

শ্রীনিকেতনের কাজ প্রথম দিকে এল্‌মহার্ষ্ট সচিব হিসেবে সব দেখাশুনা করতেন। কর্মীরা অল্প বেতনে অনেকটা স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে এখানে কাজ করতেন। কাজের ক্ষেত্রে কোন সংকীর্ণ গণ্ডীভেদ ছিল না।

প্রয়োজনে প্রত্যেকের কাজে প্রত্যেকে সহযোগিতা করতেন। কর্মীরা গ্রামবাসীদের সংগে থেকে তাদের উন্নয়নে সাহায্য করতেন। গ্রামবাসীদের সংগে এই প্রাণের যোগ স্থাপনই ছিল রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়নের মুখ্য লক্ষ্য। প্রাথমিক পর্যায়ে শ্রীনিকেতনের সব কাজ শ্রীনিকেতন সমিতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চলত। বিশ্বভারতী সোসাইটির বিধি অনুযায়ী শান্তিনিকেতন কর্মসমিতি এবং সংসদ এই শ্রীনিকেতন সমিতির সদস্য থাকতেন। রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে প্রথম দিকে

সুরুল সমিতির (পরে শ্রীনিকেতন সমিতি) বিভিন্ন অধিবেশন হতো। রবীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতনের কর্মনীতি ও কাজ সম্পর্কে সুস্পষ্ট নীতি ও অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। তবে শ্রীনিকেতনের কাজে প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ না করলেও তিনিই ছিলেন সকল কর্ম-প্রেরণার মূল উৎস।

১৯২২ সালে শ্রীনিকেতনে কিছু কৃষিকাজ ও ডেয়ারীর জন্য কয়েকটি গরু বাছুর নিয়ে প্রতিষ্ঠানটির গোড়াপত্তন হয়। ক্রমানুযায়ী তা বৃদ্ধি পায়। ১৯২৫ সালে শ্রীনিকেতনের বার্ষিক বিবরণীতে সেখানে যে সব কাজ হয়েছিল তার একটি বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল :

০১. কৃষি— নিবিড়ভাবে চাষবাস, পর্যায়ক্রমে চাষ, নূতন ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

০২. গো পালন— ডেয়ারী ও পোল্ট্রি পরিচালনা।

০৩. ট্যানারী— প্রশিক্ষণ ও পরিচালনা।

০৪. বয়ন ও কাঠের কাজ— প্রশিক্ষণও সম্প্রসারণ।

০৫. ডিসপেনসারি পরিচালনা।

০৬. প্রাথমিক বালিকাবিদ্যালয় পরিচালনা।

০৭. চলন্তিকা গ্রন্থাগার পরিচালনা।

০৮. ট্রেনিংক্যাম্প সংগঠন ও পরিচালনা।

০৯. গ্রামের কাজ— সমবায় সমিতি, রাতের ইস্কুল, ব্রতীবালকদল ইত্যাদি সংগঠন ও পরিচালনা।"[১৪]

১৯২৭ সালে শিক্ষাসত্র শ্রীনিকেতনে স্থানান্তরিত হয়। এই বছরেই এখানে বিশ্বভারতী সমবায় কেন্দ্রব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ব্যাংকের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে কৃষিঋণ প্রদান ও নানাধরনের সমবায় সমিতি গড়ে উঠে। ১৯২৯ সালে শ্রীনিকেতনে শিক্ষাভবনের গোড়াপত্তন ঘটে এবং বেশ কয়েক ধরনের নূতন শিল্পকাজ এখানে চালু হয়। গ্রামে গ্রামে ব্রতীবালক সংগঠন, সমবায় স্বাস্থ্যসমিতি, বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র ও পল্লীউন্নয়ন সমিতি গড়ে ওঠে। কৃষি ও শিল্প সম্প্রসারণ কাজেরও অগ্রগতি হয়।

শ্রীনিকেতনের আদর্শ ও কর্মনীতি

বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলার শিলাইদহ এবং রাজশাহী জেলার পতিসরকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য শুধু নয়, একটি দেশকে স্বমহিমায় জাগিয়ে তুলবার ক্ষেত্রে পল্লীউন্নয়নের যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন, বাংলাদেশে তা পরিপূর্ণভাবে সফল না হলেও তাঁর সেই অভিজ্ঞতাকে নিয়ে তিনি শ্রীনিকেতনে পল্লীউন্নয়নের পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ পল্লীউন্নয়নকে শুধু মাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নই বোঝেননি, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক উন্নয়ন ও বিকাশ সাধনকেই এই উন্নয়নের প্রধান অনুষঙ্গী হিসেবে বিবেচনা করেছেন। শ্রীনিকেতন ছিল তাঁর উন্নয়ন-চিন্তার মূর্ত প্রতীক, স্বপ্নসৌধ। শ্রীনিকেতনের উদ্দেশ্য, আদর্শ ও কর্মনীতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন :

> "The object of Sriniketan is to bring back life in its completeness into the villages, making them self-reliant and self respectful, acquainted with the cultural tradition of their own country and competent to make an efficient use of modern resources for the improvement of their physical, intellectual and economic conditions"[১৫]

শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল গ্রামজীবনের সঠিক উন্নয়ন ও বিকাশ। রবীন্দ্রনাথ ত্রিশ বৎসরের-অধিককাল সময়ে বাংলাদেশের শিলাইদহ ও পতিসরে পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে যে গ্রামজীবনকে জেনেছিলেন, এর ভালোমন্দ, হিংসা-বিদ্রূপ, এর দুঃখ-কষ্ট, আনন্দ-বেদনা যা তাকে তীব্রভাবে প্রভাবিত করেছিল তারই অভিজ্ঞতার অলোকে তিনি শ্রীনিকেতনের আদর্শ ও কর্মনীতি নির্ধারণ করেছিলেন। তাঁর চিন্তা ও আদর্শ শ্রীনিকেতনের কর্মনীতির মূল আটটি ধারায় প্রতিফলিত হয়েছে। নিম্নে তার বিবরণ দেওয়া হল:

01. To win the friendship and affection of villagers and cultivators by taking a real interest in all that concerns their life and welfare by making a lively

effort to assist them in solving their most pressing problem ...

02. To take the problems of the village and the field to the class room for study and discussion to the experimental farm for solution;

03. To carry the knowledge and experience gained in the class room and the experimental farm to the villagers, in the endeavor to improve their sanitation and health, to develop the ir resources and credit; to help them to sell their produce and buy their requirements to the best advantage; to teach them better methods of growing crops and vegetables and of keeping live-stock; to encourage them to learn and practice arts and crafts; and to bring home to them the benefits of associated life, mutual aid and common endeavor;

04. To work out practically an all-round system of elementary education in the villages based on Boy Scout ideal and training, with the object of developing ideas of citizenship and public duty such as may appeal to the villagers and be within their means and capacity;

05. To encourage in the staff and students of the department itself a spirit of sincere service and willing sacrifice in the interest of and on terms of comradeship with their poorer, less educated and greatly harassed neighbors in the villages;

06. To train the students to a due sense of their own intrinsic worth, physical and moral and in particular to teach them to do with their own hands everything which a village householder or a cultivator does or should do for a living, if possible, more efficiently.

07. To put the students in the way of acquiring practical experience in cultivation, dairying, animal husbandry, poultry keeping, carpentry, and smithing, weaving and tannery; in practical sanitation work; and in the art and spirit of cooperation;

08. To give the students elementary instruction in the sciences connected with their practical work, to train them to think and observe accurately and to express and record the knowledge acquired by them for their own benefit and for that of their fellowmen."[১৬]

শুরুতে শ্রীনিকেতনের কাজ মোটামুটিভাবে তিনটি পর্যায়ে চলত। (ক) কৃষি, শিল্প ইত্যাদি বিষয়ে হাতেকলমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা। (খ) পল্লীউন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ। (গ) গ্রামাঞ্চলে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণ। ১৯৩৪ সালে শ্রীনিকেতনে পল্লীউন্নয়নের কাজের ধারা ঢেলে সাজানো হয়। সিদ্ধান্ত হয় যে অনেকগুলি গ্রামে একসঙ্গে অনেক কাজ না চালিয়ে নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী চারটি নির্দিষ্ট গ্রামকেন্দ্রের আওতাধীন ১৭টি গ্রামে নিবিড়ভাবে কাজ চলবে। সে সময় নিবিড় এলাকায় প্রত্যকটি গ্রামকেন্দ্রের ভার একজন গ্রামকর্মীর ওপর ন্যস্ত ছিল। তারা গ্রামে থেকে নিজ-নিজ এলাকায় নির্দিষ্ট কর্মসূচী অনুযায়ী কাজ করতেন। শ্রীনিকেতন থেকে বিশেষজ্ঞ কর্মীবৃন্দ গ্রামে নিয়ে তাদের কাজকর্ম দেখাশুনা ও প্রয়োজনীয় উপদেশ এবং পরামর্শ প্রদান করতেন।

আদিপর্বে শ্রীনিকেতনের সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী

আদিপর্বে শ্রীনিকেতনে পল্লীউন্নয়নসংক্রান্ত যে সব কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো তন্মধ্যে কৃষিকাজ, কৃষিসংক্রান্ত গবেষণা ও প্রশিক্ষণ, কৃষি সম্প্রসারণ, গো-পালন, মুরগীপালন, মাছের চাষ, মৌমাছি পালন, কুঠির ও কারুশিল্প, বয়ন, ট্যানারি বা চামড়া পাকা করার কাজ, চর্মশিল্প, দারুশিল্প (কাঠের কাজ), মৃৎশিল্প, গালার কাজ, বই বাঁধাই, হাতে তৈরি কাগজ, বাঁশ ও বেতের কাজ, বাটিক ও অন্যান্য কারুশিল্প, মেশিন শপ ও পাওয়ার হাউস, রুটি তৈরি, সূচীশিল্প।

শিক্ষাসত্র

প্রসংগত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে রবীন্দ্রনাথ আজীবন যে শিক্ষা বিষয়ক ধ্যানধারণা মনে পোষণ করতেন তা তিনি শান্তিনিকেতনে পান নি। যে উদ্দেশ্যে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা তার উদ্দেশ্য থেকে অনেক দূরে সরে এসেছিল। এ কারণে রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় বিদ্যালয় গঠনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এই বিদ্যালয় 'শিক্ষাসত্র' নামে পরিচিতি লাভ করে

'শিক্ষসত্র' ছিল মূলত গ্রামীণ বিদ্যালয়। এখানে জীবনভিত্তিক বা জীবন অন্বিষ্ট শিক্ষা প্রদান করা হতো। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের পাশে শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই উদ্দেশ্যে যে পল্লীউন্নয়নের ক্ষেত্রে তাঁর এই প্রতিষ্ঠান যেমন একটি শিক্ষায়তনের মতো কাজ

করবে তেমনি তার মাধ্যমে পল্লীউন্নয়নের সংগে সম্পৃক্ত গ্রামবাসী ও অন্যান্যদেরকে উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব হবে। শান্তিনিকেতন এবং শ্রীনিকেতন এই দুই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষণ-প্রশিক্ষণের জন্য রবীন্দ্রনাথ সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি এই দুই বিদ্যালয়ের জন্য যে পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করেছিলেন তা একজন মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক এমন কি রাজনৈতিক অভাবোধকে দূরীভূত করে তাঁকে প্রকৃতিপ্রদত্ত জ্ঞানের মাধ্যমে একটি সুস্থ, পরিচ্ছন্ন, মুক্তবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম।

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ব্যর্থতা শ্রীনিকেতনের মাধ্যমে পূরণ করতে চেয়েছিলেন। এজন্যেই শিক্ষাসত্রের প্রতিষ্ঠা। বাঁধাধরা মামুলী শিক্ষার বাইরে স্বাবলম্বন ও হাতের কাজের মধ্য দিয়ে সৃজনধর্মী শিক্ষাদানের পরিকল্পনা থেকেই শ্রীনিকেতনে শিক্ষাসত্র খোলা হয়েছিল। প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে এক হয়ে গ্রামের ছেলেরা ব্যবহারিক জীবনের সবকিছুর সংগে বিদ্যাশিক্ষা করবে- এমনতর ধারণা রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘকালের। এজন্যেই শিক্ষাসত্রের বিশেষ ধরণের শিক্ষার ওপর তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এল্‌মহার্স্ট এর নিকট একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ এ প্রসংগে উল্লেখ করেছিলেন:

> "I am, therefore, all the more keen that Shiksha Satra should justify the ideal I have entrusted to it, and should represent the most important function in helping students to the attainment of mankind complete in all its various aspects. Our people need more than anything else, a real scientific training that can inspire in them the courage of experiment and the initiation of mind which we lack as a nation.....I myself attach much more significance to the eduacational possibilities of Siksha-Satra than to the school and college at Santiniketan which are everyday becoming more and more like so many schools and colleges elswhere in this country: borrowed cages that treat the students' minds as captive birds, whose sole human value is judged according to the mechanical repetitions of lessons, prescribed by an educational dispensation foreigen to the soil."[১৭]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবিতকালেই শান্তিনিকেতন ইস্কুল এবং কলেজের শিক্ষাকে মেনে নিতে পারেন নি। তিনি বেশ বুঝতে পারছিলেন শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ক্রমান্বয়ে তাঁর ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে যাচ্ছে। তিনি যে শিক্ষা ব্যবস্থা আজীবন অস্বীকার করেছিলেন, তাইই তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠানে

অনুপ্রবেশ করে তাঁকেই আঘাত করছে। এল্‌মহার্স্টের কাছে লেখা এই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের মনোকষ্ট বুঝতে কারো অসুবিধা হয় না। অতঃপর রবীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতনের শিক্ষাসত্রকে আঁকড়িয়ে ধরেছেন। এল্‌মহার্স্ট রবীন্দ্রনাথের এই দুঃখবোধকে বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং সে কারণেই শিক্ষাসত্রকে আপন মমতা দিয়ে গড়ে তোলেন। সত্যদাস চক্রবর্তী তাঁর 'শ্রীনিকতনের গোড়ার কথা' গ্রন্থে বলেন:

> "সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের অকাল মৃত্যুর পর ১২৯৭ সালের জুলাই মাসে শিক্ষাসত্র শান্তিনিকেতন থেকে শ্রীনিকেতনে স্থানান্তরিত হয়।
>
> প্রেমচাঁদ লাল এর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। শ্রীনিকেতনে সকাল বেলায় শিক্ষাসত্রের ছাত্রদের তাঁতের কাজ ইত্যাদি শিখতে হতো। বিকালে খেলাধুলা ও বাগানের কাজ চলত। লেখাপড়ার কাজ চলত সন্ধ্যাবেলায়। নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক এবং পরীক্ষাপাশের কোন ব্যবস্থা ছিল না। আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষাদানের উপর জোর দেওয়া হতো। মূল শিক্ষণীয় বিষয় ছিল বাংলা, ইংরেজি, পাটীগণিত, ইতিহাসও ভূগোল। সন্ধ্যার ক্লাসে মাঝে মাঝে গল্পবলা, পত্রপত্রিকা পাঠ, গান, আবৃত্তি ও অভিনয়ের আয়োজন বসত। প্রতি বুধবার ছাত্রদের সাহিত্য সভা বসত। ১৯৩৩ সালে শিক্ষাসত্রের ছাত্রদের 'চেষ্টা' নামে হাতে লেখা একটি পত্রিকা বের হয়। বয়স ও মানসিক গঠন অনুযায়ী ছাত্রদের তিনটি গ্রুপ বা দলে ভাগ করা হয়েছিল। বাগান করা, হাতের কাজ ইত্যাদি দলগতভাবে করা হতো। ঘরদোর সাফাই, রান্নাবান্না, হাট-বাজার হিসাবপত্র রাখা সবকিছু কাজ ছাত্ররা নিজেরাই করত।... ছাত্রদের আচার ব্যবহার ও চালচলনের দিকে শিক্ষকরা নজর রাখতেন। স্বাবলম্বন এবং চরিত্র গঠনের উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হতো। শ্রীনিকেতন চিকিৎসাকেন্দ্রে ছাত্রদের স্বাস্থ্যপরীক্ষার ও চিকিৎসার সুযোগ ছিল। সপ্তাহে একদিন ছাত্ররা আশেপাশে কোন গ্রামে গিয়ে জঙ্গল পরিষ্কার, রাস্তাঘাট মেরামত, নর্দমা সাফাই, কুইনাইন বিলি ইত্যাদি কাজে অংশগ্রহণ করত।... শিক্ষাসত্র ছিল মূলত গ্রামীণ বিদ্যালয়।... পরবর্তীকালে শিক্ষাসত্রের পাঠ্যসূচী ও শিক্ষা ব্যবস্থায় অনেক পরিবর্তন ঘটে এবং এর গ্রামীণ চরিত্র অনেকখানি পাল্টে যায়।"[১৮]

শ্রীনিকেতন প্রাথমিক বিদ্যালয়

১৯২৩ সালে শ্রীনিকেতনে একটি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। ছাত্রীদের প্রায় সবাই ছিল সুরুল গ্রামের মেয়ে। লেখাপড়ার সংগে তারা সেলাই, কাপড় বোনা ও ঘনকন্নার কাজ শিখত।

শিক্ষাচর্চা

১৯৩৭ সালে সরকারি অর্থানুকূল্যে শ্রীনিকেতনে একটি গুরু ট্রেনিং স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। এর নামকরণ হয় শিক্ষাচর্চা ভবন। বর্ধমান বিভাগের ২০ জন প্রাইমারী ইস্কুলের শিক্ষক নিয়ে শিক্ষাচর্চার কাজ শুরু হয়। শিক্ষাচর্চার সময়কাল ছিল দুই বৎসর। এই প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষাদান পদ্ধতি, প্রাথমিক, স্বাস্থ্যনীতি, কৃষিবিজ্ঞান, ব্রতীবালক সংগঠন, ভাষা ও সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণদানের ব্যবস্থা ছিল।

লোক শিক্ষা বিভাগ

১৯৩৭ সালে শান্তিনিকেতনে লোকশিক্ষা সংসদ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৩ সালে জানুয়ারি মাসে লোকশিক্ষা সংসদ শ্রীনিকেতনে স্থানান্তরিত হয়। ইস্কুল কলেজের গণ্ডীর বাইরে ঘরে বসে পড়াশুনা করে যে কেউ যাতে পরীক্ষা দিতে পারে তার ব্যবস্থা করাই ছিল লোকশিক্ষা সংসদের কাজ। এ কাজের জন্য বাংলা ও বাংলার বাইরে এই সংসদ পরিচালিত অনেকগুলি পরীক্ষা কেন্দ্র গড়ে ওঠে। বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশুনা ও পরীক্ষার জন্য পাঠ্যপুস্তক নির্দিষ্ট ছিল। প্রত্যেকটি কেন্দ্রে স্থানীয় পরিদর্শক থাকতেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে পরীক্ষা নেওয়া হতো। ছাত্রদের বিষয় অনুযায়ী 'সাহিত্যভারতী' 'ইতিহাস-ভারতী' প্রভৃতি উপাধি দেওয়া হতো। রবীন্দ্রনাথ নিজেই লোকশিক্ষা সংসদের পরীক্ষার জন্য একসেট আদর্শ প্রশ্নপত্র তৈরি করে দিয়েছিলেন। প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীনিকেতনে দীর্ঘকাল এই লোকশিক্ষা সংসদের দায়িত্বে ছিলেন। পরবর্তীকালে লোকশিক্ষা সংসদ শান্তিনিকেতনে স্থানান্তরিত হয়।

বয়স্ক শিক্ষা ও সমাজশিক্ষা

রবীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতনের আশেপাশের গ্রামে আদিবাসী ও অনুন্নত সমাজের জন্য বয়স্ক শিক্ষা ও সমাজ শিক্ষা ইস্কুল গড়ে তোলেন। ১৯২৫ সালে প্রথমে ৭টি ইস্কুল গড়ে ওঠে। পরে ১৯৩২ সালে তা এসে দাঁড়ায় ১২টিতে। সমাজ শিক্ষার জন্য গ্রামাঞ্চলে মহিলা সমিতি গড়ে ওঠে। এ সব সমিতি মহিলাদের মধ্যে জাগরণ আনতে সক্ষম হয়েছিল। প্রকৃতঅর্থে রবীন্দ্রনাথ এইসব কাজের মধ্য দিয়ে গ্রামকে জাগাতে চেয়েছিলেন। আজকে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের (এনজিও) মাধ্যমে যে কাজটি চলছে, বলা চলে, রবীন্দ্রনাথ তারও পথিকৃৎ।

চলন্তিকা গ্রন্থাগার (মোবাইল লাইব্রেরী)

সাধারণ মানুষের মধ্যে বই পড়বার আগ্রহ সৃষ্টি করবার জন্য রবীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতনে চলন্তিকা গ্রন্থাগার গড়ে তুলেছিলেন। ১৯২৫ সাল থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত চলন্তিকা

প্রন্থাগার অত্যন্ত প্রশংসার সাথে সাধারণের মধ্যে বই পড়বার আগ্রহ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। বোলপুর বাঁধাগোড়া, সাঁওতাল পাড়া, বিনুরিয়া এবং গোয়ালপাড়া ৫টি কেন্দ্রে এই মোবাইল লাইব্রেরী বিশেষ ভূমিকা রাখে।

শিক্ষা শিবির

রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়নের কর্মকাণ্ডে প্রশিক্ষণ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই পল্লী সংগঠন বিষয়ে নানা ধরণের প্রশিক্ষণ ক্যাম্প বা শিবিরের আয়োজন করা হতো। স্থানীয় শিক্ষক, সমাজকর্মী এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে আগত শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতেন। পল্লীউন্নয়নই ছিল এইসব শিক্ষা শিবিরের লক্ষ্য।

যে সব বিষয়ে এইসব শিক্ষা শিবির হতো, নিম্নে তার একটি বিবরণ দেওয়া হল:

০১. পল্লীসংগঠনের আদর্শ।
০২. পল্লীস্বাস্থ্য, সংক্রামক ব্যাধি এবং প্রাথমিক চিকিৎসা।
০৩. পল্লী প্রাথমিকশিক্ষা।
০৪. সমবায় সংগঠন নীতি।
০৫. ব্রতী সংগঠন।
০৬. কুঠিরশিল্প।

এ সব শিবিরে 'বিশ্বভারতী'র খ্যাতনামা অধ্যাপক ও কর্মীগণ বক্তৃতা ও প্রশিক্ষণ দিতেন।

কৃষি

প্রথম দিকে প্রায় ৫০ বিঘা আবাদি জমি ও একটা বড় সেচের পুকুর নিয়ে শ্রীনিকেতনের কৃষিকাজ চলত। পরে আবাদি জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৮০ বিঘা হয়। শ্রীনিকেতন ও শান্তিনিকেতন সংলগ্ন প্রায় ৭০০ একর ডাঙা জমি বিশ্বভারতীর দখলে আসে। এই সম্পত্তির মধ্যে প্রায় ২০০ বিঘা জমি চাষ বাসের জন্য স্থানীয় সাঁওতাল অধিবাসীদের মধ্যে বিলি বন্টন করা হয়। শ্রীনিকেতনে সে সময় চাষ-বাসের জন্য ৩০০০ টাকায় একটা ফোর্ডসন ট্র্যাক্টর কেনা হয়। ১৯৪০ সালে শ্রীনিকেতন খামারের অধিকাংশ জমি বর্গা প্রথায় চাষ করা হতো। এই কৃষি কেন্দ্রে কৃষি বিষয়ক পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা গবেষণা, কৃষি সম্প্রসারণ এবং কৃষি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হতো। স্থানীয় কৃষি বিভাগের সহায়তায় এই কৃষিকাজ পরিকল্পনা করা হতো। শ্রীনিকেতন থেকে কৃষি সম্প্রসারণ কাজে সহজ ভাষায় নান ধরণের বিজ্ঞপ্তি ও পুস্তিকা প্রকাশ করা হতো। ১৩৩১ সালে বিশ্বভারতী কৃষিবিভাগ 'ভূমি লক্ষ্মী' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করে।

গো-পালন— ডেয়ারী

শ্রীনিকেতনের অন্যতম কাজ ছিল গো-পালন বা ডেয়ারী। প্রথমে দেশী গরু নিয়ে এই কাজ শুরু হলেও পরবর্তীতে এখানে সিন্ধী ও মুলতানী গরু আনা হয়। এই ডেয়ারীর মাধ্যমে দুধ বিক্রয় করা হতো এবং উন্নত জাতের এঁড়ে বাছুর গ্রামবাসীদের মধ্যে স্বল্পমূল্য বা বিনামূল্যে বিতরণ করা হতো। ১৯৩৩ সালে ডেয়ারীতে ছাগলপালন বা গোটারি (goatary) চালু করা হয়। আশেপাশের গ্রামে ও সাঁওতাল পাড়ায় উন্নত জাতের ছাগল বিনামূল্যে দেওয়া হতো। পরে এই প্রকল্প বন্ধ হয়ে যায়।

মুরগীপালন

শ্রীনিকেতনের আর একটি কাজ ছিল উন্নত জাতের মুরগী পালন। ১৯২৪ সালের জুলাই মাসে শ্রীনিকেতনে পোল্ট্রী ফার্ম গড়ে উঠে। এখানে তখন লেগহর্ন, রোড-আইল্যান্ড, ব্লাক মিনর্কা ও চিটাগাঙ জাতের মোরগ-মুরগী পালন করা হতো। এ ছাড়াও কবুতর, টার্কি ও গিনি মুরগী পালন করা হতো।

শ্রীনিকেতনের চেষ্টায় আশেপাশের অসংখ্য গ্রামে মুরগী পালন শুরু হয়। মুরগীপালনের কারণে ডিম বিক্রয়ে অর্থায়ন হতো গ্রামবাসীগণও ডিম ও মোরগ-মুরগী বিক্রয়ে লাভবান হতো।

মাছের চাষ

১৯২৭ সালে সেচ ও মাছ চাষের জন্য শ্রীনিকেতনে দুটো বড় পুকুর সংস্কার করা হয়। পরে বল্লভপুর গ্রামে চারটি পুকুর সংস্কার করে মাছ চাষের আওতায় আনা হয়। আশেপাশের গ্রামে মাছ চাষের জন্য একটি সমবায় সমিতি গঠন করা হয়। শ্রীনিকেতনের 'সুখ সায়র' নামে একটি বড় পুকুরে শিক্ষাসত্রের ছাত্রেরা মাছের চাষ করত।

মৌমাছি পালন

শ্রীনিকেতনে মৌমাছি পালনের প্রকল্প গ্রহণ করা হলেও উষ্ণ আবহাওয়ার কারণে এই প্রকল্পটি পরে বন্ধ হয়ে যায়।

কুঠির ও কারুশিল্প

শ্রীনিকেতনের শুরু থেকেই বলা চলে, কুঠির ও কারুশিল্পের কাজ চালু ছিল। ১৯২২ সালে রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূই, রথীন্দ্রনাথের স্ত্রী প্রতিমা দেবী, শান্তিনিকেতনে গালা, বাটিক, ক্যালিকো— প্রিন্ট ইত্যাদি কাজ প্রবর্তন করেন।

একটি টিনের চালাঘরে এই কাজটি শুরু হয়। তখন এর নাম ছিল বিচিত্রা স্টুডিও। ১৯২৮ সালে শ্রীনিকেতনে শিল্পভবন প্রতিষ্ঠা হলে 'বিচিত্রা স্টুডিও'র সকল কাজ এখানে চলে আসে। ১৯৩৪ সালে সন্তোষকুমার ভঞ্জ চৌধুরীর পরিচালনায় কারুশিল্পের কাজ শুরু হয়। এ সময় প্রতিমা দেবীর নেতৃত্বে গ্রামের মেয়েদের নানাধরণের সেলাই শেখানো হতো। প্রতিমা দেবীর নেতৃত্বেই পরবর্তীকালে 'পল্লী কারুকারী কেন্দ্র' নামে একটি প্রতিষ্ঠান সে সময় গড়ে ওঠে। ১৯২৭ সালে শিল্পভবনে বয়ন, চামড়া পাকা করার কাজ (ট্যানিং) ও কাঠের কাজ শুরু হয়। সে সময় ৩৫ জন শিক্ষার্থী ছিলেন। পরবর্তীতে গালার কাজ, বই বাঁধাই, কাগজ তৈরি, মৃৎশিল্প, বাটিক প্রভৃতি শিল্পকাজ শুরু হলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৩৬ সালে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১০৯ জন।

এ সময় শ্রীনিকেতনের এই শিল্প কাজকর্ম দেশ- বিদেশের প্রদর্শনীতে সমাদৃত হয় এবং প্রশংসা অর্জন করে। বাটিক বা গালার কাজ, কারুকার্যমণ্ডিত চামড়ার কাজ, বিশেষ ধরনের ঝোলা ব্যাগ, নকশা চাদর ইত্যাদি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'শান্তিনিকেতন ক্রাফ্টস' হিসেবে অদ্যাবধি কারুশিল্প বিশেষ প্রশংসা লাভ করে আসছে।

বয়ন

বয়ন কেন্দ্র শ্রীনিকেতনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই বয়ন কেন্দ্রের শাড়ি. গামছা, আসন, কম্বল গালিচা, সতরঞ্জি, নেয়ার ও ফিতে ইত্যাদি বয়নের কাজ নিয়মিত চলত। অতঃপর এখানে রঞ্জনশিল্পের কাজও শুরু হয়। এখানে ক্যালিকা প্রিন্টিং, বস্ত্র বিশ্লেষণ প্রভৃতি কাজও চালু ছিল। ১৯২৮ সালে এই কেন্দ্রে রেশমের চাদর তৈরীর কাজও আরম্ভ হয়েছিল। ১৯৩৪ সালে এখানে পাবনা তাঁত এবং চিত্তরঞ্জন টাইপের তাঁত বসানো হয়। ১৯৩৫ সালে পাওয়ার লুমের কাজও এখানে শুরু হয়। জাপান থেকে প্রিপ্যারেটরি মেশিন আনা হয়। ১৯৩৭ সালে শ্রীনিকেতন তাঁত শালায় ১১টি হস্তচালিত তাঁত, ৫টি সুইডিশ তাঁত ও ১০টি পাওয়ার লুমের কাজ চলছিল। রেশমের কাজও নিয়মিত হতো। এ সব কাজ শিখবার জন্য নানা স্থান থেকে প্রচুর শিক্ষার্থীদের ভীড় হতো। ১৯২৯ সাল পর্যন্ত ২১৩ জনকে বয়ন শিল্পে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। শ্রীনিকেতনের বয়ন শিক্ষকেরা আশেপাশের গ্রামে গিয়েও কাজ শিখিয়ে আসতেন। এমনিভাবে বল্লভপুর, সুরুল, ভুবনডাঙা, সাঁওতাল পাড়া এবং ডাঙা পাড়ায় নানান ধরনের বয়ন কার্য শেখানো হয়। ১৯৩৭ সালে ১৫ জন পুরুষ ও মহিলা তাঁতের কাজ শিখে নিয়মিত রোজগারের সুযোগ পান। এরপর শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং তারা প্রশিক্ষণ লাভের পর নিজেরাই রোজগারের পথ বের করে নেয়। ১৯৪৯ সালে তাঁত শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন মূল্য দাঁড়ায় ১, ৪০, ৫১৬ টাকা।

চামড়া পাকা বা ট্যানিং এর কাজ

একসময় বীরভূম জেলার বিভিন্ন স্থানে প্রচুর চর্মব্যবসায়ী বসবাস করত। কিন্তু চামড়ার কাজে কোন অভিজ্ঞতা না থাকায় তখন এখানকার কাঁচা চামড়া কলকাতায় চালান হয়ে যেত। শ্রীনিকেতনে ট্যানারীর কাজ শুরু হলে চর্মব্যবসায়ীরা প্রশিক্ষণ নিয়ে এ কাজে বিশেষ পারদর্শী হয়ে ওঠে। এখানে চামড়া পাকা কাজ ও চামড়া থেকে জুতা তৈরি ইত্যাদি কাজে প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো।

চর্মশিল্প

১৯২৮ সালে রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে শ্রীনিকেতন শিল্পভবনে কারুকাজ করা চামড়ার মানিব্যাগ, মেয়েদের হ্যাণ্ডব্যাগ ও বটুয়া, মোড়াঢাকা ও বেল্ট ইত্যাদি কাজ বিশেষ সুনাম অর্জন করে। দেশের নানা জায়গা থেকে চামড়ার কাজ শিখতে বহু শিক্ষার্থী আসত। আশেপাশে গ্রামের মেয়েরাও এই কাজ শিখেছিল। ১৯৪০ সালে চর্মশিল্পে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৬৩ জন। শ্রীনিকেতন থেকে কাজ শিখে অনেকেই স্বাধীনভাবে ব্যবসা শুরু করে এবং লাভবান হয়। এ সময় আশেপাশের গ্রামে চর্ম শিল্পের বেশ কয়েকটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। অদ্যাবধি শ্রীনিকেতনের এই শিল্পকাজ সুনাম অক্ষুন্ন রাখতে সক্ষম হয়েছে।

দারুশিল্প

জাপানি দারুশিল্পী কামাহারা সাহেবের পরিচালনায় শ্রীনিকেতনে প্রথম থেকেই দারুশিল্পের কাজ শুরু হয়েছিল। শ্রীনিকেতনের আশেপাশে গ্রামের পুরুষ ও মহিলারা কামাহারা সাহেবের কাছ থেকে দারুশিল্পের প্রশিক্ষণ পেত। কামাহারা সাহেবের মৃত্যুর পর টি. কোণো নামে আর একজন জাপানী সাহেব শ্রীনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ দিতেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও দারুশিল্পে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

মৃৎশিল্প

১৯২৯ সালে শ্রীনিকেতনে মৃৎশিল্পের কাজ শুরু হয়। এখানে টালি তৈরির জন্য জার্মানি থেকে মেশিন আনা হয়। ১৯৩৬ সালে প্রতিমা দেবী এক সেট পটারির যন্ত্রপাতি দান করেন। ১৯৩৫ সালে সরকারি সাহায্যে শ্রীনিকেতনে একটি পটারির শেড ও ফার্নেস নির্মিত হয়। ১৯৪০ সালে একটি নূতন ফার্নেস ও চুল্লী নির্মাণ করা হয়। আচার্য নন্দলাল বসু নক্সা ইত্যাদি দিয়ে মৃৎশিল্পের কাজে সাহায্য করতেন। ১৯৪৬ সালে দুজন বিদেশী বিশেষজ্ঞ মৃৎশিল্প কাজে প্রশিক্ষক হিসেবে শ্রীনিকেতনের সংগে যুক্ত হন।

বাঁশ ও বেতের কাজ

১৯৩৬ সালে শ্রীনিকেতনে বাঁশ ও বেতের কাজ চালু হয়। আশেপাশের আদিবাসিদের মধ্যে থেকে এই কাজের প্রশিক্ষক নির্বাচিত করা হতো। তাদের সাহায্যে এখানে নানা বাঁশ ও বেতের কাজ হতো। তালপাতার পাখা টুপি, বাঁশ ও বেতের ঝুড়ি, মোড়া, চাটাই, মাদুর ইত্যাদি, নানা ধরণের কাজ হতো। এ সবের চাহিদা ছিল ভাল।

বাটিকও অন্যান্য কারুশিল্প

শ্রীনিকেতনে শিল্পভবন প্রতিষ্ঠার পর এখানে বাটিকের কাজ শুরু হয়। প্রতিমা দেবী এ কাজে বিশেষ আগ্রহী হন। আশেপাশের গ্রামের মেয়েরা অনেকেই শ্রীনিকেতন থেকে বাটিকের কাজ শিখত। ১৯৩৩-৩৪ সালে ৪৭ জন স্থানীয় মহিলা বাটিক ও এমব্রয়ডারি কাজ শিখেছিল।

মেশিনশপ ও পাওয়ার হাউস

শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার পর থেকেই শিল্পশাখার বিভিন্ন কাজের জন্য একটি মেশিনশপ ছিল। ১৯৩০ সালে এখানে একটি ছোট পাওয়ার প্লান্ট বসানো হয়। পাওয়ার হাউসের ওয়েল ইঞ্জিন ও জেনারেটর দিয়ে খামারের সেচ সুবিধা ও অন্যান্য কাজ করা হতো।

শিল্প বিক্রয় কেন্দ্র

শ্রীনিকেতনের শিল্পভবনের জিনিসপত্র বিক্রয়ের জন্য একটি বিক্রয় কেন্দ্র চালু করা হয়। এই কেন্দ্র থেকে শ্রীনিকেতনের নানা শিল্পদ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা ছিল।

শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

বিভিন্ন কাজে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শ্রীনিকেতনে একটি শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্রও স্থাপিত হয়। ১৯৩৯ সালে শ্রীনিকেতনে একটি Industrial Training School নির্মাণ করা হয়।

চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য

রবীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতনে চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ে তোলেন। শ্রীনিকেতনের গোড়ার দিকে মিস গ্রোসেন গ্রিন নামে একজন আমেরিকান সমাজসেবিকা আসেন। তিনি প্রাথমিক চিকিৎসা ও শুশ্রুষার কাজে বিশেষ

পারদর্শী ছিলেন। তাঁর চেষ্টায় শ্রীনিকেতনে একটি ডাক্তারখানা বা ক্লিনিক গড়ে ওঠে। শ্রীনিকেতনের কর্মীদের দ্বারা নানা জনস্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এল্‌মহার্স্ট, কালীমোহন ঘোষ প্রমুখ এ কাজে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিলেন। সমবায় সমিতির মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মকাণ্ড গ্রহণ করা হতো।

সমবায়

রবীন্দ্রনাথ পল্লীউন্নয়নের ক্ষেত্রে সমবায়কে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। পূর্ববাংলায় পল্লীউন্নয়নের ক্ষেত্রে সমবায় সমিতির মাধ্যমে তিনি ধনী-নির্ধন, বড়চাষী এবং বর্গাচাষীর একটি মিলন কেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন। পতিসরে তিনি এই কাজে বেশ সুফল লাভ করেছিলেন। শ্রীনিকেতনে তিনি সমবায়কে সব কাজের উপরে প্রাধান্য দিতেন। এখানে তিনি পল্লীউন্নয়ন সমিতি, সমবায় স্বাস্থ্যসমিতি, ধর্মগোলা, কৃষিঋণদান সমিতি, সেচ সমবায়, সমবায় মৎস্যচাষ সমিতি, সমবায় বয়ন সমিতি ইত্যাদি গঠন করেন। এ সব কাজে এল্‌মহার্স্ট, কালীমোহন ঘোষ হেমন্ত কুমার সরকারসহ অন্যেরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন।

পল্লী সমীক্ষা ও গ্রামীণ অর্থনীতি

পল্লীউন্নয়নের ক্ষেত্রে পল্লীসমীক্ষাকে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। শ্রীনিকেতন মুখ্যত পল্লীপুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে গড়ে ওঠে। এল্‌মহার্স্ট এবং অন্যান্যরা শ্রীনিকেতনকে Industrial Rural Reconstruction নামে অভিহিত করতেন। শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার পর ১৯২৬ সালে কালীমোহন ঘোষের সম্পাদনায় বল্লভপুর গ্রামের সমীক্ষা প্রকাশিত হয়। ১৯৩৩ সালে রায়পুর গ্রামের সমীক্ষা 'পুস্তিকা' আকারে প্রকাশিত হয়। এটিরও সম্পাদনা করেন কালীমোহন ঘোষ। শ্রীনিকেতনের আশেপাশের গ্রামে ও বিশেষ করে গোয়ালপাড়া, বাঁধাগোড়া-ও ভুবনডাঙায় পল্লীসমীক্ষার কাজ শুরু হয়েছিল।

১৩৩১ সালে শ্রীনিকেতনে গ্রামীণ অর্থনীতি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও গবেষাণার জন্য এল্‌মহার্স্ট ৫০০ পাউন্ড অনুদান দিয়েছিলেন। তিন বৎসর কাল ধরে এই গবেষণা প্রকল্পের কাজ চলেছিল। অতঃপর ১৯৩২ সালে ৩০০ পৃষ্ঠার একটি সমীক্ষাপত্র প্রকাশিত হয়।

১৯৩৪ সালে শ্রীনিকেতনের গ্রামের কাজ অনেকটা ঢেলে সাজানো হয়েছিল বলে জানা যায়। সত্যদাস চক্রবর্তী তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে বিনুরি, বাঁধাপাড়া, সুরুল এবং সাঁওতালপাড়া এই চারটি গ্রামকেন্দ্রের ১৭টি গ্রামে নিবিড়ভাবে কাজ শুরু হয়েছিল। সে সময় শ্রীনিকেতন রিসার্চ প্রকল্পের উদ্যোগে পাঁচটি প্রকল্পের কাজ শেষ হয়। এ গুলির নাম নিম্নে দেওয়া হলঃ

01. Thirty eight years of Rice yields in Lower Birbhum.
02. Varieties and yields of Rice in Benuria village.
03. Fluctuation in the prices of agricultural commodities in Bolpur
04. A Statistical Approach to the selection of a typical village.
05. Cost of production of crops in Birbhum district.

১৯৩৪ সালে শ্রীনিকেতন থেকে প্রকাশিত হয় ডঃ হাসিম আমীর আলীর Three Village Economic Studies on Rice. শান্তিপ্রিয় বসুর পরিচালনায় সে সময় Rural Indebtedness Surveyর কাজ শুরু হয়। এই সমীক্ষায় গ্রামবাসীদের ঋণ গ্রহণের কারণ, গ্রাম ও পরিবারভিত্তিক ঋণের পরিমাণ, স্থানীয় অঞ্চলে কোন কোন শর্তে এবং কী ধরনের ঋণ দেওয়া-নেওয়া চলে ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য ও তার বিশ্লেষণ প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত হয় Marketing of Rice at Bolpur নামে একটি সমীক্ষা পত্র।

১৯৩৯ সালে ড. সুধীরচন্দ্র সেন এর তত্ত্বাবধানে শ্রীনিকেতনে ৩টি কৃষি অর্থনীতি সমীক্ষার কাজ হয়েছিল।

01. Economics of paddy cultivation.
02. Irrigation problem in West Bangal.
03. Rural marketing in Bolpur Bazar

১৯৪০ সালে শ্রীনিকেতন থেকে Supur—An Experiment in Rural Reconstruction নামে একটি সমীক্ষা পত্র প্রকাশিত হয়। ১৯৪২ সালে সরকারি অর্থানুকূল্যে শ্রীনিকেতন থেকে Experiment in Afforesation and Prevention in Soil erosion নামে একটি গবেষণা প্রকল্প শুরু হয় এবং ১৯৫১ সালে তা শেষ হয়।

অতঃপর ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত রিসার্চ স্টাডিজ হিসেবে নিম্নোক্ত ৭টি গবেষণা পুস্তিকা শ্রীনিকেতন থেকে প্রকাশিত হয় ঃ

01. Conflict of Economic Ideologies in India— An Attempt at Reconstruction. (1941)
02. Rabindronath Tagore on Rural Reconstruction.(1943)
03. Land and its Problem, Vol.1. (1943)
04. Cost of production and size of Farms in West Bengal (1947).
05. Rural Indebtedness in Birbhum, (1948)

06. Agricultural Labor in Birbhum, West Bengal (1948).

07. Mechanization of Agriculture in India— its Economics.(1949)

উৎসব অনুষ্ঠান

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সকল কাজে বিশেষ করে পল্লীউন্নয়নের ক্ষেত্রে উৎসব এবং মেলা ইত্যাদি অনুষ্ঠানের কথা বিষশভাবে বলেছেন। তাঁর বক্তব্য ; "প্রতিদিন মানুষ ক্ষুদ্র, দীন, একাকী— কিন্তু উৎসবের দিন মানুষ বৃহৎ, সেদিন সে সমস্ত মানুষের সঙ্গে একত্র হইয়া বৃহৎ, সেদিন সে সমস্ত মনুষ্যত্বের শক্তি অনুভব করিয়া মহৎ।"

বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতনের উৎসব অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে পৌষউৎসব, বসন্তোৎসব, বৃক্ষরোপন ও হলকর্ষণ, বার্তামঙ্গল, শারদোৎসব, শ্রীনিকেতনের বাৎসরিক উৎসব এবং শিল্পোৎসব প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এইসব উৎসবে এবং বিশ্বভারতী ও শ্রীনিকেতনের সকল শিক্ষক, ছাত্র, কর্মী, আশ্রমবাসী সকলেই অংশগ্রহণ করেন। এ সব অনুষ্ঠান ছাড়াও পল্লীর কোন বিশেষ উৎসব কোন বিশেষ দিন ইত্যাদি উপলক্ষে নানা উৎসব হয়েছে। এ ছাড়া কৃষি ও শিল্পমেলাও বিশেষ গুরুত্ব রাখে। এ সব মেলায় মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের আমদানি হয় এবং সে সংগে চলে বাউল, কবিগান, যাত্রা, বাজি, সার্কাস ইত্যাদি। শ্রীনিকেতনে নানা সময় ব্রতীবালক সম্মেলন ও ব্রতী সমাবেশ, শিশু প্রদর্শনী, মহিলা সম্মেলন, গ্রামকর্মী সম্মেলন ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হতো। প্রতিটি অনুষ্ঠানই ছিল শিক্ষামূলক। রবীন্দ্রনাথ এ সব অনুষ্ঠানে কখনও কখনও পৌরোহিত্য করেছেন। সে সময় তিনি যে সব বক্তব্য দিয়েছেন তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে তিনি পল্লীউন্নয়নকে কত গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। শ্রীনিকেতনের স্থাপনা যে পল্লীউন্নয়নের জন্য— একথা তিনি বহুবার বলেছেন। এসব বক্তৃতায় তাঁর মনের যে অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে তা থেকে বোঝা যায় যে তিনি কত মহৎ মানুষ ছিলেন। শ্রীনিকেতনের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে যিনি রবীন্দ্রনাথের সহযোগী এবং যার অবদান অবিস্মরণীয় তিনি মিঃ লিওনার্ড নাইট এল্‌মহার্স্ট। অবশ্য শান্তিনিকেতন এবং শ্রীনিকেতনের উন্নয়নে বিদেশীদের মধ্যে অনেকেরই অবদান ছিল— বিশেষ করে চার্লি এণ্ড্রুজ, উইলি পিয়ারসন এবং সিলভিয়ান লেভি নিঃসন্দেহে গৌরবজনক ভূমিকা রেখেছিলেন। কিন্তু প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথের আহবানে যিনি তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি এল্‌মহার্স্ট। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় Not merely as a friend, but as a sharer in the intimacy of a conjoint creation; কৃষ্ণা কৃপলিনীর দৃষ্টিতে

> '... and indeed more basically and vividly, the combination of Leonard Elmhirst is an integral part of the history of Sriniketan. One can hardly think of Sriniketan without recalling the debt it-

> owes to Elmhirst's dynamic zeal, devotion and initiative. He did the spade work (literally too) and helped Rabindranath lay the foundation of a complex of activities seemingly rustic and lowly but in the long run vital for national regeneration."[১৯]

সত্যদাস চক্রবর্তী তাঁর 'শ্রীনিকেতনের গোড়ার কথা' গ্রন্থে উল্লেখ করেন :

> "এল্‌মহার্স্ট ছিলেন একজন খাঁটি পল্লীদরদী মানুষ। পল্লীজীবনের সামাজিক- অর্থনৈতিক সব কয়টি দিকে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। 'তিনি ছিলেন পণ্ডিত ব্যক্তি কিন্তু পাণ্ডিত্যের অভিমান তাঁর ছিল না। সহজ-সরল ব্যবহার ও আন্তরিকতায় তিনি সকলকে আপন করে নিয়েছিলেন। শ্রীনিকেতনে ছাত্র ও কর্মীদের সঙ্গে তিনি সব কাজে হাত লাগাতেন। কোদাল হাতে এখানে তিনি মাটি কুপিয়েছেন। নিজের হাতে লাঙল চালিয়েছেন, ময়লা পরিষ্কার করেছেন। এল্‌মহার্স্ট শ্রীনিকেতনে বেশি দিন ছিলেন না, কিন্তু সেই স্বল্পকালের মধ্যেই তিনি এখানকার কাজের কাঠামো গড়ে গিয়েছেন। শিক্ষাসত্রের মূল-পরিকল্পনা রচনায়ও তিনি ছিলেন কবির সহযোগী।... প্রখ্যাত কৃষি অর্থনীতিবিদ হিসাবে এল্‌মহার্স্টের কর্মক্ষেত্র ছিল বহুদূর বিস্তৃত। International Conference of Agricultural Economics এর তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। British Society of Agricultural Economics, British Rural Society of Forestry প্রভৃতি বিভিন্ন সংস্থার সভাপতি হিসাবেও তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। ১৯৩৯ সালে তিনি Indian Society of Agricultural Economics প্রতিষ্ঠা করেন। প্রায় তিনবৎসর তিনি তৎকালীন বাঙলা সরকারের কৃষি-উপদেষ্টা ছিলেন। স্বাধীন ভারতের সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনাকালেও তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করা হয়েছিল। এই পরিকল্পনায় শ্রীনিকেতনের কর্মনীতি ও কাজের ধারার প্রতিফলন সুস্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। স্বাধীনভারতে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন এর উপদেষ্টারূপেও এল্‌মহার্স্ট কাজ করেছেন। ১৯৬০ সালে তিনি 'বিশ্বভারতীর' 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৭৪ সালে ১৬ এপ্রিল পরিণত বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।"[২০]

এল্‌মহার্স্টের পর রবীন্দ্রনাথের বন্ধুপুত্র সন্তোষ মুজমদার শ্রীনিকেতনের ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে তিনি এবং কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ আমেরিকায় কৃষিবিজ্ঞান ও গো-পালন বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে ১৯২৪ সালে শান্তিনিকেতনে তাঁর নিজের বাড়িতে সন্তোষচন্দ্র শিক্ষাসত্রের গোড়াপত্তন করেন। শিক্ষাসত্রের ছয়জন ছাত্র নিয়ে কাজ শুরু হয়। সন্তোষচন্দ্রের বাড়িতে ছাত্র-ছাত্রীদের থাকা-খাওয়া বা লেখাপড়ার জন্য

কোন খরচ লাগত না। ছাত্ররা নিজের হাতে সব করতেন- বাগান করা, গরুবাছুর দেখা-শুনা, সুতোকাটা, তাঁতবুনা এবং নিজেদের কাপড়ও তৈরি ও সেলাই সবই তারা করতেন। এ সব কাজের সংগে লেখপড়াও চলত। সন্তোষচন্দ্র সবার উপর ব্যক্তিগত নজর রাখতেন। ১৯২৬ সালে ৪১ বৎসর বয়সে সন্তোষচন্দ্র পরলোক গমন করেন। সন্তোষচন্দ্রের মৃত্যুকালে রবীন্দ্রনাথ দেশের বাইরে ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে তিনি বেশ বিচলিত হয়ে পড়েন। একটি চিঠিতে তিনি লেখেন :

> "আমরা নিজেকে অনেকখানি পাই অন্যের মধ্যে— সন্তোষ সেই তাঁদেরই মধ্যে অন্যতম ছিল। আমার জীবনের একটা বিভাগ, সকলের চেয়ে বড় ও সত্য বিভাগ, তাঁকে নিয়ে সম্পূর্ণ ছিল। আমার মনে হচ্ছে সেইখানে যেন ফাঁক পড়ে গেল।"[২১]

শন্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র গৌরগোপাল বাবু যৌবনে মোহনবাগান দলের প্রখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন। কর্মজীবনের প্রথম দিকে তিনি শান্তিনিকেতনে গণিতের শিক্ষক, পরে শ্রীনিকেতনের কর্মী। ১৯২৭ সালে বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। শ্রীনিকেতনের শিল্পভবনের কর্মকর্তা রূপেও তিনি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছিলেন। ১৯৪০ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

প্রেমচাঁদ লাল ছিলেন শ্রীনিকেতনের প্রথমদিকের একজন নিবেদিত-প্রাণ কর্মী। সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের মৃত্যুর পর তিনি শিক্ষাসত্রের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। ১৯২৯ সালে প্রেমচাঁদ লাল উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য ইংল্যান্ডে যান। দেশে ফিরে এসে তিনি পুনরায় শ্রীনিকেতনের কাজে যোগদান করেন। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাবিস্তার বাস্তবায়নে তাঁর এক বিশেষ ভূমিকা ছিল। ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত তিনি শ্রীনিকেতনে ছিলেন। শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন নিয়ে ইংরেজিতে তাঁর একটি গ্রন্থ আছে। এই গ্রন্থের নাম Reconstruction and Education in Rural India. রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছিলেন। এই গ্রন্থের মুখবন্ধে প্রেমচাঁদ লাল বলেন :

> "Of all the problems that India presents to-day, there are probably none so pressing, none so urgent, as the problems of rural reconstruction and rural education.
>
> In this study I have described what Tagore who is better known as a poet, philosopher, novelist, dramatist doing and has achieved with regard to these problems. Cities like Bombay and Calcutta donot represent India, and yet they have been exploiting the villages and living on them, hence the degraded condition of the Indian villages."[২২]

এই গ্রন্থে প্রেমচাঁদ লাল রবীন্দ্রনাথের 'সমবায়' পদ্ধতিকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে 'সমাবায়'ই একমাত্র পথ যা মানুষকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হতে সাহায্য করে। পুরো গ্রন্থটিতে রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন কার্যক্রমকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং এতেই যে ভারতের মুক্তি এমন সাহসী মন্তব্য করা হয়েছে।

শ্রীনিকেতনের কর্মীদের অন্যতম ছিলেন রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কৃষিবিজ্ঞানে শিক্ষালাভের জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁকে আমেরিকায় পাঠিয়েছিলেন। রথীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল শ্রীনিকেতনের সচিব ছিলেন। রথীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে বিশ্বভারতীর সাধারণ সম্পাদক এবং কর্মসচিব হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। ১৯৫১ সালে বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হওয়ার পর রথীন্দ্রনাথ উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। রথীন্দ্রনাথ নিজেও একজন সুলেখক এবং স্বভাব শিল্পী ছিলেন। কারুশিল্প ও চর্মশিল্পে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। শ্রীনিকেতনে কারুকাজমণ্ডিত চর্মশিল্পের প্রসার তাঁর আমলেই হয়েছিল। এক্ষেত্রে তাঁর স্ত্রী প্রতিমা দেবীরও অসামান্য অবদান ছিল। বস্তুত, রথীন্দ্রনাথের প্রতিভা পিতার জ্যোতির কাছে অনেকটাই নিস্প্রভ হয়ে পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন ভাবনা বাস্তবায়নে রথীন্দ্রনাথের অবদান নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। শিলাইদহ ও পতিসরে পল্লীউন্নয়নের ক্ষেত্রে পিতার আরব্ধ কাজকে তিনিই অনেকাংশে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যান। 'পিতৃস্মৃতি' তে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর অসামান্য ভালবাসা ও শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯৬১ সালের ৩রা জুন রথীন্দ্রনাথ পরলোক গমন করেন।

রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়নের অন্যতম রূপকার ছিলেন কালীমোহন ঘোষ। শিলাইদহে পল্লীউন্নয়নের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের ভাবনাকে তিনি সর্বপ্রথম প্রজাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। শিলাইদহ থেকে কালীমোহন ঘোষ শ্রীনিকেতনের কর্মী হিসেবে যোগদান করেন। স্বদেশী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েই তিনি শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়নের কাজে যোগদান করেন। তাঁর ছিল অসাধারণ সংগঠন শক্তি। শ্রীনিকেতনকে তিনি ঢেলে সাজিয়েছিলেন। গ্রামবাসীদের সংগে কালীমোহন ঘোষ অত্যন্ত আন্তরিকভাবে মেলামেশা করতেন এবং সুখে-দুঃখে তিনি সর্বদায় তাদের পাশে থেকেছেন। তাঁর বুদ্ধিমত্তা এবং প্রশাসনিক দক্ষতা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। শ্রীনিকেতনের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে তাঁর অবদান ছিল বিস্ময়কর। তিনি কিছুকাল বোলপুর ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি ছিলেন। এটিও ছিল তাঁর কর্মদক্ষতার নিদর্শন। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান কর্মী ছিলেন। শ্রীনিকেতনে কাজ করবার সময় তিনি পার্শ্ববর্তী গ্রামের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেন এবং সে সম্পর্কে সমীক্ষাপত্রও প্রকাশ করেন। আদিবাসীদের কল্যাণ, অস্পৃশ্যতা বর্জন ও হরিজন আন্দোলনে কালীমোহন অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লেখেন :

> "বিশ্বভারতীর ইতিহাসে কালীমোহন ঘোষের নাম চিরস্মরণীয় ; কারণ কবির গ্রাম-উদ্যোগ পর্বের প্রারম্ভ হইতে কালীমোহন ঘোষ যুক্ত হন।

> গ্রামসেবা তাহার ধর্ম ও কর্ম ছিল। চাকরিমাত্র ছিল না। রবীন্দ্রনাথ ভাবের বাহক, কিন্তু তাহার ভাবকে যাহারা রূপ দিয়েছেন তাহাদের অন্যতম হইতেছেন কালীমোহন।"[২৩]

১৯৪০ সালের ১২ই মে কালীমোহন বাবু পরলোক গমন করেন। তাঁর মৃত্যুর সময় রবীন্দ্রনাথ কালিমপংএ ছিলেন। তাঁর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে রবীন্দ্রনাথ কালীমোহন ঘোষের জ্যেষ্ঠ পুত্র শান্তিদেব ঘোষকে লেখেন :

> "তোমার পিতার মৃত্যু সংবাদে গুরুতর আঘাত পেয়েছি। শান্তিনিকেতনে আসবার পূর্ব থেকেই তাঁর সঙ্গে আমার একটি সম্বন্ধ ঘটেছিল। কর্মের সহযোগিতায় ও ভাবের ঐক্যে তাঁর সঙ্গে আমার আত্মীয়তা গভীরভাবে বিস্তার লাভ করেছিল। অকৃত্রিম নিষ্ঠার সঙ্গে আশ্রমের কাজে তিনি আপনার জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর আন্তরিক জনহিতৈষী শ্রীনিকেতনের নানা শুভকর কার্যে নিজেকে সার্থক করেছে।"[২৪]

শ্রীনিকতনের কাজে অনেক কর্মীই রবীন্দ্রনাথের সময়ে কাজ করেছেন। এঁদের মধ্যে শ্রীনিকেতনের উপসচিব সুকুমার চট্টোপাধ্যায় অন্যতম ছিলেন। তিনি সরকারি উচ্চপদের চাকুরি ছেড়ে ১৯৩৮ সালে শ্রীনিকেতনে যোগদান করেন। ১৯৪০-৪১ সালে বীরভূমে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এ সময়ে সুকুমার চট্টোপাধ্যায় ত্রাণ কাজে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। সুকুমার চট্টোপাধ্যায় একজন সুলেখক ছিলেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৩৯ সালে তাঁর সম্পাদনায় শ্রীনিকেতন থেকে 'দেশ বিদেশে' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল।

পরবর্তীকালে শ্রীনিকেতনের পল্লীউন্নয়ন ও সংগঠনের কাজে যাঁরা দায়িত্ব পালন করেন, তাঁদের মধ্যে নীলাদ্রি শেখর বসু, সরোজরঞ্জন চৌধুরী, ধীরানন্দ রায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এ সময় বীরভূম জেলার বেশ কয়েক জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা করেন। এদের মধ্যে মৌলবী আব্দুল হাকিম, কালিদাস রায়, অবিনাশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় এবং হংসেশ্বর রায় অন্যতম ছিলেন।

তথ্যসূত্র

১. কমলাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন পরিচয়, সুবর্ণরেখা, শান্তিনিকেতন, ১৩৩২, পৃ. ১২।
২. ঐ, প্রাগুক্ত, অজিতকুমার চক্রবর্তী, পৃ. ১৫।
৩. ঐ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫-১৬।
৪. ঐ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।
৫. সত্যদাস চক্রবর্তী, শ্রনিকেতনের গোড়ার কথা, সুবর্ণরেখা, কলিকাতা, ২য় সংস্করণ, ১৩৯৯, পৃ.৪।

৬. সত্যদাস চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।
৭. Perm Chand Lal, Reconstruction and Education in Rural India, London 1932, p. 41.
৮. Perm Chand Lal, op. Cit p. 42.
৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, পুনর্মুদ্রণ, পৌষ ১৩৯৪, পৃ. ৪৬-৪৭
১০. ঐ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯-৫০।
১১. Elmhirst L. K. Poet and Plowman, Visva-Bharati, Calutta 1975(Revised edition). Introduction, Surendranath Kar, P. 13-14.
১২. সত্যদাস চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫।
চিঠিটি রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার পাঁচ বৎসর পরে ১২৯৭ সালের ৯ সেপ্টেম্বর, জাভার বালি দ্বীপ থেকে।
১৩. প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৩৩ সাল, কলিকাতা।
১৪. সত্যদাস চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০-১১।
১৫. ঐ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।
১৬. ঐ প্রাগুক্ত পৃ. ২৪-২৬।
১৭. Elmihirst L. K, The Foundation of Sriniketan in Rabindranath Tagore, Pioneer in Education, op. Cit, P. 37-38.
১৮. সত্যদাস চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭-৪৮।
১৯. Elmhirst L. K. Foreword Poet and Plowman, Visva-Bharath, Calculta, P.9.
২০. সত্যদাস চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭-১৮।
২১. সত্যদাস চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।
২২. Prem Chand Lal, Reconstruct and Education in Rural India, with an introduction by Rabindranath Tagore, London, 1932, Preface, P.9
২৩. সত্যদাস চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।
২৪. ঐ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রীনিকেতনের ইতিহাস ও আদর্শ : রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়া

১৩৪৬ সালে রবীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতনের ইতিহাস ও আদর্শ সম্পর্কে শ্রীনিকেতনের কর্মীদের একটি সভায় বক্তব্য দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্যে পল্লীউন্নয়ন সম্পর্কে তাঁর ভাবনার সূত্রপাত এবং কি কারণে তিনি এই কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন ইত্যাদি তাঁর এই বক্তব্যে প্রকাশ পেয়েছে। শ্রীনিকেতন যে তাঁর এই অভিজ্ঞতার ফসল এমনটি ধারণা করতে আমাদেরও কষ্ট হয় না। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে রবীন্দ্রনাথ পূর্ববাংলায় ঠাকুর-এস্টেটের জমিদারি দেখাশুনার দায়িত্ব না পেলে হয়তো পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচী তাঁর মাথায় আদৌ আসতো না। তিনি ছিলেন জমিদার পরিবারের সন্তান, ঐশ্বর্যে এবং বিত্ত সাহচর্যে তিনি মানুষ হয়েছেন। কিন্তু পরিবারের চৌহদ্দীতে বসবাসের সময়ে তাঁর চিত্তের মুক্তি জোটে নি। এটি হয়েছিল যখন তিনি পূর্ববাংলায় জমিদারি দায়িত্ব নিয়ে প্রথমে শিলাইদহ এবং পরে সাজাদপুর ও পতিসরে গিয়েছিলেন। তখন একদিকে গ্রামবাংলার নদ-নদী, প্রকৃতি তাঁকে আনন্দ দিয়েছে, তিনি মুগ্ধ চিত্তে তাঁর সৌন্দর্যকে প্রাণভরে অবলোকন করেছেন; অপরদিকে, এ সবের মধদিয়ে যখন তিনি গ্রামের মানুষের নিত্যদিনের দুঃখ-শোকের সংগে পরিচিত হয়েছেন তখন তাঁর বুকটা বেদনার ভরে গেছে। শুধুমাত্র জমিদার হলে হয়তো এই দুঃখ-শোকে তেমন তীব্র হয়ে বুকে বাজতোনা, কিন্তু কবি হওয়ায় তাঁর অন্তদৃষ্টি মানুষের হৃদয়ের গভীরে পৌঁছে গেছে, সেখানে তিনি নিজেকে নিয়ে বড় বিব্রত বোধ করেছেন। মনে অপরাধবোধ সৃষ্টি হয়েছে, তাই কখনো-কখনো তিনি তাঁর জমিদারের খোলশটাকে সরিয়ে ফেলতে চেয়েছেন। রথীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখেছেন দায়িত্ব সচেতন হবার জন্য। তাঁর নিজের অন্তরে যে ঝড় ওঠে নি- তা নয়, তাইতো তিনি গ্রাম বাংলাকে ছেড়ে কলকাতার বিলাসিতায় নিজেকে ডুবিয়ে দিতে পারেন নি। গ্রাম বাংলার দুঃখ-দারিদ্র্যের মূল কারণ হিসেবে তিনি যথার্থ শিক্ষার অভাবকেই বড় বেশি লক্ষ্য করেছিলেন। লক্ষ্য করেছিলেন যারা প্রচলিত শিক্ষায় শিক্ষিত তারা গ্রামকে অবজ্ঞা করে শহরের বাসিন্দা হয়ে পড়েছে, তারা অতঃপর গ্রামও গ্রামের মানুষকে অবজ্ঞা এবং ঘৃণা করতে

শিখেছে- -তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে।

রবীন্দ্রনাথ পুরাতন বিধি না মানলেও ইতিহাস, ঐতিহ্যকে তিনি কখনও অস্বীকার করেন নি। বরং বলা চলে, এ সবের মধ্যে যে জীবনের পরিচয় তিনি পেয়েছিলেন তিনি নূতন করে বুঝতে চেয়েছিলেম। এই ইতিহাস চেতনা তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছে। তিনি লক্ষ্য করেছেন অতীতে বাংলাদেশের সমৃদ্ধি কথা। বুঝেছিলেন গ্রামীণ ঐতিহ্যে সমবায়ের প্রভাব। কিন্তু তাঁর কালে তিনি লক্ষ্য করলেন কিভাবে মানুষ মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ধনী-নির্ধন, বিত্তবান এবং বিত্তহীন সকলেই একে অপর থেকে অনেক দূরে। যাদের অর্থ রয়েছে, তারা গ্রাম ছেড়ে শহরে বসবাস করছে। অথচ গ্রামই তাদের খরচ জুগিয়ে আসছে নিজে না খেয়েই। তিনি লক্ষ্য করলেন গ্রামের মানুষ অজান্তেই গ্রামের ধনী এবং বিত্তবানকে ঈর্ষা এবং হিংসা করতে শিখেছে। একে অপরের প্রতি এই ঈর্ষা-বিদ্বেষ থাকার কারণে তারা তাদের নিজের ভালোকেউ বুঝতে শেখে নি। শ্রীনিকেতনের ইতিহাস ও আদর্শ বলতে গিয়ে তিনি বারবার পিছনে ফিরে গেছেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন কিভাবে জরা- মৃত্যু বন্যায়, অনাহারে তারা তিলে তিলে শেষ হয়ে যাচ্ছে অথচ কিসে তাদের উন্নতি হবে এই বোধটি তাদের ভেতরে আসে নি। হিন্দুদের মধ্যেই তিনি এই বিচ্ছিন্নতা খুব বেশি দেখতে পেয়েছিলেন। সে দিক থেকে মুসলমানেরা ছিল অনেকটাই মুক্তবুদ্ধি সম্পন্ন এবং মানবতাবাদী। হিন্দুদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ লেখাপড়ার প্রতি আদৌ কোন আগ্রহ দেখতে পান নি, সেক্ষেত্রে তিনি মুসলমান প্রজাদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি গভীর আগ্রহ দেখতে পেয়েছিলেন। এ কারণে যখন হিন্দুদের কাছ থেকে বেশ আঘাত পেয়েছেন, ঠিক সেই সময়ে মুসলমানেরাই তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়াছে। শিলাইদহে তিনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অভাব দেখতে পেয়েছিলেন এবং তা হিন্দুদের মধ্যেই বেশি মাত্রায় ছিল। এবং সে কারণে শিলাইদহে রাখীবন্ধনে মুসলমানকেও তিনি পাশে পেয়েছেন। পতিসরে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানেরাই তাঁকে সাহায্য করেছে। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য ইস্কুলে তিনি যে শিক্ষা দেবার অভিপ্রেত করেছিলেন তাকেই তিনি প্রথমে শিলাইদহ এবং পরে পতিসের বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন।

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে শিক্ষার ধারাই ছিল ভিন্ন। প্রকৃতির নিকট থেকে জ্ঞানলাভ করেই তাঁর জীবনের শুরু এমন চিন্তা রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রবিষ্ট করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে তা সম্ভব হয় নি। অথচ শিলাইদহে 'ব্রতীবালক' 'হিতৈষীসভা' এবং 'মণ্ডলী' প্রথা গঠন করে, তিনি অনেকটাই তা সম্ভব করে তুলেছিলেন। পতিসরেই এই শিক্ষা অধিক মাত্রায় সফল হয়েছিল। এ কারণে তিনি শ্রীনিকেতনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। অবশেষে শান্তিনিকেতনের শিক্ষাসত্রকে তিনি শ্রীনিকেতনে সরিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। মানুষে মানুষে বিভেদের বিষ যে কত মারাত্মক হতে পারে শিলাইদহে প্রজাদের উন্নয়ন করতে গিয়ে তিনি তা দেখতে পেয়েছিলেন।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে রবীন্দ্রনাথ যখন পূর্ববাংলায় ঠাকুর-এস্টেটের জমিদার এবং শিলাইদহের কুঠিবাড়িকে কেন্দ্র করে জমিদারির অন্যত্র অর্থাৎ সাজাদপুর এবং পতিসরের জমিদারি কাজ তদারকি করছেন, সে সময়ে তিনি শ্রীনিকেতনে একটি বাড়ি ক্রয় করেন। পূর্ববাংলায় তিনি যে পল্লীউন্নয়নের কাজ শুরু করছিলেন সে কাজই তিনি শ্রীনিকেতনে করতে চেয়েছিলেন। কারণ, তিনি জানতেন পূর্ববাংলায় তাদের জমিদারি দীর্ঘদিন থাকবেনা। শ্রীনিকেতন নিয়েই তাঁর অনেক স্বপ্ন ছিল এবং এখানে পল্লীউন্নয়ন কর্মকাণ্ডে তিনি যে সফল হতে পারেন এমন আশা তাঁর ছিল। এজন্যে শান্তিনিকেতনে তাঁর শিক্ষা ব্যবস্থা যখন বাধাগ্রস্ত হল, তখন শ্রীনিকেতনের সংগে সে ব্যবস্থাকে যুক্ত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকে কেবল বই-পুস্তকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করেন নি একে তিনি জীবনের সংগে যুক্ত করে এ শিক্ষাকে প্রকৃতির বিষয় বলে গণ্য করেছিলেন। শ্রীনিকেতনে তাঁর প্রবর্তিত 'শিক্ষাসত্রের' পাশাপাশি বিভিন্ন কর্মকাণ্ড এই আদর্শেও কথা প্রমাণিত করে।

অনেকেই রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ ও পতিসরের পল্লীউন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে অসফল বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্ত প্রকৃত অর্থে এখানে তাঁর কাজ আপাত ব্যর্থ মনে হলেও তাঁর সাফল্যের বীজও এখানেই নিহিত ছিল। শিলাইদহ এবং পতিসর ছিল তাঁর গবেষণাগার— পরীক্ষ— নিরীক্ষার স্থান। এখানকার অভিজ্ঞতা নিয়েই তিনি শ্রীনিকেতনকে শ্রীমণ্ডিত করতে পেরেছিলেন। শ্রীনিকেতনে সাফল্যের পেছনে এল্‌মহার্স্ট, ডরোথী এবং এদেশের বেশ কয়েক জন নিষ্ঠাবান কর্মীদের আত্মত্যাগ ও আত্মনিবেদন যে মুখ্য ছিল তা অস্বীকার করা চলে না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচীকে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলে গণ্য করেন নি, তিনি এই উন্নয়নকে সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং জাতীয়চেতনার বিকাশ হিসাবে গণ্য করে এর মধ্যে এক নূতন নেতৃত্বে সম্ভাবনাময় তাকেও উপলব্ধি করেছিলেন। এজন্যেই তিনি উপলব্ধি করিছিলেন— একটি গ্রাম জাগালেই একটি দেশ জাগবে। রবীন্দ্রনাথের এই সফলতা গান্ধীকেও মুগ্ধ করেছেছিল। রবীন্দ্রনাথের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সাধারণের মধ্যে তার সকল অভাববোধের সচেতনতা সৃষ্টি। সাধারণ মানুষ যে অপরের হাতে ক্রীড়নক নয়, তার যে নিজের অস্তিত্ব আছে— যার প্রতি বিশ্বাস তাকে আত্মসচেতন এবং আত্মমর্যাদাবান করে গড়ে তুলবে— এই বোধশক্তিকেই রবীন্দ্রনাথ জাগাতে চেয়েছিলেন। একারণে তিনি অসুস্থ হয়েও প্রজাদের রোগ নিবারণের জন্য তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর কাছে এই কাজ ধর্মের মত পবিত্র ছিল এবং সে জন্য তিনি অন্য সব কাজকে ফেলে রেখে সাধারণ মানুষের মুখে হাসি ফোটাবার জন্য তাদের মাঝে এসেছিলেন। সাধারণ মানুষ অভাবী। তাই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসারও প্রসার ঘটিয়েছেন তিনি। তবে তার পাশাপাশি আধুনিক চিকিৎসাকেও তাদের জন্য প্রয়োগ করেছেন। শিলাইদহে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনা সাধারণ মানুষের চিকিৎসার ক্ষেত্রে একটি বাস্তব পদক্ষেপ ছিল। পল্লীউন্নয়নে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নয়নকে তিনি অর্থনৈতিক উন্নয়ন থেকেও

অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে বুঝেছিলেন। সব থেকে বড় যে কথা, তিনি তাঁর জমিদারিতে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে দুঃখ এবং নিরানন্দভাব দেখেছিলেন তা দুর করতে তিনি মেলা ও উৎসবের প্রচলন করেছিলেন। এর ফলে হিন্দু-মুসলমান জাতি ধর্মনির্বিশেষে একত্রে মিলতে পারবে এবং এসবের মধ্য দিয়েই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গড়ে উঠবে এমন বিশ্বাস তাঁর হয়েছিল। তখন গ্রাম আপনার মহিমা নিয়েই জেগে উঠবে এবং তার ফলে গ্রাম- স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করতে আর দেরি হবে না। রবীন্দ্রনাথ পল্লীউন্নয়ন কাজকে ধর্ম মনে করেই এ কাজে কোন প্রচার চান নি। তিনি বলেছেন এ কাজ যার দেখার তিনি যদি তা দেখে সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন তবেই তিনি সার্থক। শ্রীনিকেতন ছিল রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন এবং সাধনা। তিনি বলেছেন,

> 'আমার জীবনের যে দুটি সাধনা, এখানে হয়তো তার একটি সফল হবে। কবে হবে, কেমন করে হবে, তখন তা জানতুম না। অনুর্বর ক্ষেত্রেও বীজ পড়লে দেখা যায় হঠাৎ একটি অঙ্কুর বেরিয়েছে, কোনো শুভ লগ্নে। কিন্তু তখন তার কোনো লক্ষণ দেখা যায় নি। সব জিনিসেরই তখন অভাব। তারপর আস্তে-আস্তে বীজ অঙ্কুরিত হতে চলল। ... গ্রামের কাজের দুটো দিক আছে। কাজ এখান থেকে করতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাও করতে হবে। এদের সেবা করতে হলে শিক্ষালাভ করা চাই।... .আমি একলা সমস্ত ভারতবর্ষের দায়িত্ব নিতে পারব না। আমি কেবল জয় করব একটি বা দুটি ছোট গ্রাম। এদের মনকে পেতে হবে। এদের সঙ্গে একত্রে কাজ করবার শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। সেটা সহজ নয়, খুব কঠিন কৃচ্ছসাধন। আমি যদি কেবল দুটি-তিনটি গ্রামকেও মুক্তি দিতে পারি অজ্ঞতা অক্ষমতার বন্ধন থেকে। তবে সেখানেই সমগ্র ভারতের একটি ছোটো আদর্শ তৈরি হবে— এই কথা তখন মনে জেগেছিল। এখনও সেই কথা মনে হচ্ছে।এই গ্রামকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করতে হবে— সকলে শিক্ষা পাবে, গ্রাম জুড়ে আনন্দের হাওয়া বইবে, গানবাজনা কীর্তন- পাঠ চলবে, আগের দিনে যেমন ছিল। তোমরা কেবল কখানা গ্রামকে এইভাবে তৈরী করে দাও। আমি বলব এই কখানা গ্রামই আমার ভারতবর্ষ। তাহলেই প্রকৃতভাবে ভারতকে পাওয়া যাবে।"[১]

শ্রীনিকেতনকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্য শুধু ঐতিহাসিকই নয়, সকল কালের সকল উন্নয়নকর্মী এবং দেশপ্রেমিকের জন্যে ছিল আদর্শের কথা। রবীন্দ্রনাথের উন্নয়ন চিন্তা কোনোভাবেই খণ্ডিত ছিল না। তাঁর উন্নয়নচিন্তা ছিল মানুষকে নিয়ে— তার পরিপূর্ণ বিকাশের মধ্যেই ছিল তার সার্থকতা। উন্নয়ন বলতেই রবীন্দ্রনাথ বঝেছিলেন মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ। তা সম্ভব হতে পারে যদি প্রকৃতির দেওয়া জ্ঞানকে নিজের মেধা ও বুদ্ধির সংগে মিলিয়ে মানুষের কল্যাণে তাকে প্রয়োগ করা যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পল্লীউন্নয়ন কর্মকাণ্ডে এইটিই ঘটাতে চেয়েছিলেন। এ কাজে তিনি পরিপূর্ণ সফল না হতে পারলেও একথা নিঃসন্দেহে সত্য যে তিনি একটি অবকাঠামো নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। লিওনার্ড

নাইট এল্‌মহার্স্ট শ্রীনিকেতনের ইতিহাস বলতে গিয়ে তার মূলভিত্তি প্রসংগে বলেন :

> In 1890 Rabindranth Tagare, then aged twenty- nine, was sent to take charge of the family estate in East Bengal. He went to live at Shelaidah and came, he said, for the first time into direct touch with the people of the villages, with their sufferings and with their many problems of cultivation, of credit and marketing. There, too he listened to their songs, their drmas and their festivals, But, he said, too often they came to him as zeminder and landlord, or to the District Collector, like beggars, unable seemingly, to stand on their own feet as free and independent individuals. This experience he never forgot. Ten years later, when he was nearing forty, he moved with his family from Calcutta to Santiniketan, to start his school there. From then on certain ideas were clearly engraved in his mind; to try to rescue children from some of the frustrations he had suffered as a boy in the name of education; to cultivate and develop the arts of life-poetry, song, drama, movement in dance and design; lastly, to discover whether or not the Bengal villager could learn to stand upright on his own sturdy feet and begin to solve at least some of his many problems for himself "[২]

এই উদ্দেশ্যেই সাধারণ গ্রামবাসীর মধ্যে জীবনঘনিষ্ঠ জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার জন্যই রবীন্দ্রনাথ সুরুল অঞ্চলে একটি বাড়ি কিনে সেখানেই শ্রীনিকেতন গড়ে তুলেছিলেন। এই কাজে এল্‌মহার্স্ট এবং ডরোথীস্ট্রেইট নামে এক মহিলা রবীন্দ্রনাথের পাশে এসে দাঁড়ান। ডরোথী রবীন্দ্রনাথকে আর্থিক অনুদান দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। পরে এল্‌মহার্ষ্ট এবং ডরোথী পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। লিওনার্ড এল্‌মহার্স্ট শ্রীনিকেতনে আসবার পর লক্ষ্য করেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ প্রতিনিয়ত তাঁর স্বপ্ন ও সাধনাকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে কত দূর হিম-সিম খাচ্ছেন। এই সংগে রবীন্দ্রনাথ এল্‌মহার্স্টকে বলেন :

> "The villages around my school at Sriniketan in West Bengal seem to me, he said, 'to be dying. Yet all of them, Hindu, Muslim and primitive Santal, show signs that they once enjoyed a decent economic and social condition and a culture that no longer survives, The villagers too seem quite unable to help themselves... "[৩]

সাধারণ মানুষের প্রতি রবীন্দ্রনাথের এই ভালবাসা এবং তাদের উন্নয়ন-চিন্তা রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে পীড়িত করছিল। বিশেষ করে শিলাইদহ ও পতিসরে তাঁর অসমাপ্ত কাজকে তিনি একটি পূর্ণাঙ্গরূপ দেবার জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন। সে কারণেই এল্‌মহার্স্টের ভারতে আসা এবং রবীন্দ্রনাথের কাজকে ত্বরান্বিত করার জন্য শ্রীনিকেতনের দায়িত্ব গ্রহণ। এল্‌মহার্স্টের মতে 'শ্রীনিকেতন' নামকরণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ নিজে। এলমহার্স্ট বলেন, প্রথম দিকে শ্রীনিকেতনকে তাঁরা Institute of Rural Reconstruction বলে অভিহিত করতেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথই এই নাম পাল্টে শ্রীনিকেতন রেখেছিলেন। এ প্রসংগে তিনি উল্লেখ করেন :

> "On 5th February, 1922, with a small staff and some ten college students, all of whom said they wanted to be farmers, we set out for the village of Surul and took up residence on the poet`s farm. We fixed up our latrines, started gardens, houses and workshops, defeated the marauding monkeys and settled in. After some months we called ourselves 'An Institute of Rural Reconstruction' but we were later named by Tagore, Sriniketan, which Sanskrit for the 'Abode of Plenty.'

এল্‌মহার্স্ট উল্লেখ করেন যে এসময়ে মহাত্মা গান্ধী ভারতীয় কংগ্রেসের মাধ্যমে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্যে আন্দোলন করেছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথকে তাঁর এই আন্দোলনে সহযোগী করতে চাইলে রবীন্দ্রনাথ তা নাকচ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের কাজ নিয়েই অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন এবং শিক্ষার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের উপায় উদ্ভাবনে ব্রতী ছিলেন। অবশেষে জীবনের শেষ দিকে গান্ধীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের একটি সহমর্মিতার ভাব লক্ষ্য করা গেছে। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথ নিজেকে কখনও সরাসরি রাজনীতিব সংগে জড়াতে চান নি, যদিও দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর পথ গান্ধীর পথ থেকে ভিন্ন হলেও, তাঁর দেশপ্রেম ছিল প্রশ্নাতীত। রবীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতনে নূতন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন। এই শিক্ষা গতানুগতিক এবং প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। প্রাকৃতিকজীবন এবং মানবজীবনকে তিনি মেলাতে চেয়েছিলেন। তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন বহিরঙ্গে প্রকৃতি যে নিয়ম নীতিতে অগ্রসরমান, তা থেকে মানবজীবন স্বতত্র নয়। প্রকৃতি প্রতিনিয়ত মানুষকে শিক্ষা দিয়ে চলেছে। এই প্রসংগে ওয়ার্ডসওয়ার্থের Education of Nature কবিতাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ওয়ার্ডসওয়ার্থ সারাজীবন প্রকৃতির কাছ থেকে শিখেছেন এবং রবীন্দ্রনাথও তাঁর ব্যতিক্রম নন। তবে এখানে বলা চলে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির শিক্ষা নিয়েছেন শিশুকাল থেকেই। কিন্তু ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রকৃতির শিক্ষা নিলেও তিনি প্রচলিত শিক্ষাকে অস্বীকার করেন নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই শিক্ষাভাবনায় রথীন্দ্রনাথকেও দীক্ষিত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেন :

"শিলাইদহে বিশ্বপ্রকৃতির নিকট সান্নিধ্যে রথীন্দ্রনাথ যে রকম ছাড়া পেয়েছিল সেরকম মুক্তি তখনকার কালের সম্পন্নঅবস্থার গৃহস্থেরা আপন ঘরের ছেলেদের পক্ষে অনুপযোগী বলেই জানত এবং তার মধ্যে যে বিপদের আশঙ্কা আছে তারা ভয় করত তা স্বীকার করতে। রথী সেই বয়সে ডিঙি বেয়েছে নদীতে। সেই ডিঙিতে করে চলতি স্টীমার থেকে সে প্রতিদিন রুটি নামিয়ে আনত, তাই নিয়ে স্টীমারের সারঙ আপত্তি করেছে বার বার। চরে বন-ঝাউয়ের জঙ্গলে সে বেরত শিকার করতে— কোনোদিন বা ফিরে এসেছে সমস্ত দিন পরে অপারাহ্নে তা নিয়ে ঘরে উদবেগ ছিল না তা বলতে পারি নে, কিন্তু সে উদবেগ থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্যে বালকের স্বাধীন সঞ্চরণ খর্ব করা হয় নি। যখন রথীর বয়স ছিল ষোলোর নিচে তখন আমি তাকে কয়েক জন তীর্থযাত্রীর সঙ্গে পদব্রজে কেদারনাথ ভ্রমণে পাঠিয়েছি, তা নিয়ে ভৎর্সনা স্বীকার করেছি আত্মীয়দের কাছে থেকে, কিন্তু একদিকে প্রকৃতির ক্ষেত্রে অন্যদিকে সাধারণ দেশবাসীদের সম্বন্ধে যে কষ্টসহিষ্ণু অভিজ্ঞতা তার শিক্ষার অত্যাবশ্যক অঙ্গ বলে জানতুম তার থেকে তাকে স্নেহের ভীরুতাবশত বঞ্চিত করি নি।"[৫]

এই ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন সেই ব্যবস্থায় নিজের সন্তানকে দিয়েই তার প্রথম পাঠ শেষ করেছিলেন তিনি। 'আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখাও'। রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন এটাকে মেনে চলতেন। তাঁর শিক্ষাসত্র জীবনঅন্বিষ্ট ছিল এবং মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ সেখানে সম্ভব ছিল। পল্লীউন্নয়নে তিনি শিলাইদহে, পতিসরে এবং সর্বশেষ শ্রীনিকেতনে তাঁর শিক্ষা-চিন্তাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়ে তাকে জীবনে প্রয়োগ করতে চেয়েছেন।

পৃথিবী তাঁকে কবি হিসেবেই কেবল দেখেছে। কিন্তু তিনি যে একজন মহৎপ্রাণ কর্মযোগী ছিলেন যিান তাঁর সারাজীবনকে দুঃখ-শোকে ভরা সাধারণ মানুষের কল্যাণে উৎসর্গিত করেছিলেন, তা পৃথিবী দেখে নি। ফলে তাঁর জীবনের এই শ্রেষ্ঠতম দিকটি অনেকটাই অনালোচিত রয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতনে যে শিক্ষার প্রচলন করতে চেয়েছিলেন তা মানুষকে মানুষের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় না, বরং তা খুব কাছে টেনে নেয়। রবীন্দ্রনাথ বলেন :

"মানুষ বন্ধুকে চায়, যারা সুখে দুঃখে আমার আপন, যাদের কাছে বসে আলাপ করলে খুশি হই, যাদের বাপমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ছিল, যাদের আমার পিতৃস্থানীয় বলে জেনেছি, যাদের ছেলেরা আমার পুত্রসন্তানের স্থানীয়। এ-সব পরিমণ্ডলীর ভিতর মানুষ আপনার মানবত্বকে উপলব্ধি করে।"[৬]

রবীন্দ্রনাথ পল্লীকে ভালবেসেছিলেন তার আলো-হাওয়ায় বেড়ে উঠা মানুষের জন্য— যারা ক্ষুদ্রত্বের ঊর্ধ্বে উঠতে অনেক ক্ষেত্রে পারেনি, কারণ তারা তা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে নি তাদের অশিক্ষার কারণে। প্রকৃতিগত শিক্ষালাভের চোখও তাদের ছিল না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জমিদারিতে এসব

মানুষের কাছ থেকে কম আঘাত পান নি, কিন্তু যে মুহূর্তে তিনি তাদের এই দুর্বলতা থেকে মুক্ত করতে পেরেছেন তখন তারা তাদের জীবনকেই উৎসর্গ করেছে তার কাছে। শিলাইদহ, সাজাদপুর এবং পতিসরে এমন অনেক ঘটনাই ঘটেছে।

রবীন্দ্রনাথ পল্লীর সমাজকে দেখেছেন নগর সমাজের প্রেক্ষিতে। মানুষ সমাজে বসবাস করে। এই সমাজের মধ্যে সে নিজের আশ্রয় পায় পরস্পরের সংগে যোগাযোগের কারণে। সে তখন নিজেকে পায় তার প্রতিবেশীর মধ্যে। সে আর একাকী নয়— তার সমাজ অনেক বড়। এই সমাজের সংগে তার সম্পর্ক তাকে শক্তি যোগায়, আনন্দ দেয়। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন পল্লীতে মানুষ কষ্ট পেয়েছে। তাদের নির্বুদ্ধিতার কারণে ঘরদোর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তখনও সে একাকী হয় নি। কিন্তু শহরে তা হয় না। রবীন্দ্রনাথ বলেন :

"শহরে মানুষ কখনো ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধযুক্ত হতে পারে না। দূরে যাবার দরকার নেই— কলিকাতা শহর, যেখানে আমরা থাকি, জানি প্রতিবেশীর সঙ্গে সেখানে প্রতিবেশীর সুখে দুঃখে বিপদে আপদে কোনো সম্বন্ধ নেই। আমরা তাদের নাম পর্যন্ত জানি নে।"[৭]

এই তো শহরের শিক্ষিত সমাজ। এ শিক্ষা মানুষকে কেবল দূরে ঠেলতে শিখিয়েছে। একে অপরের মধ্যে বিভেদের জাল বুনে শোষণের পথকে সুগম করেছে। পল্লীউন্নয়নের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের মনের মধ্যে নিয়ত একটি স্বপ্ন কাজ করত। এই স্বপ্ন ছিল অতীতের গ্রামকে ঘিরে। রবীন্দ্রনাথ এই পল্লী সম্বন্ধে বলেন :

"আমি পল্লীর কথা বলছি, কিন্তু মনে রেখ— পল্লীই তখন সব। শহর তখন নগণ্য বলতে চাই না, কিন্তু গৌণ, মুখ্য নয়, প্রধান নয়। পল্লীতে পল্লীতে কত পণ্ডিত, কত ধনী, কত মানী, আপনার পল্লীকে জন্মস্থানকে আপনার করে বাস করেছে। সমস্ত জীবন হয়তো নবাবের ঘরে, দরবারে কাজ করেছে। যা কিছু সম্পদ তারা পল্লীতে এনেছে। সেই অর্থে টোল চলেছে, পাঠশালা বসেছে, রাস্তাঘাট হয়েছে, অতিথিশালা যাত্রা পূজার্চনায় গ্রামের মন প্রাণ এক হয়ে মিলেছে। গ্রামে আমাদের দেশের প্রাণ প্রতিষ্ঠা ছিল, তার কারণ গ্রামে মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সামাজিক সম্বন্ধ সেটা সত্য হতে পারে। শহরে তা সম্ভব নয়। অতএব, সামাজিক মানুষ আশ্রয় পায় গ্রামে।... এখনকার সংগে তুলনা করলে অনেক অভাব আমাদের দেশে ছিল। এখন আমরা কলের জল খাই, তাতে রোগের বীজ কম, ভালো ডাক্তার পাই, ডাক্তারখানা আছে; জ্ঞানবিজ্ঞানের সাহায্যে অনেক সুযোগ ঘটেছে। আমি তাকে অসম্মান করি না। কিন্তু আমাদের খুব একটা বড় সম্পদ ছিল, সে আত্মীয়তা। এর চেয়ে বড় সম্পদ নেই।"[৮]

রবীন্দ্রনাথ পল্লীর মধ্যে মানুষের হৃদয় খুঁজে পেয়েছিলেন। রক্তের সম্পর্কের বাইরে যে আত্মীয়তা তা সমস্ত গ্রাম ঘিরেই ছিল। রবীন্দ্রনাথ পল্লীউন্নয়নের মধ্যে

গ্রামের সামাজিকতা এবং আত্মীয়তার বন্ধনকে দৃঢ় করতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেন:

> "সমস্ত পশ্চিম মহাদেশে মানুষে মানুষে আত্মীয়তা অত্যন্ত ভাসা-ভাসাতার গভীর শিকড় নেই। সকলে বলছে, 'আমি ভোগ করব, আমি বড় হব, আমার নাম হবে, আমার সুনাম হবে।' যে তা করেছে তার কত বড়ো সম্মান।... কিন্তু আমাদের দেশে দেখবে আত্মদানের ঐশ্বর্য। একি কমকথা। এর থেকে বুঝি আমাদের দেশের লোক কী চায়। পাণ্ডিত্য নয়, ঐশ্বর্য নয়, আর কিছুই নয়, চায় মানুষের আত্মার সম্পদ।
>
> কিন্তু দিনে-দিনে তা পরিবর্তন হয়ে এসেছে। আমি গ্রামে অনেক দিন কাটিয়েছি, কোনোরকম কটুবাক্য বলতে চাইনে। গ্রামের যে মূর্তি দেখেছি সে অতি কুৎসিত। পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষা বিদ্বেষ ছলনা বঞ্চনা বিচিত্র আকারে প্রকাশ পায়। মিথ্যা মকদ্দমার সাংঘাতিক জালে পরস্পরকে জড়িয়ে মারে। সেখানে দুর্নীতি কতদূর শিকড় গেড়েছে তা চক্ষে দেখেছি।"[৯]

রবীন্দ্রনাথ যে গ্রামের স্বপ্ন দেখেছিলেন বর্তমানের গ্রামে আর তা নেই। জমিদারি তদারকিতে গ্রামে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তা উপলব্ধি করেছেন। তাই তিনি অতীতের সেই স্বপ্নের গ্রামকে ফিরিয়ে আনতে চান। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন গ্রামের উন্নয়ন ঘটাতে হলে গ্রামকে বিচ্ছিন্ন করলে চলবে না। বর্তমানে নগরায়ণের প্রভাব পড়েছে গ্রামে। ফলে গ্রাম বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। মানুষ মানুষকে আজ আঘাত করে চলেছে। একক চিন্তাই প্রবল হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ তাই গ্রামবাসীকে লক্ষ্য করে বলেন:

> 'মনের মধ্যে উৎকণ্ঠা নিয়ে আজ এসেছি, গ্রামবাসী তোমাদের কাছে। পূর্বে তোমরা সমাজ বন্ধনে এক ছিলে, আজ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে পরস্পরকে কেবল আঘাত করছ।
>
> আর একবার সম্মিলিত হয়ে তোমাদের শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে। বাহিরের আনুকূল্যের অপেক্ষা কোরো না। শক্তি তোমাদের মধ্যে আছে জেনেই সেই শক্তির আত্মবিস্মৃতি আমরা ঘোচাতে ইচ্ছা করছি। কেন না তোমাদের সেই শক্তির উপর সমস্ত দেশের দাবি আছে।"[১০]

রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছার প্রকাশ ঘটেছে এখানে। রবীন্দ্রনাথ পল্লীউন্নয়নে গ্রামের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কামনা করেছেন ঠিকই কিন্তু কেবলমাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়ন যে গ্রামের মুক্তি আনতে পারে না সে কথা তিনি স্পষ্টতই বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন। পাশ্চাত্য আজ অর্থনৈতিক উন্নতিতে শক্তিধর। সমস্ত পৃথিবী বলতে কি আজ তার করতলগত। কিন্তু সে তার পাশবিক বিস্তার— সেখানেই মনুষ্যত্বের কোনো উন্নতিই সাধিত হয় নি। রবীন্দ্রনাথ পল্লীউন্নয়নে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সংগে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটাতে চেয়েছেন।

কিন্তু এই মনুষ্যত্বের বিকাশ সম্ভব কেবলমাত্র শিক্ষায়। প্রকৃতির কাছ থেকেই

যথার্থ শিক্ষা নেওয়া সম্ভব। রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষাসত্র' এই শিক্ষারই অবকাঠামো। গোটা শ্রীনিকেতন এই শিক্ষারই প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠবে— রবীন্দ্রনাথ তা চেয়েছিলেন। এই শিক্ষা একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হবার শিক্ষা নয়। এ শিক্ষা সকলের সংগে সকলকে যুক্ত করে। সমবায়ের মধ্যেই এই শিক্ষার সার্থকতা রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে। এখান থেকেই শিক্ষা নিয়ে ছাত্রেরা গড়ে তুলবে তাদের গ্রাম। শ্রীনিকেতন হয়ে উঠবে জনসাধারণের সেই আত্মশক্তি— সমবায়ের সাধনা।

কিন্তু এই বোধকে জাগ্রত করা সহজ কথা ছিল না। পাশ্চাত্য শিক্ষা এই বোধকে অনেকাংশে তুলে নিয়েছে। রাজনীতিবিদদের অনেকের মধ্যে যে এই বোধ ছিল না রবীন্দ্রনাথ তা প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই তাঁদের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ বলেন :

> "দেশে জন্মালেই দেশ আপন হয় না। যতক্ষণ দেশকে না জানি, যতক্ষণ তাকে নিজের শক্তিতে জয় না করি, ততক্ষণ সে দেশ আপনার নয়।"[১১]

রবীন্দ্রনাথ তাই সকলকেই, যারা দেশ নিয়ে ভাবে, দেশের জন্য কাজ করতে চায়, দেশকে পরিপূর্ণভাবে দেখবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। বলেছেন, দেশের কাজ দেশাত্মবোধের বাগবিস্তারে হয় না। এর জন্য ত্যাগের প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন দেশের সমস্যাকে যথাযথভাবে চিহ্নিত করণের জন্য। কারণ, 'রোগজীর্ণ শরীর কর্তব্য পালন করতে পারে না। 'এই ব্যাধি যেমন দারিদ্র্যের বাহন, তেমনি আবার দারিদ্রও ব্যাধিকে পালন করে।'[১২] রবীন্দ্রনাথ বলেন :

> 'আমরা পারি, রোগ দূর করা অসাধ্য নয়'... আমাদের মনে রাখতে হবে, যারা নিজেদের রক্ষা করতে পারে না দেবতা তাদের সহায়তা করেন না। দেবা: দুর্বল ঘাতকা: দুর্বলতা অপরাধ। কেননা তা বহুল পরিমাণে আত্মকৃত, সম্পূর্ণ আকস্মিক নয়। দেবতা এই অপরাধ ক্ষমা করেন না।'[১৩]

রবীন্দ্রনাথ গ্রামের উন্নয়নে গ্রামের মানুষের অংশ-গ্রহণকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে গ্রামের এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ দূর করতে পারে যারা গ্রামে বসবাস করে। কিন্তু গ্রামের মানুষ অজ্ঞানতা ও অশিক্ষার কারণে এই কাজ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। নিজেদের দুর্বলতার কারণে সে পরনির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। জমিদার ও বিত্তবান গ্রামের কাজ করে দেবেন— এমন ধারণা তার মধ্যে থাকায় সে নিজের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হয়ে পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ গ্রামের মানুষের মধ্যে আত্মশক্তিকে জাগিয়ে দিতে চেয়েছেন। তাকে অপরের করুণার পাত্র না করে আত্মমর্যাদাশীল মানুষে পরিণত করতে চেয়েছেন। পল্লীউন্নয়নের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ মানুসের এই উন্নয়নকেই কামনা করেছেন। মানুষকে তিনি জনশক্তি হিসেবে গণ্য করেছেন। শ্রীনিকেতন ছিল এই জনশক্তির যথার্থ উদ্বোধন।

বাস্তবিক অর্থে রবীন্দ্রনাথের শ্রীনিকেতন ছিল একটি উন্নয়নধর্মী প্রতিষ্ঠান। 'শিক্ষসত্র' ছিল এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণ। রবীন্দ্রনাথ গ্রাম-উন্নয়নে যে সব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং যেভাবে সমাধানের উপায় নির্ধারণ করেছিলেন তাঁর সে সব অভিজ্ঞতা নিয়ে গড়ে উঠেছিল শ্রীনিকেতন। অতঃপর শ্রীনিকেতনকে পূর্ণতাদান করেন এল্‌মহার্স্ট ও কতিপয় বিশ্বস্ত কর্মী— একথা ইতোপূর্বেই বলা রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতনের আশেপাশের গ্রামে পল্লীউন্নয়নের কাজ করেছিলেন। এ সব গ্রামের মানুষকে হাতেকলমে কাজ শিখিয়েছিলেন শ্রীনিকেতনে। শ্রীনিকেতনের মাধ্যমে তিনি যে বার্তাটি সকলের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন তা হলো, দেশকে আপন করে উপলব্ধি করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ দুঃখ করে বলেন :...

> "এমন একদিন ছিল যখন পল্লীবাসী, অর্থ্যাৎ প্রকৃতপক্ষে দেশের জনসাধারণ, কেবল যে দেশের ধনের ভাগী ছিল তা নয়, দেশের বিদ্যা ও তারা পেয়েছে নানা প্রণালি দিয়ে। এরা ধর্মকে শ্রদ্ধা করেছে, অন্যায় করতে ভয় পেয়েছে, পরস্পরের প্রতি সামাজিক কর্তব্যসাধনের দায়িত্ব স্বীকার করেছে। দেশের জ্ঞান ও ধর্মের সাধনা ছিল এদের সকলের মাঝখানে, এদের সকলকে নিয়ে।
>
> সেই দেওয়া-নেওয়া সর্বব্যাপী সম্বন্ধ আজ শিথিল।এই সম্বন্ধ-ক্রটির মধ্যেই আছে অবশ্যম্ভাবী বিপ্লবের সূচনা। একধারেই সব-কিছু আছে, আর এক ধারে কোনো কিছুই নেই, এই ভার সামঞ্জস্যের ব্যাঘাতে সভ্যতার নৌকা কাত হয়ে পড়ে। একান্ত অসামোই আনে প্রলয়।"[১৪]

রবীন্দ্রনাথ আশঙ্কা করেছেন, যারা গ্রামকে অবহেলা করেছে তারা নিজেদেরকেই বঞ্চিত করেছে। আমাদের পরীক্ষায় পাস-করা পুঁথিগত বিদ্যার অভিমান গ্রামের সহজ সরল মানুষের কাছ থেকে আমাদেরকে সরিয়ে নিয়ে এসেছে। আমরা নগর তৈরি করেছি— গ্রামকে লুণ্ঠন করে। এখনও গ্রাম আমাদের সহায়তা দেয় খাদ্য ফলমুল দিয়ে। এখানেও আমরা তাদের শোষণ করি। এ সবের মধ্য দিয়ে আমাদের 'ঋণই যে পুঞ্জীভূত হচ্ছে তা নয়, শাস্তিও উঠছে জমে।

রবীন্দ্রনাথ পল্লীউন্নয়নের কাজে নিবেদিত হয়েছিলেন অন্তরের টানে। অন্তরের টানেই তিনি কবি হয়েছিলেন। তাঁর কবিতা লেখার মূলে ছিল 'মানুষ'। ধনীর সন্তান বলে নয়, কবির অন্তর ছিল বলেই তিনি মানুষের দুঃখকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেন:

> 'আমার সেদিনকার মনের আক্ষেপ কেবল যে কোনো কোনো কবিতাতেই প্রকাশ করেছিলুম তা নয়, এই লেখনীবাহন কবিকে অকস্মাৎ টেনে এনেছিল দুর্গম কাজের ক্ষেত্রে।"[১৫]

শ্রীনিকতনে পল্লীউন্নয়নের কাজ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন :

> "খুব বড়ো একটা চাষের ক্ষেত্র পাব এমন আশাও ছিল না, কিন্তু বীজ বপনের একটুখানি জমি পাওয়া যেতে পারে এটা অসম্ভব মনে হয়নি।

> বীরভূমের নীরস কঠোর জমির মধ্যে সেই বীজবপন কাজের পত্তন করেছিলুম।... কর্মের প্রথম উদ্যোগকালে কর্মসূচী আমার মনের মধ্যে সুস্পষ্ট নির্দিষ্ট ছিল না। বোধ করি আরম্ভের এই অনির্দিষ্টতাই কবি সুলভ।"[১৬]

রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়নের একটি পরিকল্পনা ছিল। শ্রীনিকেতন ছিল এই পরিকল্পনার ফসল। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ ও পতিসরে কাজ করতে গিয়ে লক্ষ্য করেছিলেন, 'পল্লীকে বাইরে থেকে পূর্ণ করবার চেষ্টা কৃত্রিম, তাতে বর্তমানকে দয়া করে ভাবীকালকে নিঃস্ব করা হয়। আপনাকে আপন হতে পূর্ণ করবার উৎস মরুভূমিতে পাওয়া যায়, সেই উৎস কখনো শুষ্ক হয় না। পল্লীবাসীদের চিত্রে সেই উৎসের সন্ধান করতে হবে।'[১৬]

রবীন্দ্রনাথ এই উৎস খুঁজতে গিয়ে গ্রামের মানুষকে প্রথমেই সঙ্গবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। সে কারণে গ্রামের জনশক্তিকে সমবায় প্রথায়— একীভূত করতে চেয়েছিলেন। এজন্যেই তিনি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। শ্রীনিকেতনের আশেপাশের গ্রামে রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে পেরেছিলেন। কিন্তু পল্লীউন্নয়নের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ যে বিষয়টির প্রতি অধিক গুরুত্ব অর্পণ করেছিলেন তা এর উৎসবের দিক। রবীন্দ্রনাথ বলেন :

> সৃষ্টিকাজে আনন্দ মানুষের স্বভাবসিদ্ধ, এইখানেই সে পশুদের থেকে পৃথক এবং বড়ো। পল্লী যে কেবল চাষবাস চালিয়ে আপনি অল্প পরিমাণে খাবে এবং আমাদের ভূমি পরিমাণে খাওয়াবে তা তো নয়। সকল দেশেই পল্লী সাহিত্য, পল্লীশিল্প, পল্লীগান, পল্লীনৃত্য নানা আকারে স্বত:স্ফূর্তিতে দেখা দিয়েছে। কিন্তু আমাদের আধুনিক কালে বাহিরে পল্লীর জলাশয় যেমন শুকিয়েছে, কলুষিত হয়েছে, অন্তরে তার জীবনের আনন্দ -উৎসবেরও সেই দশা। সেই জন্য যে রূপ সৃষ্টি মানুষের শ্রেষ্ঠধর্ম, শুধু তার থেকে পল্লীবাসীরা যে নির্বাসিত হয়েছে তা নয়, এই নিরন্তর নীরবতার জন্যে তারা দেহ প্রাণেই মরে। প্রাণে সুখ না থাকলে প্রাণ আপনাকে রক্ষার জন্যে পুরো পরিমাণ শক্তি প্রয়োগ করে না, একটু আঘাত পেলেই হাল ছেড়ে দেয়।"[১৮]

রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন 'সৃষ্টির আনন্দ প্রবাহে পল্লীর শুষ্কচিত্তভূমিকে অভিষিক্ত করতে।' এই প্রসংগে শ্রীনিকেতনের একটি ঘটনা তিনি উল্লেখ করেছেন:

> "একটা দৃষ্টান্ত দিই। কাছের কোনো গ্রামে আমদের মেয়েরা সেখানকার মেয়েদের সূচিশিল্প শিক্ষার প্রবর্তন করেছিলেন। তাদের কোনো একজন ছাত্রী একখানি কাপড়কে সুন্দর করে শিল্পিত করেছিল। সে গরিব ঘরের মেয়ে। তার শিক্ষয়িত্রীরা মনে করলেন ঐ কাপড়টি যদি তাঁরা ভালো দাম দিয়ে কিনে নেন তাহলে তার উৎসাহ হবে এবং উপকার হবে। কিনবার প্রস্তাব শুনে মেয়েটি বললে, 'এ আমি বিক্রী করব না।' এই-যে আপন মনের সৃষ্টির আনন্দ, যার দাম সকল দামের বেশি, একে অকেজো বলে উপেক্ষা করব নাকি ? এই

আনন্দ যদি গভীরভাবে পল্লীর মধ্যে সঞ্চার করা যায় তা হলেই তার যথার্থ আত্মরক্ষার পথ করা যায়। যে বর্বর কেবলমাত্র জীবিকার গণ্ডিতে বাঁধা, জীবনের আনন্দ-প্রকাশে যে অপটু, মানসলোকে তার অসম্মান সকলের চেয়ে শোচনীয়। আমাদের কর্মব্যবস্থায় আমরা জীবিকার সমস্যাকে উপেক্ষা করি নি, কিন্তু সৌন্দর্যের পথে আনন্দের মহার্ঘতাকেও স্বীকার করেছি।... সচ্ছলতার পরিমাপে সংস্কৃতির পরিমাপ একেবারে বর্জনীয়। তহবিলের ওজন-দরে মনুষ্যত্বের স্থাপন বন্টন করা বনিকবৃত্তির নিকৃষ্টতম পরিচয়।"[১৯]

রবীন্দন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতনে যে কর্মমন্দির নির্মাণ করেছিলেন তা তাঁর এই মনোভঙ্গির কারণে। রবীন্দ্রনাথ ভয় পেয়েছিলেন, তাঁর এই কাজ পরবর্তীতে কি বন্ধ হয়ে যাবে। কেউ-কেউ এ প্রশ্ন তুলেছিলেনও, তাঁর মৃত্যুর পরপরই শ্রীনিকেতন তার আদর্শ হারিয়ে ফেলতে পারে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, এ দায়-ভাগতো একা তাঁর নয়। অতঃপর তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন :

"তোমরা স্বদেশের প্রতীক। তোমাদের দ্বারে আমার প্রার্থনা, বাজার দ্বারে নয়, মাতৃভূমির দ্বারে। সমস্ত জীবন দিয়ে আমি যা রচনা করেছি দেশের হয়ে তোমরা তা গ্রহণ করো। এই কার্যে এবং সকল কার্যেই দেশের লোকের অনেক প্রতিকূলতা পেয়েছি। দেশের সেই বিরোধীবুদ্ধি অনেক সময় এই বলে আস্ফালন করে যে শান্তিনিকেতনে শ্রীনিকেতনে আমি যে কর্মমন্দির রচনা করেছি আমার জীবিতকালের সঙ্গেই তার অবসান। এ কথা সত্য হওয়া যদি সম্ভব হয় তবে তাতে কি আমার অগৌরব, না তোমাদের ? তাই আজ আমি তোমাদের এই শেষ কথা বলে যাচ্ছি, পরীক্ষা করে দেখো একাজের মধ্যে সত্য আছে কি না, এর মধ্যে ত্যাগের সঞ্চয় পূর্ণ রয়েছে কিনা। পরীক্ষায় যদি প্রসন্ন হও তা হলে আনন্দিত মনে এর রক্ষণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করো, যেন একদা আমার মৃত্যুর তোরণদ্বার দিয়েই প্রবেশ করে তোমাদের প্রাণশক্তি একে শাশ্বত আয়ু দান করতে পারে।"[২০]

রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্য ১৩৪৫ সালের ২২ অগ্রাহায়ণে প্রদত্ত। তাঁর মৃত্যুর ৬৩ বৎসর পরও শ্রীনিকেতন এবং শান্তিনিকেতন দাঁড়িয়ে আছে। নানা বৈভব, ঐশ্বর্য যোগ হয়েছে সেখানে। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী অনেকটাই দর্শনীয় স্থান হয়ে পড়েছে। এর মধ্যেও কিছু কর্মী এখনও আছেন যাঁরা রবীন্দ্রনাথের আদর্শকে ধারণ করে আছেন। চেষ্টা নিচ্ছেন রবীন্দ্রনাথের আরব্ধ কাজটিকে যুগোপযোগী করে তোলা যায় কি না। শ্রীনিকতেনে আমি এ প্রচেষ্টা দেখেছি। কিন্তু তথাপি বলতে হয়, রবীন্দ্রনাথ যেমনটি করে শ্রীনিকতেনকে গড়ে তুলেছিলেন আজকের শ্রীনিকেতন সে আদর্শকে অনেককাংশেই ভুলতে বসেছে। এখন অর্থের প্রাচুর্য হয়তো এসেছে, কিন্তু প্রাণের প্রাচুর্যের সেখানে বেশ অভাব। রবীন্দ্রনাথ গ্রামের যে পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন আজ তা অর্থনৈতিক দিক থেকে অগ্রসরমান হলেও প্রাণের দৈন্য সেখানে ক্রমশ: ঘনীভূত হচ্ছে। যে আনন্দ ধারা রবীন্দ্রনাথ গ্রামে বইয়ে দিতে চেয়েছিলেন, তাঁর জীবদ্দশায় তা প্রাণসঞ্চার করতে পারলেও

বর্তমানে সে ধারা ক্রমান্বয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে। শ্রীনিকেতন বিচ্যুত হয়ে পড়েছে রবীন্দ্রনাথের আদর্শ থেকে। এ অগৌরবের বোঝাতো আমাদেরই টানতে হবে।

তথ্যসূত্র

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পল্লীপ্রকৃতি, শ্রীনিকেতনের ইতিহাস ও আদর্শ, প্রগযুক্ত, পৃ. ১০৪
২. Elmhirst, LK Rabindranath Tagore, Poineer in Education, The Foundation of Sriniketan, London, W.I ; P. 18
৩. Elmhirst. LK, po. Cit. Preface. Rabindranath Taqore, P. 10.
৪. Elmhirsl. LK, op. Cil. p. 11
৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আশ্রমের রূপও বিকাশ, প্রাগুক্ত, প্র. ৪০-৪১
৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পল্লীপ্রকৃতি, গ্রামবাসীদের প্রতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯.
৭. ঐ পল্লী প্রকৃতি, গ্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮
৮. ঐ, " পৃ. ৭২-৭৩
৯. ঐ " পৃ. ৭৩
১০. ঐ " দেশের কাজ পৃ. ৭৬
১১. ঐ " ঐ পৃ. ৭৬
১২. ঐ " " পৃ. ৭৭
১৩. ঐ " উপশিক্ষা পৃ. ৮৪
১৪. ঐ " অভিবাদন পৃ. ৯০
১৫. ঐ " " পৃ. ৯০
১৬. ঐ " " পৃ. ৯১
১৭. ঐ " " পৃ. ৯১-৯২
১৮. ঐ " " পৃ.৯২-৯৩
১৯. ঐ " " পৃ. ৯৪-৯৫